প্রথম প্রকাশক : ১৩৬২

প্রকাশক :

মৈনাক ঘোষাল, প্রমীলা প্রকাশনী

মুদ্রাকর :

নিউ কমলা প্রেস,

শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ

৫৭/২ কেশব সেন ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

সম্পাদকের কথা

প্রবন্ধ আর 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ, সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে দুই ভিন্ন জাতের রচনা। আকৃতিগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও প্রকৃতিগত পার্থক্য এ-দুয়ের মধ্যে অনেকখানি। প্রবন্ধে যে-আলোচনা একান্তভাবে বিষয়বস্তুতেই নিবদ্ধ, রসরচনায় সে-আলোচনা লেখকের আমেজি মনের জারক রসে জারিত হয়ে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। পাঠকের সামনে সে তার বক্তব্য বিষয়কে এমনভাবে তুলে ধরে যা সম্পূর্ণ তারই সৃষ্টি, যাতে থাকে একটা বুদ্ধিদীপ্ত মনের কলা-কৌশল, সজীব হৃদয়ের স্পর্শে যা অনুপ্রাণিত। শুধু কথার অর্থটুকু নয়, শুধু কথার গঠন ও ভঙ্গির রূপটিও নয়, কথা-বলিয়েরই মনের সেই রূপ এবং চিন্তার সেই ভঙ্গিটিই এখানে লক্ষ করা যায়, যেটা একান্তভাবে তাঁরই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তাঁর ভাবনার ঘরোয়া সম্পদ। এই বিশেষ আকর্ষণ থাকে বলেই এ-জাতীয় রচনা আজ সাহিত্যের দরবারে বিশিষ্ট আসন অধিকার করে বসেছে। বিষয়-বস্তুর তাৎপর্যের তুলনায় রমণীয়তাই এ-ক্ষেত্রে বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে; এই রচনাকে তাই রসসাহিত্য বলেও অভিহিত করা যায়।

'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধের অন্যতম গুণ হচ্ছে, লেখকের ব্যক্তিত্বের বিভায় সর্বদাই তা ঝলমল করছে। লেখক তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য খুব বেশি ব্যস্ত নন। এ-লেখার পিছনে থাকে সৃষ্টির আনন্দ, কোনও উদ্দেশ্যের তাগিদ এতে তেমন থাকে না, আর থাকলেও তা পাঠকের মনের উপর জবরদস্তভাবে চাপানোর কোনও স্পৃহা এর নেই। এ যেন ভেসে-চলা মেঘ; ক্ষণে-ক্ষণে তার রূপ বদলায়, ক্ষণে-ক্ষণে তাতে রঙ ধরে। ক্ষণিকের জন্য হলেও এই রূপ ও রঙের খেলায় প্রতিমুহূর্তেই জেগে উঠছে চিরন্তনের মাধুরী। প্রবন্ধ-সাহিত্য বর্ষার জলভারাক্রান্ত মেঘমেদুর আকাশ, আর 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ শরৎ-আকাশের লঘুপক্ষসঞ্চারী হালকা মেঘের মেলা। প্রবন্ধসাহিত্য প্রকাশ, রসসাহিত্য বিকাশ।

'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আলোচনাকে সম্পূর্ণ করবার কোনও স্থির প্রয়াস লেখকের মনে থাকে না। যে-কোনও বিষয়কে পাঠকের সামনে তুলে ধরে তার উপর লেখক খেয়ালখুশি নানা রঙের আলো ফেলতে থাকেন; এর জন্যে পাঠকের কাছে তাঁর কোনও জবাবদিহির দরকার হয় না। যুক্তি এখানে অনেকটা শিথিল, ঢিলেঢালা। তাঁর বক্তব্য বিষয়ের সপক্ষে প্রমাণ দেওয়া বা না-দেওয়া সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছা। তর্ক করে আর যুক্তি দিয়ে বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত করতে হবে, এমন কোনও অঙ্গীকার পাঠকের কাছে লেখকের দেওয়া নেই। লেখক শুধু চান তাঁর আনন্দ-প্রবৃত্তি আর সৃষ্টি-বাসনার কাছে সত্যনিষ্ঠ থাকতে। তাঁর ব্যক্তিগত মনের কাছে এই নিষ্ঠা রক্ষা করে ঘরোয়া ব্রতের মত আনন্দের সন্ধান চরিতার্থ করেই তিনি নিশ্চিন্ত।

আগেই বলেছি, লঘু-নিবন্ধ বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ যে-নামেই একে অভিহিত করুন-না কেন, এ হচ্ছে শরৎ-আকাশের নিরুদ্দেশ মেঘ। যদি কোনও উদ্দেশ্য এর পিছনে লুকিয়ে থাকে তো সে হচ্ছে শিল্পীর নিজেকে প্রকাশ করার বাসনা, লেখার বিষয়কে প্রকাশ করা নয়। বিষয়টা শিল্পীর বা লেখকের একটা অবলম্বন মাত্র। তা বলে এ-রকম যেন ধারণা না হয় যে, 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ মানেই নিজের সম্বন্ধে নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবে কিছু লিখতে হবে অথবা 'আমি'র আধিক্য দিয়ে রচনা ভরিয়ে তুলতে হবে। বিষয়বস্তু এ-লেখার বড় আকর্ষণ নয়, এর আকর্ষণ নিহিত রয়েছে সেই বিষয় সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব মনোভাবে এবং সেই মনোভাবকে তিনি পাঠকের কাছে কেমন করে তুলে ধরছেন তার উপর। অর্থাৎ 'কী বলছেন', আর 'কী ভাবে বলছেন', সাহিত্য-রসিক পাঠকের কাছে দুয়ের আকর্ষণই সমান।

লেখক যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করে পাঠককে কোণঠাসা করবেন বা তাঁকে সম্পূর্ণ পরাস্ত

করবেন, পাঠক তা কখনই লেখকের কাছে আশা করেন না, পাঠক চান তাঁর মন লেখকের ভাবনার সঙ্গী হয়ে নিঃসীম শূন্যে সময়হারা উদ্দেশ্যহীন ভেসে চলুক, সেখানে প্রয়োজনের তাগিদ তাঁকে তাড়না করে ফিরবে না।

পাঠকের সঙ্গে লেখকের এই আলাপচারিতে লেখকের স্বকীয়তার ছাপ খুব স্পষ্ট থাকে। জীবনের গুণ-ভাবের সমাবেশ তাঁর রচনায় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পাঠকের কাছে তাঁর চরিত্র এই জন্যেই মধুর, এই জন্যেই তাঁকে জানবার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। রসসাহিত্যিকের কাজই হচ্ছে আমাদের চিরপরিচিত জগতের মধ্যে এমন-সব সত্তার আবিষ্কার করা যা দেখেও আমরা দেখি না, জেনেও আমরা জানি না। লেখক এখানে শিল্পীর আসনে বসে চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেন যে, তুচ্ছের মধ্যেও কী বিরাটের মহিমা অঙ্কুরিত হয়ে আছে। জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কত বিষয়ে দৃষ্টিবিমুখ আমাদের মন তাই এ-জাতীয় সাহিত্য-প্রয়াসে উজ্জ্বল নক্ষত্র আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে, এক নূতন অনুভূতি-স্পর্শে আমরা বিহ্বল হই।

'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধের প্রধান যে-লক্ষণগুলি তার সংজ্ঞা নিরূপণে সহায়তা করে, এখানে তার একটু আলোচনা করে রাখলে এই সংকলনের বিভিন্ন লেখক ও তাঁদের রচনা সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা করে নেওয়া কষ্টকর হবে না। প্রথমত, রচনার বিষয়-নির্বাচনে কোনও জাতবিচার মানলে চলবে না। গুরুগাম্ভীর বিষয় এবং বহুবার-বহু-লেখক-আলোচিত বিষয় থেকে আরম্ভ করে আপাতদৃষ্টিতে যা ক্ষুদ্র, সাধারণ, চুটকি, মামুলি বলে মনে হয়, তারাও এ-জাতীয় সাহিত্যে সমান পঙ্‌ক্তিতে মাথা উঁচু করেই বসতে পারে। অর্থাৎ জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না ; ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ-এর আবেদন এবং তুচ্ছের মধ্যেই মহত্ত্বের আস্বাদ লেখকেরাই জাগিয়ে তোলেন। কলকাতা থেকে কলতলা, বড়বাজার থেকে বড়াখাম্বা, চৌরঙ্গী থেকে চৌবাচ্চা, মান থেকে পাণ, শোবার ঘর থেকে সমুদ্রতীরে—বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে এই অবাধ বিচরণ একমাত্র রসসাহিত্যেই সম্ভব। লেখকরাও এর মধ্যে মুক্তির আস্বাদ পান, পাঠকরা পান লেখকদের অন্তরঙ্গভাবে কাছে পাবার আনন্দ।

লঘুনিবন্ধের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পড়বার সময় পাঠকের একবারও মনে হবে না যে, এ-লেখা কষ্টকল্পিত। শুধু যে তার ভঙ্গিটুকুই সহজ সাবলীল তা-ই নয়, এর চলার গতিতেও ছন্দ আছে ; সে ছন্দ মৃদু কিন্তু ম্রিয়মাণ নয়, গ্রন্থিহীন কিন্তু শিথিল নয়।

কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার তাড়া নেই, যুক্তিতর্কের শাসন উদ্যত করে পাঠককে কোনও বিশেষ একটি তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবার দৃঢ়সংকল্প বা মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ নেই। বস্তুত এ-জাতীয় সাহিত্যরচনায় লঘুরস বা হিউমার-এর উৎস একটা কোমল সমবেদনার উৎস থেকে বেশি দূরে নয়। কারণ লেখক যে-চাক থেকে মধু আহরণ করেন তার আশ্রয় হল মানুষের অন্তর-প্রকৃতির এক নিভৃতের উপবন, যেখানে জীবনের সহজ আবেগ ও ভাবগুলি একসঙ্গে মেলা করে থাকে। সেখানে লঘু-গুরু হাসি-অশ্রুর বাস পাশাপাশি।

সাহিত্য-জগতে যে-সব জাতি সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তার মধ্যে ফরাসি আর ইংরেজ সর্বাগ্রগণ্য। ছোটগল্প, উপন্যাস, জীবনীসাহিত্য, গবেষণামূলক সাহিত্য ও প্রবন্ধসাহিত্যে এই দুই দেশের কাছে বাংলাসাহিত্য অশেষ ঋণে ঋণী, এ-কথা অনস্বীকার্য। এই দুই দেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়-সাধনের ফলে বাংলাসাহিত্যে আরেকটি আগ্রহের উন্মেষ দেখা দিয়েছিল। প্রবন্ধেও একটি সুরসিত রূপ সৃষ্টির আগ্রহ। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের বাতায়ন-পথে এক শতাব্দী 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ তথা লঘু নিবন্ধ রচনার প্রেরণা হয়ে যে-আলোকরশ্মি দেখা দিয়েছিল, তাকে প্রথম অভ্যর্থনা জানালেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধও যেমন রচনা করেছিলেন, অপর দিকে তেমনি লঘু প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। তাঁর হাতেই এ-জাতীয় রচনার নতুন ভঙ্গি ও পদ্ধতির সূত্রপাত ; তার পরে বহু সাহিত্যসাধকের অনলস প্রয়াসে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ পার হয়ে আজ তা বাংলাসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় সম্পদে পরিণতি লাভ করেছে। সাহিত্যের এই বিশেষ দিকটি কালে-কালে কীভাবে ভাষা, বিষয়বস্তু, মননশীলতা এবং আঙ্গিকের দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসরমান, তার ধারাবাহিক ইতিহাসটুকু তুলে ধরা এই সংকলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাভাষা ও শৈলীর ক্রমবিকাশও এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে

পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়োজন আমি অনুভব করেছি।

সংবাদপত্রের আওতায় আরেক ধরনের রসসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, 'জার্নালিস্টিক লিটারেচর' নামে যা আজকাল জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচারিত। সে-ধরনের রচনাকে এই সংকলনে স্থান দেওয়া হয়নি। তার একমাত্র কারণ, সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন পাবার দাবি সে রাখে না। সাময়িক প্রয়োজনের তাগাদায় রচিত বলেই সময় পার হয়ে গেলে তার রঙও ফিকে হয়ে যায়। যে কয়েকজন লেখকের রচনাকে এই সংকলনে স্থান দেওয়া হয়েছে, প্রবন্ধসাহিত্যে তাঁরা প্রায় সকলেই সিদ্ধহস্ত ; বিশেষভাবে রসসাহিত্যরচনায় তাঁদের সযত্ন প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। বিষয়বস্তু-নির্বাচনে, ভাষার করণকৌশলে, বলবার কায়দায় এঁদের অধিকাংশই রসসাহিত্য-রচনার নিজস্ব স্টাইল গড়ে তুলেছেন, যার প্রভাব সাম্প্রতিককালের তরুণতম সাহিত্যিকদের মধ্যে স্পষ্টতই উপস্থিত। এ-ছাড়া এমন কয়েকজন সাহিত্যিক আছেন, আমি জানি, যাঁদের গদ্যরচনারীতি বাংলা সাহিত্যে সম্পদ বলে বিবেচিত ; তাঁদের এ-জাতীয় রসসাহিত্য আমার নজরে পড়েনি এবং বহু অনুসন্ধান করেও যথাসময়ে আমি সংগ্রহ করতে পারিনি।

পরিশেষে, 'পরমরমণীয়'র পাঠকদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, বাংলাভাষায় এ-ধরনের রসসাহিত্য-সংকলন ইতিপূর্বে আর হয়নি। প্রথম প্রচেষ্টা বলেই এর দুরূহতা আমাকে প্রতিপদেই বাধাগ্রস্ত করেছে। এ-বইয়ের সম্পাদনা-কার্যে তাই কিছু দোষত্রুটি থেকে গেল, সবিনয়ে তা স্বীকার করে নিয়ে পাঠকদের ক্ষমাশীল সহানুভূতি প্রার্থনা করছি।

৭ আষাঢ়
১৩৬২ বঙ্গাব্দ

রম্যরচনাটিকে 'পরমরমণীয়' গ্রন্থের এই নতুন সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করলাম। এই রম্যরচনাটির শিরনামাও শ্রীমান্ কল্যাণের প্রদত্ত। রচনা এবং নাম—এই দুইয়ের জন্যই তাঁর কাছে আমার স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা এই সুযোগে জানিয়ে রাখি।

এই সংকলনকার্যে আমার যে-দু'জন সাহিত্যানুরাগী অনুজপ্রতিম বন্ধু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন তাঁদের একজন কবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ও অপরজন সুনীল দাস। রচনা নির্বাচনের ও 'প্রেস-কপি' তৈরির কাজে প্রণব নানাভাবে আমার শ্রম লাঘব করেছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে-লেখক পরিচিতি—বহু শ্রম স্বীকার করে সেটি তৈরি করে দিয়েছেন আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্মী সুনীল। এঁদের দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	ব্রজবিলাস	১৫
রাজনারায়ণ বসু	জেঠামো	১৮
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পালামৌর পর	২০
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বুড়া বয়সের কথা	২২
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	সোনায় সোহাগা	২৬
চন্দ্রনাথ বসু	কোকিল	৩০
কালীপ্রসন্ন ঘোষ	রসিকতা	৩২
অক্ষয়চন্দ্র সরকার	গগন-পটো	৩৫
নবীনচন্দ্র সেন	প্রথম অনুরাগ	৩৮
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	নক্ষত্রদের বৌ	৪০
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	পূর্ণিমার শশী	৪৩
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	মান	৪৯
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	তৈল	৫১
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	শীত সুন্দরী	৫৩
জগদীশচন্দ্র বসু	হাজির	৫৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মন	৫৭
শরৎকুমারী চৌধুরানী	মেয়ে-যজ্ঞি	৬০
স্বামী বিবেকানন্দ	হাঙর	৬৩
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	বসন্ত পঞ্চমী	৬৬
প্রমথ চৌধুরী	বর্ষা	৬৮
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পান	৭০
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	বোলতা ও মধ্যাহ্ন	৭৫
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিচরণ	৭৯
শশিশেখর বসু	লিচুফল	৮৫
চারুচন্দ্র দত্ত	শিকার প্রসঙ্গ	৮৯
রাজশেখর বসু	ভেজাল ও নকল	৯৩
অতুলচন্দ্র গুপ্ত	গণেশ	৯৭
সুকুমার রায়চৌধুরী	ক্যাবলের পত্র	৯৯
দিবাকর শর্মা	অভিসার	১০২
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	বৈকালী	১০৫
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	স্টোভ	১০৯
জ্যোতির্ময় ঘোষ	খিচুড়ি	১১৩
কাজী নজরুল ইসলাম	আমার সুন্দর	১১৬
পরিমল গোস্বামী	বিজ্ঞাপন	১২০
প্রমথনাথ বিশী	গোরুর গাড়ি	১২৩
শিবরাম চক্রবর্তী	চিত্রকলা	১২৬
ইন্দ্রজিৎ	গদ্য আর পদ্য	১২৯
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	বিরল মুহূর্ত	১৩৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র	খোকার খেলনা	১৩৯
অন্নদাশঙ্কর রায়	চিঠির কথা	১৪১
সৈয়দ মুজতবা আলী	বই কেনা	১৪৩
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	হট্টশ্রী	১৪৭
প্রবোধকুমার সান্যাল	শোবার ঘর	১৫৩
অজিত দত্ত	ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকা	১৫৬

লীলা মজুমদার	আরেক দিন	১৫৯
বুদ্ধদেব বসু	খাকি	১৬৯
পরিমল রায়	ভেগোলজি	১৭৩
সুবোধ ঘোষ	মধুমালার দেশ	১৭৯
যাযাবর	পত্রসাহিত্য	১৮১
জ্যোর্তিময় রায়	ইন্‌সম্‌নিয়া	১৮৪
সুভো ঠাকুর	পোষা পাখি নয়—পোষা পাথর	১৮৭
সুশীল রায়	চৌবাচ্চা	১৯১
কালপেঁচা	যদি	১৯৪
রঞ্জন	"আমি"	১৯৭
সন্তোষকুমার ঘোষ	বাসা-বদল	১৯৯
বিমল কর	আঁচল	২০১
পত্রনবীশ	ছদ্মনাম	২০৪
রূপদর্শী	কামরাডেয়ারি	২০৯
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	অবসর	২১৪
ইন্দ্রমিত্র	ইহুদিরঙ্গ	২১৭
হিমানীশ গোস্বামী	হারিয়ে যাওয়া ঘোড়ার গাড়ি	২২৩
সুনীল বসু	গোপন সম্মোহন	২৩২
শ্রীপান্থ	অরওয়েল ও চপ্পল	২৩৮
নীললোহিত	ঘড়ি	২৪৪
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	তিন টুকরো আমি	২৫১
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	শশধর, হাক্সলি অ্যান্ড গুজ	২৫৭
নবনীতা দেবসেন	শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর	২৬৬
জয় গোস্বামী	শরতে আজ কোন অতিথি	২৮০
অমলেন্দু বসু	বাংলায় রম্যরচনা	২৮৮
	লেখক-পরিচিতি	২৯১

পরমরমণীয়

ব্রজবিলাস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ব্রজবিলাস নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু, গ্রাহকবর্গের আগ্রহনিবৃত্তি হয় নাই। এ-জন্য অনেকের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, এই মহাকাব্য পুনরায় মুদ্রিত করিতে হইল।

ফাজিলচালাকেরা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মত বিজ্ঞ, বোদ্ধা, যোদ্ধা ভূমণ্ডলে আর নাই। তাঁহারা যে-বিষয়ে যে-সিদ্ধান্ত করেন, অন্যে যাহা বলুক, তাঁহাদের মতে, অভ্রান্ত ও অকাট্য। শুনিতে পাই, আমার এই ক্ষুদ্র মহাকাব্যখানি অনেকের পছন্দসই জিনিস হইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও শুনিতে পাই, ফাজিলচালাকেরা রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বিদ্যাসাগর লিখিত। যাঁহারা সেরূপ বলেন, তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন আনাড়ি, তাহা, এক কথায় সাব্যস্ত করিয়া দিতেছি।

এক গণ্ডা মাস অতীত হইল, বিদ্যাসাগর বাবুজি, অতি বিদকুটে পেটের পীড়ায় বেয়াড়া জড়ীভূত হইয়া পড়িয়া লেজ নাড়িতেছেন, উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই। এ-অবস্থায় তিনি এই মজাদার মহাকাব্য লিখিয়াছেন, এ-কথা যিনি রটাইবেন, অথবা এ-কথায় যিনি বিশ্বাস করিবেন, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত, তাহা সকলে স্ব-স্ব প্রতিভাবলে অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমার প্রথম বংশধর "অতি অল্প হইল" ভূমিষ্ঠ হইলে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া কোনও মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন, এই পুস্তকখানি কি আপনার লিখিত? তিনি কোনও উত্তর না দিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। তাহাতে অনেকে মনে করিতেন, তবে ইঁহারই লিখিত। বিদ্যাসাগর মহোদয় সেরূপ চালাকি খেলেন কিনা ইহা জানিবার জন্য, এবার আমি চতুর চালাক বিশ্বস্ত বন্ধুবিশেষ দ্বারা, তাঁহার নিকট ঐরূপ জিজ্ঞাসা করাইব। দেখি, তিনি, পূর্বোক্ত মহোদয়ের মত, ঈষৎ হাসিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, অথবা, আমার লিখিত নয় বলিয়া, স্পষ্ট বাক্যে উত্তর দেন। যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে তিনি "না বিয়াইয়া কানাইব মা" হইতে চাহিবেন, সে-ধরনের জন্তু নহেন।

অধিকন্তু, তিনি ভাল লেখক বলিয়া এক সময়ে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, সত্য বটে। কিন্তু, যে-অবধি আমি প্রভৃতি কতিপয় উচ্চদরের লেখকচূড়ামণি, সাহিত্যরঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, নানা রঙ্গে অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই অবধি তাঁহার লেখার আর তেমন গুমর নাই। ফলকথা এই, তিনি প্রভৃতি প্রাচীন দলের লেখকদিগের ভোঁতা কলমের থোঁতা মুখ হইতে এবংবিধ রঙদার মহাকাব্য নিঃসৃত হওয়া, গোময়কুণ্ডে কমলোৎপত্তির ন্যায়, কোনও মতে সম্ভব নহে।

যথাবিহিত যাহা অভিহিত হইল, ইহাতে যদি প্রাচীন দলের অভিমানী লেখক মহোদয়েরা রাগ করেন, করুন; আমার তাহাতে কিছুই বহিয়া যাইবেক না। আমি এ-সকল বিষয়ে কাহারও তুআক্কা রাখি না, ও রাখিতেও চাহি না। এ-জন্যে যদি আমায় নরকে যাইতে হয়, আমি তাহাতেও পিছপাও নই।

যদি বলেন, নরক কেমন সুখের স্থান, সে-বোধ থাকিলে তুমি কখনই নরকে যাইতে চাহিতে না। এ-বিষয়ে বক্তব্য এই, কিছুদিন পূর্বে, কলিকাতায় এক ভদ্রসন্তান বেয়াড়া ইয়ার হইয়াছিলেন। তিনি একবারে উচ্ছন্নে যাইতেছেন ভাবিয়া, তাঁহার গুরুদেব উপদেশ দিয়া তাঁহাকে দুরস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 'তোমার কি নরকে যাইবার ভয় নাই', গুরুদেব এই কথা বলিলে, সেই সুবোধ, সুশীল, বিনয়ী ভদ্রসন্তান কহিয়াছিলেন, 'আপনি দেখুন, যত প্রবলপ্রতাপ রাজারাজড়া, সব নরকে যাইবেন; যত ধনে মানে পূর্ণ বড় লোক সব নরকে যাইবেন; যত

দিলদরিয়া, তুখড় ইয়ার, সব নরকে যাইবেন ; যত মৃদুভাষিণী, চারুহাসিনী, বারবিলাসিনী, সব নরকে যাইবেন ; স্বর্গে যাইবার মধ্যে কেবল আপনাদের মত টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল। সুতরাং, অতঃপর নরকই গুলজার ; এবং, নরকে যাওয়াই সর্বাংশে বাঞ্ছনীয়।' আমারও সেই উত্তর।

কিন্তু একটি বিষয়ে উক্ত ভদ্রসন্তানের মতের সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য আছে। তিনি কহিয়াছিলেন, 'টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল স্বর্গে যাইবেন।' আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই, যদি নরক নামে বাস্তবিক কোন স্থান থাকে, এবং কাহারও পক্ষে সেই নরকপদবাচ্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল সর্বাগ্রে নরকে যাইবেন এবং নরকের সকল জায়গা দখল করিয়া ফেলিবেন, আমরা আর সেখানে স্থান পাইব না।

শ্রীমান্ বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, মনগড়া বচন পড়িয়া বলিয়া থাকেন, জ্ঞানকৃত পাপের নিষ্কৃতি নাই। বিষয়ী লোক শাস্ত্রজ্ঞ নহেন ; সুতরাং, তাঁহাদের অধিকাংশ পাপ জ্ঞানকৃত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ খুড়দের শাস্ত্রেও যেমন দখল, পাপেও তেমনই প্রবৃত্তি ; সুতরাং তাঁহাদের পাপের সংখ্যাও অধিক এবং সমস্ত পাপই জ্ঞানকৃত। এমন স্থলে, তাঁহারাই নরক একচেটিয়া করিয়া ফেলিবেন, সে-বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহারা, আমাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্যে, নানা রঙ চড়াইয়া বর্ণনা করিয়া, নরককে এমন ভয়ানক স্থান করিয়া তুলেন যে, শুনিলে হৃৎকম্প হয় এবং একেবারে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু, আপনাদের বেলায়, 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়' বলিয়া অবলীলাক্রমে সমস্ত পাপকর্মে সম্পূর্ণ লিপ্ত হইয়া থাকেন। এ-বিষয়ে অতি সুন্দর একটি উদাহরণ দর্শিত হইতেছে।

কিছুকাল পূর্বে এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে এক সুপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী প্রত্যহ তাঁহার কথা শুনিতে যাইতেন। কথা শুনিয়া এত মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি অবাধে সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসায় গিয়া তদীয় পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া অবশেষে ঐ বিধবা রমণী গুণমণি শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

একদিন শিরোমণি মহাশয়, ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, স্ত্রীজাতির ব্যভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্তন করিয়া, পরিশেষে কহিয়াছিলেন, 'যে-নারী পরপুরুষে উপগতা হয়, নরকে গিয়া তাহাকে অনন্তকাল যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলি বৃক্ষ আছে। তাহার স্কন্ধদেশ অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা ব্যভিচারিণীকে সেই ভয়ঙ্কর শাল্মলি বৃক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া বলে, তুমি জীবদ্দশায় প্রাণাধিক প্রিয় উপপতিকে নিরতিশয় প্রেমভরে যেরূপ গাঢ় আলিঙ্গন দান করিতে, এক্ষণে, এই শাল্মলি বৃক্ষকে উপপতি ভাবিয়া সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন দান কর। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিলে, যমদূতেরা যথাবিহিত প্রহার ও যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলপূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন করায়, তাহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায় ; অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে ; সে যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া অতিকরুণ স্বরে বিলাপ, পরিতাপ ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া কোনও স্ত্রীলোকেরই অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক সুখের অভিলাষে পরপুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে' ইত্যাদি।

ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগ বৃত্তান্ত শ্রবণে, কথকচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যাহা করিয়াছি, তাহার আর চারা নাই ; অতঃপর আর আমি প্রাণান্তেও পরপুরুষে উপগতা হইব না।' সেদিন সন্ধ্যার পর তিনি পূর্ববৎ শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া যথাবৎ আর আর পরিচর্যা করিলেন ; কিন্তু, অন্যান্য দিবসের মত, তাঁহার চরণসেবার জন্য, যথাসময়ে, তদীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না।

শিরোমণি মহাশয় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলেন ; অবশেষে, বিলম্ব দর্শনে অধৈর্য হইয়া, তাঁহার নামগ্রহণপূর্বক, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেবাদাসী, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন ; এবং, গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, গদ্গদস্বরলোচনে, শোকাকুল বচনে

কহিলেন, 'প্রভো ! কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। শিমুল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি ; আপনকার চরণসেবা করিতে আর আমার কোনওমতে প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি।'

সেবাদাসীর কথা শুনিয়া, পণ্ডিত চূড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং, দ্বারদেশে আসিয়া, সেবাদাসীর হস্তে ধরিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন, 'আরে পাগলি ! তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না ? আমরা পূর্বাপর যেরূপ বলিয়া আসিয়াছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। শিমুল গাছ পূর্বে ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, যথার্থ বটে ; কিন্তু শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে, লৌহময় কন্টকসকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে, শিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে ; এখন আলিঙ্গন করিলে, সর্বশরীর শীতল পুলকিত হয়।' এই বলিয়া, অভয় প্রদান ও প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক, শয্যায় লইয়া গিয়া, গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে পূর্ববৎ চরণসেবায় প্রবৃত্ত করিলেন।

পূর্ব বারে অমার্জনীয় অনবধান-দোষবশত নির্দেশ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি, এ-জন্য, ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক, বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিতেছি, বেঢপ বিদ্যাবাগীশ দলের যেরূপ গুণকীর্তন করিলাম, তাহাতে কেহ এরূপ না ভাবেন, আমাদের মতে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই একবিধ, তাঁহাদের মধ্যে ইতরবিশেষ নাই। আমরা, সরল হৃদয়ে, ধর্মপ্রমাণ নির্দেশ করিতেছি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ে এরূপ অনেক মহাশয় ব্যক্তি আছেন যে, তাঁহাদিগকে দেখিলে, ও তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলে, অন্তঃকরণ প্রকৃত প্রীতিরসে পূর্ণ ও প্রভূত ভক্তিরসে আর্দ্র হয়। তাঁহারা, যশোহরধর্মরক্ষিণীসভার আজ্ঞাবহ দলের ন্যায়, বাহ্যজ্ঞানশূন্য নহেন। তাঁহাদের সদসদ্বিবেক, উচিতানুচিত বিবেচনা প্রভৃতি এ-কাল পর্যন্ত লয়প্রাপ্ত হয় নাই। তুচ্ছ লাভের লোভে, অবলীলাক্রমে, ধর্মাধর্ম বিবেচনায় বিসর্জন দিতে পারেন, তাঁহারা সেরূপ প্রকৃতি ও সেরূপ প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই।

জেঠামো

রাজনারায়ণ বসু

নৈয়ায়িকেরা অনেক পদার্থের লক্ষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের যদি জেঠামো শব্দের লক্ষণা করিতে হইত, তাহা হইলে, তাঁহারা মুশকিলে পড়িতেন। যেহেতু জেঠামো নানাবিধ ও এক-একবিধ জেঠামি নানারূপ ধারণ করে। সামান্যত জেঠামোর লক্ষণা করিতে গেলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যাহা নিজের ক্ষমতার অতীত, সে-বিষয়ে কথা কওয়া জেঠামো। জেঠা নানা প্রকার। জেঠা কবি, জেঠা সমালোচক, জেঠা দার্শনিক, জেঠা বৈজ্ঞানিক, জেঠা পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী, জেঠা বক্তা, জেঠা রিফর্মর। জেঠা কবির বস্তুত কবিত্বশক্তি নাই, কিন্তু, কতকগুলি শব্দাড়ম্বর দ্বারা লোককে জানাইতে চান যে, তিনি একজন প্রকৃত কবি। তাঁহাদের কবিতাতে 'ঘনঘটা', 'সৌদামিনী', 'নলিনীনায়ক', 'চাতকিনী', 'মৃদুল মৃদুল সমীর' সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করে। আজকাল জেঠা কবিদিগের জ্বালায় তিষ্ঠানো ভার হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল গুটিকতক শব্দ সংগ্রহ করিলে, সমালোচনায় বিলক্ষণ জেঠামি করা যায়—সে-সকল শব্দ 'ওজোগুণ' 'প্রসাদগুণ' 'প্রাঞ্জলতা' প্রভৃতি। জেঠা সমালোচকেরা আশু প্রতিপত্তি লাভ করিবার জন্য বড়ো-বড়ো লেখককে গালি দিয়া থাকেন, যথা—ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল ইত্যাদি। সকল প্রকার জেঠা অপেক্ষা দার্শনিক জেঠা সর্বশ্রেষ্ঠ ! মনুষ্য যাহা কখনো নিরূপণ করিতে পারে না, যাহা ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, দার্শনিকেরা সেই সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া বিলক্ষণ জেঠামি করেন। যেন কতই বিজ্ঞ, যেন পৃথিবীর সকল সকল তত্ত্বই বুঝিয়াছেন। দার্শনিকদের গ্রন্থ হইতে যদি জেঠামি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে অল্পই অবশিষ্ট থাকে। তাঁহারা ঘটত্বাবচ্ছিন্ন, পটত্বাবচ্ছিন্ন ইত্যাদি শব্দদ্বারা কান ঝালাপালা করেন। বৈজ্ঞানিক জেঠা পূর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক মত প্রমাণসিদ্ধ হইলেও, তাহা খণ্ডন করিয়া নাম লইবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগের মত জলবুদ্বুদের ন্যায় বৈজ্ঞানিক জগতে এক-একবার উত্থিত হয় ; আবার কিছু দিন পরে বিলীন হইয়া যায়। সকল বৈজ্ঞানিক জেঠা অপেক্ষা বাঙালি বৈজ্ঞানিক জেঠা আরও ভয়ানক। তাঁহারা ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হইতে উপাদান অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগের অজ্ঞ স্বদেশস্থ ব্যক্তিগণের নিকট বিলক্ষণ জ্যেষ্ঠতাতি ফলান। নিজে একটি কোনো নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতে পারেন না, কেবল ইউরোপীয় মহাজনদিগের নিকট ক্রয় করিয়া 'রিটেল' বিক্রয় করেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী জেঠা হাওয়ার উপর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। সামান্য নিদর্শন ধরিয়া তুলকালাম করিয়া তুলেন। এই শ্রেণীর জেঠারা বলেন যে, বাল্মীকি হোমরের চুরি করিয়া রামায়ণ লিখিয়াছেন, এবং ভাগবদ্‌গীতা প্রণেতা বাইবেল হইতে ভাব লইয়া গীতা রচনা করিয়াছেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী জেঠা প্রস্তরখণ্ডের উপর নৈসর্গিক কারণে যে-সকল আঁজিবিজি পড়িয়াছে, তাহা পুরাকালের কোনো রাজার খোদিত আদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে, যখন তাঁহার জেঠামো ধরা পড়ে তখন, অপ্রতিভ হয়েন। তখন জেঠার পদ হইতে ছোটো খুড়োর পদে তাঁহাকে নামিতে হয়। বক্তৃতাতে যখন জেঠামি চলে, এমন অল্প বিষয় আছে যাহাতে তদ্রূপ জেঠামি চলিতে পারে। নিমিষ বলিয়া এক পদার্থ আছে, অতি অল্প দুগ্ধ ফেনাইয়া তাহা প্রস্তুত হয়। জেঠা বক্তার বক্তৃতা এই নিমিষের ন্যায়। সার অতি অল্প থাকে, কিন্তু তিনি তাহা ফেনাইয়া ফেনাইয়া মস্ত করিয়া তুলেন। তিনি গুটিকতক পুরাতন পচা কথা লইয়া তিন ঘণ্টা কাটাইতে পারেন। জেঠা বক্তার বক্তৃতাতে এই কয়টি কথা থাকিবেই থাকিবে : 'পূর্বপশ্চিম এক করা', 'হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত', 'জয়পতাকা উড্ডীন' ইত্যাদি। তাঁহার বক্তৃতার শেষে, 'উত্থান কর, জাগ্রত হও, আর কতকাল আলস্য-শয্যায় শয়ান থাকিবে' এই কথাগুলি চাইই চাই। কোনো কোনো জেঠা বক্তা, নম্রতার ভান করিয়া, বক্তৃতার প্রথমে বলেন যে, 'যদ্যপিও এই বিষয় বলা আমার ক্ষমতার অতীত, তথাপি

সাহসের উপর নির্ভব করিয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।' ইহা খুড়ামির আকারে জেঠামো। কোনো কোনো জেঠা বক্তা বক্তৃতার প্রারম্ভে বলেন যে, 'আমি এ-বিষয়ে বলিতে প্রস্তুত হইবার সময় পাই নাই।' কিন্তু, হয়তো, বাড়ি হইতে সমস্ত বক্তৃতা মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন! আরও বলেন যে, 'বন্ধুগণের অনুরোধে আমি এ-বিষয় বলিতে আসিয়াছি'; কিন্তু, হয়তো, বক্তৃতা করিবার লালসায় তাঁহার প্রাণ ছটফট করিতেছিল! ইহার পর, জেঠা রিফর্‌মর। জেঠা রিফর্‌মরেরা শহরের বড়ো-বড়ো সভায় রিফর্‌মেশন ফলান। কথা শুনিয়া বোধ হয়, তাঁহারা রাতারাতি ভারতবর্ষকে বিলাত করিয়া তুলিবেন, কিন্তু কাজে সব ফাঁকি। তাঁহাদিগের ছোটো-ছোটো অনেক সভা আছে। সে-সকল সভার সাংবাৎসরিক অধিবেশন মহাসমারোহপূর্বক সম্পন্ন হয়, তাহাতে রাঙা মুখের বিলক্ষণ ছড়াছড়ি হইয়া থাকে, কিন্তু মাসিক অধিবেশন হয় না কেন, ইহা নরলোকের বুদ্ধির অগম্য। তাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে লম্বা-লম্বা বক্তৃতা করেন, স্ত্রীলোকের দুঃখে তাঁহাদিগের চোখে জল ধরে না, কিন্তু তাঁহাদিগের বাটির স্ত্রীলোকের বর্ণপরিচয় হইয়াছে কিনা সন্দেহ! তাঁহারা সামান্য লোকের সঙ্গে পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছা করেন না। বিলাতে বড়ো-বড়ো লোকের সঙ্গে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। ইঁহারা, কোনো একটি সামান্য কীর্তি করিলে যাহাতে তাঁহাদিগের নাম সংবাদপত্রে উঠে এইজন্য, সম্পাদকদিগের বিলক্ষণ খোসামোদ করিয়া থাকেন। জেঠা রিফর্‌মরদের রিফর্‌মেশন প্রধানত বোতলেই পর্যাপ্ত হয়। পূর্বে, লোকের কোনো উপজীবিকা না থাকিলে, গুরুমহাশয় অথবা কবিরাজের ব্যবসা অবলম্বন করিত, এক্ষণে, লোকের অন্য কোনো জীবনোপায় না থাকিলে, সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়েন। বিদ্যা যত না থাকুক, তাহার অভাব জেঠামি দ্বারা পূরণ করেন। ইঁহারা সবজান্তা। এমন তত্ত্ব নাই, যাহা উঁহারা অবগত নহেন। ইস্তক 'কানাইয়ে ঠেলা' হইতে নাগাত 'দণ্ড গ্রহণ' পর্যন্ত এমন বিষয় নাই, যাহাতে ব্যাপকতা না করিতে পারেন। আমরা এই শ্রেণীভুক্ত জেঠা।

কিন্তু সকল জেঠা অপেক্ষা বিরক্তিকর বালক জেঠা ও মেয়ে জেঠা অথবা জেঠাইমা! বালক জেঠার জ্বালায় আমরা অস্থির হইয়াছি! গলা টিপলে দুধ বেরোয়, অথচ ভারি ভারি বিষয়ে বিজ্ঞতা ফলাইতে চেষ্টা করে। ইহারা অল্প বয়সে চশমা ব্যবহার করে ও নস্য লয়। বালকদিগের সম্বন্ধে জেঠামি অত্যন্ত অনিষ্টকর। যে-বালক জেঠিয়ে যায়, তাহাদের আর ভদ্রস্থ নাই। তাহাদের লেখাপড়ার বিষয়ে জলাঞ্জলি। বাঙালি বালকেরা, অন্য দেশের বালক অপেক্ষা শীঘ্র, এঁচোড়ে পাকিয়া যায়। অন্য দেশীয় বালকেরা, ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়, বালকবৎ ব্যবহার করে; কিন্তু বাঙালি ঐ বয়সে পরম বিজ্ঞ হইয়া ওঠে ও বিলক্ষণ জেঠামি আরম্ভ করে! নিতান্ত ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষে বড়ো-বড়ো বিস্বাদ আম্র ফলিলে যেমন খারাপ, বালক জেঠারা তদ্রূপ। বালক জেঠাদিগের প্রায় এই দুর্দশা ঘটিয়া থাকে যে, তাহারা প্রকৃত জেঠার বয়স প্রাপ্ত হইলে, খুড়ার ন্যায় লোকের নিকট প্রতীয়মান হয়; প্রকৃত বিজ্ঞতা কখনো লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এক্ষণে আমাদের দেশে মেয়ে জেঠার সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু, মনে এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইতেছে যে, আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষা যত বিস্তৃত হইবে, ততই ঐ শ্রেণীর জেঠা বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষণেই বসন্ত প্রারম্ভের কুসুমের ন্যায় দুই-একটি দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদিগের কোনো বন্ধু সেদিন আমাদিগের নিকট গল্প করিতেছিলেন যে, তিনি রেলের গাড়িতে একটি জেঠাইমার হস্তে পড়িয়াছিলেন। জেঠাইমা ধর্ম-সংস্কারের বিষয় কিছুই বুঝেন না, কিন্তু সে-বিষয়ে বিলক্ষণ জেঠাইমো করিতেছিলেন! আমাদিগের বন্ধুকে তিনি বিশেষরূপে আক্রমণ করিলেন, বন্ধু 'ত্রাহি মধুসূদন' করিতে লাগিলেন। কি ভাগ্য যে গাড়ি শীঘ্র আড্ডায় আসিয়া পৌঁছিল, তা না হইলে তাঁর কী দশা হইত বলা যায় না। আমাদিগের আর একটি বন্ধু প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তিনি আমাদের নিকট একদিন গল্প করিতেছিলেন যে, তাঁহার কোনো গ্রন্থ রচনার সময় তাঁহার কোনো সুহৃদ তাঁহার নিকট করজোড়ে বলিলেন যে, দোহাই, তুমি এ-গ্রন্থখানি রচনা করিও না। আমার বাড়িতে আমার শালী থাকেন, তিনি একজন শিক্ষিতা স্ত্রীলোক, তাঁহার জেঠাইমোতে আমার বাড়িতে তিষ্ঠানো ভার হইয়াছে। তোমার এ-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে, তাঁহার জেঠাইমো আরও বৃদ্ধি পাইবে।

বিবিধ প্রবন্ধ। ১৮৮২।

পালামৌর পর

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহু কালের পর পালামৌ সম্বন্ধে দুইটা কথা লিখিতে বসিয়াছি। লিখিবার একটা ওজর আছে। এক সময়ে একজন বধির ব্রাহ্মণ আমাদের প্রতিবাসী ছিলেন, অনবরত গল্প করা তাঁহার রোগ ছিল। যেখানে কেহ একা আছে দেখিতেন, সেখানে গিয়া গল্প আরম্ভ করিতেন ; কেহ তাঁহার গল্প শুনিত না, শুনিবারও কিছু তাহাতে থাকিত না। অথচ তাঁহার স্থিরবিশ্বাস ছিল যে, সকলেই তাঁহার গল্প শুনিতে আগ্রহ করে। একবার একজন শ্রোতা রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আর তোমার গল্প ভাল লাগে না, তুমি চুপ কর।" কালা ঠাকুর উত্তর করিয়াছিলেন, "তা কেমন করে হবে, এখনও যে এ গল্পের অনেক বাকি।" আমারও সেই ওজর। যদি কেহ পালামৌ পড়িতে অনিচ্ছুক হন, আমি বলিব যে, "তা কেমন করে হবে, এখনও যে পালামৌর অনেক কথা বাকি।"

পালামৌর প্রধান আওলাত মৌয়া গাছ। সাধুভাষায় বুঝি ইহাকে মধুদ্রুম বলিতে হয়! সাধুদের তৃপ্তির নিমিত্ত সকল কথাই সাধুভাষায় লেখা উচিত। আমারও তাহা একান্ত যত্ন। কিন্তু মধ্যে-মধ্যে বড় গোলে পড়িতে হয়, অন্যকেও গোলে ফেলিতে হয়, এই জন্য এক-এক বার ইতস্তত করি। সাধুসঙ্গ আমার অল্প, এই জন্য তাঁহাদের ভাষায় আমার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে নাই। যাঁহাদের সাধুসঙ্গ যথেষ্ট, অথবা যাঁহারা অভিধান পড়িয়া নিজে সাধু হইয়াছেন, তাঁহারাও একটু-একটু গোলে পড়েন। এই যে এইমাত্র মধুদ্রুম লিখিতে হইল, অনেক সাধু ইহার অর্থে অশোকবৃক্ষ বুঝিবেন। অনেক সাধু জীবন্তীবৃক্ষ বুঝিবেন। আবার, যে-সকল সাধুর গৃহে অভিধান ন'ই, তাঁহারা হয়ত কিছুই বুঝিবেন না ; সাধুদের গৃহিণীরা নাকি সাধুভাষা ব্যবহার করেন না ; তাঁহারা বলেন, সাধুভাষা অতি অসম্পন্ন, এই ভাষায় গালি চলে না, ঝগড়া চলে না, মনের অনেক কথা বলা হয় না। যদি এ-কথা সত্য হয়, তবে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বলুন, সাধুভাষা গোল্লায় যাক।

মৌয়ার ফুল পালামৌ অঞ্চলে উপাদেয় খাদ্য বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানীয়েরা কেহ কেহ শখ করিয়া চালভাজার সঙ্গে এই ফুল খাইয়া থাকেন। শুখাইয়া রাখিলে, এই ফুল অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। বর্ষাকালে কোলেরা কেবল এই ফুল খাইয়া দুই-তিন মাস কাটায়। পয়সার পরিবর্তে এই ফুল পাইলেই তাহাদের মজুরি শোধ হয়। মৌয়ার এত আদর, অথচ তথায় ইহার বাগান নাই।

মৌয়ার ফুল শেফালিকার মত ঝরিয়া পড়ে, প্রাতে বৃক্ষতল একেবারে বিছাইয়া থাকে। সেখানে সহস্র সহস্র মাছি-মৌমাছি ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কোলাহলে বন পুরিয়া যায়। বোধ হয়, দূরে কোথায় একটা হাট বসিয়াছে। একদিন ভোরে নিদ্রাভঙ্গে সেই শব্দে যেন স্বপ্নবৎ কী একটা অস্পষ্ট সুখ আমার স্মরণ হইতে-হইতে আর হইল না। কোন্ বয়সের কোন্ সুখের স্মৃতি, তাহা প্রথমে কিছুই অনুভব হয় নাই, সে-দিকে মনও যায় নাই। পরে তাহা স্পষ্ট স্মরণ হইয়াছিল। অনেকের এইরূপ স্মৃতিবৈকল্য ঘটিয়া থাকে। কোনো একটি দ্রব্য দেখিয়া বা কোনো একটি সুর শুনিয়া অনেকের মনে হঠাৎ একটা সুখের আলোক আসিয়া উপস্থিত হয় ; তখন মন যেন আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠে। অথচ কীজন্য এই আহ্লাদ, তাহা বুঝা যায় না। বৃদ্ধেরা বলেন, ইহা জন্মান্তরীণ সুখস্মৃতি। তাহা—হইলে হইতে পারে ; যাঁহাদের পূর্বজন্ম ছিল, তাঁহাদের সকলই সম্ভব। কিন্তু আমার নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ইহজন্মের স্মৃতি। বাল্যকালে আমি যে পল্লীগ্রামে অতিবাহিত করিয়াছি, তথায় নিত্য প্রাতে বিস্তর ফুল ফুটিত, সুতরাং নিত্য প্রাতে বিস্তর মৌমাছি আসিয়া গোল বাধাইত। সেই সঙ্গে ঘরে-বাহিরে, ঘাটে-পথে

হরিনাম—অস্ফুট স্বরে, নানা বয়সের নানা কণ্ঠে, গুন্ গুন্ শব্দে হরিনাম মিশিয়া কেমন একটা গম্ভীর সুর নিত্য প্রাতে জমিত, তাহা তখন ভাল লাগিত কি না স্মরণ নাই, এখনও ভাল লাগে কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সেই সুর আমার অন্তরের অন্তরে কোথায় লুকানো ছিল, তাহা যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিল। কেবল সুর নহে, লতা-পল্লব-শোভিত সেই পল্লীগ্রাম, নিজের সেই অল্প বয়স, সেই সময়ের সঙ্গিগণ, সেই প্রাতঃকাল, কুসুমসুবাসিত সেই প্রাতর্বায়ু, তাহার সেই ধীর সঞ্চরণ—সকলগুলি একত্রে উপস্থিত হইল। সকলগুলি একত্র বলিয়া এই সুখ, নতুবা, কেবল মৌমাছির শব্দে সুখ নহে।

অদ্য যাহা ভাল লাগিতেছে না, দশ বৎসর পরে তাহার স্মৃতি ভাল লাগিবে। অদ্য যাহা সুখ বলিয়া স্বীকার করিলাম না, কল্য আর তাহা জুটিবে না। যুবার যাহা অগ্রাহ্য, বৃদ্ধের তাহা দুষ্প্রাপ্য। দশ বৎসর পূর্বে যাহা আপনিই আসিয়া জুটিয়াছিল, তখন হয়ত আদর পায় নাই, এখন আর তাহা জুটে না, সেই জন্য তাহার স্মৃতিই সুখদ!

নিত্য মুহূর্তে এক-একখানি নূতন পট আমাদের অন্তরে ফোটোগ্রাফ হইতেছে এবং তথায় তাহা থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের চতুষ্পার্শে যাহা কিছু আছে, যাহা-কিছু আমরা ভালবাসি, তাহা সমুদয় অবিকল সেই পটে থাকিতেছে। সচরাচর পটে কেবল রূপ অঙ্কিত হয়, কিন্তু যে-পটের কথা বলিতেছি, তাহাতে গন্ধ-স্পর্শ, সকলই থাকে। ইহা বুঝাইবার নহে, সুতরাং সে-কথা থাক।

প্রত্যেক পটের এক-একটা করিয়া বন্ধনী থাকে, সেই বন্ধনী স্পর্শ মাত্রেই পটখানি এলাইয়া পড়ে, বহু কালের বিস্মৃত বিলুপ্ত সুখ যেন নূতন হইয়া দেখা দেয়। যে-পটখানি আমার স্মৃতিপথে আসিয়াছিল বলিতেছিলাম, বোধ হয়, মৌমাছির সুর তাহার পটবন্ধনী।

কোনো পটের বন্ধনী কী, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন; যিনি তাহা করিতে পারেন, তিনি কবি। তিনিই কেবল একটি কথা বলিয়া পটের সকল অংশ দেখাইতে পারেন, রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, সকল অনুভব করাইতে পারেন। অন্য সকলে অক্ষম, তাহারা শত কথা বলিয়াও পটের শতাংশ দেখাইতে পারে না।

মৌয়া ফুলে মদ্য প্রস্তুত হয়, সেই মদ্যই এই অঞ্চলে সচরাচর ব্যবহার। ইহার মাদকতা-শক্তি কতদূর, জানি না, কিন্তু, বোধ হয়, সে-বিষয়ে ইহার বড় নিন্দা নাই, কেননা আমার একজন পরিচারক একদিন এই মদ্য পান করিয়া বিস্তর কান্না কাঁদিয়াছিল। তাহার প্রাণও যথেষ্ট খুলিয়াছিল, যেরূপে আমার যত টাকা সে চুরি করিয়াছিল, সেই দিন তাহা সমুদয় বলিয়াছিল। বিলাতি মদের সহিত তুলনায় এ-মদের দোষ কী, তাহা স্থির করা কঠিন। বিলাতি মদে নেশা আর লিকর দুইই থাকে। মৌয়ার মদে কেবল একটি থাকে, নেশা—লিকর থাকে না; তাহাই এ-মদের এত নিন্দা, এ-মদ এত সস্তা। আমাদের ধেনোরও সেই দোষ।

দেশি মদের আর-একটা দোষ, ইহার নেশায় হাত-পা দুইয়ের একটিও ভাল চলে না। কিন্তু বিলাতি মদে পা চলুক বা না চলুক, হাত বিলক্ষণ চলে, বিবিরা তাহার প্রমাণ দিতে পারেন। বুঝি আজকাল আমাদের দেশেরও দুই-চারি ঘরের গৃহিণীরা ইহার সপক্ষ কথা বলিলেও বলিতে পারেন।

বিলাতি পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত করিতে পারিলে মৌয়ার ব্রাণ্ডি হইতে পারে, কিন্তু অর্থসাপেক্ষ। একজন পাদরি আমাদের দেশি জাম হইতে শ্যামপেন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তিনি তাহা প্রচলিত করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশি মদ একবার বিলাতে পাঠাইতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, অনেক অন্তরজ্বালা নিবারণ হয়।

"বঙ্গদর্শন"। ১২৮৯ বঙ্গাব্দ।

বুড়া বয়সের কথা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বুড়া বয়সের কথা লিখিব ! লিখি-লিখি মনে করিতেছি, কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,—আপনার মর্মান্তিক দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে পড়িবে কে ? যে যুবা, কেবল সেই পড়ে ; বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক জুটিবে না।

অতএব, আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব না। বলিতে পারি না ; বৈতবণীর তরঙ্গাভিহত জীবনের সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই ; আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ করা হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সেদিন আজিও আসে নাই। তবে যৌবনেও আমার আর দাবিদাওয়া নাই ; মিয়াদি পাট্টার মিয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দিকে মিয়াদ অতীত হইল, কিন্তু বাকি-বকেয়া আদায় উসুল করা হয় নাই, তাহার জন্য কিছু পীড়াপীড়ি আছে ; যৌবনের আখিরি করিয়া ফারখতি লইতে পারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি ; অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি এমত সাধ্য নাই। তার উপর, পাটনির কড়ি সংগ্রহ করিবার সময় আসিল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি একবার শুনিবে না ?

আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক—আমি কি বুড়া ? আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে. আমি বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাঁহারই বয়সটা একটু দোটানা রকম—যাঁরই ছায়া পূর্বদিকে হেলিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপনি কি বুড়া। আপনার কেশগুলি হয়ত আজিও অনিন্দ্য ভ্রমরকৃষ্ণ, হয়ত আজিও দন্ত সকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার লজ্জাস্থল, হয়ত আপনার নিদ্রা অদ্যাপি এমন প্রগাঢ় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ভার্যাও তাহা ভাঙিতে পারে না ;—তথাপি, হয়ত আপনি প্রাচীন। নয়ত, আপনার কেশগুলি সাদা কালোয় গঙ্গা-যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন মুক্তাপাতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে—নিদ্রা, চক্ষুর প্রতারণামাত্র, তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে ইহার অর্থ "বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।" তাহা নহে—আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখনও দেখিবে না যে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটে। যে পঁয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে হয় যমভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে ; যে পঁয়ত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় বড়াই ভালবাসে, নয় পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে দুঃখী।

কিন্তু এই অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া, প্রথমে চশমাখানি হাতে করিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে, আমি বুড়া হইয়াছি কি না ! বুঝি বা হইয়াছি। বুঝি হই নাই। মনে-মনে ভরসা আছে, একটু চক্ষুর দোষ হউক, দুই-এক গাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই ! এই চিরপ্রাচীন ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন ; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই ; আমার সৌন্দর্যমাখা, হীরা-বসান, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই ; প্রভাতের বায়ু, বকুল-কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই—তেমনই সুন্দর আছে। আমি কেবল প্রাচীন হইলাম ? আমি এ-কথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল ? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমনি অপর্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই ? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে ? সলমন কোম্পানির দোকানে বজ্রাঘাত হউক,

আমি এ-চশমা ভাঙিয়া ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে—ছাড়ান যায় না। ধীরে-ধীরে দিনে-দিনে পলে-পলে বয়শ্চোর আসিয়া, এ-দেহপুরে প্রবেশ করিতেছে—আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহাদিগের মন রাখি। অন্যে কাঁদে, আমি কেবল লোক-লজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি—ভাবি, ইহারা এ-বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন ? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম, আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই, আমার ত আশা-ভরসা কিছু নাই ! কই—দূর হউক, যাহা নাই তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি ? যে-কুসুমদাম এ-জীবনকানন আলো করিত, পথিপার্শ্বে একে-একে তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে-মুখমণ্ডলসকল ভালবাসিতাম, একে-একে অদৃশ্য হইয়াছে, না হয় রৌদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ-ভগ্নমন্দিরে, এ-পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ-ভাঙা মজলিসে সে-উজ্জ্বল দীপাবলী কই ? একে-একে নিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে—হৃদয়। সে-সরল, সে-ভালবাসা-পরিপূর্ণ, সে-বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌন্দর্যে স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে-বন্ধুহৃদয় কই ? নাই। কার দোষে নাই ? আমার দোষে নহে। বন্ধুর দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে।

তাতে ক্ষতি কি ? একা আসিয়াছি, একা যাইব—তাহার ভাবনা কি ? এ-লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল না—আচ্ছা রোখশোধ। পৃথিবি ! তুমি তোমার নিয়মিত পথে আবর্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করি—তোমায় আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল—তাহাতে, হে মৃন্ময়ি জড়পিণ্ডগৌরব-পীড়িতে বসুন্ধরে ! তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই বা ক্ষতি কি ? তুমি অনন্তকাল শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর অল্প দিন ঘুরিব মাত্র। পরে তোমার কপালে ছাইগুলি দিয়া, যাঁর কাছে সকল জ্বালা জুড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব।

তবে স্থির হইল এক প্রকার যে, বুড়া বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্তব্য কি ? "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ ?" এ কোন্ গণ্ডমূর্খের কথা ? আবার বন কোথা ? এ-বয়সে, এই অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপণীসমাকুলা নগরীই বন। কেন না, হে বর্ষীয়ান পাঠক ! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই। বিপদ্‌কালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারে যে, "বুড়া ! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও,—" কিন্তু সম্পদ্‌কালে কেহই বলিবে না, "বুড়া ! আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধি কর !" বরং আমোদ-আহ্লাদ কালে বলিবে, "দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে।" তবে আর অরণ্যের বাকি কি ?

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে-পুত্র তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও অর্ধ-নিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিয়া তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সংবাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে, বয়ঃপ্রাপ্ত ; কর্কশকান্তি, হয়ত মহাপাপিষ্ঠ, পৃথিবীর পাপস্রোত বাড়াইতেছে, হয়ত, তোমারই দ্বেষক—তুমি কেবল কাঁদিয়া বলিতে পার, "ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।" তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া ক, খ শিখাইয়াছিলে, সে হয়ত এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মূর্খতা দেখিয়া মনে-মনে উপহাস করে। যাহারই স্কুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয়ত এখন তোমাকে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে সুদ খায়। তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয়ত সে তোমায় শিখাইতেছে, যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাকি কি ?

অন্তর্জগত ছাড়িয়া বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে। যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্মাণ করিয়াছিলে,—বাছিয়া-বাছিয়া গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগ্নেনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা-মটরের চাষ—হারাধন পোদ গামছা কাঁধে, মোটা মোটা বলদ লইয়া নির্বিঘ্নে লাঙল দিতেছে—সে লাঙলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে-অট্টালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ

মনে-মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পুরাইয়া যত্নে নির্মাণ করিয়াছিলে, যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়া নয়নে-নয়নে অধরে-অধরে মিলাইয়া ইহ-জীবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয়ত দেখিবে, সে-গৃহের ইষ্টকসকল দামু ঘোষের আস্তাবলের সুরকির জন্য চূর্ণ হইতেছে, সে-পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাসীর মা পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছে—আর অরণ্যের বাকি কি ? সকল জ্বালার উপর জ্বালা, আমি সেই যৌবনে যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম—এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয়বন্ধু দাসু মিত্র যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্বে বেড়াইত—কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাহাকে দেখিয়া "নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া ফুল দিতে, দাসু মিত্রায় নমঃ বলিয়া ফুল দিয়াছে। এখন সেই দাসু মিত্র শুষ্ককণ্ঠ, পলিতকেশ, দন্তহীন, লোলচর্ম, শীর্ণকায়। দাসুর একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,—এখন দাসু নামাবলীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে। আর অরণ্যের বাকি কি ?

গদার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুষ্পোদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়া উদ্যান-বায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে কাঁটা বিঁধিয়া দিয়া, গোলাপ গাছ রসকেলি করিত। আর আজি গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতে-করিতে চাল ঝাড়িতেছে—মলিনবসনা, বিকটদশনা, তীব্ররসনা—দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, লোলচর্ম, পলিতকেশ, শুষ্কবাহু, কর্কশকণ্ঠ। এই সেই তরঙ্গিণী—আর অরণ্যের বাকি কি ?

তবে স্থির, বনে যাওয়া হইবে না। তবে কি করিব ? হিন্দুশাস্ত্রের বশবর্তী হইয়া কালিদাসও সর্বগুণবান্ রঘুগণের বার্ধক্যে মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে 'রঘুবংশ' যৌবনে লিখিয়াছিলেন এবং 'কুমারসম্ভব' চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

প্রথম অজবিলাপে

> "ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
> তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
> নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
> বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্ ॥"

এটি যৌবনের কান্না।

তারপর রতিবিলাপে,

> "গত এব ন তে নিবর্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
> অহমস্য দশেব পশ্য মামবিসহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্ ॥"

এটি বুড়া বয়সের কান্না।—

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলেও কখনও বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি লিখিতেন না। বিস্মার্ক, মোলটকে ও ফ্রেডেরিক বুড়া ; তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে—জর্মন ঐক্যজাত্য কোথা থাকিত ? টিয়র প্রাচীন—টিয়র মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণতন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত ? গ্লাডস্টোন এবং ডিস্রেলি বুড়া—তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পার্লামেন্টের রিফর্ম এবং আইরিশ চার্চের ডিসেস্টাব্লিশমেন্ট কোথা থাকিত ?

প্রাচীন বয়সই বিষয়েষার সময়। আমি অস্ত্র-দন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না—তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নাই বলিয়াই বুড়া, আমি তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ব, তাহাতে আবার রাগ দ্বেষ ভোগাসক্তি এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে তাহা সতত হীনপ্রভ ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্যকারিতার সময়। এইজন্য আমার পরামর্শ যে, বুড়া

হইয়াছি বলিয়া কেহ স্বকার্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভান করিবে না। বার্ধক্যেও বিষয়চিন্তা করিবে।

তোমারা বলিবে, একথা বলিতে হইবে না ; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তনপান অবধি উইল করা পর্যন্ত আবালবৃদ্ধ, কেবল বিষয়ান্বেষণে বিব্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে-কাজ করিয়াছ, সে আপনার জন্য ; তারপর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি ? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত, তব্ আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বার্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বার্ধক্যেও যদি আপনার জন্য হউক, পরের জন্য হউক, বিষয়-কার্যে নিয়ত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে ? পরকালের কাজ করিব কবে ? আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে-কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীনকালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন ? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কার্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ-সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতেছিল—হইতে-হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন ? এইমাত্র বুড়া বয়সের ঢেঁকি পাতিয়া, বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে—আবার এ শিবের গীত কেন ? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু মনে মনে বোধ হয় যে, সকল কাজেই একটু-একটু শিবের গীত ভাল।

ভাল হউক বা না হউক, প্রাচীনের জন্য উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিণী, হেমাঙ্গিণী, সুরঙ্গিণী, কুরঙ্গিণীর দল আর আমার দিকে ঘেঁষিবে না। তোমার মিল, কোমত, স্পেন্সর, ফ্যুয়রবাক মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার—সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দিনে—আজি এ-কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে—এ-নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে,—আমায় আর কে রাখিবে ? এ-ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্তভীষণ উপকূলে—এ-দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে ? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো ! চারিদিকেই অন্ধকার ! আমার এ-ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারী হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে ?

"কমলাকান্ত"। ১২৯২ বঙ্গাব্দ।

সোনায় সোহাগা

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমাজ-সংস্কারকদিগের এই একটি সহজ সত্যের প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্তব্য যে, সভ্যসমাজ মাত্রই ভাল-মন্দে জড়িত। পৃথিবীতে এমন কোনও সভ্যসমাজ নাই, যাহার ষোল আনাই মন্দ কিংবা যাহার ষোল আনাই ভাল। কোনো সভ্য মনুষ্যেরই এমন কোনও দায় পড়িতে পারে না যে, তাঁহাকে তাঁহার স্বজাতীয় সভ্যতার ষোল আনা মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, ও অপর কোনও জাতীয় সভ্যতার ষোল আনা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এককালে ইংলণ্ডে নর্মান জাতির কত বড় প্রতাপ ছিল! নর্মানেরা মনে করিত তাহাদের আপনাদের রীতিনীতি ষোল আনাই ভাল ও সাক্‌সন্ রীতিনীতি ষোল আনাই মন্দ। কিন্তু ফলে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, ইংরাজদের জাতিত্বের উপাদান অধিকাংশই সাক্‌সন্—তাহার উপর কিছু কিছু করিয়া ফরাসিস্ রঞ্জনের প্রলেপ দেওয়া আছে মাত্র। দর্শন-শাস্ত্রে "পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ" বলিয়া একটা মিশ্রণ-পদ্ধতি আছে; যে-কোনও ভূত হউক না কেন (যেমন জল কিংবা বায়ু), তাহার নিজের আট আনা এবং অবশিষ্ট ফী-চারি ভূতের দুই আনা—একুনে চারি-দুগুণে আট আনা—এই দুই আট আনার সংযোগে যে-পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা পঞ্চীভূত ভূত বলিয়া উক্ত হয় (যেমন পঞ্চীকৃত জল, পঞ্চীকৃত বায়ু, ইত্যাদি)। তেমনি, ইংরাজি সভ্যতাকে বলা যাইতে পারে যে, তাহা পঞ্চীকৃত সাক্‌সন্ সভ্যতা। ইংরাজি সভ্যতার আট আনা সাক্‌সন্, এবং অবশিষ্ট আট আনার দুই আনা লাটিন, দুই আনা গ্রীক, দুই আনা ফরাসিস্ ও দুই আনা কেল্‌ট্! সাক্‌সন্ মূল উপাদান ইংরাজি সভ্যতার ভিত্তি-ভূমিকে এমনি বলপূর্বক কামড়িয়া ধরিয়া আছে যে, তাহাকে রাজবংশের দিক দিয়া ফরাসিস্ টানাটানি করিয়াছে, ধর্মযাজকের দিক দিয়া লাটিন-গ্রীক টানাটানি করিয়াছে, আদিম নিবাসীর দিক দিয়া কেল্‌ট্ টানাটানি করিয়াছে এত যে প্রাণপণ বলে—কেহই তাহাকে একচুলও স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। নর্মান কঙ্কেস্‌টের গ্রন্থকার ফ্রীমান বলেন—"ইংলণ্ড বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নর্মানেরা এমনি এক মারাত্মক রকমের বৈদেশিক অনুপান সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল যে, কি আমাদের শোণিত, কি আমাদের ভাষা, কি আমাদের রাজ-নিয়ম, কি আমাদের শিল্প, কিছুরই উপর তাহা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই; কিন্তু তবুও তাহা অনুপান বই আর কিছুই নহে; পূর্বতন দৃঢ়তর মূল উপাদানগুলি, তবুও, অব্যাহতরূপে টেঁকিয়া ছিল এবং অনেক প্রকার ধাক্কা সামলাইয়া চরমে সেগুলি আবার আপনাদের প্রাধান্য বলবৎ করিল।" অর্থাৎ সাক্‌সন্ মূল উপাদান কিয়ৎকাল দমনে থাকিয়া আবার তাহা স্বকীয় মহিমায় প্রাদুর্ভূত হইল। ইংরাজেরা যেমন স্বজাতীয় সভ্যতার মূল উপাদানগুলি অব্যাহত রাখিয়া তাহার অঙ্গে কিছু-কিছু করিয়া অপর জাতীয় সভ্যতা অনুপান স্বরূপে মিশাইয়াছে, আমরা যদি সেইরূপ পঞ্চীকরণ-পদ্ধতি অবলম্বন করি, তাহা হইলে খুব ভাল হয়,—তাহা হইলে আমাদের স্বজাতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রের উপর ইউরোপীয় সভ্যতার রাসায়নিক সার পতিত হইয়া তাহাকে শতগুণ উর্বরা করিয়া তোলে, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয়; নচেৎ, যদি স্বজাতীয় সভ্যতার সমস্তই উড়াইয়া দিয়া অপর কোনও জাতীয় সভ্যতাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে যাই, তবে আমাদের দেশের শস্যশালিনী উর্বরা ভূমিকে রসাতলে দিয়া তাহার স্থানটি অন্য দেশের কঠিন মৃত্তিকার দ্বারা ভরাট করিবার জন্য বৃথা আয়াস পাই মাত্র, তাহাতে হিতে বিপরীত হয়। এডওআর্ড-দি-কন্‌ফেসর একজন সাক্‌সন্ রাজা ছিলেন কিন্তু তাঁহার মন ছিল সম্পূর্ণ ফরাসিস্। ফ্রীমান তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলেন—"এডওআর্ড, সজ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক, নর্মানদিগের বিজয়ের পথ আরও নিষ্কণ্টক করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করেন নাই। স্বদেশে গৌরবের বা লাভের যেখানে যতকিছু বরণীয় স্থান, সমস্তই বিদেশীয় লোকের দ্বারা ক্রমাগত ভরাট

হইতে দেখা ইংরাজদের চক্ষে অভ্যাস পাওয়াইয়া ঐ বিপত্তিটি তিনি যাচিয়া আনিয়াছিলেন। নর্মানদিগের কর্তৃক ইংলণ্ড-বিজয়ের সূত্রপাত এডওআর্ড হইতেই হইয়াছিল।"

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, এডওআর্ড দি-কন্‌ফেসর ইংলণ্ডের বিভীষণ ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী গডওয়াইন আর-এক ধাঁচার লোক ছিলেন বলিয়া—তাই যা একটু রক্ষা! ফ্রীমান বলেন,—গডওয়াইন যে সমস্ত ইংরাজি ভাবের প্রমাণস্থল ছিলেন, তিনি যে সমস্ত আরম্ভোদ্যমের নেতা ছিলেন, তিনি যে আপনার অসাধারণ গুণ-গৌরবে অন্তত তাঁহার নিজস্ব ভূমির প্রজাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, ইহা যারপরনাই সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।" এখানে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তটি উল্লেখ করিবার তাৎপর্য কেবল এইটিই দেখানো যে, আমরা এডওআর্ডের ন্যায় বিদেশের টানে পড়িয়া স্বজাতি হইতে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে আমাদের দেশের কোনও উপকারেই আসিতে পারিব না,—লাভের মধ্যে তাহার পতনের পথ আরো পেশল ও প্রশস্ত করিয়া দিব। গডওয়াইনের ন্যায়, স্বজাতীয় সভ্যতার পত্তনভূমি দৃঢ়রূপে রক্ষা করা আমাদের প্রধান কর্তব্য ; তাহার উপরে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী নানাজাতীয় সভ্যতা মাধুর্যের সহিত যথাকালে যথা দেশে যথা পরিমাণে ধীরে-সুস্থে সন্নিবেশিত করিতে পারিলে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সভ্যতা আমাদের দেশে আবির্ভূত হইতে পারে, তাহা হইলেই প্রকৃতপক্ষে সোনায় সোহাগা হয়।

এক ব্যক্তির হৃদয় খুব প্রশস্ত, কিন্তু তাঁহার কোনও কিছু করিবার ক্ষমতা নাই ; আর-এক ব্যক্তির হৃদয় অতীব সংকীর্ণ, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার দৌড় অনেক দূর পর্যন্ত। যদি পূর্বোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা পান, কিংবা যদি শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্বোক্ত হৃদয় পান, তবেই সোনায় সোহাগা হয়। আমাদের দেশের শক্তি ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পদতলে এবং আমাদের দেশের হৃদয় আমাদের স্বজাতীয় পূর্বপুরুষদিগের পদতলে বাঁধা রহিয়াছে। আমরা যদি স্বদেশের হৃদয়, স্বজাতির স্বজাতিত্ব অব্যাহত রাখিয়া ইংরাজ-শক্তি আত্মসাৎ করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশের হৃদয়ের উপর শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সোনায় সোহাগা করিয়া তোলে। কিন্তু, যদি আমরা আমাদের দেশের হৃদয়ের মূলোৎপাটন করিয়া ইংরাজ-শক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করি, তবে যে-শাখায় আমরা উপবিষ্ট আছি সেই শাখা আমরা স্বহস্তে কর্তন করি। আমরা আমাদের মূল আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে যদি-বা ঝঞ্ঝাবায়ুর তাড়না হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম, আপনাদের মূল আপনারা উচ্ছেদ করিয়া আমরা তাহার সম্ভাবনা পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া ফেলি।

এক্ষণকার নব্যমহলে "চাই নূতন—চাই নূতন" "কই নূতন—কই নূতন" "এই নূতন—এই নূতন" বলিয়া এক তুমুল রব উঠিয়াছে। জানেন না যে, পুরাতনে ঠেস না দিলে নূতন এক মুহূর্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। গোড়া না থাকিলে কি আগা থাকিতে পারে? ইতিহাসে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, পুরাতন ভিত্তি-ভূমি সমূলে উন্মূলন করিয়া "নূতন" যখনই ভুস্ করিয়া মাথা তুলিয়াছে, তাহার পরক্ষণেই তাহা টুস্ করিয়া জলগর্ভে বিলীন হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্মের পতন ও ফরাসিস্ দেশে সাধারণতন্ত্রের পতন ঐ কারণেই ঘটিয়াছিল। হৃদয়কে ছাঁটিয়া ফেলিয়া বুদ্ধিকে অতিমাত্র মার্জিত করিতে গেলেই ঐরূপ হিতে বিপরীত হয়। বৌদ্ধধর্মের ভিতর অনেক ভাল-ভাল রত্ন আছে, ফরাসিস্ বিদ্রোহীদিগের মধ্যেও অনেক ভাল-ভাল রত্ন ছিল,—কেবল একটি রত্নের অভাব ছিল, সেটি—হৃদয়। বৌদ্ধধর্মে, আত্মসংযম তপস্যা কঠোরতা প্রভৃতি ধর্মের জন্য যাহা-যাহা চাই সমস্তই আছে, কেবল একটির অভাবে সমস্তই ভণ্ডুল হইয়া গেল,—সেটি ভগবদ্ভক্তি বা ঈশ্বর-প্রেম। ফরাসিস্ বিদ্রোহীদিগেরও ঐ দশা হইয়াছিল। ধর্মের গোড়া কাটিয়া আগায় জল-সিঞ্চন করিলে তাহা হইতে কিই আর অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? হৃদয় যদি গেল, তবে শুধু শক্তিতে কি হইতে পারে? এক্ষণকার নব্য-সমাজ হৃদয়শূন্য শক্তির এমনি ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, সামান্য সামান্য গার্হস্থ্য বিষয়েও তাঁহাদের রুচি-বিকার ধরা পড়ে। যদি এক্ষণকার কোনও একটি সুসভ্য নব্য উদ্যানে প্রবেশ কর, তবে হৃদয়স্নিগ্ধকারী মাধুর্যের পরিবর্তে মস্তিষ্ক-মন্থনকারী উদ্ভিদতত্ত্বেরই সবিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইবে। সেখানে কিয়ৎকাল বিচরণ করিলে, জুঁই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি ফুলের জন্য তোমার মন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে—বড়-বড় ল্যাটিন নামধারী গন্ধহীন রঙচোঙে ফুল তোমার চক্ষুশূল হইবে ও তাহাদের বড়-বড় নাম তোমার কর্ণশূল

হইবে। তখন তুমি ক্রোটন বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিবে। "হায়! ক্রোটন্ বৃক্ষ! তুমি পূর্বজন্মে কত-না তপস্যা করিয়াছিলে। এই উদ্যানে, গ্রীষ্মকালে জুঁই, বেল, গন্ধরাজ প্রভৃতি কত ফুলই প্রস্ফুটিত হইত—তাহারা উদ্যানের শ্রী সমুজ্জ্বল করিত ও দশ দিকে মুহূর্তে-মুহূর্তে শীতল সুগন্ধ উপঢৌকন দিত, তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ! বর্ষাকালে কদম্ব, কেতকী, শেফালিকা, নববারিধারায় প্রাণ পাইয়া সৌরভের মাধুর্যে দিক্ আমোদিত করিত, তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ! শরতকালে প্রস্ফুটিত কামিনীফুলে বৃক্ষের আপাদ-মস্তক ভরিয়া উঠিত ও তাহার মধুর সুগন্ধ জ্যোৎস্নাধৌত প্রাসাদ-বাতায়ন ছাড়াইয়া উঠিয়া ছাদ পর্যন্ত মাতাইয়া তুলিত, তাহাকে তুমি তাড়াইয়াছ—ধন্য তোমার ইংরাজি পরাক্রম! বিদেশী বৃক্ষ দ্বারা উদ্যানের বৈচিত্র্য সাধন কর—তাহার বিরুদ্ধে আমরা একটি কথাও বলিব না—কিন্তু পনেরো আনা গন্ধহীন বিদেশী ফুলগাছের একধারে পড়িয়া এক আনা সুগন্ধি দেশী ফুল যে এই বলিয়া দুঃখের গীত সুরু করিবে যে, "এবার মো'লে ক্রোটন হ'ব" ইহা আমাদের প্রাণে সহ্য হয় না। আমাদের মন্তব্য কথাটি এই যে, উদ্যানে, জুঁই-বেল-মল্লিকা-গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প-বৃক্ষ রীতিমত সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে যথাস্থানে যথাপরিমাণে ইংরাজি পুষ্প-বৃক্ষ সাজাও, কিংবা আম্র-কাঁটাল-বট-অশ্বত্থ -তাল-নারিকেল প্রভৃতি ফল-পুষ্প-ছায়াপ্রদ বৃক্ষসকল যথারীতি সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে (এদেশে যাহা আজও হয় নাই) ওক্, আলিব্, সাইপ্রেস্ প্রভৃতি নানা-দেশীয় নানা বৃক্ষ, উপায় আবিষ্কার-পূর্বক, যথাস্থানে যথাপরিমাণে বসাও—তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হইবে; কিন্তু যদি, ওকের খাতিরে বট-অশ্বত্থকে দূর করিয়া দেও অথবা স্ট্রবেরি, পিয়ার এবং আপেলের খাতিরে আম্র-কাঁটাল-আতা প্রভৃতি দূর করিয়া দেও, তবে তাহাতে হিতে বিপরীত হইবে, একূল-ওকূল—দুকূল নষ্ট হইবে।

পুরাতনের ভিত্তিভূমির উপর কিরূপে নূতনের মূল-পত্তন করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের আপনাদের দেশেরই স্বর্গীয় মহাত্মারা—রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজসংস্কারকেরা—আমাদিগকে তাহার প্রকৃত পদ্ধতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের সংস্কারক ছিলেন, পরম হিতৈষী ছিলেন, উচ্ছেদক ছিলেন না। তাঁহারা স্বজাতির হীনতাসূচক কুসংস্কারগুলিই কেবল মানিতেন না, তদ্ভিন্ন, কেমন করিয়া স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতেন। উঁহাদের একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তিকে যখন ইংরাজেরা বড় বড় টাইটেল দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন—"যে-টাইটেল আমার আছে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর টাইটেল তোমরা আমাকে দিতে পারিবে না! এই যে উপবীত দেখিতেছ—ইহার সমক্ষে রাজারা পর্যন্ত মস্তক অবনত করে!" ব্রহ্মণ্য ফলাইবার জন্য তিনি যে ঐ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নহে—তাঁহার ও-কথার অর্থ এই যে, আমরা আপনাদের দেশের পিতৃপুরুষদের নিকট হইতে যে-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই আমাদের নিকট পূজ্য—তোমরা আমাদের কে যে, তোমাদের নিকট হইতে উপাধি পাইয়া আমরা আপনাদিগকে শ্লাঘান্বিত মনে করিব?

এক্ষণে আমাদের দেশে ইংরাজ-বাঙালির মধ্যে সাম্যরক্ষা বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে; কিন্তু কিরূপে সাম্যরক্ষা করিতে হয়—আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই তাহা জানেন। সাম্য দুইরূপ, (১) ভাবসাদৃশ্য, (২) আকারসাদৃশ্য। আকার-সাদৃশ্য এক তো অসম্ভব, তায় আবার তাহাতে কাহারও কোনও পুরুষার্থ নাই; অথচ আমাদের দেশের সাম্য-ভক্তেরা প্রায়ই বাহ্য আকার-সাদৃশ্যের প্রেমে মজিয়া আর্য-জাতিসুলভ আন্তরিক ভাব-সাদৃশ্যটি হেলায় হারাইয়া ফেলেন। ইংরাজ-বাঙালির মধ্যে বাহ্য-আকার-সাদৃশ্য দুইরূপে ঘটিতে পারে,—(১) ইংরাজেরা ধুতিচাদর পরিলে তাহা ঘটিতে পারে, (২) বাঙালিরা হ্যাট-কোট পরিলে তাহা ঘটিতে পারে। এরূপ যখন,—তখন উভয় জাতির মধ্যে কোন-এক জাতি যদি পর-পরিচ্ছদের কাঙালি হয়, তবে নিশ্চয়ই দাঁড়ায় যে, এক জাতি পরের সাজ সাজিতে লজ্জিত—আর এক জাতি পরের সাজ সাজিতে একটুও লজ্জিত নহে। এইরূপ হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাঁহারা ইংরাজ-বাঙালির মধ্যে সাম্য সংস্থাপন করিতে যান, তাঁহারা ফলে ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসেন—বাহ্য আকারসাম্য ঘটাইতে গিয়া আন্তরিক ভাব-বৈষম্য জাজ্বল্যরূপে

ফুটাইয়া তোলেন। আমরা যদি ইংরাজ-বাঙালির মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধির সাম্য সংঘটন করিতে পারি, তবেই আমরা কাজের মত কাজ করি। তুচ্ছ আকারসাম্য তাহার তুলনায় কিছুই নহে। সহস্র সাবান মাখিলেও বাঙালির গায়ের রঙ ইংরাজের মত বিশ্রী উৎকট ধবল বর্ণ হইতে পারে না ও সহস্র কোট পরিলেও বাঙালির স্নিগ্ধ মনুষ্য-মূর্তি বিকট নেকড়েবাঘ-মূর্তিতে পরিণত হইতে পারে না! তাহা হইয়া কাজও নাই! অতএব বলি যে, "হে সাম্য-প্রিয় দেশহিতৈষী যুবা! বাহ্য আকার-সাম্য হইতে মনের বাগ ফিরাইয়া আর্য জাতীয় ভাবসাম্যের পথ অবলম্বন কর যে, অন্তঃকরণে পুরুষার্থ লাভ করিবে!" একজন বাঙালি ভদ্রলোক যদি নিখুঁত ষোল আনা ইংরাজ সাজেন, তথাপি দাঁড়াইবে যে, ইংরাজেরা আসল ইংরাজ—তিনি নকল ইংরাজ। আপন মনে তিনি ষোল আনা ইংরাজ হইতে পারেন, কিন্তু ইংরাজের নিকট তিনি অধম বাঙালি—প্রসাদের কাঙালি—ভাষার কাঙালি—পরিচ্ছদের কাঙালি—অনুগ্রহের কাঙালি—এ-ছাড়া আর কিছুই নহে। ইংরাজেরা যদি অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে অন্তত চারি আনা ইংরাজ মনে করে, তাহা হইলেও কতকটা রক্ষা—কিন্তু তাহা হইবার নহে। ইংরাজ সাজিয়া, ইংরাজের দলে মিশিতে গেলে—অবশেষে তাঁহাকে ইংরাজদেরই নিকট এই বলিয়া হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে হইবে যে, "নিদেন তোমরা আমাদের মান রক্ষা কর!" আমরা বলি যে, এরূপ যাচিয়া মান ও কাঁদিয়া সোহাগ উপার্জন করিতে যাওয়ার অর্থই বা কি—প্রয়োজনই বা কি? বাঙালির উচিত যে, যাহাতে স্বদেশীয় হৃদয়ের সহিত অল্পে-অল্পে বিদেশীয় শক্তি-সামর্থ্য সংযুক্ত হইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ রাখিয়া স্বদেশীয় সভ্যতার উপরে অন্তত বারো আনা ভর দিয়া দাঁড়ান ও সেইখানে অবিচলিত থাকিয়া বিদেশীয় শক্তিপুঞ্জ (অর্থাৎ বাহ্য আকার-পরিচ্ছদ নহে, কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি, বল-পৌরুষ, কার্যনৈপুণ্য, কর্মিষ্ঠতা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণ) অল্পে-অল্পে আত্মসাৎ করিতে থাকুন,—তাহা হইলে আমাদের জাতি-গৌরবও বজায় থাকিবে, তদ্ভিন্ন আমাদের দেশের মস্তকে ও বাহুতে শক্তির সঞ্চার হইয়া তাহার মুখশ্রীতে নূতন হইয়া উঠিবে, ইহাকেই আমরা বলি—সোনায় সোহাগা।

[১] সোনায় সোহাগা। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

কোকিল

চন্দ্রনাথ বসু

লোকে বলে কোকিলের রূপ নাই, কোকিল কুৎসিত—কেননা কোকিল কালো। স্বীকার করি, নানা রঙে রঞ্জিত সুকোমল-পক্ষবিশিষ্ট অনেক পক্ষী আছে—তাহারা কোকিল অপেক্ষা সুন্দর। তাহাদের মধ্যে অনেকের সৌন্দর্যে অপূর্ব কমনীয়তা, অনেকের সৌন্দর্যে জ্যোতি, অনেকের সৌন্দর্যের অপূর্ব কান্তি, অনেকের সৌন্দর্যে অপূর্ব মহিমাও লক্ষিত হয়। কোকিল কালো—অতএব কোকিলের সেরূপ সৌন্দর্য নাই। কিন্তু কালো বলিয়াই কি কোকিল কুৎসিত ? কালো জল সুন্দর, কালো মেঘ সুন্দর, কালো চুল সুন্দর। তবে কালো কোকিল সুন্দর নয় কেন ? তুমি বলিবে—কেন তাহা বলিতে পারি না, তবে কুৎসিত দেখি, তাই বলি কালো কোকিল কুৎসিত। আমি বলি—তুমি সৌন্দর্য দেখিতে জান না, তাই কালো কোকিলকে কুৎসিত দেখ। দেখ, কালো জল কালো বলিয়া সুন্দর নয় ; তাহা হইলে এই যে কালো কালিতে লিখিতেছি ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই হইত না। কালো জলে নক্ষত্র-খচিত নীল আকাশের ছবি উঠে বলিয়া কালো জল সুন্দর। তেমনি কালো মেঘ অমৃতবৎ বারি বর্ষণ করিয়া কালো জলের সহিত কথা কয় বলিয়া সুন্দর। আর কালো চুল সতীর পায়ে লুটায় বলিয়া সুন্দর। ভালোর সম্পর্কে থাকিয়াই কালো ভালো। ছেলে নাড়ীছেঁড়া ধন বলিয়াই জননীর চক্ষে তাহার কালো রঙ এত সুন্দর। কালো কোকিলের কি এমন কিছুই নাই, যাহার গুণে তাহাকে কুৎসিত না দেখিয়া সুন্দর দেখি ? তুমি বলিবে, কিছুই তো নাই, থাকিলে তাহাকে কুৎসিত দেখিব কেন ? আমিও এই কথার একটি মীমাংসা করিব বলিয়া আজ কোকিলের কথা পাড়িয়াছি।

কোকিল অনেক দিনাবধি কবিদিগের সম্পত্তি। কবিরা কোকিলকে লইয়া অনেক খেলা খেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোকিলকে চিনিতে পারেন নাই। তাই আজ কোকিল এত কুৎসিত পাখি! কবিরা বলেন যে, কোকিলের স্বরে বিষ বই আর কিছুই নাই—যে-মধু আছে তাহাও বিষ-মাখা। কিন্তু কোকিলের স্বরে বিষ বই আর কিছুই নাই ? সেই সুললিত, সুমধুর, সুঠাম, সর্বাঙ্গসুন্দর, সতেজ, হোমাগ্নি শিখার ন্যায় পূর্ণাবয়ব, স্বতঃ-উৎপন্ন, স্ফূর্তিবৎ কু-উ ধ্বনিতে কি বিষ থাকিতে পারে ? খলতাশূন্য, গ্লানিশূন্য, সরল বালক সমস্ত রাত্রি সুখের ঘুম ঘুমাইয়া, শেষ নিশাতে দিবসের খেলার স্বপ্ন দেখিতেছে। গৃহপার্শ্বস্থ কাননে কোকিল কু-উ করিয়া উঠিল। বালক আহ্লাদে মাতিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া খেলা করিতে ছুটিল। কোকিল ডাকিয়াছে আর তাহাকে ধরে কে ? কোকিলের স্বরে বিষ কই ? কোকিলের স্বর তমসাচ্ছন্ন জগৎকে ফুটাইয়া দিল ; নিদ্রিত বিষাদমণ্ডিত দিঙ্‌মণ্ডলকে হাসাইয়া তুলিল, সমস্ত শিরায় রক্তস্রোত ছুটাইয়া দিল ; সর্বশরীরে এক অপূর্ব আনন্দ-তড়িৎ হানিল। কোকিলের কু-উ ধ্বনি ঐন্দ্রজালিকের নিঃশ্বাস!

আবাব বালককে ছাড়িয়া বাল-সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখ। তমসাবৃত সুদূর গগনপ্রান্তে ঈষৎ লাল রঙে রঞ্জিত হইয়াছে। অন্ধকারের প্রাণের ভিতর চোরের ন্যায় নিঃশব্দে এবং অলক্ষিতে একটু-একটু করিয়া অস্পষ্ট আলোক প্রবেশ করিতেছে। এখানে ওখানে কোথায় কি যেন আস্তে-আস্তে খুস্ খাস্ করিতেছে—ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু বোধ হইতেছে, যেন শূন্যে কোন একটা শব্দের নিস্তব্ধরকম প্রতিধ্বনি শুনা গেল। যেন কানের কাছে একটা গাছের পাতা আস্তে আস্তে নড়িয়া উঠিল। যেন কোথায় কে রুদ্ধ কণ্ঠে 'আব', 'হাম' এইরূপ একটা শব্দ করিল। নিদ্রিত মনুষ্য যেন গভীর সমুদ্রতল হইতে একটু-একটু করিয়া উর্ধ্বে উঠিয়া সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসিয়া পড়িল—তাহার মুদ্রিত চক্ষের পল্লবের ভিতরে একটু-একটু আলো খেলা করিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটা ফুটিল-ফুটিল বোধ হইতেছে। এমন সময়ে যেন সমস্ত স্ফোটনোন্মুখী পৃথিবীখানা কু-উ শব্দ করিয়া উঠিল, আর একেবার বনে পাখি ঝাড়া দিয়া উঠিল,

গ্রামে মানুষ 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া উঠিল, পূর্বদিকে একটা প্রকাণ্ড রাঙা গোলা হুস্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, চারিদিক ফরসা হইয়া গেল। কালো কোকিল ব্রহ্মাণ্ডটাকে ফুটাইয়া দিল!

কোকিলের কু-উ স্বরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্ফোট একীভূত। সেই বিশাল স্ফোটের অপূর্ব-সঙ্গীত কোকিলের কালো কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়। জগতে যত কিছু অপূর্ব স্ফোট, অপূর্ব বিকাশ, অতুল উন্নতি আছে, সবই যেন কোকিলের অপূর্ব কু-উ ধ্বনি। প্রস্ফুটিত ফুল, প্রস্ফুটিত শিশু, প্রস্ফুটিত যুবা,—হোমরের ইলিয়দ, কালিদাসের কুমার, সেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেথ, শেলীর স্কাইলার্ক, ফিদিয়াসের যুপিতর, বীরশ্রেষ্ঠ গর্দন, দয়াবতার হাউয়ার্ড, প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য, জ্ঞানোন্মত্ত শঙ্কর, ব্রহ্মাণ্ডরূপী ব্যাস—সকলই এক-এক অপূর্ব কু-উ ধ্বনি!

"ফুল ও ফুল"। ভাদ্র ১৩০৯।

রসিকতা

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

এই বঙ্গদেশ রসিকতার সমুদ্রবিশেষ। পৌরাণিকেরা ক্ষীর লবণ প্রভৃতি সপ্ত সমুদ্রের বিবরণ লিখিয়াছেন। যদি তাঁহারা বঙ্গভূমির আধুনিক ইতিহাস দিব্যনেত্রে পাঠ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহাকে রস-সমুদ্র নাম দিয়া, পুরাণ-প্রসিদ্ধ ভূগোল-শাস্ত্রে সমুদ্রের সংখ্যা সাত না লিখিয়া আট লিখিতেন। জ্ঞানানন্দের অভিধানে বঙ্গের এক নাম দাসনিবাস, আর এক নাম রসবিলাস। কেননা, এদেশের সকলেরই ললাটপটে দাসত্বের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-রেখা এবং অধরে ও নয়নপ্রান্তে রসিকতার মধুর লাঞ্ছন, সকল সময়ে সমানরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পুত্রকন্যা কি ভ্রাতা-ভগিনীর নাম রাখিতে হইবে,—বাঙালি তখনও রসিক। কারণ, পুত্রের নাম রসরাজ কি রসিকচন্দ্র, কন্যার নাম রসময়ী চৌধুরাণী। ভ্রাতার নাম প্রাণনাথ দত্ত, কি রতিকান্ত রায় ; ভগিনীর নাম অনঙ্গমঞ্জরী ; নামে এইরূপ অসাধারণ রসিকতা পৃথিবীর আর কোন দেশে দৃষ্ট হইয়াছে ?

দেশবিশেষের নামাবলী-পাঠ এক হিসাবে সেই দেশের প্রকৃতি-পাঠ। বৃটনেরা জ্ঞানে গুণে বৈজ্ঞানিক বলে এবং রাজনীতির কৌশলে আজিকালি সমস্ত সভ্যজগতে শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিলেও তাঁহারা কোনও একদিন যে গর্তে বাস করিতেন ও আম-মাংস ভালবাসিতেন, এবং এইক্ষণও তাঁহাদিগের বাস্তুরাজ্যের ডারউইনের বিজ্ঞান-বিনোদিনী কল্পনা যে বিরাজ করিতে পারিতেছে, তাঁহাদিগের নামেই তাহার নিদর্শন। কারণ, যদিও তাঁহাদিগের মিল, মেকলে প্রভৃতি ঐতিহাসিকবর্গ পরকীয় জাতিচরিত ও সাহিত্যাদির সমালোচনায় ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর পুরাতনতম জাতিকেও অকুণ্ঠিত কণ্ঠে অসভ্য বলিয়া গালি দিতেছেন, এবং ভাষাতত্ত্বের ভাষ্যস্বরূপ দেবজনস্পৃহনীয় সংস্কৃত ভাষাকেও বিকটবুদ্ধি জ্ঞান করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে Fox (শৃগাল) Wolf (বৃক) Savage (বন্যবর্বর) Hogg (শূকর) ও Badcock (মন্দ কুক্কুট) প্রভৃতি শ্রুতিমধুর ও মধুরার্থক নাম সমূহ সাহিত্যে গ্রথিত ও সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, এবং লোকে অদ্যাপি এই সকল নাম সাদরে গ্রহণ ও সসম্মানে ব্যবহার করিতেছে। স্বামী দিবসের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত কলেবরে গৃহে আসিতেছেন, গৃহলক্ষ্মী প্রেমভরে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছেন,—'হে শৃগাল, হে শৃগাল !' অথবা 'হে বৃক, হে বৃক'! পুনরপি বলিতেছি, কি মোহন ধ্বনি, কি মধুর ! বঙ্গীয় কুল-কামিনীরা ক্লান্ত-কলেবর কান্তকে 'হে শৃগাল' অথবা 'হে বৃক' বলিয়া সম্ভাষণ করেন না বটে, কেন-না বাঙালি রসিক। কিন্তু রসিকতার অনুরোধে বাঙালির নামাবলী যে-মূর্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা পুরুষের শোভা পায় কি না এবং পুরুষের তাহাতে তৃপ্তিলাভ সম্ভব কি না, ইহা গভীর সন্দেহের বিষয়। অথবা ইহাতে সংশয় ও বিস্ময়ের কথা কি ? যাঁহারা ভারত উদ্ধারের জন্য আদ্ধার তালে গীত গাইতে পারেন, এবং তালে-তালে নাচিয়া-নাচিয়া নাচনিচ্ছন্দের অশ্রাব্য কবিতায় জাতীয় হৃদয়ের মর্মনিহিত শোকবহ্নি উদ্‌গারণ করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ্য বীরেন্দ্রকেশরী, সুরসিক ধুরন্ধর পুরুষদিগের নাম কামিনীকান্ত, যামিনীকান্ত, কুমুদিনীকান্ত ও বিনোদিনীকান্ত এবং রমনীমোহন ও সুন্দরীমোহন অথবা 'দলিতাঞ্জন পুঞ্জগঞ্জন' ও 'ভামিনীরঞ্জন' ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? কবি সমাজের কীর্তিস্তম্ভ শেক্ষপীর কহিয়াছেন—

> "নামে কী করে,
> গোলাপ, যে-নামে ডাকো সৌরভ বিতরে।"

আমরা অকবি, সুতরাং একথা আমরা মানিতে পারি না। আমাদিগের এই বিশ্বাস যে, নামে আর কিছু না করুক, উহা দেশীয় রুচি এবং সাময়িক প্রকৃতির অন্তঃস্থল পর্যন্ত প্রদর্শন করে।

প্রাচীন আর্যবীরদিগের নাম ভরত, শত্রুঘ্ন, ভীষ্মার্জুন, বলদেব, বসুদেব, দুর্যোধন, ভীম ; ঋষিদিগের নাম ব্যাস, বাল্মীকি, কণাদ এবং দেশস্থ সাধারণ ভদ্রলোকদিগের নাম শতানন্দ, শাকটায়ন। যখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি মাননীয় আর্যগণ বঙ্গে প্রথম সমাগত মহানুভাবদিগের নাম দক্ষ, বেদগর্ভ, মকরন্দ ও বিরাট। তাহার পর যবন অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব সময়ে বঙ্গভূমি যখন অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন এবং সর্বথা অধোগতি প্রাপ্ত হইল, শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে ভাঁটা লাগিল, বিদ্যাবুদ্ধি ও মহত্বের গৌরব পর-পাদুকা-লেহন জন্য নূতন গৌরবের নিকট হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, তখন তাঁহাদিগের নাম হইল, আই, চাই, কচু, ঘেচু, বিক, কোক ইত্যাদি। * এইক্ষণ বহুদিনের পর বহুযুগের তপস্যার পর বিলাসসমুদ্রে ভাসমান সুশিক্ষিত, সুসভ্য, সুরুচিসম্পন্ন বাঙালি বীরদিগের নাম হইয়াছে রমণী, কামিনী, মানিনী, ভামিনী, কুমুদিনী, বিনোদিনী, রাই, কিশোরী। † ইহার পর কোনওদিন হয়তো কোন এক সুরসিক বাঙালি ব্রজবিলাস যাত্রায় জয়দেবের গীত শুনিয়া আত্মজের নাম রাখিবেন,—"ললিতলবঙ্গলতাবল্লভ" এবং অনুজের নাম রাখিবেন,—"প্রেমময়ী পদ-পঙ্কজ"। তিন কালের ত্রিবিধ রুচি, সুতরাং ত্রিবিধ নাম।

পূর্বে যেমন আমরা বাংলার ভারতউদ্ধাররত বীরভদ্রদিগের নামাবলী পাঠ করিয়াছি, যে-সকল অমূল্য গ্রন্থের দ্বারা সেই ভারতউদ্ধার লাভ করিবে, পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা এস্থলে তাহারও দুই একটি নাম উল্লেখ করিতে পারি। বাঙালির মস্তিষ্কসম্ভূত বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থমালার নাম চিন্তামণিদীধিতি, শব্দশক্তি প্রকাশিকা, শব্দতত্ত্ব কৌমুদী। এইক্ষণকার গ্রন্থসমূহের নাম—'হায় কি মজার শনিবার', হায় কি রসের নূতন বাহার' ইত্যাদি। বঙ্গদেশ কাব্যের প্রিয় নিবাস, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রসসমূহের অকালিক উচ্ছ্বাসে এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একেবারে একসঙ্গে কবি হইয়া বসিয়াছে, এবং দুর্ভিক্ষ-দুঃখকাতরা ক্ষীণ কলেবরা বঙ্গভূমি কাব্যের তটাভিঘাতী তরঙ্গতাড়নে এবং বঙ্গেয় কথায় কথার উৎপীড়নে অহোরাত্র থর থর কাঁপিতেছে। গ্রন্থকার চতুর্দশ বৎসরের বালক, শিক্ষকের গল গর্জনে বিদ্যালয়ে তাঁহার স্থান হইল না ; গৃহিণী একাদশবর্ষীয়া বালিকা, শ্বশ্রূজনের নিষ্ঠুরগঞ্জনায় গার্হস্থ্যজীবনে তাঁহার চিত্ত রহিল না। অতএব উভয়ে মিলিয়া কবিতা লিখিলেন, 'হায় বৃথা আছি' অথবা 'হায় বৃথা কাঁদি'। অনুসন্ধান করিলে সপ্রমাণ হইবে যে, আধুনিক কবিতাপুঞ্জের অনেক কবিতাই এইরূপ রসলিপ্সু বালক-বালিকার রসিকতার বিজৃম্ভণ।

কেবল বালক-বালিকারাই যে এই দোষে দোষী, এমন নহে। বৃদ্ধ এবং বয়ঃপ্রাপ্ত তরুণদিগের মধ্যেও অনেকে এই রসবিকারের প্রবল স্রোতে পড়িয়া ইদানিং হাবুডুবু খাইতেছেন। এদেশের একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অভিনব কবি আদিরসের কবিতা লিখিতে বড় ভালবাসেন। আদিরসের কবিতা লিখিতে তাঁহার ক্ষমতাও আছে। ঐ প্রকার আদিরসের কবিতা নীতি-বিগর্হিত বলিয়া অনেক সময় যার-পর-নাই অনিষ্টকর হইলেও ভাবের আবেগে এবং ভাষার পারিপাট্যে প্রায়শই পাঠক সমাজের একান্ত প্রীতিকর হইয়া থাকে। তিনি কবিতা লিখিয়াছেন,—'কেন দেখিলাম'। কবিতাটি সুন্দর ও সুখপাঠ্য এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তির লেখনীযোগ্য। অমন কবিতা ঠিক ঐরূপ উদ্দীপনী ভাষায় বাংলায় আর কেহ লিখিতে পারে কিনা, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁহার ছন্দানুবর্তনে ন্যূনত একশত মস্তিষ্কশূন্য এবং শতাধিক রস-পরিচয়শূন্য অকর্মণ্য যুবা কবিতা লিখিয়াছেন,—'কেন চাহিলাম', 'কেন চাহিলে', 'কেন নাচিল নয়ন', 'কেন ঝাঁপিলে বদন'। এইভাবে যেন তেন প্রকারে অদ্যাপি অনন্তকোটি 'কেন' বাংলায় লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচলিত হইতেছে। এই 'কেন' এইরূপ রসিকতার রাজ্য ছাড়িয়া আর যে যায়, এমন ভরসা কি ?

যে-সময়ে যুবরাজ এদেশে পদার্পণ করিলেন, প্রফুল্ল শরৎচন্দ্রের ন্যায় আনন্দ-লহরী বিকীরণ করিয়া ভারতে ভারতসাম্রাজ্য সংস্থাপনের জন্য উপনীত হইলেন, তখন এ-দেশের কাব্যকণ্ঠে ভয়ানক এক কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল। যেই দুই-তিনটি প্রকৃত কবি জাতীয় সম্মান রক্ষার অভিলাষে কবিতায় যুবরাজকে সম্ভাষণ করিলেন, অমনি কবিতার ককার বোধ-বিরহিত সহস্র যুবা, যেন কি এক রসাবেশে আবিষ্ট হইয়া যুবরাজকে কবিতায় অঞ্চলের ধন, শ্বেতরতন বলিয়া চতুর্দিক হইতে সমস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। লোকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া একে অন্যকে জিজ্ঞাসা

করিল—ইহা কি ? বঙ্গভূমির বাৎসল্যরস সহসা এইরূপ উচ্ছলিয়া উঠিল কেন ? কিন্তু যেহেতু শুধু এক বাৎসল্যরসেই কবিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন হয় না, এই নিমিত্ত বঙ্গের এক বয়োবৃদ্ধ পুরাতন কবি বঙ্গভূমিতে দর্পসহকারে প্রবেশ করিয়া কবিতায় বর্ণনা করিলেন যে, ভারত-মাতা জরতী হইলেও আজি রস-ভাবের উচ্ছলিত প্রবাহে পুনরায় যুবতী হইয়াছেন, এবং যৌবনের শোভা দেখাইয়া,—কেশে ফুল, কর্ণে দুল এবং কপালে চূর্ণ-কুন্তল দুলাইয়া মদনমোহন নৃপনন্দনকে প্রেমভরে আহ্বান করিতেছেন,—অতএব যুবরাজ সানন্দে আসিয়া সমাগত হউন। এই কবিতা আমাদিগের কল্পিত প্রলাপ নহে। ইহা লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং সহৃদয় পাঠকবর্গ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা রসের কথা। পঞ্চবিংশতি কোটি মনুষ্যের দগ্ধপ্রাণ ভারতমাতা বলিয়া যাঁহার নাম করিতেছে দেশে-বিদেশে শাস্ত্রার্থ-দর্শী সুধীপুরুষেরা যাঁহাকে সভ্যতা ও সামাজিক নীতির আদি জননী, পরমার্থতত্ত্বের রত্নখনি এবং সকল ভাষার ভাষা-প্রসবিনী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই আর্যাশ্রু প্রবাহরূপা নর্মদা ও ভাগীরথীর পবিত্র বারিবিধৌতা ভারতভূমিকে চটুল-নয়না নবীন নায়িকা সাজাইয়া, তাঁহাকে রাজবেশে বিভূষিত নবীন নায়কের সঙ্গে সম্মিলিত করা সামান্য কবিত্বশক্তি এবং সামান্য রসিকতার পরিচয় নহে !

গগন-পটো

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

গগন-পটোকে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ ; পথে-ঘাটে দাঁড়াইয়া কতবারই দেখিয়া থাকিবে। কিন্তু তোমরা সকলে তাহার গুণাগুণ জানো না, তাই আমাদিগকে আজ তোমাদের কাছে সেই অপরিচিতের পরিচয় দিতে হইতেছে।

কারিগর লোক প্রায়ই একটু খামখেয়ালি হয় ; কেহ বদ্‌মেজাজের উপর খামখেয়ালি, আর কেহ বা রসখেপার উপর খামখেয়ালি। কিন্তু গগন-পটোর মত খামখেয়ালি রসখেপা লোক আর দুনিয়ায় নাই। সে কখনও কাহারও ফরমাস মত চিত্র করে না, আপনার মনে আপনার ঝোঁকে নিয়তই আঁকিতেছে, আর পুঁচিতেছে ; কিন্তু যখন যেটা দাঁড় করাইবে, সেটা একেবারে চূড়ান্ত। যেমন রং তার তেমনি 'শেড়' ; যেমন ভাব-ভঙ্গি, তেমনি অঙ্গ-সৌষ্ঠব ! তাহাতেই বলিতেছিলাম, গগন-পটো খামখেয়ালি বটে, কিন্তু মস্ত কারিগর।

তবে গগনের অনেক সময় সময়-অসময়-বোধ নাই। প্রথম আলাপে সেই জন্য গগনের উপর বড়ই বিরক্ত হইতে হয় ; কিন্তু তাহার পর ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝা যায়, লোকটা অসাময়িক হইলেও বদ্‌রসিক নহে, রসখেপা বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে অন্তরে লুকানো-ছাপানো সহৃদয়তা বিলক্ষণ আছে। তবে সহিষ্ণুতা না থাকিলে, ঘনিষ্ঠতা না হইলে তাহার সেই ভাবটুকু কিন্তু বুঝিয়া উঠা ভার।

তুমি স্বজনের সদ্যোনাশে শোকে জর্জর, সংসার আঁধার দেখিতেছ, থাকিয়া-থাকিয়া তলদেশে মেদিনী ঘুরিতেছে, বাতাসে হু হু করিয়া সেই স্বজনের নাম ধ্বনিত হইতেছে, বুকের ভিতর বামদিকে কে যেন কীলক পুঁতিয়া দিয়াছে—ঘোরতর বিষাদে তুমি অবসন্ন হইয়াছ। আকুলস্বরা কুলকুলনাদিনী কল্লোলিনীর তীরে তুমি অবসাদে উপবিষ্ট হইয়া আছ। দূরে গগন-পটোর চিত্রপটে তোমার দৃষ্টি পড়িল। সে যেন তোমাকেই ভুলাইবে বলিয়া রং ফলাইয়া বসিয়াছিল ; তুমি চাহিবামাত্রই অমনই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার পটে আঁকিতে বসিয়া গেল। শোকগাম্ভীর হৃদয় সহজেই এক-মনস্ক হয়,—তুমি একমনে সেই অপূর্ব চিত্রণ দেখিতে লাগিলে। তোমার সেই স্বজনের সৌম্যমূর্তিই বা আঁকিবে। কিন্তু তা তো নয় !—ভীষণ-দ্রংষ্টা একটা ভীষণ ব্যাঘ্র কাহাকে যেন কামড়াইয়া রহিয়াছে। তোমার বোধ হইল, সেই ব্যাঘ্র-দষ্ট ব্যক্তিই যেন তোমার স্বজন। তোমার বুকের শেল কে যেন নাড়িয়া দিল, তোমার মর্মজ্বালা হইল,—গগন-চিত্রকরকে মহানিষ্ঠুর স্থির করিয়া মহাবিরক্ত হইলে।

তুমি মুখ ফিরাইবে, এমন সময় চকিতের মধ্যে দেখিলে যে, চিত্রপটে আর সে-ভয়ানক ব্যাঘ্র নাই, তোমার সেই ভূপাতিত বন্ধু সৌম্যমূর্তিতে গগনের পট শোভা করিতেছেন, আর একখানি সুন্দর হস্ত যেন তাঁহাকে আস্তে-আস্তে কোথায় মন্দ-মন্দ লইয়া যাইতেছে। তোমার প্রাণ যেন একটু শীতল হইল, তুমি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে ; ভাবিলে গগন-পটো খেপা হউক, আর যাই হউক—মনের কথা বুঝিতে পারে,—পোড়া মন একটু শীতল করিতে পারে। মনে যদি একবার ধারণা হয় যে, লোকটা সহৃদয় এবং তোমার ব্যথার ব্যথী, তাহা হইলেই তাহাকে ভালবাসিতে হয়। আর হৃদয় যখন শোক তাপে গম্ভীর, তখন সেই ভালবাসাও এক দিনে এক মুহূর্তে প্রগাঢ় হইয়া পড়ে। তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিলে যে, গগন তোমার ব্যথার ব্যথী, অমনই যেন তাহার উপর তোমার একটু ভালবাসা জন্মিল। তুমি নদীতীরস্থ শষ্প-শয্যায় শায়িত হইয়া, একমনে, স্থির নয়নে গগনের খামখেয়ালির কারিগরি পর্যালোচনা করিতে লাগিলে।

গগন আঁকিল,—একটা বৃহৎ কুম্ভীর, সূচল মুখ, কর্কশগাত্র, কণ্টকিত লাঙুল, কপিশ বর্ণ, ভয়ঙ্কর ভঙ্গি—সব ঠিকঠাক হুবহু,—যেন অগাধ নীল জলে সাঁতার দিতেছে। হঠাৎ কুম্ভীর

দ্বিখণ্ডীকৃত হইল, গায়ের কাঁটাগুলি তূলার মত ফুলোফুলো হইল, মুখ-কোণ সংযত হইল, রংটা কেমন একটু ঘোলা ঘোলা হইল। পরক্ষণেই দেখ, দুইটি নিরীহ মেষ পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সেই নীল প্রান্তরে শনৈঃ শনৈঃ বিচরণ করিতেছে। তুমি ভাবিতেছ, ভয়ঙ্কর কুম্ভীর যমজ মেষশিশু হইল ; ভাবিতে না ভাবিতেই সে-চিত্র নাই। সেই মেষদ্বয়ের স্থলে বিচিত্র বর্ণের বৃহৎ এক সদন্ত পতাকা, খরখর বাতাসে যেন ফর্‌ফর্ করিয়া উড়িতেছে। স্বজন বিয়োগ-চিন্তা তোমার মন হইতে ক্ষণেকের তরে অন্তর্হিত হইল। বিষম রসখেপা গগন তোমাকে আপনার পাগলামির কীর্তি দেখাইয়া হাসাইল। তোমার সেই মলিন ম্লান মুখের অধরপ্রান্তে সেই অন্তরের হাসি ঈষৎ দেখা দিল। তুমি অন্তরে বলিলে, পাগলা পটোর ভিতরের কথাটা ঠিক—সংসারের সকলই তো এইরূপ পরিবর্তনশীল, তা ঐ কেবল স্থাবর চিত্র আঁকিবে কেন !

এ-চিন্তায় তুমি অন্যমনস্ক হইয়াছিলে,—দেখিলে সে-বিচিত্র নিশান আর নাই,—মৃদু আভায় একটি স্থির চিতা যেন ধীরিধীরি জ্বলিতেছে। সেই চিতার মধ্যে অস্পষ্ট অবয়বে তোমার সেই স্বজনের শবমূর্তি। শবদেহ কিন্তু নিষ্প্রভ নহে,—সূর্যাস্ত-কালের পূর্বদিকের পাতলা মেঘের উপর ক্ষীণ রামধনুর ন্যায় একটু হাসি যেন সেই মুখ-প্রান্তে দেখা দিতেছে, চক্ষুর্দ্বয়ের প্রশান্ত শীতল জ্যোতি গগনের চিত্রান্তরে যেন স্থাপিত রহিয়াছে। সে-চিত্র গগনের আর এক অপূর্ব কীর্তি। স্বর্ণময়ী একটি দিব্যাঙ্গনা সতী-স্বভাব-সুলভ লজ্জায়, অথবা প্রৌঢ়া প্রোষিত-ভর্তৃকার স্বামিসমাগমের আগ্রহে এবং বনশোভিনী সদ্যঃ-কুসুমিতা বসন্তলতার প্রফুল্লতা ভরে সেই চিতার সজীব, সহাস্য শবদেহটিকে সুকোমল হস্ত-প্রসারণে আহ্বান করিতেছেন। সেই কাঞ্চনময়ী দিব্য মূর্তিতে তোমার বন্ধুব মৃতা পত্নীর মুখশ্রী লক্ষ করিলে,—সেইরূপ পুরু পুরু জোড়া ভ্রূ—যেন তেমনই করিয়াই নীচের দিকে নামানো আছে, সেই স্থির নয়নে যেন তেমনই করিয়াই জ্যোৎস্না মাখানো আছে !

উপর স্তরে দিব্যাঙ্গনা ভাসিয়া-ভাসিয়া নিম্নস্তরে চিতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নিম্নস্তরের চিতা ও শবদেহ লইয়া দিব্যাঙ্গনার দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল,—কাছাকাছি হইল, তোমার চক্ষুতে জল আসিল ; চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলে সে-সব আর কিছুই নাই,—গগন পটো নীল পটের এখানে সেখানে কেবল কাঁচা সোনার স্তবক আঁটিতেছে। আর তাহাতে জরদ, ধূমল, পাংশু কত বিচিত্র রঙের শেঁড় দিতেছে। তুমি উঠিয়া বসিলে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে, এবার মুখ ফুটিয়া বলিয়া উঠিলে,—"গগন সকলকেই জানে,—সকলকেই চেনে ; আমরা কিন্তু উহাকে কেহই চিনিতে পারিলাম না। দেখ, আমাদের সকল সংবাদই রাখে, আমরা কিন্তু উহার কিছুই জানি না।"

গগনের কার্যসাধনা হইয়াছে। তাহার সহিত একবার ঘনিষ্ঠতা করিলেই সে তাহার অবস্থার পট দেখাইয়া তোমার কিছু-না-কিছু ভাল করিবেই। হয় তোমার মনের কবাট খুলিয়া দিবে, নয় তোমার শোকে সান্ত্বনা করিবে। কখনও হয়তো তোমার আনন্দের সংবর্ধনা করিবে, আবার কখনও হয়তো তোমাকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিবে। আজ সে তোমার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিয়াছে, তোমার মাথা হাল্‌কা হইয়াছে বটে,—এখন আর ঘুরিতেছে না ; বাতাস এখনও হু হু করিতেছে—এখনও পিলুরাগিণীতে ভরিয়া আছে, কিন্তু এখন তো আর তোমার বন্ধুর নাম করিয়া কাঁদিতেছ না। বুকে এখনও শেল বিঁধিয়া আছে বটে, কিন্তু তেমন করিয়া আর তো কেহ তাহাকে মোচড় দিতেছে না ; গগনের কার্যসমাধা হইয়াছে। গগন তোমার শোকবহ্নির প্রখরতা নষ্ট করিয়াছে। তুমি এবার ধীরে-ধীরে ফিরিয়া দেখিলে, পশ্চিমে দিক্‌চক্রবাল ব্যাপিয়া ঘন সন্নিবেশিত শালবিটপাচ্ছাদিত পর্বতবেদীর উপর জ্বলন্ত কাঞ্চনরাগে এক অপূর্ব প্রতিমা দীপ্তি পাইতেছে। গগন পটোর সেই এক প্রিয় প্রতিমা। মাস-মাস ধরিয়া প্রত্যহই আঁকে, আর প্রত্যহই পুঁছিয়া ফেলে,—বিরক্তিও নাই, তৃপ্তিও নাই।

ঐ প্রতিমা একখানি আশ্চর্য ছবি। গগন পটো প্রায়ই প্রত্যহ আঁকে, আর আমরাও তো প্রায়ই প্রত্যহ দেখি, তবু নিত্যই নূতন। পুরাণের পুরাণ মহাপুরাণকে নূতন করিয়া দেখাইতে গগন পটো যেমন পটু এমন আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু কেবল তাই বলিয়া যে পশ্চিমের প্রতিমা আশ্চর্য ছবি, তাহা নহে। ও এক আজগুবি কাণ্ড।—মুখ নাই অথচ দেখ কেমন হাসিতেছে। চোখ নাই, ভ্রূ

নাই—তবু দেখ কেমন চোখ রাঙাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া রহিয়াছে। আর আশ্চর্যের আশ্চর্য—ঐ মধুর হাসিতে আর ঐ ভীষণ ভ্রূকুটিতে দেখ দেখি কেমন মাখামাখি, কেমন মেশামেশি। পৌরাণিকী অন্ধকারময়ী কালীমূর্তিতে একবার প্রসন্নাং স্মিতাননাং করালবদনাং দেখিয়াছ, আর একবার গগন-পটোর ঐ জ্বলন্ত চিত্রে ললিতে ভৈরবে, কোমলে ভীষণে অপূর্ব মিলন দেখ। ঐ দেখ কেমন হাসি! ঢল ঢল তপ্তকাঞ্চনসাগরে যেন অমৃতের লহরী উঠিল। ঐ দেখ কেমন রাগ! ব্রহ্মকোপানলে যেন খাণ্ডব দাহ হইবে। ঐ দেখ নিঃশব্দ, তবু যেন তোমাকে স্বর্গের বার্তা ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিতেছে। চক্ষু নাই, তবু যেন তোমার মনের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। আর দেখ, নিশ্চল, সুস্থির—তথাপি যেন হাত তুলিয়া তোমাকে অভয় দান করিতেছে। আইস, আমরা প্রণত হই। সঙ্গে সঙ্গে মহাশিল্পী গগন চিত্রকরকে নমস্কার করি এবং তাহার ওস্তাদকে একবার দেখাইবার জন্য তাহার কাছে প্রার্থনা করি।

গগন-দাদা! তোমার খেপামিতে ক্ষান্ত দিয়া একবার আমাদের গুটিকতক কথা শুন। গঙ্গার উপর তোমার প্রভাত ছবি, পর্বত-পৃষ্ঠে তোমার এই সন্ধ্যার প্রতিমা, প্রাবৃটের সেই ঘনকৃষ্ণ সিংহাসন, নিদাঘের সেই রৌদ্রমূর্তি—ও-সকল কারিগরি তোমার অনেকবার দেখিয়াছি, তোমার বিচিত্র পট দেখিয়া অনেকবার জ্বলিয়াছি, পুড়িয়াছি, হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি; কিন্তু ঐ সকল বিচিত্রচিত্রে আত্মহারা হই বটে, অথচ পরমার্থ পাই না, তুষ্টি হইলেও তৃপ্তি হয় না। না দাদা, আর খেপামি করিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। তোমার এইসকল ছায়াময়ী প্রতিমার অন্তবস্থ প্রতিমা আমাকে সেই দিনের মতো আর একবার দেখাও। তোমার সেই বিষম ভেল্কি আর একবার ভাঙিয়া দাও। এই ছায়াবাজীর ছায়া-পট একবার ক্ষণ-মুহূর্তের জন্য সরাইয়া দাও! আমি আর একবার তোমার সেই নীল, নীল, অতি নীল বাজিঘরের অভ্যন্তরস্থ তোমার ওস্তাদকে প্রাণ ভরিয়া দেখি। সেদিন তুমি দেখাইলে বটে, কিন্তু আমি যে কি দেখিলাম তাহার কিছুই বুঝিলাম না। কোমলের কোমল অতি কোমল বংশীরবে আমার মোহ হইল; নীল মধ্যে অতি নীল দেখিতেছিলাম, সমস্ত জগৎ নীল আভায় প্রতিভাত হইল—আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর তুমি তোমার ছায়াপটে তূলারাশি ছড়াইয়া হাসিতে লাগিলে। না দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, এবার আর ও সময়ে খেপামি করিও না; ভালো করিয়া তোমার ওস্তাদকে একবার দেখাও।

"নবজীবন"। ১২৯২ বঙ্গাব্দ। সাহিত্য সাধনা।

প্রথম অনুরাগ

নবীনচন্দ্র সেন

প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হইল। ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। শেষ দিন যখন পরীক্ষার গৃহ হইতে বাহির হইলাম, বোধ হইল, হৃদয়ে যেন একটু নবীন উৎসাহ, শরীরে যেন একটি নবীন জীবন সঞ্চারিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কথা যখন মনে করি, তখন আমার একটি দৃশ্য মনে পড়ে। বলিদান। অজ্ঞ শিশুগুলিকে প্রক্ষালন করিয়া আনিল। পরীক্ষার ফিস দাখিল হইল। ছাগল চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—বালক অনাহার-অনিদ্রায় রাত্রি জাগিয়া চীৎকার করিয়া পড়িতে লাগিল। ছাগলের ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা এবং গলায় বিল্বপত্রের মালা অর্পিত হইল, বালকের "নমিনেশন রোল" পহুঁছিল। ছাগল তাহার পর কাঁপিতে-কাঁপিতে হাড়িকাষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইল—বালক কাঁপিতে-কাঁপিতে পরীক্ষাগৃহে দাখিল হইল। তাহার পর উভয়ের বলিদান। তারতম্যের মধ্যে এই—ছাগল তখনই মরে, সকল যন্ত্রণা শেষ হয়। বালক যাবজ্জীবনের জন্যে আধমরা হইয়া থাকে, তাহার যন্ত্রণা আরম্ভ হয় মাত্র।

যাহা হউক বলিয়াছি, প্রবেশিকা শেষ হইল ; শরীরে নবীন জীবন, নবীন উৎসাহ প্রবেশ করিল ; প্রকৃতি নবীন সৌন্দর্যে হাসিল। হৃদয় হইতে কি পাহাড় নামিয়া গিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নানা আনন্দে আমরা দলে-দলে গিরিশৃঙ্গের উপত্যকায় এবং নির্ঝরের ধারে বেড়াইতে লাগিলাম। কখনও-কখনও প্রশ্নের কাগজ খুলিয়া যে-যে প্রকার উত্তর দিয়াছি সেরূপ নম্বর ধরিতাম, কিন্তু কিছুতেই 'পাস মার্ক' কুলাইয়া উঠিত না।

বিদ্যুৎ আমার কোনো দূর আত্মীয়-কন্যা। তাহার ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে পড়িত। দিনরাত্রি আমরা প্রায় এক সঙ্গে পড়িতাম, খেলিতাম ; কখনও-কখনও ঝগড়া করিতাম। বিদ্যুৎ তখন ক্ষুদ্র বালিকা—চঞ্চলা, মুখরা, হাস্যময়ী। বিধাতার হস্তের একটি অপরূপ একমেটে প্রতিমা। যখন সে তাহার নাতিদীর্ঘ কুঞ্চিত অলকরাশি দোলাইয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া যাইত দেখিতাম, তখন সে শত ত্যক্ত করিয়া গেলেও তাহাকে মারিতে ইচ্ছা হইত না। সেও আমাদিগকে বিরক্ত করাটি একরূপ বিজ্ঞান শাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ভ্রাতা আমাদের অপেক্ষা ভাগ্যবান। যখন বিদ্যুৎ সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা, সে একাদশ কি দ্বাদশ বৎসর বয়সে ভাবি সংসার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করে। তদবধি আমি তাহার গৃহে বড় একটা যাইতাম না ; গেলে মনে কি যেন দুঃখ, হৃদয়ে কি যেন একটা অভাব বোধ হইত। চার কি পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর একদিন বিদ্যুতের মাতা আমাকে ডাকিলেন। আমি অপরাহ্নে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছি, পাশে ও কে ধীরে ধীরে কোমল পদবিক্ষেপে আসিয়া বসিল ? বিদ্যুৎ। কি চমৎকার পরিবর্তন। যে-বালিকা ছুটিয়া, বাতাসে কুন্তলের কুঞ্চিত অলকাবলি এবং অঞ্চল উড়াইয়া ভিন্ন চলিতে পারিত না, সে আজি ধীরে-ধীরে কোমল পদক্ষেপে—পায়ের নিচে ফুলটি পড়িলেও নামিতে হইত না—এরূপ অলক্ষিতভাবে আসিয়া বসিল। যাহার হাসি ও কণ্ঠ বাঁশির মত অনবরত বাজিত, আজ তাহার তরঙ্গায়িত অধরবিপ্লাবী হাসি কোমলার অধর প্রান্তে বিলীনপ্রায় হইয়া এক অস্ফুট ভাব ও শোভা বিকাশ করিতেছিল। কণ্ঠ নীরব। যে কখনও গলা জড়াইয়া ধরিয়া অংসে উরসে ভিন্ন বসিত না, কি আশ্চর্য, আজি তাহার সঙ্গে চোখে চোখে দেখা হইলে সে চোখ নামাইয়া লইতেছে। আমি অন্য কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে, সে তাহার কমলদলায়ত দুই ভাসা চক্ষু আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে স্থাপিত করিয়া অতৃপ্ত ভাবে চাহিতেছে। কি দৃষ্টি ! কি অর্থ ! কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে যে কলকণ্ঠে কাকলি বর্ষণ না করিয়া থামিত না, সে আজি ঈষৎ হাসিয়া নিরুত্তরে অধোমুখে চাহিতেছে।

আমারও হৃদয়ে কি একটি ভাবের উদয় হইতেছিল, আমি বড় বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমারও সেই মুখখানি বড় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছিল, অথচ নয়ন ভরিয়া দেখিতে পারিতেছিলাম না। কে যেন চোখ ফিরাইয়া দিতেছিল। চোখে চোখে দেখা হইলে কি যেন একটি কোমল কুসুম স্পর্শ-মৃদু-মধুর আঘাত হৃদয়ে পঁহুছিতেছিল। সেখান হইতে যে উঠিতে পারিতেছিলাম না সেকথা আর বলিতে হইবে না। বসিতে বসিতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর কিঞ্চিৎ রাত্রি হইল। অবশেষে উঠিলাম ; আত্মহারাবৎ চলিয়া যাইতেছিলাম, অন্ধকারে বারাণ্ডা পার হইতে বক্ষে কি লাগিল ? আমি এক পা পিছাইলাম, কিন্তু আবার সে কুসুমস্তবকনিভ স্পর্শ হৃদয়ে লাগিল—আহা ! কি স্পর্শ ! বুঝিলাম, আমার বুকে মাথা রাখিয়া বিদ্যুৎ। অজ্ঞাতে আমার দুই ভুজ তাহাকে আরও বুকে টানিয়া ধরিল। আমার সমস্ত শরীরের যন্ত্র কি এক অমৃতে আপ্লুত হইয়া নিশ্চল হইল। বালিকা আমার করে একটি গোলাপ ফুল দিল। আমি তাহার ললাটে একটি চুম্বন দিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে গুরুঠাকুর চন্দ্রকুমারের কাছে ঊর্ধ্বশ্বাসে উপস্থিত হইলাম। গুরুমহাশয় আমাকে যথাশাস্ত্র বুঝাইয়া দিলেন যে, বিদ্যুতের সঙ্গে আমার বিবাহ হইতে পারিবে না। অতএব সেখানে আর যাইতে আমাকে নিষেধ করিলেন।

"আমার জীবন"। ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

নক্ষত্রদের বৌ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

খোক্কশের বাচ্ছা ধরিয়া আকাশে উঠিবার কথা নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী বসিয়া বসিয়া শুনিল। তাহারা দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল যে, যদি কাজটি নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে খর্বুর আর আমাদের দোষ দিতে পারিবে না, অথচ খাদ্যটি আমাদের হাতছাড়া হইবে না।

মাসী বলিল, "বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন পৃথিবীর অর্ধেক দ্রব্যে অরুচি। এইরূপ কোমল রসাল মাংস খাইতে এখন সাধ হয়। যদি ভাগ্যক্রমে একটি মিলিল, তাও বুঝি যায়!"

নাকেশ্বরী বলিল, "মাসী, তুমি এক কর্ম কর। তোমার ঝুড়িতে বসিয়া তুমি গিয়া আকাশে উঠ। সমস্ত আকাশ তুমি একেবারে চুনকাম করিয়া দাও। ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া চুনকাম করিবে, কোথাও যেন একটু ফাঁক না রহিয়া যায়। তুমি তোমার চশমা নাকে দিয়া যাও, তাহা হইলে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে। চুনকাম করিয়া দিলে ছুঁড়ী আর আকাশের ভিতব যাইতে পথ পাইবে না, চাঁদও দেখিতে পাইবে না, চাঁদের মূল-শিকড়ও কাটিয়া আনিতে পারিবে না।"

দুইজনে এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাসী গিয়া ঝুড়িতে বসিল। ঝুড়ি হু হু শব্দে আকাশে উঠিল। সমস্ত আকাশে নাকেশ্বরী মাসী চুনকাম করিয়া দিল।

অট্টালিকা হইতে বাহির হইবার সময়ে মশা দেখিলেন যে, সেখানে একটি ঢাক পড়িয়া রহিয়াছে। মশা সেই ঢাকটি সঙ্গে লইলেন। বাহিরে আসিয়া কঙ্কাবতী ও মশা হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ কবিলেন। যে-বনে খোক্কশের বাচ্ছা হইয়াছে, সেই বনে সকলে চলিলেন। সন্ধ্যার পর খোক্কশের গর্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

একবাব আকাশ পানে চাহিয়া মশা বলিলেন, "কি হইল? আজ দ্বিতীয়ার রাত্রি, চাঁদ এখনও উঠিলেন না কেন? মেঘ করে নাই, তবে নক্ষত্র সব কোথায় গেল? আকাশ এরূপ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল কেন?"

ধাড়ী খোক্কশ আপনার বাচ্ছা চৌকি দিয়া গর্তে বসিয়া আছে। একে রাত্রি তাতে নিবিড় অন্ধকার বন। দূর হইতে ধাড়ী খোক্কশ কঙ্কাবতীর গন্ধ পাইল।

ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া ধাড়ী খোক্কশ বলিল, হাঁউ মাঁউ খাঁউ রে, মনুষ্যেব গন্ধ পাঁউ রে! কেরে তোরা, এদিকে আসিস?"

মশা চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে?"

খোক্কশ বলিল, "আমি আবার কে? আমরা খোক্কশ!'

মশা বলিলেন, "আমরা আবার কে? আমরা ঘোক্কশ!"

এই উত্তর শুনিয়া খোক্কশের ভয় হইল। খোক্কশ বলিল, "বাপ রে! তবে তো তোরা কম নয়? ক খ গ ঘ, আমি খ-য়ে তোরা ঘ-য়ে, আমার চেয়ে তোরা দুই পইঠা উঁচু! আচ্ছা কেমন তোরা ঘোক্কশ, একবার কাশ দেখি শুনি?"

মশা তখন সেই ঢাকটি ঢং ঢং করিয়া বাজাইলেন।

সেই শব্দ শুনিয়া খোক্কশ বলিল, "ওরে বাপরে! তোদের কাশির কি শব্দ! শুনলে ভয় হয়, কানে তালা লাগে! তোরা ঘোক্কশ বটে!"

খোক্কশ কিন্তু কিছু সন্দিগ্ধ চিত্ত। এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও তবু তাহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। তাই সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা! তোরা কেমন ঘোক্কশ, তোদের মাথার একগাছা চুল ফেলিয়া দে দেখি?"

এই কথা বলিতে, মশা হাতীর কাছিগাছটি ফেলিয়া দিলেন। খোক্কশ তাহা হাতে করিয়া

দেখিতে লাগিল। অনেক দেখিয়া শেষে বলিল, "ওরে বাপ রে! এই কি তোদের মাথার চুল! তোদের চুল যখন এত বড়, এত মোটা, তখন তোরা না জানি কত মোটা। তোদের সঙ্গে পারা ভার!"

তবুও কিন্তু খোক্কশের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া খোক্কশ পুনরায় বলিল, "আচ্ছা তোরা যদি ঘোক্কশ, তবে তোদের মাথার একটা উকুন ফেলিয়া দে দেখি?"

মশা বলিলেন, "কঙ্কাবতী, শীঘ্র হাতীর পিঠ হইতে নামো।"

তাহার পর মশা হাতীকে বলিলেন, "হাতী ভায়া! এইবার!"

এই কথা বলিয়া মশা হাতীটিকে ধরিয়া খোক্কশের গর্তে ফেলিয়া দিলেন। গর্তে পড়িয়া হাতী শুঁড় দিয়া খোক্কশের বাচ্ছাটিকে ধরিলেন। খোক্কশের বাচ্ছা 'চ্যাঁ চ্যাঁ' শব্দে ডাকিয়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তোলপাড় করিয়া ফেলিল। শুঁড়-বিশিষ্ট পর্বতাকার উকুন দেখিয়া, ত্রাসে খোক্কশের প্রাণ উড়িয়া গেল।

খোক্কশ ভাবিল, তোদের মাথার উকুন আসিয়া তো আমার বাচ্ছাটিকে ধরিল, ঘোক্কশেরা নিজে আসিয়া আমাকে না ধরে! এই মনে করিয়া খোক্কশ বাচ্ছা ফেলিয়া উড়িয়া পলাইল।

মশা ও কঙ্কাবতী তখন সেই গর্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মশা বলিলেন, "কঙ্কাবতী, তুমি এখন ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ কর। খোক্কশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া তুমি এখন আকাশে গিয়া উঠ, চাঁদের শিকড় লইয়া পুনরায় এখানে আসিবে! তোমার প্রতীক্ষায় আমরা এখানে বসিয়া রহিলাম। তুমি আসিলে আমরা খোক্কশের বাচ্ছাটিকে ফিরিয়া দিব। কারণ, এখন এ স্তন্যপান করে, অতি শিশু। ইহাকে লইয়া আমরা কি করিব? যাই হউক, তুমি এখন আকাশের দুর্দণ্ড সিপাহীর হাত হইতে রক্ষা পাইলে হয়। শুনিয়াছি সে অতি ভয়ঙ্কর দোর্দণ্ড-প্রতাপান্বিত সিপাহী। সাবধানে আকাশে উঠিবে।"

আকাশপানে চাহিয়া মশা পুনরায় বলিলেন, "কঙ্কাবতী, আমার কিছু আশ্চর্য বোধ হইতেছে। আজ দ্বিতীয়বার রাত্রি, চাঁদ উঠিবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চাঁদও দেখিতে পাই না, নক্ষত্রও দেখিতে পাই না। অথচ মেঘ করে নাই। কালোমেঘে না ঢাকিয়া সমস্ত আকাশ বরং শুভ্রবর্ণ হইয়াছে, ইহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি? আকাশে উঠিলে হয়ত তুমি বুঝিতে পারিবে। অতি সাবধানে আপনার কার্য উদ্ধার করিবে।"

কঙ্কাবতী খোক্কশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া আকাশের দিকে তাহাকে পরিচালিত করিলেন; দ্রুতবেগে খোক্কশ-শাবক উড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতী অবিলম্বে আকাশের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

আকাশের কাছে গিয়া কঙ্কাবতী দেখিলেন যে, সমুদয় আকাশে চুনকাম করা। কঙ্কাবতী ভাবিলেন, এ কি প্রকার কথা। আকাশের উপর এরূপ চুনকাম করিয়া কে দিল?

আকাশের উপর উঠিতে কঙ্কাবতী আর পথ পান না? যে দিকে যান, সেই দিকেই দেখেন চুনকাম। আকাশের একধার হইতে অন্যধার পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইলেন, পথ কিছুতেই পাইলেন না। সব চুনকাম। কঙ্কাবতী ভাবিলেন, ঘোর বিপদ! আকাশের উপর এখন উঠি কি করিয়া?

হতাশ হইয়া আকাশের চারিধারে কঙ্কাবতী পথ খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক অন্বেষণ করিয়া, সহসা এক স্থানে একটি সামান্য ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্রটি দিয়া নক্ষত্রদের বউ উঁকি মারিতেছিল। কঙ্কাবতী সেই ছিদ্রটির নিকটে যাইলেন। কঙ্কবতীকে দেখিয়া নক্ষত্রদের বউ একবার লুকাইল; পুনরায় আবার ভয়ে-ভয়ে উঁকি মারিতে লাগিল।

কঙ্কাবতী বলিলেন, "ওগো নক্ষত্রদের বউ। তোমার কোনও ভয় নাই। আমিও মেয়েমানুষ, আমাকে দেখিয়া আবার লজ্জা কেন বাছা?"

নক্ষত্রদের বউ উত্তর করিল, "কে গা মেয়েটি তুমি? তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছি, তুমি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তাই মনে করিলাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি তুমি খুঁজিতেছ? কিন্তু হাজার হউক, আমি বউ মানুষ, সহসা কি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারি? তাতে রাত্রিকাল। একটু আস্তে কথা কও বাছা! আমার ছেলে-পিলেরা সব শুয়েছে, এখনই জাগিয়া উঠিবে, কাঁচা ঘুম ভাঙিলে কাঁদিয়া জ্বালাতন করিবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "ওগো নক্ষত্রদের বউ! আমার নাম কঙ্কাবতী। আমি পতিহারা সতী, আমি বড় অভাগিনী। আকাশের ভিতর যাইবার নিমিত্ত পথ অন্বেষণ করিতেছি। তা আজ এ কি হইয়াছে বাছা, পথ কেন পাই না? একবার আকাশের ভিতর উঠিতে পারিলে আমার পতির প্রাণ রক্ষা হয়। বাছা, তুমি যদি পথটি বলিয়া দাও তো আমার বড় উপকার হয়।"

নক্ষত্রদের বউ উত্তর করিল, "পথ আর বাছা তুমি কি করিয়া পাইবে? এই সন্ধ্যাবেলা এক বেটি ভূতিনী-বুড়ী আসিয়া আকাশের উপর সব চুনকাম করিয়া দিয়াছে। তা যাই হউক, আমি চুপি চুপি তোমাকে আকাশের খিড়কি-দ্বারটি খুলিয়া দিই। সেই পথ দিয়া তুমি আকাশের ভিতর প্রবেশ কর।"

এই কথা বলিয়া নক্ষত্রের বউ চুপি-চুপি আকাশের খিড়কি-দ্বারটি খুলিয়া দিল। সেই পথ দিয়া কঙ্কাবতী আকাশের উপর উঠিলেন।

"কঙ্কাবতী"। ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

পূর্ণিমার শশী

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

তর তর করিয়া আপন মনে কোথায় যাইতেছ, একবার দাঁড়াও দেখি হে ? দাঁড়াও ; একবার ভাল করিয়া তোমায় দেখি। এ-দুঃখের মনুষ্যজীবনে দুঃখ অনন্তবিধ ; কিন্তু মর্মান্তিক দুঃখ এই যে, কিছুই ভাল করিয়া দেখা যায় না। যাহা কিছু দেখিলাম, যাহা দেখিয়া মোহিত হইলাম, যাহা দেখিয়া আবার দেখিবার জন্য লালায়িত হইলাম—কিছুই ভাল করিয়া দেখা হইল না। কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া গেল ; ইন্দ্রধনু দেখিতে না দেখিতে মিলাইয়া গেল ; ক্ষণপ্রভা যেমন ভাসিল, অমনি ডুবিল—কিছুই নয়ন ভরিয়া দেখা হইল না। আর কুসুমের সৌন্দর্য, বিদ্যুতের শোভা, ইন্দ্রধনুর বৈচিত্র্য, সায়াহ্ন-গগনের কোমলতা, বসন্ত-পবনের মাধুরী, চন্দ্ররশ্মির পবিত্রতা, যেখানে একাধারে মিলিত দেখিলাম, তাহাও কোথায় কোথায় চলিয়া গেল ?

"ভাল করি পেখন না ভেল !
মেঘমালা সঞে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥"

একবার দাঁড়াও দেখি হে ! একবার দাঁড়াও, একবার নয়ন ভরিয়া, সাধ মিটাইয়া তোমায় দেখি। তোমায় বড় ভালবাসি। তুমি সুন্দর, তাই তোমায় ভালবাসি। তুমি কোমল, তাই তোমায় ভালবাসি। যেমন তোমার হৃদয়ে, তেমনি আমারও হৃদয়ে কালিমা পড়িয়াছে, তাই তোমায় ভালবাসি। আর ভালবাসি তোমার ঐ—

"ঘুমে ঢুলু ঢুলু যুগললোচন, মুখে মুখে মৃদু হাস।"

সুদ্ধ কি ঐজন্য ? তা তো নয়। আর কিছু আছে কি ? এ-ভালবাসার ভিতর—এ কেবল চক্ষের ভালবাসার ভিতর আর কিছু আছে কি ? তুমি আকাশের চাঁদ, আমাদের আকাশকুসুম—কখনও তো বুকে করিতে পাই না—বুকে রাখিয়া, একশবার পলকে একশবার, মুখখানি চাহিয়া দেখিতে তো পাইব না। বলিবার কিছু নাই, তবু বলি বলি মনে করিয়া, কেবল স্পর্শসুখটুকুর জন্য, কখনও তো অনর্থক জাগিয়া রাত পোহাইতে পাইব না। কখনও তো আমার জন্য একটু অধিক হাসি, আমি আসিয়াছি বলিয়া একটু অধিক আহ্লাদ ও-চাঁদমুখে দেখিতে পাইব না। কখনও তো বচনামৃত কর্ণবিবর ভরিয়া ঢালিবে না—কেবল চক্ষের ভালবাসা ইহার ভিতর আবার কিছু আছে কি ? বুঝি তাই। তোমাকে দেখিলে স্মৃতির গভীর অন্ধকারের ভিতর কি যে অস্পষ্ট দেখিতে পাই ; আবার পলকের মধ্যে কই আর দেখিতে পাই না। খুঁজি, পাই না। যেদিকে তাকাই—শূন্য। তাহা—যাহা চাই, তাহা কই পাই না। সংসার খুঁজিয়া দেখি, সে-স্পর্শমণি একখানা বৈ ছিল না। অন্তরে চাহিয়া দেখি, ধু-ধু করিতেছে—দিগন্ত ব্যাপিয়া, হৃদয়াকাশ ভরিয়া কি যেন ধু-ধু করিতেছে। সেই কি যেন কিছুই যেন নয়। মরুভূমি নয়, অরণ্য নয়, সাগর নয়, অকূল নদী নয়, আকাশ নয় ; যাহা কিছুর সহিত লোকে দগ্ধ হৃদয়ের তুলনা দেয়, তাহা নয়—সেই কি যেন কিছুই যেন নয়। মরুভূমে ওয়েসিস্ আছে, অরণ্যে জীব আছে, প্রান্তরে সরসী আছে, সাগরে দ্বীপ আছে, নদীতে জল আছে, আকাশে তারা আছে—হৃদয়ে কিছু নাই। এ-নদীর কূল নাই, এ-নদীতে খেয়া নাই ; ইহাতে মৎস্য ভাসে না, চন্দ্র হাসে না, নক্ষত্র নাচে না, প্রতিবিম্ব পড়ে না ; এ-নদীতে জল নাই, মৃত্তিকা নাই, বালুকা নাই—এ-নদী শূন্যময়। এ-আকাশে ভানু নাই, শশী নাই, নক্ষত্র নাই, মেঘ উঠে না, বিদ্যুৎ হাসে না, উল্কাপাত হয় না, বজ্র গর্জে না—এ-আকাশ আকাশময় ; এ-মরুভূমে সূর্যরশ্মি পড়ে না ; বায়ু বহে না, উত্তাপ লাগে না ; ইহাতে বালুকা নাই, মৃত্তিকা নাই, খণ্ডকুঞ্জ নাই—এ-মরুভূমি মরুভূময়। এ-অরণ্যে সরসী নাই,

বৃক্ষ নাই, লতা নাই, তৃণ নাই, পথ নাই ; ইহাতে বন্যফুল ফুটে না, বনের পাখি গায় না—এ-অরণ্যে যেন কিছুই নাই। কোথাও খুঁজিয়া পাই না। তার পর অনন্ত দুঃখে অনন্তে মিশিবার জন্য অনন্ত আকাশের দিকে যখন চাই, তখন তোমাকে দেখিয়া, আবার সেই স্বপ্নময়ী মূর্তি জাগিয়া উঠে। তাই কলঙ্কী চাঁদ ! তোমার কলঙ্ক-সত্ত্বেও তোমায় এত ভালবাসি ! ক্ষতি বৈ লাভ নাই, দুঃখ বৈ সুখ নাই, কাঁদাও বৈ হাসাও না, হাস বৈ কাঁদ না—তবু এত ভালবাসি। কেবল সেই অতুল মুখখানির সঙ্গে দূর সম্বন্ধ আছে বলিয়া—নতুবা তুমি আমার কে ? কিন্তু শশি ! যাহা মনে পড়ে, তাহাতে বড় যন্ত্রণা পাই ! জীবন অন্ধকার, সংসার শূন্য—মন কেমন উদাস হইয়া যায়। আমি সুখ চাহি না ; কেননা, সুখ দুঃখ হইতে অবিযোজ্য—সুখ-দুঃখের যে-মূর্তি সক্রেটিস্ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক। আমি সুখ চাহি না ; কেবল শান্তির ভিখারী ! বলিতে পার চন্দ্রদেব, যেখানে গেলে চক্ষের জল শুকায়, এমন শান্তিনিকেতন কোথায় ! তাহাকে ভুলিতে পারিলে বোধ করি, শান্তি পাইতে পারি। তবে তাঁহাকে ভুলিব কি ? হা অদৃষ্ট ! ভুলিব মনে করিলেই ভুলিতে পারি কই ? কিন্তু ভুলিতে যদি পারি, তাহা হইলেই কি ভুলিতে চাই ? যদি কোনও দেবতা প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চায়, তবে কি তাহাকে ভুলিতে চাই ? তাহা হইলে কি চাই ? কি আবার চাই ? তাহাকে চাই। ঐ বরটি ছাড়া যদি আর সব দিতে চায়, তবে কি চাই ? ভুলিতে চাই কি ? না ; তাহাকে যদি না পাই, তবে মরিতে চাই ! ও-বরটিও যদি না পাই—যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় অথচ তাহাকে না পাই, তবে কি ভুলিতে চাই ? না ; আবার মরিতে চাই ! কথা হইতেছে মৃত্যু যদি না হয়—তবে—তবে—তবে—আবার মরিতে চাই। মরণ যে হবে না, ওর বর যে পাইব না—তবু আবার মরিতে চাই। নতুবা আর কি চাহিব ? এত যে কাঁদি, সে তো দেখে না ; এত যে বিলাপ করি, সে তো শুনে না—কই সান্ত্বনা করিতে তো আসে না—কই, চক্ষের জল মুছাইতে তো আসে না। তবে ভুলিব না কেন। বেশ তো, ভুলিয়া যাইব, আবার এ-অন্ধকারে দীপ জ্বলিবে, এ-আকাশে চাঁদ উঠিবে, এ-নদীতে নক্ষত্র নাচিবে, এ-মরুভূমে কুসুম ফুটিবে, এ-সমুদ্রে দ্বীপ ভাসিবে, এ-অরণ্যে পথ জাগিবে, এ-মেঘে বিদ্যুৎ হাসিবে ; আবার সংসার সুন্দর দেখিব, জগৎকার্যে বৈচিত্র্য দেখিব, মনুষ্যমুখে দেবভাব দেখিব, সকল বিশ্বাস করিব, উচ্চ হাসি হাসিব, পৌষের রজনীকে ক্ষুদ্র বোধ করিব, আবার হৃদয়যন্ত্র বাজিবে, শূন্য হৃদয় ভরিবে, গৃহে আকর্ষণীশক্তি ফিরিবে, চক্ষের জল শুকাইবে, অন্তরের শ্বাস মিলাইবে, দুঃখশর্বরী পোহাইবে—বেশ তো, ভুলি না কেন ? ভুলিব কি ? ভুলিব কি ? না, না, হইল না। পারিলাম না, আর কি করিব ? মন মানিল না। হৃদয় বুঝিল না, বুক বাঁধিতে পারিলাম না,- -কি করিব, নাচার। দিবানিশি তাহাকে ভাবিয়া ভাবিয়া এমন তন্ময় হইয়া উঠিয়াছি। এখন ঐ স্মৃতিই আমার জীবন—ইহা জীবন—ইহা ভুলিলে থাকিব কি লইয়া ? শূন্য হৃদয় অপেক্ষা যন্ত্রণা ভাল।

বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু এত জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করিয়া, এমন করিয়া মরমে মরিয়াও যে, সেই স্মৃতিমূল্যে পড়িয়া থাকি—আনচান করি, ছটফট করি, কাঁদি, তবু যে সেই জ্বলন্ত-অনল বুকে করিয়া রাখি, তাহার মধ্যে একটু স্বার্থপরতা আছে।

হৃদয়ে সে থাকিলে, হৃদয় বেশ পবিত্র থাকে। যে-গৃহে সে অতিথি, সে-গৃহে কাঠিন্য কার্কশ্য কিছু দাঁড়াইতে পায় না। সে মনে থাকিলে—সে-মন ছাড়া কখন ? সে মনে থাকিলে যেন বিনা আয়াসে পরের হাসিতে হাসিতে পারি, পরের কান্নায় কাঁদিতে পারি—যেন আপনা আপনি আপনাকে ভুলিয়া যাই, বেশ যেন অনুভব করি যে, পরকে সুখী করিবার জন্যই এ-মনুষ্যজন্ম। হৃদয় পুড়িয়া যায় বটে, কিন্তু না পুড়িলে অপবিত্রতা দূর হইবে কেমন করিয়া ? না পোড়াইলে সুবর্ণ খাঁটি হয় না। শোকদুঃখ না থাকিলে সহৃদয়তা জন্মিবে কেমন করিয়া ? স্বীকার করিয়াছি তো একটু স্বার্থপরতা আছে। সে আমার ধর্মের বন্ধন। তাহাকে মন হইতে দূর করিলে, ধর্মের বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইবে। স্ত্রীলোকের মুখ হৃদয়ে না থাকিলে ধর্মগ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় ! অন্য কোনও স্ত্রীলোক এ-হৃদয়ে স্থান পায় না—স্ত্রীলোকের কথা পাড়িলেই স্ত্রীলোকের কথা ভাবিলেই অমনি সে আসিয়া সমস্ত হৃদয়টুকু জুড়িয়া দাঁড়ায়। তাহাতেই বলি তাহাকে ভুলিলে ধর্মের পথে স্থির হইয়া চলিতে পারিব না—আত্মবিসর্জনটা কেবল কথার কথা হইয়া দাঁড়াইবে। কাগজে কলমে নিঃস্বার্থ পরহিতব্রতে অনেক কথা লিখিতে পারিলেও পারিতে পারি, কিন্তু এখন যেমন

অন্তরের পরতে পরতে তাহা অনুভব করি ; তেমনটি আর থাকিবে না।

সেদিন যখন সেই ভোগস্পৃহাশূন্য সংসারত্যাগী যোগীপুরুষ বলিলেন, "স্ত্রীলোককে কালভুজঙ্গী জানিয়া তাহার পথের দূরে থাকিও, যদি ধর্মে মন থাকে, পুণ্যসঞ্চয়ে অভিরুচি থাকে, ইন্দ্রিয়দমনে বাসনা থাকে, স্বর্গে যাইবার অভিলাষ থাকে, তবে কখনও রমণীর মুখ দেখিও না"—তখন আমি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলাম না বটে, কিন্তু মনে-মনে হাসিলাম। পাছে তিনি মনে ব্যথা পান, এইজন্য তাঁহার কথায় আপত্তি করিলাম না, কিন্তু মনে-মনে হাসিলাম। হা কৃষ্ণ! স্বর্গ-গমনে পাছে ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে রমণীর মুখ দেখিব না ? হা কৃষ্ণ ! রমণীর প্রণয়পবিত্র মুখ দেখিব না তো বুঝিব কেমন করিয়া, স্বর্গ কেমন—দেবতারা কেমন—দেবীরা কেমন—তাঁহারা দেখিতে কেমন—তাঁহাদের পবিত্রতা কেমন—স্বর্গে সুখ কেমন ? রমণীর মুখ দেখিবে না তো শিখিবে কেমন করিয়া পবিত্রতা কি—ভক্তিপ্রীতি কি—সহিষ্ণুতা কি—আত্মবিসর্জন কি—নিঃস্বার্থ ভালবাসা কি ? ও-মুখ দেখিবে না তো জানিবে কেমন করিয়া নন্দনকাননে যে-ফুল ফুটে, সে কেমন ফুল—অপ্সরা-কিন্নরে যে-গান গায়, সে কেমন সঙ্গীত—দেবতারা যে আমাদিগকে স্নেহ করেন, সে কেমন স্নেহ,—অনন্ত স্নেহ, অনন্ত প্রেম কাহাকে বলে ?

এ-পাপসংসারে, রমণীর মুখ ব্যতীত, দেখিবার উপযুক্ত আর কি আছে ? রমণী-কণ্ঠ-শব্দ ব্যতীত শুনিবার উপযুক্ত আর কি আছে ? ধর্মশিক্ষার জন্য, রমণী-হৃদয়ের ন্যায় আদর্শ আর কি আছে ?

ও কি, ও শশি ! মেঘের আড়াল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া, উচ্চ হাসি হাসিতেছে যে বড় ? কি বলিতেছ ?—মিথ্যা কথা ? মুখের আদর ? মুখের বৈ কি ! নতুবা অন্তঃপুরবদ্ধা দাসীবৎ করিয়া রাখ কেন ? দাসীরও দাসীত্বের সময় আছে, দাসীরও প্রভুপরিবর্তনের ক্ষমতা আছে, দাসীরও বিষয়-বিশেষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু প্রাণের যে-প্রাণ জীবনের যে-জীবন, ধর্মে যে-বন্ধন, সংসারে যে-শান্তিনিকেতন, গৃহে যে-আকর্ষণীশক্তি—তার দাসীত্বের সময় অসময় নাই, তার দাসীত্বে প্রভুপরিবর্তন নাই, তার কোনও স্বাধীনতা নাই ; সে জাগিতে ঘুমাইতে দাসী, সে উঠিতে বসিতে দাসী, সে চলিতে ফিরিতে দাসী, সে হাসিতে কাঁদিতে দাসী, সে ভক্তিশ্রদ্ধায় দাসী, সে হৃদয়ে-মনে দাসী। তার দাসীত্বের মোচন নাই, তার দাসীত্বের মূল্য নাই, তার দাসীত্বের প্রশংসা নাই। তাকে যত ইচ্ছা পোড়াইতে পার, যে-অপমান ইচ্ছা করিতে পার, অতি জঘন্য ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করিবার উপকরণমাত্র করিয়া রাখিতে পার। অপরের ক্রীড়ার পুতুল হওয়ার ন্যায়, যে-অত্যাচারী, তাহারই বিলাস সামগ্রী হওয়ার ন্যায়, অধঃপাত আর কি আছে ? তাহারাও মানুষ তোমরাও মানুষ—তাহাদের উপর এ-আধিপত্য তোমাদিগকে কে দিল ? শরীরের উপর অত্যাচার অধর্ম। ইন্দ্রিয়ের উপর অত্যাচার ততোধিক অধর্ম। কিন্তু হৃদয়ের উপর অত্যাচারের ন্যায় অধর্ম জগতে নাই। তোমরা কিসের উপর অত্যাচার না কর ? তোমরা আপনাদের জন্য সহস্র বন্ধন রাখিয়া, তাহাদের সর্বস্ব, এক দুর্বল বন্ধন বাঁধিয়া দাও। যে-দীপ প্রতি মুহূর্তে নিবিতে পারে, যে-নীহার-বিন্দু প্রতি সূর্যরশ্মিতে শুকাইতে পারে, যে-লতা প্রতি পদে ছিঁড়িতে পারে, যে-কুসুম প্রতি বায়ুহিল্লোলে বৃন্তচ্যুত হইতে পারে, যে-ইন্দ্রধনু প্রতি পলকে মিলাইতে পারে, যে-শূন্য প্রক্ষিপ্ত প্রতিক্ষণে মৃত্তিকাসাৎ হইতে পারে, যে-জলবুদ্‌বুদ্ কথায় কথায় জল হইয়া যাইতে পারে, তাহার সঙ্গে তাহাদের সর্বস্ব বাঁধিয়া দাও ! তোমাদের এক বন্ধন ছিঁড়ে, সহস্র বন্ধন থাকে। তাহাদের একটি মাত্র বন্ধন ; সেইটি ছিঁড়িলেই সব ফুরাইল ! সকল অর্থের যে-সার, তার এই দুর্দশা—তোমার মুখের আদর নয় ? তার পিতা-মাতা নাই, তার ভাই-বন্ধু নাই, ত্রিজগতে তার স্বামী বৈ কেহ নাই। যেদিন বিবাহ হইল, সেই দিন তার মনের সকল নদী স্বামীসাগরে পতিত হইল, স্বামীই পিতা-মাতা, স্বামীই ভাই-বন্ধু, স্বামীই ধ্যান-জ্ঞান, স্বামীই সর্বস্ব, স্বামীই ইহলোক পরলোক, স্বামীই চতুর্বর্গ, স্বামিপাদোদকপানই প্রধান কর্ম, স্বামিচরণসেবাই তার পরমধর্ম, স্বামিমুখমণ্ডল তার সংসার-সাগরের তরণী, স্বামিচরণারবিন্দ তার ভবসাগরের ভেলা। তুমি তাহাকে পদাঘাত কর, সে বেশ—সে তোমার প্রতি বিরক্ত হইলেই নরকে যাইবে ; কেন এত অত্যাচার ? কেবল কথার ভালবাসা নয় ? এ-সুখসৌন্দর্যপূর্ণ সংসার সে দেখিতে পাইবে না কেন ? যাহা করিতে ভাল লাগে, তাহা করিতে পাইবে না কেন ?

কথা কি জান, সকল বিষয়েই দুই পার্শ্ব আছে। কিছুই একেবারে ভাল নহে—আলোকেও ছায়া আছে ; কিছুই একেবারে মন্দ নহে—শোক হইতে সহৃদয়তা জন্মে। এ কেবল এক পার্শ্ব দেখানো হইল। জন স্টুয়ার্ট মিলও কেবল এক পার্শ্ব দেখিয়াছেন। এইজন্য, তাঁহার গ্রন্থে অসাধারণ শক্তির পরিচয় থাকিলেও সন্দেহ দূর হয় না। ইহার অন্য পার্শ্বও আছে। সমাজপদ্ধতি অনুসারে তাহারা দাসী বটে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা বল দেখি, তাহারা আমাদের দাসী, না, আমরা তাহাদের দাস ? ফল কথা, যেখানে ভালবাসা আছে, সেখানে পরস্পর পরস্পরের দাস, পরস্পর পরস্পরের প্রভু।

"তুমি সে শ্যামের সরস ধন, শ্যাম সে তোমার প্রাণ।"

স্ত্রী এবং স্বামীর এই প্রকৃত সম্বন্ধ। আর—সুখসৌন্দর্যপূর্ণ সংসার দেখিতে পাইব না কেন ? হা অদৃষ্ট ! সংসার সুখসৌন্দর্যপূর্ণ হইতে দেখাইতে কে না চাহিত ? তা নয় বলিয়াই তো দেখিতে দিই না। তাহারা যাহাতে ভাল থাকে, তাহাতে কি আমাদের অসাধ ? সংসারে সুখ হইতে ধরিয়া রাখি, এ-ইচ্ছা আমাদের নয়। আমাদের বাসনা, সংসারের সুখ হইতে অন্তরে রাখি ! স্বাধীন হইয়া কি হইবে ? আমরা যে দিবারাত্রি বুকে করিয়া রাখি, তাহা অপেক্ষা কি সংসার ভাল ? আমরা যে মুখে ঘাম দেখিলে দশদিক অন্ধকার দেখি, মুখ মলিন হইলে মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ে, চক্ষে জল দেখিলে তাহা মুছাইবার জন্য প্রাণ দিতে পারি—সংসারে কি ইহার অধিক আদর পাইবে ? এ-স্বার্থপর সংসারে ও-কাঁচা মুখখানির পানে কে তাকাইবে ? মনে অভিলাষের উদয় হইতে না হইতে, কে সে অভিলাষ পুরাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে ? গৃহসরোবরে স্নেহসলিলে, আদরপবনে সোহাগের বাতাস তুলিয়া মাধুর্যের ধ্বজা উড়াইয়া যে-প্রমোদতরণী নাচিয়া বেড়ায়, সেই ক্ষুদ্র প্রাণতরণী সংসার-মহাসাগরের উত্তালতরঙ্গমালা-সঙ্কুল অতল জলরাশির উপর শোক-তাপ-দুঃখ-নৈরাশ্য-প্রবল-বাত্যা-সন্তাড়িত হইবে, সে কি ভাল ? যে-বিষম অনলে আমরা অহর্নিশ মর্মে-মর্মে পুড়িতেছি, সেই অনলেই নবনীর পুতুল পুড়িবে, সে কি ভাল যে-চরণে কাঁটা ফুটিবে বুকে শেল বিঁধে, যাহাকে বুকের ভিতর বুক ঢাকা দিয়া রাখিয়াও, পাছে ব্যথা পায় বলিয়া, ভয়ে মরি, উঠিতে-বসিতে সহস্রবার চক্ষু চাহিয়া দেখি, মূর্তিমতী সুকুমারতা হিংসাদ্বেষে ক্লিষ্ট হইবে, জ্বালাযন্ত্রণায় ব্যাকুল হইবে—প্রাণ ধরিয়া কি ইহা দেখা যায় ? আমরা মরি, তাহাতে দুঃখ নাই, আমরা সংসারদহনে দগ্ধ হই, দুঃখ নাই—তাহারা সুখে থাক্। তাহাদের সুখের সামগ্রী, আমরা মাথায় বহিয়া আনিয়া দিব—আমরা থাকিতে তাহারা দুঃখ সহ্য করিবে কেন ? এত যে জ্বালাতন হই, এত যে দুঃখভোগ করি, কিছুই তো মনে থাকে না—ওই চাঁদমুখ দেখিলে সব ভুলিয়া যাই ! পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নমস্কার করি, আমেরিকার দৃষ্টান্তকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি ; আমরা কিন্তু হৃদয়ের নিধি হৃদয়ে রাখিব। হৃদয়ে রাখিব, হাসিতে দেখিলে হাসিব, কাঁদিতে দেখিলে কাঁদিব—তাহার প্রতিদানে, কেবল ওই মুখখানি দেখিব ! যখন রোগ-শোক-দুঃখ আসিয়া ব্যাকুল করিবে, তখন ওই মুখখানি দেখিব। যখন কোমল আকাশে তুমি উঠিয়া, আজিকার মতন এমনই সৌন্দর্য ছড়াইবে, তখন তোমাকে দেখিব, এই মুখখানি চাহিয়া দেখিব ! যখন সংসারের কদর্য দেখিয়া দেখিয়া চক্ষে শেল বিঁধিবে, তখন একবার ওই মুখপানে চাহিয়া চক্ষু জুড়াইয়া লইব। যখন বাল্যসুখস্বপ্নসকল আবার জাগিয়া উঠিবে, বাল্যক্রীড়ার সঙ্গীদিগকে মনে পড়িবে, তখন একবার ওই মুখপানে চাহিয়া, ওইখানে সে-সকল সমবেত দেখিব। যখন পরলোকের চিন্তা আসিয়া উদয় হইবে, তখন আবার ওই মুখখানি দেখিয়া ভরসা বাঁধিব। যখন পরদুঃখে কাতর হইয়া ওই চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিবে, তখন একবার ওই মুখখানি দেখিয়া মনুষ্যের মহত্ত্ব শিখিব। আর যখন স্নেহময়ী, ভক্তিপ্রীতিময়ী ধৈর্য-সহিষ্ণুতাময়ী রোগীর রুগ্নশয্যার শিয়রে বসিয়া, পরের জন্য আপনাকে ভুলিয়া যাইব, তখন আবার ওই মুখখানি চাহিয়া দেখিয়া নিঃস্বার্থ ভালবাসার উপদেশ লইব। ইহার অধিক প্রতিদান আর চাহি না। ইহার অধিক সুখ আর কি আছে। এমন পবিত্র নিধিকে যে বিলাসের উপকরণ মনে করে, রমণীকে যে জঘন্য পশুবৃত্তিচরিতার্থতার সামগ্রীমাত্র বলিয়া জানে, সে মূর্খ সে নীচ, সে মনুষ্যনামের কলঙ্ক, সে নরাকারে পিশাচ। কিন্তু শশধর ! তোমার কাছে কি বলিব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি।

এই তো জ্বালা ? দিবানিশি ভোর করিয়া রাখিয়াছি। আমার মন, কি জানি কি আনন্দে, কি

জানি কি দুঃখে, কি জানি কি অবসাদে, চিন্তাতরঙ্গিণীতে সাঁতার দিতে পারে না তো, কেবল স্রোতে গা ঢালিয়া ভাসিয়া যায়। কি জানি কেমন চাঁদই যে হৃদয়াকাশে উঠে, সে-দিকে একদৃষ্টি চাহিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া যায়। ভাসিতে ভাসিতে কতদূর চলিয়া যায়, তখন আমি আবার আমার মন পানে একমনে চাহিয়া থাকি। মনে হয়, বুঝি হারাইলাম। বোধ হয় গেল গেল। মনের উপর স্বত্ব—তাহা তো অনেক দিন গিয়াছে; অধিকারটুকু আছে, তাও বা হারাইলাম! ঐ তো সংসারের কু। জিনিস হারাইয়া যায়। অতি যত্নে রাখিলেও জিনিস হারাইয়া যায়। চক্ষে চক্ষে রাখিলেও জিনিস হারাইয়া যায়। বুকে করিয়া রাখিলেও জিনিস হারাইয়া যায়। আবার এ-দুর্গম অরণ্যে—গভীর সমুদ্রে জিনিস হারাইলে তাহার খোঁজই হয় না। যখন এ-সংসারপ্রবাসে আসিয়াছিলাম, তখন জননীপ্রকৃতি, কত কি সঙ্গে দিয়াছিলেন—সরলতা, সহস্রপ্রফুল্লতা, স্থিতিস্থাপকতা, উৎসাহ, বিশ্বব্যাপিনী আশা, লীলাময়ী কল্পনা। প্রবাসে পাছে দুঃখ পাই বলিয়া কত সুখের সামগ্রী সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছেন। সে-সব হারাইয়া গেল—এক এক করিয়া নহে, একেবারে সব গেল—সব ফুরাইল। সব যায়, কিছুই তো থাকে না—ফিরিয়া যাইবার সময় কেবল প্রবাস-যাতনার কাহিনী লইয়া যায়। জগদীশ! তুমি নাকি মানবের পিতা? কিন্তু সন্তানের জন্য পিতার যে-স্নেহ, তাহা তোমার কৈ? জগৎ সংসারে এত দুঃখ দিয়াছ কেন? বিরহশ্বাস দিয়া মানবহৃদয় গড়িয়াছ কেন? কেবল রোদনের অভিনয় করিবার জন্য আমাদিগকে এ-রঙ্গভূমিতে পাঠাইয়াছ কেন? তুমি দয়াময়। তুমি ইচ্ছাময়। তুমি সর্বশক্তিমান। অন্যে কি ভাবে জানি না; কিন্তু আমি ইহা বুঝিতে পারি না; দয়া, ইচ্ছা, শক্তি—তবে সংসারে দুঃখ কেন? সংসারে যে-দুঃখ আছে, তাহা তো আর কেহ অস্বীকার করিবে না; সুতরাং ও-তিনটি কথাই ভুল। তিনি দয়াময় হইলে, আমরা যখন দুঃখের ভারে মরিয়া যাই, তখন অবশ্য আমাদের দুঃখ-বিমোচনের ইচ্ছা করিবেন—নতুবা আর দয়া কি? দুঃখীর দুঃখমোচনের ইচ্ছাই দয়া। সে-ইচ্ছার প্রতিরোধ না থাকিলে অবশ্য তাহা কার্যে পরিণত হইবে।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোনো প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা অবশ্য কার্যে পরিণত করা হইবে। তাহা হয় না, মনুষেরা দুঃখ ঘুচে না, যে যাহার ভিখারী, সে তাহা পায় না; তাহাতেই বলি, তিনি সে-ইচ্ছা করেন না। তিনি কিসের দয়াময়? আর যদি তাঁহার ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের দুঃখ দূর না হয়, তবে তিনি কিসের ইচ্ছাময়? কিসের সর্বশক্তিমান? কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি।

জিনিস হারাইয়া যায়। হারাইলামই বটে। কিছুই তো একেবারে বিলুপ্ত হয় না। কিছুরই তো ধ্বংস নাই। এ-বিশ্বে, আজ যাহা উপস্থিত আছে, তাহার চিরকালই ছিল। এক পরমাণুর ন্যূনাধিক্য নাই—কেবল সংযোগের বিশ্লেষ মাত্র—কেবল সম্বন্ধ ছুটিয়া যায়। হরি হে! সম্বন্ধ ছুটিয়া যায় কেন? যায় তো একেবারে যায় না কেন? তাহার পর আবার অন্য সম্বন্ধ হয় কেন? সুখের সঙ্গে সম্বন্ধ ছুটিয়া যায়, আবার দুঃখের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় কেন? ঐ সঙ্গে সকল সম্বন্ধ মিটিলে ভাল হয়।

পূর্ণিমার শশি, আর একদিন—এখন সেই দিন নাই—আর কখনও যে হইবে, সে-আশাও নাই—বহুদিন হইল আর একদিন, মুক্ত বাতায়ন-পথে এমনই হাসিয়া হাসিয়া, ইহার অপেক্ষা সহস্র গুণ সৌন্দর্য ফুটাইয়া ঘরময় পড়িয়াছিলে, আমায় শরীরময় পড়িয়াছিলে, আমার প্রাণময় পড়িয়াছিলে। আর কিছুতেই কি পড় নাই? তবে অত সুন্দর, অত শীতল, অত প্রেমময়, অত পবিত্রতাময় লাগিয়াছিল কেন? আর যত দুঃখ থাক, তখন একা নই। তোমার সঙ্গ যে বেশ মধুর, এ-কথা শুনাইবার লোক ছিল। তোমাকে দেখিতে দেখিতে, যাহার দিকে চাহিয়া তোমাকে ভুলিয়া যাইতাম, সে এখন নাই। আজ আমি একা। এ-জগৎসংসারে আর আমার জুড়াইবার স্থান নাই। একজনের অভাবে সব অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। সেই একদিন আর এই একদিন। ইহারই মধ্যে কত কি হইয়া গেল। ঈশ্বরের দয়ার বালাই লইয়া মরি! কত কোমল-হৃদয় ব্যথিত হইল, কত কুরঙ্গনয়নে অশ্রু ঝরিল, কত বিম্বাধর শুকাইয়া উঠিল, কত জীবন অন্ধকার হইল, কত হৃদয় শূন্য হইল, কত আলোক নিবিয়া গেল, কত নক্ষত্র অদৃশ্য হইল, কত চাঁদ—তোমার অপেক্ষা কত ভাল চাঁদ অস্তমিত হইল, কৈ আর উঠিল না! তুমি চাঁদ, যাও, আইস, আবার যাও, আবার

আইস। আমাদের হৃদয়াকাশের চাঁদ যায়—জন্মের মতন যায়—আর ফিরিয়া আইসে না। এই মধুর সময়ে প্রাণাধিকে, একবার এসো দেখি রে; এই মধুর জ্যোৎস্নার উপর মধুতর জ্যোৎস্না ফুটাইয়া চক্ষের আগে একবার দাঁড়াও দেখি রে। এই যে হাসি অধর হইতে পলাইয়া গিয়া নয়নপ্রান্তে লুকাইত, সেই ভুবনভুলানো হাসি একবার হাস দেখি রে। সেই যে-কণ্ঠধ্বনি, যাহার প্রত্যেক-শব্দ-প্রবর্তিত-বায়ু-তরঙ্গ কর্ণবিবর দিয়া প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের ভিতর ইতালীয় বীণা বাজাইয়া দিত; সেই কল-কণ্ঠে একবার কথা কও দেখি রে! সেই যে-দৃষ্টি, যাহার সৌন্দর্য জগৎসংসারকে সুন্দর করিত, সেই দৃষ্টিতে, এ-দগ্ধ-হৃদয়ের উপর একবার অমৃত বর্ষণ কর দেখি রে! সেই যে-লাবণ্যবালা, সায়াহ্ন-গগনের ন্যায় পলকে পলকে নূতন নূতন শোভা ধারণ করিত, সেই শোভায় এ-তাপিত প্রাণ একবার জুড়াও দেখি রে! এত ভালবাসায় যে বিচ্ছেদ হইবে, ইহা কখনও মনে ছিল না। তোমা ছাড়া হইয়া যে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, ইহা স্বপ্নেও জানি না। কিন্তু শশি, মেঘের অন্তরালে লুকাইলে কেন? দেখ, আমার হৃদয়াকাশে একখানি করাল জলদ দেখা দিয়াছে—কখনও গর্জে না, কেবল অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে। দুঃখ হইলে পৃথিবীর লোক কাঁদে আমি কাঁদিতে পাই না; চক্ষের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে—হৃদয়ের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে—একবিন্দু জল নাই। অশ্রুপ্রস্রবণ শুকাইয়া গিয়াছে না কি, কাঁদিতে পাই না। তাই মরিতে ইচ্ছা হয়। তোমার শুভ্ররশ্মিতরঙ্গে ডুবিয়া মরা হয় না? মেঘে মুখ ঢাকিয়া রহিলে যে? এই অপরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় ডুব দেওয়া হয় না। ফুটফুটে জ্যোৎস্না অপেক্ষা এই অপরিস্ফুট কৌমুদী, এই ঈষদন্ধকারযুক্ত জ্যোৎস্না, আমি বড় ভালবাসি—আমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলে ভাল। কিন্তু শশাঙ্ক, আর কি মুখ খুলিবে না? তবে আর কি জন্য বসিয়া থাকি? এখন যাই। এত যখন মনের কথা হইল, তখন আর ভুলিব না—আবার সময় পাইলেই তোমাকে দেখিতে আসিব। এমনই সংগোপনে আসিয়া দেখিয়া যাইব। কেবল চক্ষের দেখা—তা চক্ষের দেখাই দেখিয়া যাইব। সকল ইন্দ্রিয়কে চক্ষুতে আনিয়া, একবার—একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া যাইব! আমার এ-দুঃখময় জীবনে, ঐ সুখ! এমনই মৃদুপবনে, এমনই নির্জনে, এমনই গভীর নিশায়, এমনই নীরবে, এমনই করিয়া একা আসিব তোমায় দেখিয়া যাইব। একা আসিব, কেননা, দুঃখ স্বার্থপর—কেননা, যে দুঃখী, সে নির্জন ভালবাসে। আর যেদিন বড় সুন্দর সাজে সাজিবে, সোহাগের বড় বেশি ছড়াছড়ি করিবে, সেদিন ঐ সুন্দর মুখখানি দেখিতে দেখিতে সঙ্গে সঙ্গে একবার কাঁদিয়া যাইব। রোদনে যে এত সুখ, তাহা পূর্বে জানিতাম না। যে না জানে, সে আছে ভাল। জানি না কতদিনে এ-হাহাকার ঘুচিবে!

"উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"। ১২৮২ বঙ্গাব্দ।

মান

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রাণ অতি তুচ্ছ গণি, প্রাণাধিক মান। হে রাম! এমন কুশিক্ষাও কি আর আছে! এমন ভ্রমপূর্ণ কথাও লোকে উপদেশস্থলে বলে! কোথায় অমূল্য, অতুল্য, পরম যত্নের, পরম সমাদরের প্রাণ—আর কোথায় ছেঁড়া ন্যাকড়া মান। ছি ছি! প্রাণের কাছে, ধনের কাছে, মানের কথা কি তুলিতে আছে?

যেমন গামছা ধুতি, ছড়ি ছাতি, তেমনি মান—দাম দিলেই পথে-ঘাটে হাটে-মাঠে যত চাই ততই পাই। তাই যে খুব দরে চড়া, দাম কড়া তাহাও নয়; টাকাকড়ির তো কথাই নাই, একটু ভানের বদলেই মান পাওয়া যাইতে পারে। "আপনার মান আপনার ঠাঁই"—কেবল যার যত্ন নাই, সাধ নাই, ইচ্ছা নাই, তারই মান নাই। নহিলে মানের জন্য আবার ভাবনা?

হারাধন মান হারাইয়াছে, আর হারাধনের মুখ দেখাইবার জো নাই: —হয় ইহা স্বার্থপর শঠের কথা, নয় বুদ্ধিহীন ঘটের কথা; যাহারই হউক, ভদ্রলোকের অগ্রাহ্য, শুনিবার যোগ্যই নহে। কিছু পাইয়া কিংবা পাইবার আশায় যদি হারাধন এই অকিঞ্চিৎকর মান দু'দিনের তরে হারাইয়াই থাকে, তাহাতে ক্ষতিটা এমন কি হইল? আজি মান গিয়াছে, আবার কাল মান হইবে; তবে আব মুখ দেখানো বন্ধ হইতে গেল কেন? জুতার সুখতলা হারাইলে তোমার আর লোকের সম্মুখে বাহির হওয়া উচিত হয় না। সুখতলার অভাবে তবু পায়ে লাগে। আর, মানের অভাবে?—কৈ, আহারেরও ব্যাঘাত নাই, নিদ্রারও বিঘ্ন নাই।

শঠের কথা বলিতেছিলাম, আর নিপট নির্বোধের কথা বলিতেছিলাম। ইহারা বলে, মান গেলেই সব গেল। খাঁটি জানিবে, বুদ্ধিশুদ্ধি থাকিতেও যে-ব্যক্তি এমন কথা বলে, সে বড় সহজ লোক নয়; হয় সে মানের দালাল, খরিদদার জুটিলেই তাহার লাভ হয়; নয় তো সে কোনও দালালের হাতে পড়িয়া আপনি ঠকিয়া এখন বারেন্দ্রগিরি ধরিয়াছে; তোমাকেও ঠকাইয়া আপনার পর্যায়ে বসাইবার—ভুক্তভোগী করিবার—চেষ্টায় আছে। তাই বলিতেছি, ইহারা স্বার্থপর শঠ, ইহাদের কথায় ভুলিও না, ঠকের কাছে ঠকিও না। যাহাতে মানের দর বাড়ে, মানের কদর বাড়ে, তাই করাই ইহাদের বৃত্তি ব্যবসা। আর, নির্বোধের কথা ছাড়িয়া দাও, ইহারা কবির দলে দিন-মজুরির দোয়ার, গান বুঝুক আর নাই বুঝুক, প্রাণপণে চেঁচাইয়া দিলেই ইহারা বাহাদুরি মনে করে। ডার্বিন বলিলেন—বানরের বংশেই ক্রমে মানুষ হয়; নির্বোধের দল ধুয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—ঐ কথাই ঠিক, আমরা দেখিয়াছি আমাদের সাক্ষাৎ বাবা বানর ছিলেন। তাই বলিতেছি, নির্বোধের কথা ছাড়িয়া দাও। তাহাদিগকে যাহা ধবাইয়া দিবে, তাহাই তাহারা ধরিবে। এই এতকাল কেহ বলে নাই, আমি আজি নূতন বলিতেছি—মান নিতান্ত অপদার্থ সামগ্রী। দেখিও আভাস পাইবামাত্র কাকের পালের কলরবের মত এখন ঐ রবই শুনিতে পাইবে—মান অতি অপদার্থ সামগ্রী।

ফলে শঠের কাছে সাবধান! কি রাজদ্বারে, কি কারাগারে, ইহারা সর্ব্বত্রই আছে, সেই পঞ্চমের উপর গলা চড়াইয়া ডাকিতেছে—চাই মা—ন, বড় মান, খুব মান, সম্মান। ডাকুক, তায় ভুলিও না, তোমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার ফিকির। তমসুক লিখিয়া তোমার কাছে কেহ কর্জ্জ করিতে আসিলে তোমাকে "মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত—" সম্বোধন করে; তুমি তখন মনে করিতেছ সে-ব্যক্তির অপমান, আর তোমার সম্মান, উভয়েরই সীমা নাই; কিন্তু তোমার লাভ—কাগজ, তাহার—টাকা। বল দেখি, কে ঠকিল? বল দেখি, মান ভাল, না অপমান ভাল? তাই বলিতেছি যে, যে-টাকা কয়টি রাখিয়া দিতে পারিলে, তোমার সংবৎসরের অন্নচিন্তা কমিবে, মান কিনিতে যেন তাহা হাতছাড়া করিও না। বুঝিলে তো? তোপ মারিলেও না! আপনি বাঁচিলে হাজার

তোপ ! সেইরূপ আঁখর দিয়া বলিলেও ভুলিও না ; কীর্তন গাইবার সময়ে আখর দেয়, মন ভুলাইবার জন্য ; তাহা তো জান ? আমার কথা না শুনিলে আখেরে কাঁদিতে হইবে।

মান যে কত সুলভ, মান যে আপনার হাতে, সেটা একটু দেখাইয়া দিই ; নহিলে তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে না। চেয়ে চিন্তে একটু লম্বা কোঁচা, পায়ে মোজা, ফর্সা জামা, আর ভৃত্য শ্যামা—সঙ্গে করিয়া যেখানে যাইবে, সেইখানেই তোমার মান ; তুমি আপনাকে আপনি বাবু বলিলে বাবু, বাহাদুর বলিলে বাহাদুর, রাজা বলিলে রাজা, তাহাতে তোমার অন্য বাবুগিরি চাই না, কাজে বাহাদুরি চাই না, সত্যিকার প্রজার পুরী চাই না, চাই কি ভাল মানুষকে ভেড়া করিয়া তুমি দশ টাকা নগদও হস্তগত করিতে পার। আবার সেই টাকাতে কত ইয়ার, কত ডিয়ার লইয়া কত বালাখানায় টপ্পা গেয়ে, কি পথের খানায় ধাক্কা খেয়ে কত কারখানাই তুমি করিতে পার। তুমি জঘন্য নগণ্য জীব, তবু সকলেই তোমার নাম করিবে, সেও তো মান। আর যদি সে-সময়ে সম্মান নাই হইল, তাহাতেই বা কি ? তোমার নেশা ছুটিলে চোখ ফুটিলে দেখিতে পাইবে, তুমি যে ছিলে সেই ; মোদ্দা জামাটা যেন সদ্য পাটভাঙা হয়। ধোপাকে ভার দিও, সে দুটি পয়সায় তোমার সঙ্গদোষ চরিত্রদোষ সকল দোষ ধুইয়া দিয়া তোমার পুরাতন মান ইস্তিরির জোরে খাড়া করিয়া দিবে , তোমার সেই নিখুঁত নিভাঁজ নির্মল মান লইয়া আবার তুমি চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া, চোখ রাঙাইয়া, বুক ফুলাইয়া চলিয়া যাইবে, কেহ পাশে আসিলে চাবকে দিয়া আবার তুমি বাহবা লইবে। মান ধোপার হাতে , আর ধোপা তো দু'পয়সার চাকর। মানের জন্য আবার ভাবনা ?

বাংলাদেশে কেহ ইতিহাসে লেখে না, কেহ ইতিহাস পড়েও না। সেটার প্রতি কখনও লক্ষ করিয়াছ ? আমি বোধ করি, এ বড় সুবুদ্ধির বন্দোবস্ত। ইতিহাসে পুরাতন কথা লেখা থাকে ; কাজ কি বাপু সে কথায় ? এখন, এই উপস্থিত মুহূর্তে আমার যদি গাড়িজুড়ি, চেইন ঘড়ি, হুইপ ছড়ি, চশমা দাড়ি সমস্তই থাকে তাহা হইলে কাল, আমার কি ছিল আমিই বা কে ছিলাম—সে খোঁজখবরে আমার দরকার কি ? বাস্তবিক, দরকার কিছুই নাই ; আর দরকার যাহাতে নাই বাঙালীও তাহাতে নাই। বাঙালী তো অজ্ঞান নয়। "ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ"—যে-জাতির ইষ্টমন্ত্র, সে কি কখনও অজ্ঞান নয়।

বাস্তবিক মানের জন্য ভাবিতে নাই। মান তোমারও নয়, মান আমারও নয় ; মান যায়ও না , ফল কথা মান মানীর, যখন যাহার মানে দরকার, তখনই তাহার মান ! মানের সঙ্গে যখন চিরন্তনের বাঁধা সম্বন্ধ কাহারই নাই তখন মানের জন্য প্রাণ দেওয়া ধন দেওয়া দূরে থাকুক, এমন যে-ফক্কিকার জিনিস ফাঁকি, তাহাও সকল সময়ে দিতে নাই। কালেভদ্রে ফাঁকি দিয়া, কি দুটা মিছা কহিয়া যদি মান পাওয়া যায় ক্ষতি নাই। কিন্তু, ঐ ব্যস।

"পাঁচু ঠাকুর"। ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।

তৈল

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

তৈল যে কী পদার্থ, তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ —বাস্তবিক স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর, অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে!

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমানরূপ স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান, যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য— তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্বশক্তিমান। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না। উকিলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না। বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোনও কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসর হইতে পারে, আহাম্মুক হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গভর্নর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ, তৈল নহিলে জগতের কোনও কায সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কাজ চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদ হয় না, চেহারা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম প্রণয়, যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী, যাহা দ্বারা সমস্ত জগতকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার বা সৌজন্য, 'ফিলনথ্রপি'; যাহার দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি, যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম নম্রতা বা মডেস্টি, চাকর বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতে অগ্ন্যুদগম হয়, সেই অগ্ন্যুদগম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এইজন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্বি দিয়া থাকে। এইজন্যই যখন দুইজনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত তবে গৃহে-গৃহে, গ্রামে গ্রামে, পিতা পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, রাজায়-প্রজায় বিবাদ-বিসম্বাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্বেই বলা গিয়াছে যে তৈল দিতে পারে সে সর্বশক্তিমান, কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্যন্ত বশতাপন্ন হয়। 'অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া' সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্তিমান।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয়, তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাট সাহেব পর্যন্ত সকলেই তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিস নয় যে নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলেই নিশ্চয় কোনও-না-কোনও ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে সে ই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র।

সময়—যে-সময়ই হউক, তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল—পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যেরূপেই হউক তৈল দিলে কিছু-না-কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ, ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট পাঁচ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না—একজন ইংবেজিওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে পঞ্চাশ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া একবিন্দু দিলে যত কার্য হয়, বিনা কৌশলে কলস-কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনী শক্তি আছে যে তাহাতে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে তাহার তৈল আমার তৈল অপেক্ষা মূল্যবান। বিদ্যাব উপর যার বুদ্ধি আছে তাহার আরও মূল্যবান। তাহার উপর যদি ধন থাকে তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।

তৈল দিবাব প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ-প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধা মতে আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে, বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদান প্রবৃত্তিতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাক্টিক্যাল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার—অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব, আমরা প্রস্তাব করি, বাছিয়া বাছিয়া কোনো রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপ্যাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহনিষেকের কালেজ খোলা হয়। অন্তত উকিলি শিক্ষার নিমিত্ত লা কালেজে একজন তৈল-অধ্যাপক নিযুক্ত আবশ্যক।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন—কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে, আমি দিই। সুতরাং এ-বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার, এ-বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমত লেকচার পাওয়া যায় না, যদিও কোনও রীতিমত কালেজ নাই, তথাপি, যাঁহার নিকট চাকরির বা প্রোমোশনের সুপারিশ মিলে, তাদৃশ লোকের বাড়ি সদাসর্বদা গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙালীর বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙালীর একমাত্র ভরসা তৈল। বাঙলায় যে-কেহ কিছু করিয়াছেন, সকলই তৈলের জোরে। বাঙালীদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়। এবং কি কৌশলে সেই তৈলে বিধাতৃপুরুষদিগেব সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহাবাই আমাদের দেশের বড়লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে ইচ্ছা করিলে সে-শিক্ষা এদেশে হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়ার আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ-বিষয়ে প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের থ্রু হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষ মনে রাখা উচিত, এক তৈলে চাকা ঘোরে, আর তৈলে মন ফেরে।

"বঙ্গদর্শন"। ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।

শীত সুন্দরী

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

আমি শৌর্যে সিংহিনী ; সৌন্দর্যে ইন্দ্রাণী, আমি বিলাস-বিভবে বহুরূপিণী। আমি শীত। আমি নেমেছি।

আমি ইংরেজ-শাসনে ঋতুরাজ্যের পাটরানী। রাজদরবার ও শৈত্য-সোহাগে বিলাস-সম্ভার বুকে করে আমি নেমেছি।

আমি সিমলা-শৈল নিবাসে স্বর্গ-বিলাসে ছিলুম। শরকুট করিতে শখ করে নিম্নে—নেটিভ-লোকে নেমেছি।

আমি এই শহরে মাস দুই-তিন সফর-প্রবাস করব। পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন। চৈত্র পড়িতে-না-পড়িতে আমার চতুর্দোল পুন বিমানে উঠিবে। চৌরঙ্গী ত্যজিয়া, আমার চতুরঙ্গ বল তখন চন্দ্রলোকে চম্পট দিবে। সুবিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের শাসন পালনার্থে আমার এই প্রবাসকালের পবিত্র পদচিহ্নই প্রচুর।

আমি আট মাস অন্তরীক্ষে আরাম করি। মুহূর্তের তরে মাটিতে পা দিই না। নিদাঘের উষ্ণ নিশ্বাস আমার অতীব অপ্রিয়, আমি নিদাঘ তাপকে, প্রায় নেটিভ-সন্নিভ, সমগ্র প্রাণের সহিত ঘৃণা করি। আমি নিদাঘে নামি না।

আমার শৈত্যসম্পদে বঞ্চিত হয়ে, সমতলভূমি শ্মশানবৎ সন্তপ্ত হয়। আমি আট মাস এ-রাজ্যে নামি না। এ রাজ্যের নিয়ন্তাদিগকেও নামাই না। আমরা একত্রে হিমালয়ের উচ্চ চূড়ে ঈশ্বরের অনুপম পরমাণুস্পর্শে পুলকিত হই ; আর প্রমোদপ্রবাহে রাস-বিলাসের পানসি ছুটাই। পৃথিবীতে পা বাড়াই না।

আমি ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তাদিগকে নিষ্ঠুর নৈদাঘতাপ হইতে নবনীতবৎ রক্ষা করি। সোহাগ-শৈলের নীরদ-নীলিমা-মধ্যে আমি তাঁদের নধরকান্তি লুকায়ে রাখি। আতপ-তাপে এক বিন্দুও উছলিতে দিই না। আমার মহিমায় তাঁদের চিত্ত-মন মোলায়েম হয়। আমি তাঁদের মহা মস্তিষ্কে মারুতহিল্লোলের শৈত্য সঞ্চারিয়া তাহার মার্তণ্ড তেজ তরলিত করি। নইলে কি নিস্তার থাকিত! নেটিভ কোলাহল ও রবির কিরণ এ-উভয়েরই উপর আমি ক্ষণ আবরণ ঝেঁপে তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত রাখি। নতুবা এই পুরাতন ভারতভূমির ভরসা বেশি ছিল না।

ভারত-ভাগ্যের যাঁরা নিয়ামক, আমি তাঁদের নিয়ন্ত্রী, আমার ইঙ্গিতে তাঁরা উঠেন নামেন। আমি তাঁহাদিগকে চালাই ; তাঁহাদের শাসন-যন্ত্রটিও তাপমান-যন্ত্রের প্রত্যেক আকুঞ্চন প্রসারণে উঠাই নামাই। আমি এই হিন্দুস্থানের হলন-পালন শাসন-কারিণী।

ভারত সাম্রাজ্যের শাসন-চক্র আমি আট মাস আসমানে ঘুরিয়ে আবার তায় নিম্নে নামাইয়েছি। ভারতীয় প্রজার প্রারব্ধ লিপি আমার এই পেটিকোটের পকেটে।

আমি নেমেছি। দেখ, এই শহরে সুরলোক নামাইয়েছি। বর্ষা-বিড়ম্বিত গ্রীষ্ম শুষ্ক শ্মশানকে আমি মুহূর্ত মধ্যে আমার মোহন স্পর্শে—আ! আমার ঐন্দ্রজালিক চুম্বনে পরমরমণীয় প্রমোদ উদ্যানে পরিণত করেছি। আমার ইঙ্গিত মাত্রে দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধর, অপ্সরা, স্ব-স্ব সঙ্গিনী স্বজনসহ এখানে এসে সমবেত হয়েছেন। আমি অঙ্গুলি-হেলনে ত্রিশকোটি মানুষের অধীশ্বর, রাজরাজেশ্বর বৃটিশরাজপ্রতিনিধি প্রবল প্রতাপান্বিত ভারতীয় ভাইস্রয়কে ভারত রাজধানীর ক্ষুণ্ণ, ম্লান, শূন্য সিংহাসনে পুন প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমারই আদেশে তিনি আজ নিদাঘত্যক্ত রাজতক্তে সমারূঢ়, আমারই অনুরোধে শূন্য সিংহাসন সুরা-সুর-বাঞ্ছিত শুভ্র অঙ্গ-সংস্পর্শে সুশোভিত করেছেন।

আমি এসেই গ্রীষ্মে গতাসু গভর্ণমেন্ট প্রাসাদে প্রাণসঞ্চার করেছি। আমার অনুপস্থিতিতে ঐ

অত্যুচ্চ অট্টালিকা গৌরবস্ফীত অহংকারোন্নতগ্রীব গভর্ণমেন্ট হৌস সুবিস্তীর্ণ গোরস্থানে পরিণত হয়েছিল। আমার আবির্ভাবে পুন উহা আত্মস্থ হয়েছে। আমারই প্রভাবে উহার ঐ আকাশভেদী উচ্চতম স্তম্ভে আজ বৃটিশ সিংহের দিগ্‌বিদিগ্‌বিজয়ী রক্ত পতাকা সমগ্র সংসারের প্রতি সাহংকার করিয়া স্বকীয় সিংহদর্পে হেলিয়া দুলিয়া উড়িতেছে। আমি আজ উহা উড়াইয়েছি। তোমরা কি কেহ জানো, আমার শক্তির পরিমাণ কত?

যে-বৃটিশসিংহ স্বেচ্ছা করিলে সসাগরা সমগ্র পৃথিবী রসাতলে প্রেরণ করতে পারেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বার্তকীবৎ-ব্রাণ্ডির শরবত অবহেলে উদরস্থ করতে পারেন, তাঁহার--সেই বৃটিশসিংহের স্বাস্থ্য এবং অস্বাস্থ্য আমারই হ্রাসবৃদ্ধির উপর নিত্য ও নৈমিত্তিক ভাবে নির্ভর করে। তোমরা বুঝতে পেরেছ কি, আমি কে, আর আমার শক্তি কত? আমি অপরিমেয় শক্তিশালিনী; বৃটিশসিংহের বক্ষে, শোণিতে, শিরায় শিরায় বিশ্ব-বিদারক বল-সঞ্চারিণী, আমি শীত।

"শহরচিত্র"। ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

হাজির

জগদীশচন্দ্র বসু

হঠাৎ চীৎকার করিয়া কেহ উত্তর দিল—"হাজির"। কাহাকেও ডাকিতে শুনি নাই, তথাপি করুণ ও ভক্তিউচ্ছ্বসিত স্বরে উত্তর শুনিলাম—"কি আজ্ঞা প্রভু?" কে তোমার প্রভু, কাহার হুকুমে এরূপ উদ্দীপ্ত হইলে?

কি আশ্চর্য! একটি কথাতেই জীবনের সমস্ত স্তরগুলি আলোড়িত হইল। সুপ্ত স্মৃতি আজ জাগরিত—যাহা অশব্দ, আজ তাহা শব্দায়মান; যাহা পূর্বে অর্থহীন ছিল, আজ তাহা অর্থযুক্ত হইল।

এখন বুঝিতে পারিতেছি, বাহির ছাড়া ভিতর হইতেও হুকুম আসিয়া থাকে। মনে করিতাম, আমার ইচ্ছাতেই সব হইয়াছে। আমি কি এক? একটু মন স্থির করিলেই দুই জনের মধ্যে যে সর্বদা কথা বলিতেছে তাহা শুনিতে পাই। ইহারাই আমাকে চালাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কুমতি তো আমি, সুমতি তবে কে?

এ-সম্বন্ধে ২৭ বৎসর পূর্বের কয়েকটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। কোনো বিষয় নিয়মিতভাবে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমটা সাহসে 'আকাশস্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক' বিষয়ে লিখিলাম; পরে লিখাইল, 'জড়ের জীবন মানবীয় জীবনেরই ছায়া মাত্র'। জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছু জানিতাম না, কাহার আদেশে এরূপ লিখিলাম? লিখিয়াও নিষ্কৃতি পাইলাম না, ভিতর হইতে কে সমালোচক সাজিয়া বলিতে লাগিল—'এত যে কথা রচনা করিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি ইহার কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা?' জবাব দিলাম, 'যেসব বিষয় অনুসন্ধান করিতে বিদেশীয় বড় বড় পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইয়াছেন, আমি সেইসব কি করিয়া নির্ণয় করিব? তাঁহাদের অসংখ্য কলকারখানা ও পরীক্ষাগার আছে, এখানে তাহার কিছু নাই; অসম্ভবকে কি করিয়া সম্ভব করিব?' ইহাতেও সমালোচকের কথা থামিল না। অগত্যা ছুতার কামার দিয়া তিন মাসের মধ্যে একটি কল প্রস্তুত করিলাম। তাহা দিয়া যেসব অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, তাহা আমার কথা দূরে থাকুক, বিদেশী বৈজ্ঞানিকদিগকে পর্যন্ত বিস্মিত করিল।

অল্পদিনের মধ্যেই এ-বিষয়ে অনেক সুখ্যাতি হইল এবং বিলাতের রয়েল সোসাইটিতে নিমন্ত্রিত হইলাম। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উলিয়াম রামসে বহু সাধুবাদ করিলেন, পরে বলিলেন—'কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে, এখন হইতে ভারতে নূতন জ্ঞানযুগ আরম্ভ হইল, কিন্তু একটি কোকিলের ধ্বনিতে বসন্তের আগমন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।' সেদিন বোধ হয় আমার উপর কুমতিরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকিবে, কারণ স্পর্ধার সহিতই উত্তর দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম—'আপনাদের আশঙ্কা করিবার কোনো কারণ নাই। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, শীঘ্রই ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে শত কোকিল বসন্তের আবির্ভাব ঘোষণা করিবে।' এখন সেদিন আসিয়াছে; যাহা কুমতি বলিয়া ভয় করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহাই সুমতি। তখনকার শুভ লগ্ন পাঁচ বৎসর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। একদিনের পর আর একদিন অধিকতর উজ্জ্বল হইতে লাগিল এবং সম্মুখের সমস্ত পথগুলিই খুলিয়া গেল।

এমন সময় যে-হুকুম আসিল তাহাতে সোজা পথ ছাড়িয়া দুর্গম অনির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করিতে হইল। তখন তারহীন যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিতে পাইয়াছিলাম, কলের সাড়া প্রথম প্রথম বৃহৎ হইত, তাহার পর ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইত। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, দিবারম্ভেই পরীক্ষা শ্রেয়, কারণ সারাদিন পরীক্ষার পর কল শ্রান্ত হইয়া যায়। অমনি ভিতরকার সমালোচক বলিয়া উঠিল—'কল কি মানুষ, যে শ্রান্ত হইবে?

কলে কেন ক্লান্তি হয় ? এই প্রশ্ন কিছুতেই এড়াইতে পারিলাম না। অনেকগুলি আবিষ্কার কেবল লিখিবার অপেক্ষায় ছিল ; সেসব ছাড়িয়া দিয়া নূতন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে হইল। ক্রমে দেখিতে পাইলাম, জীবনহীন ধাতুও উত্তেজিত ও অবসাদগ্রস্ত হয়। উত্তেজনা স্থগিত রাখিলে স্বল্পাধিককালে ক্লান্তি দূর হয়। উদ্ভিদে এইসব প্রক্রিয়া অধিকতররূপে পরিস্ফুট দেখিলাম। বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইলাম।

জীবতত্ত্ববিদদের হস্তে এইসব নূতন তত্ত্ব রাখিয়া পদার্থবিদ্যা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ফিরিয়া আসিব মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। রয়াল সোসাইটিতে সব পরীক্ষা দেখাইয়াছিলাম। সর্বপ্রধান জীবতত্ত্ববিদ্ বার্ডন সেন্ডারসন বলিলেন—'জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যে-পরীক্ষা করিয়াছেন সে-সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা পূর্বে নিষ্ফল হইয়াছে ; সুতরাং আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য। এ-শাস্ত্রে আপনার অনধিকার-চর্চা হইয়াছে। আপনি পদার্থবিদ্যায় যশস্বী হইয়াছেন, আপনার সম্মুখে সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব রহিয়াছে, আপনার অজ্ঞাত পথ হইতে নিবৃত্ত হউন।' তখন কুমতির প্ররোচনায় বলিলাম—নিবৃত্ত হইব না, এই বন্ধুর পথই আমার। আজ হইতে সোজা পথ ছাড়িলাম। আজ যাহা প্রত্যাখ্যাত হইল তাহাই সত্য ; ইচ্ছায়ই হউক অনিচ্ছায়ই হউক, তাহা সকলকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

এই দুর্মতির ফল ফলিতে অধিক বিলম্ব হইল না। সবদিকের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল এবং সমস্ত আলো যেন অকস্মাৎ নিবিয়া গেল। কিন্তু ইহার পর হইতেই অন্তরের ক্ষীণ আলো অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল। প্রখর আলোকে যাহা দেখিতে পাই নাই, এখন তাহা দেখিতে পাইলাম। আশা ও নিরাশাব অতীত, এইভাবে বিশ বৎসর কাটিল।

এক বৎসর পূর্বে হঠাৎ যেন নির্দেশ শুনিতে পাইলাম—'বিদেশ যাও'। বিদেশ যাত্রা। সেখানে কে আমার কথা শুনিবে ? এবার কঠিন স্বর শুনিলাম—'আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল ! লাভালাভ বলিবার তুমি কে ?' আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইলাম।

তারপর সমস্ত দিকের রুদ্ধ দ্বার একেবারে খুলিয়া গেল। কাহার হুকুমে এরূপ হইল ? এ কি স্বপ্ন ? বিরোধী যাঁহারা ছিলেন, এখন তাঁহারাই পরম মিত্র হইলেন। যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, এখন তাহা সর্বত্র গৃহীত হইল। বিশ বৎসর আগে যাহা কুমতি মনে করিয়াছিলাম পুনরায় দেখিতে পাইলাম—তাহাই সুমতি।

সুতরাং, কোন্‌টা সুমতি আর কোন্‌টা কুমতি জানি না ; কোন্‌টা বড় আর কোন্‌টা ছোট তাহা মন বুঝে না। সুদিনের বৃহৎ সফলতা ভুলিয়া দুর্দিনের বিফলতার কথাই মনে পড়িতেছে। তখন সর্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম, কেবল দুই-এক জনের অহেতুক স্নেহ আমাকে আগলাইয়া রাখিযাছিল। আজ তাহারা অন্ধকার যবনিকার পবপারে। অস্ফুট ক্রন্দন কি সেথায় পৌঁছিয়া থাকে ?

জীবনের যখন পূর্ণশক্তি তখন কোলাহলের মধ্যে তোমার নির্দেশ স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পারিতাম না। এখন পারিতেছি ; কিন্তু সব শক্তি নির্জীব হইয়া আসিতেছে। একদিন তোমার হুকুমে মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন হইবে, মৃত্তিকা দিয়া যাহা গড়িয়াছিলেন তাহা ধূলি হইয়া পড়িয়া রহিবে। কি লইয়া তখন সে তোমার নিকট উপস্থিত হইবে ? অল্পই তাহার সুকৃতি, অসংখ্য তাহার দুষ্কৃতি। তবে বলিবার কি আছে ? কোন্‌টা সুমতি আর কোন্‌টা দুর্মতি, এই ধান্ধাতেই জীবন কাটিয়াছে। সাফাই করিবার কথা যখন কিছুই নাই, তখন তোমাব পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত সে কেবল বলিবে—'আসামী হাজিব !'

"অব্যক্ত"। ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

মন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই যে মধ্যাহ্নকালে নদীর ধারে পাড়াগাঁয়ের একটি একতলা ঘরে বসিয়া আছি ; টিকটিকি ঘরের কোণে টিক্‌টিক্ করিতেছে ; দেয়ালে পাখা টানিবার ছিদ্রের মধ্যে একজোড়া চড়ুই পাখি বাসা তৈরি করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইতে কুটা সংগ্রহ করিয়া কিচমিচ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে ; নদীর মধ্যে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে—উচ্চতটের অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীত পালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে ; বাতাসটি স্নিগ্ধ, আকাশটি পরিষ্কার, পরপারের অতিদূরে তীররেখা হইতে আর আমার বারান্দার সম্মুখবর্তী বেড়া-দেওয়া ছোট বাগানটি পর্যন্ত উজ্জ্বল রৌদ্রে একখণ্ড ছবির মতো দেখাইতেছে—এই তো বেশ আছি ; মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটি আরাম, একটি স্নেহ পায়, তেমনি এই পুরাতন প্রকৃতির কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া একটি জীবনপূর্ণ আদরপূর্ণ মৃদু উত্তাপ চতুর্দিক হইতে আমার সর্বাঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। তবে এইভাবে থাকিয়া গেলে ক্ষতি কী। কাগজ-কলম লইয়া বসিবার জন্য কে তোমাকে খোঁচাইতেছিল। কোন্ বিষয়ে তোমার কী মত, কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি, সে-কথা লইয়া হঠাৎ ধুমধাম করিয়া কোমর বাঁধিয়া বসিবার কী দরকার ছিল। ঐ দেখো, মাঠের মাঝখানে, কোথাও কিছু নাই, একটা ঘূর্ণী বাতাস খানিকটা ধূলা এবং শুকনো পাতার ওড়না উড়াইয়া কেমন চমৎকারভাবে ঘুরিয়া নাচিয়া গেল। পদাঙ্গুলিমাত্রের উপর ভর করিয়া দীর্ঘ সরল হইয়া কেমন ভঙ্গিটি করিয়া মুহূর্তকাল দাঁড়াইল, তাহার পর হুসহাস করিয়া সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। সম্বল তো ভারি। গোটাকতক খড়কুটা ধুলাবালি সুবিধা মতো যাহা হাতের কাছে আসে তাহাই লইয়া বেশ একটু ভাবভঙ্গি করিয়া কেমন একটা খেলা খেলিয়া লইল। এমনি করিয়া জনহীন মধ্যাহ্নে সমস্ত মাঠময় নাচিয়া বেড়ায়। না আছে তাহার কোনো উদ্দেশ্য, না আছে তাহার কেহ দর্শক। না আছে তাহার মত, না আছে তাহার তত্ত্ব, না আছে সমাজ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অতি সমীচীন উপদেশ। পৃথিবীতে যাহা-কিছু সর্বাপেক্ষা অনাবশ্যক, সেই সমস্ত বিস্মৃত পরিত্যক্ত পদার্থগুলির মধ্যে একটি উত্তপ্ত ফুৎকার দিয়া তাহাদিগকে মুহূর্তকালের জন্য জীবিত জাগ্রত সুন্দর করিয়া তোলে।

অমনি যদি অত্যন্ত সহজে এক নিশ্বাসে কতকগুলো যাহা-তাহা খাড়া করিয়া সুন্দর করিয়া ঘুরাইয়া উড়াইয়া লাটিম খেলাইয়া চলিয়া যাইতে পারিতাম। অমনি অবলীলাক্রমে সৃজন করিতাম, অমনি ফুঁ দিয়া ভাঙিয়া ফেলিতাম। চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, লক্ষ্য নাই, শুধু একটা নৃত্যের আনন্দ, শুধু একটা সৌন্দর্যের আবেগ, শুধু একটা জীবনের ঘূর্ণা। অবারিত প্রান্তর, অনাবৃত আকাশ, পরিব্যাপ্ত সূর্যালোক—তাহারই মাঝখানে মুঠা মুঠা ধূলি লইয়া ইন্দ্রজাল নির্মাণ করা, সে কেবল খ্যাপা হৃদয়ের উদার উল্লাসে।

এ হইলে তো বুঝা যায়। কিন্তু বসিয়া বসিয়া পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া কতকগুলা নিশ্চল মতামত উচ্চ করিয়া তোলা। তাহার মধ্যে না আছে গতি, না আছে প্রীতি, না আছে প্রাণ। কেবল একটা কঠিন কীর্তি। তাহাকে কেহ-বা হাঁ করিয়া দেখে কেহ-বা পা দিয়া ঠেলে—যোগ্যতা যেমনই থাক্।

কিন্তু ইচ্ছা করিলেও এ-কাজে ক্ষান্ত হইতে পারি কই। সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না।

লিখিতে লিখিতে আমি বাহিরে চাহিয়া দেখিতেছি, ঐ একটি লোক রৌদ্র নিবারণের জন্য

মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া দক্ষিণ হস্তে শালপাতের ঠোঙায় খানিকটা দহি লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে চলিয়াছে। ওটি আমার ভৃত্য, নাম নারায়ণ সিং। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফুল্লচিত্ত। উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁঠাল গাছটির মতো। এইরূপ মানুষ এই বহিঃপ্রকৃতির সহিত ঠিক মিশ খায়। প্রকৃতি এবং ইহার মাঝখানে বড় একটা বিচ্ছেদচিহ্ন নাই। এই জীবনধাত্রী শস্যশালিনী বৃহৎ বসুন্ধরার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া এ-লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের তিলমাত্র বিরোধ বিসম্বাদ নাই। ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্যন্ত কেবল একটি আতাগাছ হইতে উঠিয়াছে, তাহার আর কিছুর জন্য কোনো মাথাব্যথা নাই, আমার হৃষ্টপুষ্ট নারায়ণ সিংটিও তেমনি আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র একখানি আস্ত নারায়ণ সিং।

কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ঐ আতাগাছটির মাঝখানে কেবল একটি ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়, তবে ঐ সরস শ্যামল দারুজীবনের মধ্যে কী এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়। তবে চিন্তায় উহার চিক্কণ সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠে এবং গুঁড়ি হইতে প্রশাখা পর্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মতো কুঞ্চিত হইয়া আসে। তখন বসন্তকালে আর কি অমন দুই চারিটি দিনের মধ্যে সর্বাঙ্গ কচিপাতায় পুলকিত হইয়া উঠে; বর্ষাশেষে ঐ গুটি-আঁকা গোল গোল গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে প্রত্যেক শাখা আর কি ভবিয়া যায়। তখন সমস্ত দিন এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে, 'আমার কেবল কতকগুলো পাতা হইল কেন, পাখা হইল না কেন। প্রাণপণে সিধা হইয়া এত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, তবু কেন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাইতেছি না। ঐ দিগন্তের পরপারে কী আছে; ঐ আকাশের তারাগুলি যে-গাছের শাখায় ফুটিয়া আছে সে-গাছ কেমন করিয়া নাগাল পাইব? আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, এ কথা যতক্ষণ না স্থির হইবে ততক্ষণ আমি পাতা ঝরাইয়া, ডাল শুকাইয়া, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতে থাকিব। আমি আছি অথবা আমি নাই, অথবা আমি আছিও বটে নাইও বটে, এ প্রশ্নের যতক্ষণ মীমাংসা না হয়, ততক্ষণ আমার জীবনে কোনো সুখ নাই। দীর্ঘ বর্ষার পর যেদিন প্রাতঃকালে প্রথম সূর্য ওঠে সেদিন আমার মজ্জার মধ্যে যে একটি পুলকসঞ্চার হয় সেটা আমি ঠিক কেমন করিয়া প্রকাশ করিব এবং শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি যেদিন হঠাৎ সায়ংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস ওঠে, সেদিন ইচ্ছা করে—কী ইচ্ছা করে কে আমাকে বুঝাইয়া দিবে।'

এই সমস্ত কাণ্ড। গেল বেচারার ফুল ফোটানো, রসশস্যপূর্ণ আতা ফল পাকানো। যাহা আছে তাহা অপেক্ষা বেশি হইবার চেষ্টা করিয়া, যে-রকম আছে আর এক রকম হইবার ইচ্ছা করিয়া, না হয় এ-দিক, না হয় ও-দিক। অবশেষে একদিন হঠাৎ অন্তর্বেদনায় গুঁড়ি হইতে অগ্রশাখা পর্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয়—একটা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা, অরণ্যসমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক তত্ত্বোপদেশ। তাহার মধ্যে না থাকে সেই পল্লবমর্মর, না থাকে সেই ছায়া, না থাকে সর্বাঙ্গব্যাপ্ত সরস সম্পূর্ণতা।

যদি কোনো প্রবল শয়তান সরীসৃপের মতো লুকাইয়া মাটির নিচে প্রবেশ করিয়া শত লক্ষ আঁকাবাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা তৃণগুল্মের মধ্যে মনঃসঞ্চার করিয়া দেয় তাহা হইলে পৃথিবীতে কোথায় জুড়াইবার স্থান থাকে! ভাগ্যে বাগানে আসিয়া পাখির গানের মধ্যে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না এবং অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্তে শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিকপত্র সংবাদপত্র এবং বিজ্ঞাপন ঝুলিতে দেখা যায় না।

ভাগ্যে গাছেদের মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই। ভাগ্যে ধুতুরাগাছ কামিনীগাছকে সমালোচনা করিয়া বলে না, 'তোমার ফুলের কোমলতা আছে কিন্তু ওজস্বিতা নাই' এবং কুল ফল কাঁঠালকে বলে না, 'তুমি আপনাকে বড়ো মনে কর কিন্তু আমি তোমা অপেক্ষা কুষ্মাণ্ডকে ঢের উচ্চ আসন দিই।' কদলী বলে না, 'আমি সর্বাপেক্ষা অল্পমূল্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পত্র প্রচার করি' এবং কচু তাহার প্রতিযোগিতা করিয়া তদপেক্ষা সুলভ মূল্যে তদপেক্ষা বৃহৎ পত্রের আয়োজন করে না।

তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাশ্রান্ত মানুষ উদার উন্মুক্ত আকাশের চিন্তারেখাহীন জ্যোতির্ময় প্রশস্ত ললাট দেখিয়া, অরণ্যের ভাষাহীন মর্মর ও তরঙ্গের অর্থহীন কলধ্বনি শুনিয়া, এই মনোবিহীন অগাধ প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া তবে কতকটা স্নিগ্ধ ও সংযত হইয়া

আছে। ঐ একটুখানি মনঃস্ফুলিঙ্গের দাহ নিবৃত্তি করিবার জন্য এই অনন্ত প্রসারিত অমনঃসমুদ্রের প্রশান্ত নীলাম্বুরাশির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আসল কথা পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। খাইবার পরিবার জীবনধারণ করিবার সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে যতখানি আবশ্যক, মনটা তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বড়ো হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য, প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিয়াও চতুর্দিকে অনেকখানি মন বাকি থাকে। কাজেই সে বসিয়া বসিয়া ডায়ারি লেখে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, যাহাকে সহজে বোঝা যায় তাহাকে কঠিন করিয়া তুলে, যাহাকে এক ভাবে বোঝা উচিত তাহাকে আর এক ভাবে দাঁড করায়, যাহা কোনো কালে কিছুতেই বোঝা যায় না, অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে, এমন কি, এ সকল অপেক্ষাও অনেক গুরুতর গর্হিত কার্য করে।

কিন্তু আমার ঐ অনতিসভ্য নারায়ণ সিংহের মনটি উহার শরীরের মাপে, উহার আবশ্যকের গায়ে গায়ে ঠিক ফিট করিয়া লাগিয়া আছে। উহার মনটি উহার জীবনকে শীতাতপ, অসুখ, অস্বাস্থ্য এবং লজ্জা হইতে রক্ষা করে কিন্তু যখন তখন উনপঞ্চাশ বায়ুবেগে চতুর্দিকে উড়ু-উড়ু করে না। এক আধটা বোতামের ছিদ্র দিয়া বাহিরের খোলা হাওয়া উহার মানস আবরণের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে কখনো একটু-আধটু স্ফীত করিয়া তোলে না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ততটুকু মনশ্চাঞ্চল্য তাহার জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।

'পঞ্চভূত'। ১৩০৪। (নি[illegible] অংশ, [illegible] মুদ্রিত)

মেয়ে-যজ্ঞি

শরৎকুমারী চৌধুরানী

মেয়ে-যজ্ঞি বলিলেই বুঝিতে হইবে বিশৃঙ্খলার সমষ্টি! প্রাতঃকাল হইতে ভিয়েনের গন্ধে, দাসীর কলরবে, ছেলের কান্নায়, মলের রুনুঝুনুতে, চুড়ির ঝন্‌ঝন্ শব্দে যজ্ঞিবাড়ি সরগরম। পিচ্ছলে তাড়াতাড়ি চলা যায় না, অথচ হাতে অনেক কাজ, তাড়াতাড়ি করিতেই হইবে—সুতরাং কেহ আছাড় খাইয়া লোক হাসাইতেছে, কাহারও ঢাকাই শাড়িতে কাদা লাগায় মন খুঁত খুঁত করিতেছে, কোনো ছেলে 'সন্দেশ খাব রে' বলিয়া সেই কাদাতেই গড়াগড়ি দিতেছে।

একটি ঘরে বড় বড় বঁটি পাতিয়া সধবা, বিধবা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, কুৎসিতা, সুন্দরী মহিলারা তরকারি কুটিয়া ঝুড়ি ঝোড়া বোঝাই করিয়া দিতেছেন, হাসি গল্পের বিরাম নাই। বাঙ্গালীর মেয়েরা প্রত্যেকেই ইংরাজ মহিলাদের মত সুস্বরের প্রতি মনোযোগিনী নহেন, সুতরাং কেহ বা কোকিলকণ্ঠে, কেহ বা মোটা গলায় উচ্চস্বরে কথা কহিতেছেন।

শিশুসন্তান আসিয়া মাতাকে বিরক্ত করিতেছে—অনেকক্ষণ মায়ের ভ্রুক্ষেপ নাই—হাতে কাজ, মুখে গল্প, ঠোঁটে হাসি—যখন ছেলে পঞ্চম স্বরে—'মা, খাবার দে না, আ-আঁ'—বলিয়া ক্ষুদ্র হাতে দু-একটা চড় দিল বা মাথার কাপড়টা খুলিয়া দিল—তখন মা, 'আ মোলো হতভাগা ছেলে, তর সয় না' বলিয়া ক্ষুদ্র হাতেব মৃদু চড়েব ঋণ সুদসুদ্ধ ফেবত দিয়া আবাব গল্পে মনোনিবেশ করিলেন। কেহ বা 'এই যে বাবা, দিচ্ছি, খাবাব দিচ্ছি চল, ক্ষিদে পাবেই ত' বলিয়া গল্পেব হারানো খেই খুঁজিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে গল্পে প্রবৃত্ত হইলেন। ছেলে কাঁদিয়া 'যজ্ঞি-বাড়ি' বলিয়া জানান দিতে লাগিল।

আর একটা ঘরে বালিকারা ও ছোট ছোট বধূরা পান সাজিতেছে। ঘোমটার প্রান্তে হাসিমাখা লাল লাল ঠোঁটের উপর নোলকটি ঝুলিতেছে। হাত দুখানি চুন খয়েবের দাগে রঞ্জিত; মাঝে-মাঝে নিজের হাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সকলের বিষম ভাবনা হইতেছে যে, এই হাত লইয়া কেমন করিয়া লোকের সামনে বাহির হইবে—কেহ বা 'কি ক'রে এ দাগ উঠবে ভাই' বলিয়া হাসিয়া আকুল হইয়াছে। কেহ বা দাগ উঠিবার উপায় বলিয়া দিতেছে। এই ঘবে শিশুর কলরব বড় একটা নাই, যদি কোনো শিশু 'দিদি, নে-না' বলিয়া আসিতেছে, অমনি তাহার দিদি 'যা যা, ঐ ঘরে মা আছে যা' বলিয়া সদ্যই বিদায় করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছে।

এমন সময় ডাক পড়িল—'ওরে, এই বেলা সবাই ভাত খেয়ে নে-না গো—এখনই যে সব মেয়েরা আসতে আরম্ভ করবে, দুটো বেজে গেছে!'

দালানে সারি সারি কলাপাতায় ভাত ও পাঁচ সাত প্রকার তরকারি একটু একটু দিয়া পাতা সাজানো আছে। ভাত শুখাইয়া চাল হইতেছে, যে আসিতেছে, সে বসিতেছে। কেহ ডাকিতেছে—'ও সেজ বৌ, আয় না'—কেহ ডাকে, 'ন-দিদি, শীগ্‌গির নে-না ভাই খেয়ে, না হ'লে যে কারও চুল-বাঁধা হবে না।' কাহারও ডাকাডাকিতে সাড়া নাই পাতা পড়িয়া আছে। যাহাদের অর্ধেক আহার হইয়াছে, তাহারা ডাকিল—'ও ঠাকুর আর কি আছে নিয়ে এস না।' ঠাকুর পিতলের হাতা লইয়া আসিয়া সকলকে এক এক হাতা দিয়া গেল। 'ও ঠাকুর—এদিকে এদিকে', 'ও ঠাকুর, আর একখানা মাছ ভাজা দাও না', 'ও ঠাকুর মাছের ঝোলের মুড়োটা লক্ষ্মীর পাতে দাও—কাঁটার মাছ একখানা খুঁজে দাও ত।' ঠাকুর পরিবেশনে আসিলেই বধূরা ঘোমটার মাত্রা বাড়াইয়া হাত গুটাইয়া আহার বন্ধ করিতেছে, মেয়েরা চাহিয়া চাহিয়া খাইতেছে।

ভাত খাওয়ার পালা শেষ হইতে না-হইতে একে-একে নিমন্ত্রিতেরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। একজন তাঁহাদের দেখিয়া "ঐ রে—কারা এল, ওঠ ওঠ, আর দই খায় না।' কেহ ত্রস্তে উঠিয়া পড়িল, কেহ গল্প বন্ধ হওয়ায় এইবার ভাল করিয়া কাজে মনোনিবেশের অবসর পাইয়া, 'দইটা

বেশ হয়েছে জেঠাই-মা, আর এক খুরি দাও ত' বলিয়া প্রচুর দই খাইয়া লইল। একটি করিয়া শিশু প্রায় সকলের পাশে আছেই—কারও পাশে বা দুটি। মা এখন বিশেষ মনঃসংযোগে ছেলেকে আহার করাইতে লাগল, কেহ উঠিতে বলিলে বলে, 'এই যে ছেলেটা খাচ্ছে, খাওয়া হোক, উঠি।' নিজেও যে না খাচ্ছেন, এমন শপথ করা যায় না।

এদিকে ত্বরিতাগত মহিলারা আপাদমস্তক বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া জড়ভরতের ন্যায় উচ্ছিষ্টের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন—কোন্ দিকে যাই। গৃহিণীরা দই সন্দেশের হাঁড়ি হাতে পরিবেশনে ব্যস্ততার সহিত বলিতেছেন, 'এস এস—চল চল, উপবে চল।' কিন্তু উপরের সিঁড়ির সন্ধান কে দেয়? সুতরাং নিমন্ত্রিতারা দাঁড়াইয়া আহার দেখিতেছেন। ইহাতে দু-একজন শীঘ্র আহার শেষ করিয়া—'পিসিমা যেন কি, এঁদের নিয়ে বসাও না গা' বলিয়া হাত ধুইতে গেল। তাহারা যখন হাত ধুইয়া আসিল, তখন আরও অনেকে আসিয়া জুটিয়াছেন। তখন একজন 'আসুন আসুন, আপনারা এইদিকে এখন আসুন' বলিয়া উপরে লইয়া একটি ঘরে বসাইলেন। যাহারা পূর্ব্বের পরিচিতা, তাহারা আসিয়া সিঁড়ি, ঘর, মাদুর খুঁজিয়া লইয়া এক রকম বসিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। মহিলারা প্রায় পরস্পরের অপরিচিত ; মূক ও বধিরের ন্যায় বসিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। যদি কেহ কাহাকেও পবিচিতা পাইয়া থাকেন, তবে তিনি দুই-এক কথা কহিয়া সকলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন।

এমন সময় গৃহিণীদের কাহারও বন্ধু অথবা মেয়েদের শ্বশুরবাড়ির কুটুম্ব বা পিত্রালয়ে কেহ আসায় তাঁহাদের কল্যাণে গৃহিণীদের কেহ একবার আসিয়া সকলকেই সমভাবে আপ্যায়িত করিয়া গেলেন—একজন আসিয়া পান দিয়া গেল। যাঁহারা সকাল সকাল আসিয়াছেন—মনোগত বাসনা যে, সকাল সকাল ফিরিবেন। গতিক দেখিয়া বুঝিলেন যে, সে আশা বৃথা!

বাড়ির মেয়েদের মধ্যাহ্নের আহার ও বৈকালিক বেশভূষা সমাপ্ত হইতে পাঁচটা বাজিল। তখন একটি গলা-খোলা লাল বডি বা হাতকাটা কালো জ্যাকেটের সঙ্গে কেহ নীলাম্বরী, কেহ ঢাকাই, কেহ শান্তিপুরের ডুরে পরিধান করিয়া দু-চারখানি অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া এ-ঘর ও-ঘর হইতে নিমন্ত্রিতাদের সংগ্রহ করিয়া উঠানে লইয়া গিয়া বসাইতে লাগিলেন ; সেখানে শতরঞ্জির উপর পরিষ্কার চাদর পাতা। এক পাশে কারচোপের কাজের বিছানা, তাহাতে আইবড় ভাতের বা বৌভাতের বা 'সাধের' কনে উজ্জ্বল বস্ত্রালঙ্কার ও পুষ্পমাল্যে ভূষিতা হইয়া বসিয়া আছে, সম্মুখে দুইটি বৃহৎ বৃহৎ পুষ্পাধারে বড় বড় দুটি গোলাপ ফুলের তোড়া। এক পাশে নাচের বাজনা বাজিতেছে, কতকগুলি কালো কালো মোটাসোটা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ঢোলক, মন্দিরা ও বেহালা বাজাইতেছে। তিন-চারজন নাচওয়ালী আবাহু, আকণ্ঠ আপাদমস্তক অলঙ্কার পরিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে, কেহ বা সিগারেট খাইতেছে, কেহ পান খাইতেছে। নিমন্ত্রিতাদের আসিতে দেখিয়া দুইজন তাড়াতাড়ি উঠিয়া নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে নাচ গান জুড়িয়া দিল ও নাচিতে নাচিতে প্রত্যেকের অতি নিকটে আসিয়া পেলার জন্য ব্যস্ত করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে উঠান ভরিয়া গেল, আতর, গোলাপ ফুলের মালা ও তোড়া বিতরণে নিমন্ত্রিতাদের অভ্যর্থনা করা হইল। এখন যাঁরা আসিতেছেন, তাঁহাদের কোনো চিন্তা নাই যে, কোথায় বসিব। প্রবেশপথে ও ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বাড়ির মেয়েরা নিমন্ত্রিতাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। যে-কেহ গাড়ি বা পালকি হইতে নামিতেছেন, অমনিই তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া উঠানে বসানো হইতেছে। আসর জমজমাট, হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া পাল ভেদ করিয়া ছড়ছড় কবিয়া জল পড়িতে লাগিল। হৈ হৈ করিয়া সকলে উঠিয়া পড়িল এবং 'নবেন কোথা গেলি', 'খুকী ঝিয়ের কোলে যা', 'হরে রুমালখানা মাথায় দে', 'রোগা ছেলে ভিজে গেল', 'ওমা কি হবে, আজ সবে দুটি ভাত দিচ্ছি' বলিতে বলিতে মহিলারা ঘরের ও বারান্দার দিকে ছুটিতে লাগিলেন। বেনারসী, ক্রেপ, বোম্বাই প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র ভিজিল। হুড়াহুড়ি, কলরব, কাদার পিচ্ছিল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। কে কাকে দেখে! তারই মাঝে নাচওয়ালীরা ভাঙা গলায় চেঁচাইতেছে—'ওগো, মেয়েদের দালানে বসাও না!' তাহার বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে, হীরা, মুক্তা ও প্রচুর সোনায় ভূষিতা মহিলাদের দেখিয়া তাহারা আশা করিয়াছিল যে, প্রচুর পেলা পাইবে—কিন্তু হায় রে বৃষ্টি!

বারান্দায়, দালানে ও ঘরে ঘরে খাদ্যের পাতা সাজানো হইয়াছে, তিল মাত্র স্থান নাই যে

মহিলারা আশ্রয় লয়েন, তা আবার গানের মজলিস বসিবে !

বৃষ্টির প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া বাড়ির মেয়েরা অভ্যাগতদিগের হাত ধরিয়া সযত্নে আহারে বসাইলেন এবং বৃষ্টিতে সকলের বড়ই কষ্ট ও ক্ষতি হইল বলিয়া দুঃখ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গোলযোগে পরিবেশনে অনেক ত্রুটি হইতে লাগিল—কেহ লুচি পাইল, কচুরি পাইল না, সন্দেশ পাইল ত রসগোল্লা পাইল না। রান্না হইয়াছে—পোলাও, কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারি, মাছ দিয়া ছোলার দাল, রোহিতের মুড়া দিয়া মুগের দাল, আলুর দম, ছোকা, মাছের চপ, চিংড়ির কাটলেট, ইলিশ ভাজা, বেগুন ভাজা, শাক ভাজা, পটোল ভাজা, দইমাছ, চাটনি তারপর লুচি, কচুরি, পাঁপর ভাজা ; একখানি সরাতে খাজা, গজা, নিমকি, রাধাবল্লভি, সিঙ্গারা, দরবেশ, মেঠাই ; একখানা খুরিতে আম, কামরাঙ্গা, তালশাঁস ও বরফি সন্দেশ ; আর একখানায় ক্ষীরের লাড্ডু, গুজিয়া, গোলাপজাম ও পেরাকী। ইহার উপর ক্ষীর, দধি, রাবড়ি ও ছানার পায়স। বাবুদের জন্য মাংসের কোর্মা ছিল, কিন্তু মেয়েরা অনেকেই মাংস খান না, এজন্য তাহা মেয়েদের মধ্যে পরিবেশন করা হইল না। আহার্য প্রচুর ও অনেক প্রকারের, সুতরাং পরিবেশনে বিশৃঙ্খলা ঘটিলেও প্রত্যেকেরই ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল।

এইবার বাড়ি যাওয়ার পালা। 'গাড়ি কই', 'খোকা কোথা', 'খুকীর গলার হার কে নিলে ?' কিছুই খুঁজিয়া মিলিতেছে না ! বৌমার হীরার ধুকধুকি নাই, টেপির মাথার টুপির ল্যাজ ছেঁড়া, গিন্নীর নাকের নথের নোলক পর্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে। অমিয় জুতা হারাইয়া শুধু মোজা পায়েই 'আমার জুতো ও—ও—ও—ও' করিতে করিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল।

গিন্নীর বকুনি, কর্তার ক্রোধ শান্ত হইতে রাত বারোটা বাজিল। জুতার শোক ভুলিয়া অমিয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এক ঘুমে রাত্রি প্রভাত। একজন বৈষ্ণব খঞ্জনি বাজাইয়া গান গাহিতেছে—জয় যদুনন্দন জগত-জীবন—

"ভারতী"। ভাদ্র ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

হাঙর

স্বামী বিবেকানন্দ

সকালবেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড়-বড় হাঙর ভেসে-ভেসে বেড়াচ্চে।

জল-জ্যান্ত হাঙর পূর্বে আর কখন দেখা যায়নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তা-ও আবার শহরের গায়ে। হাঙরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড কেলাসটি জাহাজের পাছার উপর—সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে-কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে, ঝুঁকে হাঙর দেখচে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙর মিঞারা একটু সরে গেচেন ; মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু দেখি যে, জলে গাঙধাড়ার মত এক প্রকার মাছ ঝাঁকে-ঝাঁকে ভাসচে। আর-এক রকম খুব ছোট মাছ, জলে থিক থিক করচে। মাঝে মাঝে এক একটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিশ মাছের চেহারা, তীরের মত এদিক ওদিক কোরে দৌড়ুচ্চে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙরের বাচ্চা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম—তা নয়। ওঁর নাম বনিটো। পূর্বে ওঁব বিষয় পড়া গেছল বটে ; এবং মালদ্বীপ হতে উনি শুঁটকিরূপে আমদানি হন, হুড়ি চড়ে—তাও পড়া ছিল। ওঁর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে। এখন ওঁর তেজ আর বেগ দেখে খুশী হওয়া গেল। অত বড় মাছটা তীরের মত জলেব ভিতব ছুটচে, আর সে সমুদ্রের কাচের মত জল, তার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি দেখা যাচ্চে। বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টাটাক, এইপ্রকার বনিটোর ছুটোছুটি আর ছোট মাছের কিলিবিলি ত দেখা যাচ্চে। আধ ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার,—ক্রমে তিতিবিরক্ত হয়ে আসচি, এমন সময় একজন বললে—ঐ ঐ ! দশ বার জনে বলে উঠল, ঐ আসচে, ঐ আসচে !! চেয়ে দেখি দূরে প্রকাণ্ড একটা কালো বস্তু ভেসে আসচে, পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নিচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগল। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিলে ; সে গদাইলস্করি চাল ; বনিটোর সোঁ সোঁ তাতে নেই ; তবে একবার ঘাড় ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হল। বিভীষণ মাছ ; গম্ভীর চালে চলে আসচে—আব আগে আগে দু-একটা ছোট মাছ ; আর কতকগুলো ছোট মাছ তার পিঠে গায়ে পেটে খেলে বেড়াচ্চে। কোনও কোনওটা বা জেঁকে তার ঘাড়ে চড়ে বসচে। ইনিই সসাঙ্গোপাঙ্গ হাঙর। যে-মাছগুলি হাঙরের আগে-আগে যাচ্চে, তাদের নাম "আড়কাটি মাছ—পাইলট ফিশ।" তারা হাঙরকে শিকার দেখিয়ে দেয় আর বোধ হয় প্রসাদটা-আসটা পায়। কিন্তু হাঙরের সে-মুখ ব্যাদান দেখলে তারা যে বেশী সফল হয়, তা বোধ হয় না। যে-মাছগুলি আশে পাশে ঘুরচে, পিঠে চড়ে বসচে, তারা হাঙর-'চোষক'। তাদের বুকের কাছে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওড়া চেপটা গোলপানা একটি স্থান আছে। তার মাঝে, যেমন ইংরাজী অনেক রবারের জুতোর তলায় লম্বা লম্বা জুলি কাটা কির্‌কিরে থাকে, তেমনি জুলি কাটা কাটা। সেই জায়গাটা ঐ-মাছ, হাঙরের গাদে দিয়ে চিপ্সে ধরে ; তাই হাঙরের গায়ে পিঠে চড়ে চলচে দেখায়। এরা নাকি হাঙরের গায়ের পোকা মাকড় খেয়ে বাঁচে। এই দুই প্রকার মাছ পরিবেষ্টিত না হয়ে হাঙর চলেন না। আর এদের, নিজের সহায় পরিষদ জ্ঞানে কিছু বলেনও না ; এই মাছ একটা ছোট হাতসুতোয় ধরা পড়ল। তার বুকে জুতোর তলা একটু চেপে দিয়ে পা তুলতেই সেটা পায়ের সঙ্গে চিপ্সে উঠতে লাগল। ঐ রকম কোবে সে হাঙরের গায়ে লেগে যায়।

সেকেণ্ড কেলাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক—তার ত উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটা ভীষণ বঁড়শিব যোগাড় করলে। সে "কুয়োর ঘটি তোলার" ঠাকুরদাদা। তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা-দড়ি দিয়ে জোর করে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে একটা মোটা কাছি বাঁধা হল। হাত চার বাদ দিয়ে, একখানা মস্ত কাঠ

ফাতনার জন্য লাগানো হল। তারপর, ফাতনা সুদ্ধ বঁড়শি, ঝুপ কোরে জলে ফেলে দেওয়া হল। জাহাজের নিচে একখানি পুলিসের নৌকা আমরা আসা পর্যন্ত চৌকি দিচ্ছিল—পাছে ডাঙার সঙ্গে আমাদের কোনোরকম ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল, আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড় বন্ধু হয়ে উঠল। হাঁকাহাঁকির চোটে আরব মিঞা চোখ মুছতে-মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে কোমর আঁটবার যোগাড় করচেন, এমন সময় বুঝতে পারলেন যে, অত হাঁকাহাঁকি কেবল তাঁকে কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙর ধরবার ফাতনাটিকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে দেবার অনুরোধ-ধ্বনি। তখন তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে, আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে, একটা বল্লির ডগায় কোরে ঠেলেঠুলে ফাতনাটাকে ত দূরে ফেললেন; আর আমরা উদগ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারাণ্ডায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙরের জন্য 'সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম, এবং যার জন্যে মানুষ ঐ প্রকার ধড়ফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগল—অর্থাৎ "সখি, শ্যাম না এলো।" কিন্তু সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দুশ' হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মূষকের আকার কি একটা ভেসে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে, "ঐ হাঙর ঐ হাঙর" রব! চুপ্ চুপ—ছেলের দল!—হাঙর পালাবে। বলি, ওহে! সাদা টুপিগুলো একবার নাবাও না, হাঙরটা যে ভড়কে যাবে—ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করচে, তাবৎ সেই হাঙর লবণসমুদ্রজন্মা, বঁড়শি-সংলগ্ন শোরের মাংসের তালটি উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ করবার জন্যে, পালভরে নৌকার মত শোঁ করে সামনে এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত—এইবার হাঙরের মুখ টোপে ঠেকেছে! সে ভীম পুচ্ছ একটু হেলল—সোজাগতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ, হাঙর চলে গেল যে হে! আবার পুচ্ছ একটু বাঁকল, আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে বঁড়শিমুখো দাঁড়াল। আবার শোঁ করে আসচে—ঐ হাঁ কোরে, বঁড়শি ধরে-ধরে! আবার সেই পাপ লেজ নাড়লো আর হাঙর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চলল। আবার ঐ চক্র দিয়ে আসচে, আবার হাঁ করচে; ঐ—টোপটা মুখে নিয়েচে, এইবার —ঐ ঐ চিতিয়ে পড়ল, হয়েচে, টোপ খেয়েছে—টান্ টান্ টান্, ৪০/৫০ জন্ টান, প্রাণপণে টান্! কি জোর মাছের! কি ঝটাপট—কি হাঁ। টান্ টান্। জল থেকে এই উঠল, ঐ যে জলে ঘুরচে, আবার চিতুচ্চে, টান্ টান্। যাঃ টোপ খুলে গেল! হাঙর পালাল! তাই ত হে, তোমাদের কি তাড়াতাড়ি বাপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে! যেই চিতিয়েচে অমনিই কি টানতে হয়? আর—"গতস্য শোচনা নাস্তি"; হাঙর ত বঁড়শি ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড়। আড়কাঠি মাছকে, উপযুক্ত শিক্ষা দিলে কি না তা খবর পাইনি—মোদ্দা হাঙর চোঁচা। আবার সেটা ছিল "বাঘা" বঁড়শি-সন্নিধি পরিত্যাগ করবার জন্য, স-"আড়াকাঠি"—"রক্তচোষা" অন্তর্দধে।

কিন্তু নেহাত হতাশ হবার প্রয়োজন নেই। ঐ যে পলায়মান "বাঘা"র গা ঘেঁষে আর একটা প্রকাণ্ড "থ্যাবড়া মুখো' চলে আস্‌চে! আহা, হাঙরদের ভাষা নেই! নইলে "বাঘা" নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান করে দিত। নিশ্চিত বলত, "দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নতুন জানোয়ার এসেচে, বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কিন্তু কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙর-গিরি করচি, কত রকম জানোয়ার—জ্যান্ত, মরা আধমরা—উদরস্থ করেচি, কত রকম হাড়-গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-টুকরো পেটে পুরেচি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম!! এই দেখ না—আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কি হয়েছে' বলে, একবার সেই আকটি দেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান কোরে আগন্তুক হাঙরকে অবশ্যই দেখাত। সেও প্রাচীন বয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে চ্যাঙ মাছের পিত্তি, কুঁজো-ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোনও-না-কোনওটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না, তখন হয় হাঙরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে, কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না! অতএব যতদিন না কোনও প্রকার হাঙুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন কোরে হয়?—অথবা "বাঘা" মানুষ-ঘেঁষা হয়ে মানুষের ধাত পেয়েছে, তাই "থ্যাবড়া"কে আসল খবর কিছু না বলে, মুচকে হেসে "ভাল আছ ত হে" বলে সরে গেল।—"আমি একাই ঠকব?"

"আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা..."—শঙ্খধ্বনি ত শোনা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেছেন "পাইলট ফিশ্", আর পাছু-পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসচেন "থ্যাবড়া" ; তাঁর আশে পাশে নেত্য করচেন "হাঙর-চোষা" মাছ। আহা, ও-লোভ কি ছাড়া যায় ? দশহাত দরিয়ার উপর ঝিক্ ঝিক্ কোরে তেল ভাসচে, আর খোসবু কতদূর ছুটচে, তা "থ্যাবড়া"ই বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য—সাদা, লাল, জরদা—এক জায়গায় ! আসল ইংরেজি শুয়ারের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, বং-বেবঙের গোপীমণ্ডল—মধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্চে !!

এবার সব চুপ—নোড়োচোড়ো না, আর দেখ—তাড়াতাড়ি কোরো না। মোদ্দা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ,—বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরচে ; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখচে ! দেখুক। চুপ চুপ—এইবার চিত হল—ঐ যে আড়ে গিল্চে, চুপ—গিল্তে দাও। তখন "থ্যাবড়া" অবসর ক্রমে, আড় হয়ে টোপ উদরস্থ কোরে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়ল টান ! বিস্মিত "থ্যাবড়া", মুখ ঝেড়ে চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উলটো উৎপত্তি ! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে বুড়ো, জোয়ান, দে টান্—কাছি ধরে দে টান। ঐ হাঙরেব মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠল—টান্ ভাই টান্। ঐ যে—প্রায় আধখানা হাঙব জলেব উপর। বাপ্ কি মুখ ! ও যে সবটাই মুখ আর গলা হে ! টান্—ঐ সবটা জল ছাড়িয়েচে। ঐ যে বঁড়শিটা বিঁধেচে—ঠোঁট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়—টান্। থাম্—থাম্—ও আরব পুলিস মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও ত—নইলে যে এত বড় জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও-ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে যায়। আবার টান--কি ভারি হে ? ওমা, ও কি ? তাই ত হে, হাঙরের পেটের নীচে দিয়ে ও ঝুলচে কি ? ও যে নাড়িভুঁড়ি ! নিজের ভারে নিজের নাড়িভুঁড়ি বেরুল যে ! যাক্ ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক ; টান্ ভাই টান। এ যে বক্তের ফোয়ারা হে ! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান্—এই এল। এইবার জাহাজের ওপর ফেল ; ভাই হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড়—ধুপ ! বাবা, কি হাঙর ! কি ধপাৎ কোরেই জাহাজের উপর পড়ল ? সাবধানের মার নেই—ঐ কড়িকাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মার—ওহে ফৌজিম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ। —"বটে ত"। রক্ত মাখা গায়, কাপড়ে, ফৌজি যাত্রী, কড়ি কাঠ উঠিয়ে, দুম্ দুম্ দিতে লাগল হাঙরের মাথায়। আর মেয়েরা—'আহা কি নিষ্ঠুর, মের না' ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগল—অথচ দেখতেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এইখানেই বিরাম হোক্। কেমন কোরে সে হাঙরের পেট চেরা হল, কেমন বক্তের নদী বইতে লাগল, কেমন সে হাঙর ছিন্ন অন্ত্র, ভিন্ন দেহ, ছিন্ন হৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগল, নড়তে লাগল ; কেমন করে তার পেট থেকে অস্থি চর্ম, মাংস, কাঠকুটবো, একরাশ বেরুল—সে সব কথা থাক। এই পর্যন্ত যে, সেদিন আমার খাওয়া দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিসেই সেই হাঙরের গন্ধ বোধ হতে লাগল।

"পবিব্রাজক"। ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

বসন্ত পঞ্চমী

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকালের হিসাবে আজ হইতে মদনোৎসব আরম্ভ, চৈত্র মাসের কন্দর্প-চতুর্দশীর দিন এই উৎসবের শেষ হইত। পুরা বসন্তকালটা আমোদে, প্রমোদে, উৎসব আনন্দে কাটিত। সঙ্গীত, কবিতা রচনা, কাব্যামোদ, রং লইয়া খেলা, কুঙ্কুমের ছড়াছড়ি, আর ফুলেব বাহার—মদনোৎসবের ইহাই উপাদান ছিল। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের ফুলের সাজে সাজাইয়া, বাসন্তী রঙের কাপড় পরাইয়া বাহির করা হইত। তাহারা নাচিত, খেলিত, হাসিয়া বেড়াইত। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর দলও সাজিয়া কুঙ্কুম কস্তুরী লইয়া বাহির হইত এবং নানা বসেব কবিতা আবৃত্তি করিত, কথা-কাটাকাটি করিত এবং নাচ-গান করিত। ইহা ছাড়া মদনেব পূজা, আরতি এবং শোভাযাত্রাও হইত। এই উৎসবে যেন একটা আনন্দের ঢেউ সমাজের উপর দিয়া বহিয়া যাইত।

এই মদনোৎসবই আকারান্তরিত হইয়া হোলি উৎসবে পরিণত হইয়াছে। কাব্যামোদের পরিবর্তে গালাগালি চলিয়াছে, কুৎসিত ভাবের আলোচনা হইয়া থাকে। পূর্বে যখন আমরা সজীব জাতি ছিলাম, তখন মদনোৎসবে মধুর রসেরই আধিক্য হইত—সাজে মাধুর্য, ভাষায় মাধুর্য, সঙ্গীতে মাধুর্য, চিত্রলিখনে মাধুর্য—সর্বত্রই মাধুরীর প্রবাহ বহিয়া যাইত। জাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর পরিবর্তে কৌসিত্য প্রবল হইয়াছে, আমোদ-প্রমোদ অশ্লীল কুরুচিকব আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের পুরাতন উৎসব সকলেব বিপবিণাম দেখিলেই বুঝা যায় আমরা কতটা হীন হইয়াছি।

বসন্ত পঞ্চমীর দিন সরস্বতী পূজাটা তন্ত্রের কীর্তি! বাঙ্গালায় যেমন মাটির সবস্বতী গড়িয়া পূজা হয়, ভারতের আব কোন প্রদেশে এমন হয় না। এমন কি বাঙালীব মতন পুস্তকপূজা—ভারতীর আরাধনা আর কোন প্রদেশে হয় না। অদ্য অনধ্যায় বটে, কিন্তু বাঙালী যেমন একেবারেই কলম স্পর্শ করে না, গ্রন্থাদিব প্রতি দৃষ্টিপাত করে না—এত কঠোব অনধ্যায় ভাবতের আর কোন প্রদেশে প্রচলিত নাই। সবস্বতী পূজা বাঙ্গালার খাস-সামগ্রী—খাস-উৎসব। বিহারের হিন্দুগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন দোয়াত পূজা কবিয়া থাকে, আর সরস্বতী পূজার দিনে তাহারা দোয়াত পূজা বা গ্রন্থ পূজা করে না। আজ হইতে তাহাদের হোলি আরম্ভ হইল, আজ হইতে আবীর ও গালাগালি চলিতে আরম্ভ হইল, আজ হইতে দোলপূর্ণিমা পর্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে তাহারা হোলি গান করিবে। হোলিব সূচনাব দিন বলিয়া আজ বসন্তপঞ্চমী তাহাদের পক্ষে আমোদের দিন। যুক্তপ্রদেশে এবং পাঞ্জাবে বিহারের মতন হোলিব প্রথম দিন বলিয়া বসন্তপঞ্চমীর আদর। কেবল বাঙ্গালায় আজ শক্তিপূজার বোধন বসিল, বাসন্তী দুর্গোৎসবের বিজয়ার পর চতুর্দশীব দিন এই বোধনেব শেষ হইবে।

আমরা ইংরেজিনবীশ বাঙালী মেকী সভ্যতাব খাতিরে দেশের পুরাতন উৎসব আনন্দ ছাড়িয়া দিয়াছি বটে, পরন্তু নূতন উৎসব আনন্দ অবলম্বন কবিতে পাবি নাই আসল কথা—আমবা উৎসব আনন্দে মত্ত হইতে ভুলিয়াছি। তাহার একটু কারণ আছে। দশজনকে লইয়া উৎসব আমোদে প্রমত্ত হইতে হয়। উৎসব বলিলেই সংহতি বুঝায়! আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবাসী, বন্ধুবান্ধব লইয়া উৎসব করিতে হয়। দশজনকে লইয়া আনন্দ কবিতে হইলে ট্যাকেব কড়ি খরচ করিতে হয়, নিজে একটু সংযমী ত্যাগী হইতে হয়। যে বিলাসী সে অত পরের উপদ্রব সহিবে কেন, পরের জন্য পয়সা খরচ করিবেই বা কেন? বিশেষত, বাবু বিলাসীর বিলাসের আকাঙ্ক্ষাটা খুব বড়, অথচ তদনুরূপ অর্থ-সামর্থ্য অর্থোপার্জন করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি বিলাসে ইংবেজের নকল করেন বটে, কিন্তু ইংরেজ বা ইয়োরোপীয় জগৎ ছানিয়া টাকা রোজগার করে এবং বাবুয়ানি

করে, তিনি ইংরেজের এঁটো পাতা চাটিয়া তাহার চাকরি—দালালি—মোসাহেবি করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করেন। এমন নকলনবীশ বিলাসীর আধিক্য সমাজে হইলে সামাজিক আমোদ উৎসব একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। আর একটা কথা, আজকালকার সামাজিক বাবুরা আর অল্পে তুষ্ট নহেন; তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইলে বাদশাহী খোরাক না তৈয়ারী করিতে পারিলে, তাঁহারা খাইতে আইসেন না। দশজনে মিশিতে হইলে যে দশজনকে একটু একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। ফলে আনন্দময়—উৎসবময় বাঙ্গালা দেশ এখন নিরানন্দ এবং উৎসবহীন হইয়াছে। তাহার ফলে রোগ শোক অল্পায়ু অল্পভোগী হইয়া আমরা কষ্ট পাইতেছি, বল বুদ্ধি ভরসা চল্লিশ পেরুলেই ফরসা হইয়া যাইতেছে।

কাজেই বলিতে হয়, আজ বসন্তপঞ্চমীর দিন একবার বুক-ভরা, গাল-পোরা হাসি হাস না ভাই। হাসি না পায়, জোর করিয়া হাস—শুষ্ক হাসি হাস। হাসির ভান করিতে করিতে আসল হাসি ফুটিয়া উঠিবেই। সুখ দুঃখ লইয়াই সংসার; কাহারও ভাগ্যে নির্জলা সুখ বা নির্জলা দুঃখ ঘটিতেই পারে না;—সুখের মধ্যে দুঃখ থাকে, দুঃখের মধ্যে সুখ থাকেই। যে হাসিতে জানে সে সুখেও হাসে, দুঃখেও হাসে—সে হাসিয়া সুখ-দুঃখকে এক করিয়া ফেলিতে পারে। মুসলমানের আমলে এমন কি অধিক সুখ ছিল যে, বাঙলা উৎসবময় হইয়াছিল। আসল কথা, তখন বাঙালী আমোদ করিতে জানিত—হাসিতে হাসাইতে জানিত। এখন বাঙালী হাসিতেও জানে না, হাসাইতেও পারে না। তাই বঙ্গভূমি নিরানন্দময়ী। হাস না?—বসন্তপঞ্চমী বড় সুখের, বড় ভোগের উৎসব, এই শুভ দিনে একবার আপনা ভুলিয়া হাস না? তোমার মঙ্গল হইবে, তোমার জাতির কল্যাণ হইবে, তোমার পরমায়ু বৃদ্ধি হইবে, বংশ রক্ষা হইবে, প্রকৃত সুখোদয় হইবে। মা-সরস্বতীকে সামনে রাখিয়া—একবার গাল-ভরা সরল হাসি হাস! উৎসব সার্থক হউক, বাঙালী জীবন ধন্য হউক।

"প্রবাহিণী"। ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

বর্ষা

প্রমথ চৌধুরী

এমন দিনে কি লিখতে মন যায়?

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। মাথার উপর থেকে অবিরাম অবিরল অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ধারা পড়ছে। সে-ধারা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায়, অথচ এত স্থূলও নয় যে তা চোখ জুড়ে থাকে। আর কানে আসছে তার একটানা আওয়াজ; সে-আওয়াজ কখনও মনে হয় নদীর কুলুধ্বনি, কখনও মনে হয় তা পাতার মর্মর। আসলে তা একসঙ্গে ও-দুইই; কেননা আজকের দিনের জলের স্বর ও বাতাসের স্বর দুই মিলে-মিশে এক সুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন দিনে মানুষ যে অন্যমনস্ক হয়, তার কারণ, তার সকল মন তার চোখ আর কানে এসে ভর করে। আমাদের এই চোখ-পোড়ানো আলোর দেশে বর্ষার আকাশ আমাদের চোখে কি যে অপূর্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দেয় তা বাঙালী মাত্রেই জানে। আজকের আকাশ দেখে মনে হয়, ছায়ার রঙের কোনো পাখির পালক দিয়ে বর্ষা তাকে আগাগোড়া মুড়িয়ে দিয়েছে, তাই তার স্পর্শ আমাদের চোখের কাছে এত নরম, এত মোলায়েম।

তারপর চেয়ে দেখি গাছপালা মাঠঘাট সবারই ভিতর যেন একটা নূতন প্রাণের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সে-প্রাণের আনন্দে নারকেল গাছগুলো সব দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দুলছে, আর তাদের মাথার ঝাঁকড়া চুল কখনো-বা এলিয়ে পড়ছে, কখনো-বা জড়িয়ে যাচ্ছে। তার পাতার চাপে যেসব গাছের ডাল দেখা যায় না, সেসব গাছের পাতার দল এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, পরস্পর কোলাকুলি করছে; কখনও-বা বাতাসের স্পর্শে বেঁকে-চুরে এমন আকার ধারণ করছে যে, দেখলে মনে হয়, বৃক্ষলতা সব পত্রপুটে ফটিকজল পান করছে। আর এই খামখেয়ালি বাতাস নিজের খুশিমত একবার পাঁচ মিনিটের জন্য লতাপাতাকে নাচিয়ে দিয়ে বৃষ্টির ধারাকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার থেমে যাচ্ছে। তারপর আবার সে ফিরে এসে যা ক্ষণকালের জন্য স্থির ছিল তাকে আবার ছুঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সে যেন জানে তার স্পর্শে যা-কিছু জীবন্ত অথচ শান্ত সে-সবই প্রথমে কেঁপে উঠবে, তারপর ব্যতিব্যস্ত হবে, তারপর মাথা নাড়বে, তারপর হাত-পা ছুঁড়বে; আর জলের গায়ে ফুটবে পুলক আর তার মুখে সীৎকার। বৃষ্টির সঙ্গে বৃক্ষপল্লবের সঙ্গে সমীরণের এই লুকোচুরি খেলা আমি চোখ ভরে দেখছি আর কান পেতে পেতে শুনছি। মনের ভিতর আমার এখন আর কোনও ভাবনাচিন্তা নেই, আছে শুধু এমন একটা অনুভূতি যার কোনও স্পষ্ট রূপ নেই, কোনও নির্দিষ্ট নাম নেই।

মনের এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কি লেখা যায়? যদি যায় তো সে কবিতা, প্রবন্ধ নয়।

আনন্দে-বিষাদে মেশানো ঐ অনামিক অনুভূতির জমির উপর অনেক ছোটখাট ভাব মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠেছে, আবার মুহূর্তেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে। এই বর্ষার দিনে কত গানের সুর আমার কানের কাছে গুনগুন করছে, কত কবিতার শ্লোক, কখনও পুরোপুরি কখনও আধখানা হয়ে, আমার মনের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে আমি ইংরেজি ভুলে গিয়েছি। যেসব কবিতা, যেসব গান আজ আমার মনে পড়ছে, সেসবই হয় সংস্কৃতে, নয় বাঙলা, নয় হিন্দি।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভূবশ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ

গীতগোবিন্দের এই প্রথম চরণ যে-বাঙালী একবার শুনেছে, চিরজীবন সে আর তা ভুলতে পারবে না। আকাশে ঘনঘটা হলেই তার কানে ও-চরণ আপনা হতেই বাজতে থাকবে। সেইসঙ্গে মনে পড়ে যাবে মনের কত পুরনো কথা, কত লুকানো ব্যথা। আমি ভাবছি, মানুষ ভাষায় তার মনের

কথা কত অল্প ব্যক্ত করে, আর কত বেশি অব্যক্ত রয়ে যায়। ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করবার জন্যই যাঁরা এ-পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরাও, অর্থাৎ কবির দলও, আমার বিশ্বাস, তাঁদের মনের অর্ধেক প্রকাশ করেছেন, অর্ধেক গোপন রেখেছেন। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরনো গানের প্রথম ছত্রটি ঘুরে-ফিরে ক্রমান্বয়ে আমার কানে আসছে—'এমন দিনে তারে বলা যায়'। এমন দিনে যা বলা যায়, তা হয়তো রবীন্দ্রনাথও আজ পর্যন্ত বলেননি, শেক্‌স্‌পীয়রও বলেন নি। বলেন নি, যে সে, ভালোই করেছেন। কবি যা ব্যক্ত করেন, তার ভিতর যদি এই অব্যক্তের ইঙ্গিত না থাকে তা হলে তাঁর কবিতাব ভিতর কোনো Mystery থাকে না, আর যে-কথার ভিতর Mystery নেই, তা কবিতা নয়—পদ্য হতে পারে।

সে যাই হোক, আজ আমার কানে শুধু রবীন্দ্রনাথেব গানের সুর লেগে নেই, সেই সঙ্গে তিনি বর্ষার যে-অসংখ্য ছবি এঁকেছেন, সেইসব চিত্র বায়োস্কোপের ছবির মতো আমার চোখের সুমুখ দিয়ে একটির পব আর-একটি চলে যাচ্ছে। ভালো কথা—এটা কখনও ভেবে দেখেছেন যে, বাঙলাব বর্ষা রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন, ও-ঋতুর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের ভারতী ভরপুর, তার ভীমমূর্তি আর তার কান্তমূর্তি, দুইই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, দুইই তাঁব ভাষায় সমান সাকার হয়ে উঠেছে? নবাবি আমলের বাঙালী কবিরা এ-ঋতুকে হয় উপেক্ষা করেছেন, নয় তাকে তেমন আমল দেন নি। চণ্ডীদাসের কবিতায় কি বর্ষাব স্থান আছে? আমার তো মনে হয় না। হয়তো বীরভূমে সেকালে বৃষ্টি হত না, তাই তিনি ও-ঋতুর বর্ণনা করেন নি। বাকি বৈষ্ণব কবিবাও এ বিষয়ে একরূপ নীরব। অবশ্য ঝড়-বৃষ্টি না হলে অভিসার করা চলে না, সুতরাং অভিসারের খাতিরে তাঁদের কাব্যেও মেঘ-বজ্র-বিদ্যুতের একটু-আধটু চেহারা দেখাতে হয়েছে: অর্থাৎ ও-ক্ষেত্রে বর্ষা এসেছে নিতান্ত আনুষঙ্গিকভাবে। অবশ্য এ-বিষয়ে সেকালের একটা কবিতা আছে যা একাই এক শ—

রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গবজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

সংগীত হিসেবে এ-কবিতা গীতগোবিন্দের তুল্য। আর কাব্য হিসেবে তার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

এখন আমার কথা এই যে, আজ আমার মনের ভিতর দিয়ে যেসব কথা আনাগোনা করছে, সেসব এতই বিচ্ছিন্ন, এতই এলোমেলো যে, সেসব যদি ভাষায় ধরে তাবপর লেখায় পুরে দেওয়া যায় তা হলে আমার প্রবন্ধ এতই বিশৃঙ্খল হবে যে, পাঠক তার মধ্যে ভাবের গোলকধাঁধায় পড়ে যাবেন। বাইরের ল অ্যান্ড অর্ডারকে আমরা যতই বিদ্রূপ করি, ভাবের ল অ্যাণ্ড অর্ডারকে না মান্য করে আমরা, সাহিত্য তো মাথায় থাক্, সংবাদপত্রও লিখতে পারি নে। আর যদি এমন পাঠকও থাকেন, যিনি বাঙলাদেশের ছেলেভুলোনো ছড়া-পাঁচালির অনুরূপ অসম্বন্ধ গদ্যরচনা মনের সুখে পড়তে পারেন, তা হলেও আমি আজ মন খুলে লিখতে প্রস্তুত নই। অনেক কথা যা আজ মনে পড়ছে, তার যা-কিছু মূল্য আছে, তা আমার কাছেই আছে, অপর কারও কাছে নেই। বহুকাল-মৃত বহুকাল-বিস্মৃত কোনও শুকনো ফুলের পাপড়ি যদি হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়, তা হলে যে সেটিকে এককালে সজীব অবস্থায় সাদরে সঞ্চিত করে রেখেছিল, একমাত্র তারই কাছে সে-শুষ্কপুষ্পের মূল্য আছে, অপরের কাছে তা বর্ণগন্ধহীন আবর্জনা মাত্র। মানুষের স্মৃতির ভিতরও এমন অনেক শুক্‌নো ফুল সঞ্চিত থাকে যা অপরের কাছে বার করা যায় না। কিন্তু এমন দিনে তা আবিষ্কার করা যায়।

আবার ঘোর করে এল, বাতি না জ্বালিয়ে লেখা চলে না; আর কালির অপব্যয় করা যত সহজ, বাতির অপব্যয় করা তত সহজ নয়। অতএব, এইখানেই এ-লেখা শেষ করি।

পাণ

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পাণ কতকাল ভারতে আছে ? এই আকস্মিক প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি গ্রীস দেশের ইতিহাস খুঁজিতে হয়। কেহ-কেহ হয়ত সদম্ভে বলিবেন যে, প্রাচ্যজগতের ভারতবর্ষ, চীন, মিশর প্রভৃতি দেশই মানব-সভ্যতার আদি জন্মস্থান। কিন্তু এ-অন্ধ বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি নাই। আর্যজাতির আদিবাস যে ইউরোপখণ্ডে, বল্‌টিক্‌ সাগরের তীরভূমিতে, বা ঐরূপ কোনও একটা স্থানে ছিল, ইহা অভ্রান্ত সত্য। 'অন্যে পরে কা কথা', ব্রাহ্মণকুলতিলক বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় পর্যন্ত ঐ দিকে ঢলিয়াছেন। সুতরাং, সভ্যতার প্রথম বিকাশ যে প্রতীচীতে হইয়াছিল এই সারতত্ত্ব অনার্য ভিন্ন কেহই অস্বীকার করিবে না। এ-অবস্থায় পাণের জন্মকথা আলোচনা করিতে হইলে প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল গ্রীস দেশের ভাষা ও ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়, এ-কথা কি আর বার-বার বলিতে হইবে ?

এই অনুসন্ধানকার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পথে একটি সামান্য বাধা আছে—লেখক গ্রীকভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষেত্রে ইহাতে বড় আসিয়া যায় না। সকলেই জানেন, ভাষাতত্ত্ববিচারে ভাষায় অধিকারের আদৌ প্রয়োজন নাই। এ-ক্ষেত্রে অভিধানই আমাদের পরম সহায় ; শব্দচয়নকার্য অভিধানের সাহায্যে সহজে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। মহাজন-প্রদর্শিত এই সুগম পন্থা অনুসরণ করিয়া যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা পাঠকসমাজকে উপহার দিতেছি।

গ্রীক ভাষায় প্যানিক (Panic) শব্দটি দেখা যায়। এই শব্দের অর্থ অকারণ আতঙ্ক। বৈষ্ণবধর্মে যেমন অহেতুকী প্রীতি, তেমনই একটা অহেতুকী ভীতিও আছে। দিনমানের সমস্ত বিচিত্র কোলাহল স্তব্ধ হইলে 'অর্ধরাত্রে শয্যাগৃহে' প্রদীপ নির্বাণলাভ করিলে যখন সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে একমাত্র জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত থাকে তখন সকলেই এই অহেতুকী ভীতির সত্তা অনুভব করিয়াছেন। ইহাই গ্রীক ভাষায় প্যানিক। ভাষাকথায় ইহাকে 'ভূতের ভয়' কহে। এক্ষণে, শব্দের অর্থ বিচারে বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া, প্রণিধান করিয়া দেখা যাউক, শব্দটি হইতে আমরা কী ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিতে পারি। বাস্তবিক, শব্দের অর্থ বুঝিবার চেষ্টায় অনর্থক সময়ক্ষেপ না করিয়া, একটি মাত্র শব্দ অবলম্বন করিয়া ভূরি-ভূরি ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার করাই (modern method) আধুনিক-প্রণালী-সম্মত গবেষণা।

কথায় বলে, ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্ত করে (history repeats itself)। এই গ্রীক প্যানিক শব্দ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, আজকাল আমাদের মধ্যে পাণাতঙ্ক দেখা দিয়াছে, বহুকাল পূর্বে এইরূপ একটা পাণাতঙ্ক গ্রীসদেশে দেখা দিয়াছিল। তাহার ফলে প্যানিক শব্দের উদ্ভব। খুব সম্ভব সেই সময় হইতেই প্রতীচীতে পাণ খাওয়ার আর চলন নাই ; আমরাও এই সুযোগে পাশ্চাত্ত্য সুসভ্য জাতিগণের অনুসরণ করিতে পারিব না কি ? কালক্রমে এই প্যানিক শব্দের অর্থের ব্যাপ্তি ঘটিয়া সকল প্রকার অমূলক আতঙ্ক বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। অর্থের এরূপ পরিণতি ভাষাতত্ত্বে একটা মোটা কথা।

এইবারে কথাটা ভাল করিয়া দেখা যাউক। গ্রীসদেশে পাণাতঙ্ক যখন ঘটিয়াছিল, তখন তথায় যে পাণ খাওয়ার প্রথার পূর্ববিধি প্রচলন ছিল—ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। Pantheon, pancratium, Panathenaic প্রভৃতি গ্রীক শব্দেও এ-কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, পাণ (গ্রীক উচ্চারণ প্যান) একটা উপসর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শরীর-বিজ্ঞানের Pancreatic juice-এরও এই পাণ হইতে উদ্ভব ; এই কারণেই পাকস্থলীতে ভুক্তদ্রব্য সহজে জীর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে আহারান্তে পাণ চিবানোর ব্যবস্থা, ইহাতে Pancreatic juice অর্থাৎ পাণদ্বারা সৃষ্ট

রস বহুল পরিমাণে নিঃসৃত হয়।

কেহ কেহ বলিবেন, গ্রীকদিগের মধ্যে Pan নামক এক অরণ্যচারী দেবযোনি ছিলেন, তাঁহারই নাম হইতে panic শব্দ নিষ্পন্ন। ইহাকেই বলে, পুঁথিগত বিদ্যা! এই জন্যই 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' একটা প্রবাদ আছে। এই পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতগণ জানেন না যে, উক্ত Pan দেব আদিতে পাণের অধিষ্ঠাতা দেব, এবং তাঁহার নিবাসারণ্য ব্যাঘ্রতরক্ষুসঙ্কুল কন্টকারণ্য নহে, পাণের বরজ। কল্পনাকুশল সৌন্দর্যপ্রিয় কবিত্বপ্রবণ গ্রীক জাতি প্রকৃতির প্রতি বৃক্ষে, প্রতি লতায়, প্রতি পুষ্পে দেবতার সঞ্চার দেখিতেন, তাঁহারা কবিত্বরসাভিষিক্ত প্রেমিকপ্রেমিকার বসালাপের নিত্য-সহচর পানের বেলায় সে-ভাবটি বিস্মৃত হইয়াছিলেন ইহা কি সম্ভবপর? ক্রমে গ্রীক জাতির মন বিস্তারলাভ করিলে প্যাণ (রোমীয় ফণস্) এই পাণপাত্র হইতে সমস্ত উদ্ভিদ্-প্রকৃতির দেবতা হইয়া পড়িলেন। পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতগণ শুধু প্যাণ অরণ্যের দেবতা; এই শেষ কথাটাই জানেন। *

এতক্ষণে সপ্রমাণ হইল, পাণ 'কোথায় ছিল'; এক্ষণে ভারতবর্ষে 'কে আনিল এ মধুর পাণ' ইহার বিচার করিতে হইবে।

সকলেই জানেন, পুরাকালে ফিনীশীয় জাতিব বাণিজ্যের বিলক্ষণ প্রসার ছিল। এই বণিগবৃত্তি জাতির নাম হইতেই সংস্কৃত বণিক্ (বণিজ্) আপণ, বিপণি, পণ, পণ্য প্রভৃতি বাণিজ্যব্যবসায়ের শব্দগুলির উদ্ভব। সংস্কৃতে এরূপ বিদেশজাত শব্দের অভাব নাই, ইহা বৈয়াকরণেরা স্বীকার করেন। উচ্চারণ-বৈষম্যে ফিনীক বণিক হইয়াছে। এই ফিনীশীয় জাতির নিকট হইতে গ্রীস ও ভারতবর্ষ বর্ণমালা সংখ্যালিখনপ্রণালী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছে, বড়-বড় পণ্ডিতেরা ইহা বলিয়া গিয়াছেন। গ্রীস ও ভারতবর্ষ উভয় দেশের সঙ্গেই এই জাতির বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল। তাহা হইলেই দাঁড়াইতেছে, এই জাতি গ্রীস হইতে ভারতবর্ষে পাণের প্রথম আমদানী করেন। গ্রীসে পাণাতঙ্ক (Panic) আরম্ভ হওয়াতে অন্য দেশে পাণ চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা।

বেদে এই জাতি পণি নামে উল্লিখিত। আর্যেরা অল্পস্বর ভালবাসিতেন, সেইজন্য ফিনীশ্যান বা পিউনিক (punic) পণি হইয়াছে। এই পণি হইতেই পাণ। পরে যখন পৌরাণিক কালে বৈদিক কালের আচাররীতি সকলে ভুলিয়া গেল, তখন প্রকৃত ব্যুৎপত্তির স্মৃতিলোপ হইয়া পর্ণ হইতে পাণ, এই নূতন ব্যুৎপত্তি দাঁড়াইল। অর্থাৎ খাঁটি বিদেশী শব্দ পাণকে সংস্কৃত করিয়া পর্ণ শব্দের উদ্ভাবনা করা হইল (এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের গবেষণাত্মক প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।) 'পুত্র' 'অসুর' প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তির বেলায়ও এইরূপ ঘটিয়াছে। বিদেশ হইতে আনীত বলিয়া কপি-শালগমের ন্যায় পাণও অদ্যাপি অনেক শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচর্যব্রতধারিণী বিধবা ব্যবহার করেন না। কিছুকাল বিদেশ হইতে আমদানী হওয়ার পর উদ্যমশীল ব্যবসায়িগণ এদেশেই ইহার চাষ আরম্ভ করিলেন। অবশ্য প্রথম-প্রথম বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল গঙ্গাতীরবর্তী স্থানে ইহার চাষ হয়, সেইজন্য আজও নৈহাটী অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পাণ জন্মে।

পাণব্যবসায়ীদিগকে বারুই বলে। অনুমান হয়, স্মরণাতীতকালে এক সম্প্রদায় লোক গ্রীস দেশের Pherae নামক স্থান হইতে আসিয়া পাণের ব্যবসায়সূত্রে ভারতবর্ষে চাষ আবাদ করে ও ক্রমে এদেশের বাসিন্দা হইয়া পড়ে। আজকাল ঠিক এইভাবেই অনেক হিন্দু ব্যবসায়ী আফ্রিকা ও আমেরিকায় বসবাস করিতেছে। স্বদেশের নামে এই জাতি 'বারুই' ও ইহাদের আবাদ 'বরজ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজের স্বভাবসিদ্ধ সঙ্কীর্ণতার দোষে এই বিদেশ হইতে আগত জাতি, শাকলদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, হিন্দু সমাজের সঙ্গে ভালরূপে মিশিতে পারে নাই।

পাণের আর এক নাম তাম্বুল, পাণব্যবসায়ী আর এক সম্প্রদায়ের নাম তাম্বুলী বা তামুলী। তাম্বুল (Stamboul) ইস্তাম্বুল হইতে আসিয়াছিল বলিয়া ইহার নামকরণ হয়, অথবা প্রাচীন তাম্রলিপ্তি বর্তমান তমলুকে ইহার প্রথম আবাদ হয়, অথবা দাক্ষিণাত্যের তামিল জাতির সঙ্গে ইহার কোনও সংস্রব আছে। এই জটিল প্রশ্ন সম্বন্ধে (সময়াভাবে) কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। অনুমান হয়, প্রথমটিই সত্য, কেননা ইস্তাম্বুলবাসীরা চিরদিনই শৌখিন।

এই অনুমান সত্য হইলে বাজারে যাহা ছাঁচি পাণ বলিয়া বিক্রীত হয় তাহাই বোধ হয় ইস্তাম্বুলের আমদানী। মুসলমান ভ্রাতারা কথাটা সমঝাইবেন। একই জিনিসের একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কালে আমদানী হওয়া মানবেতিহাসে বিচিত্র ঘটনা নহে। ইংলণ্ডে

তথা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয়ধর্মের আমদানী, ইংরাজী ভাষায় ল্যাটিন শব্দের আমদানী ইত্যাদি ঐতিহাসিক উদাহরণের অভাব নাই।

আপাতত ভাষাতত্ত্ববিচারের একটু প্রয়োজন আছে। 'পাণ' শব্দের বানান লইয়া কিঞ্চিৎ গোলযোগের সম্ভাবনা। কেহ কেহ এ-শব্দটিতে দন্ত্য 'ন' চালাইতে চাহেন। তাঁহারা বোধ হয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যেহেতু জল খাইলেই পান খাইতে হয়, অতএব 'পান' শব্দের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা তাম্বুল অর্থ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি, বেদের 'পণি' শব্দ হইতে 'পাণ' শব্দ সিদ্ধ। অতএব মূর্ধন্য 'ণ' এ স্থলে অপরিহার্য। বৈদিক ভাষা ছাড়িয়া দিলেও লৌকিক ব্যাকরণের মতেও 'পর্ণ' শব্দের অপভ্রংশ পাণ, যেমন চূর্ণ=চূণ, স্বর্ণ=সোণা, কর্ণ=কাণ, বর্ণন=বাণান। [পাণ সকল পর্ণ বা পাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং ইহা একাই নামটি দখল করিয়া লইয়াছে। যেমন সম্বন্ধের মধ্যে যাঁহার সহিত সকলের অপেক্ষা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, তিনি সম্বন্ধী par excellence হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। রঘুবংশের সিংহ এইজন্য 'সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং' বলিয়া শ্রেষ্ঠ প্রণয়ের দোহাই দিয়াছেন ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্।]

অতএব দেখা গেল এ-হিসাবেও মূর্ধন্য 'ণ' সঙ্গতপ্রয়োগ। তবে হয়ত, কেহ ব্যাকরণের সূত্র তুলিয়া তর্ক করিবেন যে, অপভ্রংশে যখন রেফের অভাব ঘটিয়াছে তখন ণত্ববিধানের আর অবসর নাই। কারণ 'নিমিত্তস্যাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাপ্যপায়ো ভবতি।' কিন্তু ইহা বিজ্ঞানসম্মত কথা নহে। পূর্বে যেস্থান দ্বীপ ছিল তাহার দ্বীপত্ব লোপ পাইলেও দ্বীপনামের লোপ হয় না—যথা নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ। তালগাছের ধ্বংসাভাব ঘটিলেও তালপুকুর তালপুকুরই থাকে। মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান বলে, কোনও অঙ্গের অভাব হইলেও সে-অঙ্গের অনুভূতির অভাব ঘটে না। "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা" বৈজ্ঞানিক সত্য। মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থে পড়িয়াছি, একজন সৈনিকের পায়ের বুড়া আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ঐ অঙ্গে কণ্ডূয়নপ্রবৃত্তি মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ সজাগ হইত। জীবিত ভাষারও জীবিত দেহের ন্যায় স্নায়ুমণ্ডলী আছে, অঙ্গচ্ছেদ হইলেও স্নায়ুর কার্য চলিতে থাকে। অতএব, রেফের অভাব হইলেই যে শব্দের ণত্ব লোপ পাইবে ইহা সঙ্গত যুক্তি নহে। বরং এরূপ বর্ণবিন্যাসে ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের সহায়তা করে। 'পান' ও 'পাণ' উভয়ের প্রভেদের জন্যও ইহার প্রয়োজন।

এক্ষণে ব্যাকরণের কচকচি ছাড়িয়া এই দেশব্যাপী আতঙ্কের নিদান-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। পাণে কিরূপে ও কেন পোকা ধরিল ? কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরার কথা জানা আছে। 'কদু কুমড়ো ছেড়ে আল্লা সরষির মধ্যি তেল', মানিকপীরের গানে একথাও শুনিয়াছি। কিন্তু এ যে তাহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর। 'বৈদ্যবাটী' অর্থাৎ কুমড়া মূলা বেগুনে পোকা হইলে ত কোন ক্ষতি ছিল না, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে মটন আনিয়া খাইলেই চলিত। বাল্যকালে একবার মাছে পোকা হইয়াছিল অল্প অল্প মনে পড়ে ; কিন্তু সে-সময় কেহ বা চতুর্মাস্য করিয়াছিলেন, কেহ বা অতি সুবিবেচনার সহিত মৎস্য ত্যাগ করিয়া অনুকল্পে মাংসভোজন করিয়া 'কথমপি পরিত্যাগদুঃখং বিষেহে।' রংপুর অঞ্চলে পাকা আমে পোকা দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, কেননা সে-দেশে অজস্র কাঁঠাল মেলে। কিন্তু পাণে পোকা, এ যে অসহ্য অকথ্য অবাঙ্মনসগোচর ! যাক্ বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব-নির্ণয়-ক্ষেত্রে মিছামিছি প্রলাপবাক্যপ্রয়োগে কোনও ফল নাই।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক বলেন, হেলির ধূমকেতু যখন পৃথিবীর সহিত সঙ্ঘর্ষে আসে তখন অজস্র উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সেই উল্কাপিণ্ডের ধ্বংসাবশেষ তাঁহারা বহু অনুসন্ধানেও জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে কোথাও পান নাই। এমন কি সম্ভব নহে যে, ঐ উল্কাসমূহের সূক্ষ্ম অণুগুলি পাণের বরজে পতিত হইয়াছিল এবং ভাদ্র মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে ডিম্বাকৃতি অণুগুলি ফুটিয়া কীট আকারে দেখা দিয়াছে ? একজন সংবাদপত্রের পত্রপ্রেরক নীল পীত হরিদ্রা প্রভৃতি নানানবর্ণী পোকা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। 'ইন্দ্রধনু চূর্ণ হয়ে' এরূপ বর্ণবৈচিত্র্য ঘটিয়াছে কিনা কে জানে ? যাঁহারা আকাশতত্ত্বে অভিজ্ঞ তাঁহারা এই সকল (hypothesis) অনুমানের সত্যতা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে এরূপও হইতে পারে যে, ভারতবর্ষের বাহিরে, নীলনদের তীরে বা দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যপ্রদেশে, এমন কোন ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে যাহার দরুন এই

অত্যাহিত। কেননা সম্প্রতি একজন বৈজ্ঞানিক বহু গবেষণায় ও বিস্তর নূতন উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির প্রাকৃতিক কারণ দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যদেশে নিহিত রহিয়াছে। 'অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি ?'

পাণের পোকার নিদাননির্ণয় একটু সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ইহার মধ্যেই রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, পাণে তিনি অণুবীক্ষণযোগেও কোনো পোকা দেখিতে পান নাই :—যদিও অনেকে সাদা চোখেই দেখিতে পাইতেছেন ও বলিতেছেন—"Still it moves"! রায়বাহাদুরের এই অভয়বাণী যদি সত্য হয়, তবে বলি, চুনীবাবুর মুখে ফুল-চন্দন—শ্রীবিষ্ণুঃ—পাণসুপারি পড়ুক। তিনি আতঙ্ক নিগ্রহ করিয়া হিন্দুসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এক্ষণে মুসলমানসমাজ হইতে কোন খয়ের খাঁ হাকিম মুশকিল আসান করিলেই সোনায় সোহাগা হয় অর্থাৎ পাণে চুনখয়ের সমান হয়, বাঙলা মায়ের উভয় সন্তান মায়ের দুই গালের চর্বিত পাণ খাইয়া ধন্য হয়। [শেষ কথাটিতে কেহ স্বরাজের বিভীষিকা দেখিবেন না ত ?]

যাহা হউক, এই হুজুগ বেশীদিন থাকিলে বাঙালীর ধর্মকর্ম, বাঙালীর সামাজিক জীবন, বাঙালীর কাব্যসাহিত্য, সব রসাতলে যাইবে। বাঙালীর উন্নতিবৃক্ষে পোকা ধরিবে। এই হুজুগ চলিলে, বাঙালীর আসরে আর ঘর ঘর তামাক-পাণ ও পরনিন্দার অনুপান চলিবে না, বাঙালী গৃহিণী আর স্বামিবশীকরণের অভিপ্রায়ে পাণের সঙ্গে শিকড় খাওয়াতে পারিবে না, বাঙালী বীর আর পাণের থেকে চূণ খসিলে অন্দরের সমরাঙ্গণে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাইতে পারিবে না, বিবাহের স্ত্রী-আচারে আর হাঁই-আমলা বাঁটিয়া বাঙালী বরের দুই গালে পাণ দিয়া মার্কা মারা চলিবে না, শুভদৃষ্টিকালে আর কনের শরমমাখা ঢলঢলে মুখখানি পাণ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া চলিবে না, বাঙালীর ঘরের কচি মেয়ে আর 'পাণ, পাণ, পাণ কোথাও না যান', বলিয়া সাঁজপূজনী যাচা পাণের ব্রত করিবে না, আর পাণ দিয়া ঠাকুরানীবরণ হইবে না, পানসুপারির অভাবে সত্যনারায়ণের পূজাপাঠ চলিবে না, কবিরাজ মহাশয় আর পাণের সত্ত্বের অনুপান দিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না, ব্রাহ্মণভোজনের রজতখণ্ড দক্ষিণার সঙ্গে আর পাণ দেখা দিবে না, খেম্‌টার আসরে আর পাণ দিয়া খেম্‌টাওয়ালী বরণ হইবে না, চাপরাসী সাহেবের আর 'পাণ খাবার জন্য' সিকি বকশিশ মিলিবে না।

তাহার পর কাব্যসাহিত্যের কথা। কাব্যের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে আপাতত মনে হয় বটে, পাণে পোকা হইয়া ভালই হইল। কবিদের একটা নূতন উপমা জুটিল ; এতদিন সেই মামুলি ব্যবস্থা ছিল :—চন্দ্রে কলঙ্ক, বসন্তবায়ুতে গরল, কুসুমে কণ্টক, যুবতীর মুখে ব্রণ, রমণীহৃদয়ে কপটতা, ইলিশমাছে কাঁটা—এখন হইল পাণে পোকা। অর্থাৎ জগতে কিছুই সর্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু এই নূতন উপমা আপাতমনোরম পরিণামবিষম। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি তাম্বুলরসের অভাবে অচিরে বাঙালীর জীবনে ও বাঙালীর সাহিত্যে কাব্যরসের নিদারুণ অভাব ঘটিবে। সাহিত্য পরিষদের বিজ্ঞানপিপাসু সম্পাদক ও সভ্যগণ একবার এ-সর্বনাশের কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ?

প্রথমেই দেখুন, কলিকাতার রাস্তায়-রাস্তায় যে-ডানাঝরা পরীরা 'মিঠাপাণের খিলির সঙ্গে মিঠা কথা' বেচিত তাহারা দুর্লভদর্শন হইল। হায় ! আর আমরা সেই কাব্যের উপেক্ষিতা তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখার সুলভ সংস্করণগুলিকে দেখিতে পাইব না ; স্ত্রীস্বাধীনতার সেই জ্বলন্তচিত্রগুলি না দেখিতে পাইয়া সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কারে আর আমাদের তাদৃশ নিঃস্বার্থ অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মিবে না ; (aesthetic culture) সৌন্দর্যচর্চার এমন সুগম পন্থা, এমন সুলভ সহায় আর থাকিবে না। হায় ! 'ইংলিশম্যান' তথা 'প্রবাসী' পত্রের প্রচণ্ড আন্দোলনে যে-ফল ফলিল না, সামান্য একটি পোকায় সে বিভ্রাট ঘটাইল।

অথবা মৃদু বস্তু হিংসিতুং
মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।

পাণওয়ালীদের সংহারের জন্য ইংলিশ্‌ম্যানের অশনি ও প্রবাসীর কষাঘাত কাজে লাগিল না,

ক্ষুদ্র একটি কীটে প্রমাদ ঘটাইল। হায়! এ যে ক্লিওপেট্রার অপেক্ষাও সাঙ্ঘাতিক অবস্থা!

শুধু ইহাই নহে। আর দুরন্ত শিশুকে 'ঘুমপাড়ানিয়া মাসিপিসি' 'বাটা ভরা পাণ গাল ভ'রে' খাইবার লোভে ঘুম পাড়াইতে আসিবে না। সুতরাং নবীনা জননীদিগের কাব্যচর্চার তথা প্রণয়চর্চার অবসর হইবে না (খোকা যে ঘুমায় না)। ইংরাজীনবীশ কবি আর বাঙালীর মেয়ের রূপ বর্ণনায় 'তাম্বুলে তামাকুরস রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট' পাঠকের সমক্ষে ধরিয়া আসর জমাইতে পারিবেন না। ভাবুক কবি আর "পাণ কিনলাম চুন কিনলাম ননদভাজে খেলাম। একটি পাণ হারাল দাদাকে ব'লে দিলাম।" ইত্যাকার মেয়েলী ছড়ার কবিত্ববিশ্লেষণ করিতে পারিবেন না। রসিক সমালোচক আর 'বঁধু একটি পাণ খেয়ে যাও' গানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনাইয়া ভক্তহৃদয় পুলকিত করিতে পারিবেন না। ললিত আর তেমন করিয়া লীলাবতীর চিবুক ধরিয়া "লীলাবতী ক'রেছ কি হেরে হাসি পায়। রক্তগঙ্গাতরঙ্গিণী চিবুক তোমার।"—বলিয়া আদর করিবে না। আর আমরা বিলাসভবনে সে-পাণের সঙ্গে প্রাণের বিনিময় দেখিতে পাইব না। নবীন-নবীনার দাম্পত্যলীলায় সে কাড়াকাড়ি ছোড়াছুড়ি, সে মিঠাখিলির Grapeshot, সে পাণের দোনার, সে 'রাধাধরসুধাপান', সে 'দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া' আর দেখিতে পাইব না। অফিসের ফেরতা ঘরে আসিয়া আর তেমন করিয়া পাণের বাটা সামনে লইয়া চুনখয়েরে রঞ্জিতাঙ্গুলি তাম্বুলরসে রঞ্জিতাধরা 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা' কুট্টমাসীনা স্রস্তবসনা মনোহারিণী নারীমূর্তি দেখিতে পাইব না—

(পতন ও মূর্ছা)

"ফোয়ারা"। ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

বোলতা ও মধ্যাহ্ন

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি সন্ধ্যারও নহি, উষারও নহি, আমি মধ্যাহ্নের জীব। বৈশাখের প্রখর রবিকিরণে আমার জন্ম—জন্মাবধি রবিকিরণ পান করিয়া এ-দেহ গঠিত। সারা হিমরজনী অন্ধ জীবনভার বহন করিয়া চাকের মধ্যে জড় হইয়া থাকি, ভীতি-বিহ্বল বিবশ দেহে ক্ষীণপ্রাণ কোনপ্রকারে লাগিয়া থাকে মাত্র, প্রভাতে রবিকিরণ আসিয়া প্রথম আমাকে জাগাইয়া তুলে—আমার দেহে প্রাণ সঞ্চার করে, নয়নে দৃষ্টি দেয়। আমি মধ্যাহ্নের প্রখর তাপে জন্মিয়াছি, তাই রবিকরে আমার এত আনন্দ। রবিরই মত আমার কনকবর্ণ, মধ্যাহ্নের মত আমার সৌন্দর্য তীব্র। সন্ধ্যা ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আসে, উষা ছায়ার হৃদয়ে একটুকু মৃদু তরুণ অরুণ-আভা, মধ্যাহ্নের মত এত আলো কোথায়? এত রূপ কাহার? মধ্যাহ্ন আর আমি, দুই জনেই কেবলমাত্র আলোক, কেবলমাত্র ঔজ্জ্বল্য, ছায়া নাই, অন্ধকার নাই, ম্লান পাণ্ডু মধুরতা নাই। এ-রূপ কেবলই তপ্ত তীব্র দহনজ্যোতি। তাই ত তোমাদের কবিরা মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য কদাচ গাহেন, বোলতাব সৌন্দর্যও গাহেন না। এ-সৌন্দর্যে তাঁহাদের হৃদয় জ্বলিয়া যায়, এ-রূপ মর্মে মর্মে তীক্ষ্ণাগ্র সূচের মত বিঁধিতে থাকে, দারুণ দহনে কবিতা উথলে না। সন্ধ্যা উষা তরল কোমলভাবে হৃদয় প্লাবিত করে, প্রখর জ্বলন নাই, তরঙ্গভঙ্গে মধুর ছন্দে কবিহৃদয় সে সৌন্দর্যে বহিয়া যায়। মধুকাতর হৃদয়ে মৃদু গুঞ্জনে পদ্মিনীর সহিত ভ্রমর মধুরালাপ করে, কবিহৃদয় মধুকাহিনী মুগ্ধ। কিন্তু মধ্যাহ্নের সৌন্দর্যও ন্যূন নহে, ভ্রমরও সৌন্দর্যে বোলতার নিকটে ঘেঁষিতে পারে না। সৌন্দর্যই ত প্রখর। আলোক ঝলসিবে না ত কি ঝলসিবে?

আমি মধ্যাহ্নের—তা কাব্যে স্থান পাই বা না পাই। মধ্যাহ্নকে আমি আপনার অন্তরে অনুভব করি—এমনি আমার মত হৃদয়, এমনি নীরব নৈরাশ্য, নিশিদিন অন্তরে অন্তরে এমনি দারুণ দহন। এই চাকে বসিয়া দেখিতেছি, আমার চাকের সম্মুখে বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তরের প্রান্তদেশ ব্যাপিয়া অনল-মধ্যাহ্ন বহিয়া গিয়াছে—কম্পিত তীব্র লাবণ্যে ধরণী দিশাহারা। এই ত সৌন্দর্য। এমন প্রখর তেজ! এমন সুতীব্র স্নেহ। 'যেখানে দিয়া বাহিয়া যায় সব শুকাইয়া, যেখানে হৃদয় খুলে সব জ্বালাইয়া।' জ্বালা নহিলে ত সৌন্দর্য মৃদু। আমারও সৌন্দর্য তাই এমনি জ্বালাময়—যেখানে বিঁধে তীব্র মদিরার মত প্রতি শিরায় শিরায় জ্বালা ধরাইয়া। তোমরা ত এ-জ্বালা সহিতে পার না, সৌন্দর্য কিরূপে অনুভব করিবে? আমি হুল বিঁধাইয়া আপন অন্তরে মধ্যাহ্নের তীব্রতা উপভোগ করিতেছি।

এক একবার ইচ্ছা হয়, ঐ কবিহৃদয়ে এই হুল ফুটাইয়া সে-তীব্রতা বিঁধিয়া দিই। কিন্তু তোমাদের কবি কি এ-সৌন্দর্য সহিতে পারিবেন?

তোমাদের কাব্যে ত কোথাও দারুণ তীব্রতা অনুভব করা যায় না। কেবলই ঢলঢল কোমলতা, শিথিল মৃদু আলস, মধুর প্রেমে অর্ধনিমীলন। এত মধুরতার মধ্যে তোমরা নিমগ্ন হইয়া থাক কিরূপে? আমি কেমন মধ্যাহ্নের প্রখর হৃদয়ে জ্বালাবিদ্ধ জীবন লইয়া চিরদিন এই রবিকিরণের জ্বলন্ত আনন্দে মগ্ন হইয়া আছি। মধ্যাহ্ন আমাকে জানে, আমি মধ্যাহ্নকে জানি। সন্ধ্যার মত এ কেবলই প্রশান্ত মধুরতা নহে। তাই ত এত সৌন্দর্য উপভোগ করিয়াও একেবারে গলিয়া যাই না, আশা মিটে না। সন্ধ্যায় দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসে, হৃদয় অবসন্ন, একরত্তি জীবনের পরে বৃহৎ সংসার যেন ঝুঁকিয়া পড়ে, সৌন্দর্য তখন কোথায়? অন্ধকার ঘনাইয়া ত সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করে না। তোমাদের কবিরা বোধ করি আধ ঘুমঘোরে স্বপ্নে সন্ধ্যার সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। মধুরতা বৈ তাহা আর কিছুই নয়। মধ্যাহ্ন সুস্পষ্ট এবং সুতীব্র। পূর্ণালোকে স্বপ্ন রচিত হয় না, কোমলতাও তাদৃশ নাই। কোনও-কোনও কবি মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু

সে ছায়ায় দাঁড়াইয়া। এইজন্য মধ্যাহ্নের তরল আলস-ভাবেই তাঁহারা মুগ্ধ। কিন্তু এ-মৃদুতায় আমার মন উঠে না। আমার মত এমনি হুল বিঁধিয়া সে তীব্রতায় জ্বলিয়া-জ্বলিয়া মধ্যাহ্নকে একবার অন্তরে অনুভব না করিলে সকলই ব্যর্থ। তোমরা তীব্র প্রখর জ্বালা উপভোগ করিতে পার না, হুল নাই, মধুরতায় গলিয়া যাও। আমি চিরদিন এই প্রখর জ্বালায় জ্বলিতে থাকি।

এই জ্বালায় মধ্যাহ্নের প্রেম ব্যক্ত হয়। মধ্যাহ্নের প্রেম মর্মবেধী—আমারই মত বিঁধিয়া-বিঁধিয়া। বেধন প্রেমের ধর্ম—জ্বালা প্রেমে অনিবার্য। তোমরা এত করুণহৃদয়, প্রিয়জনের অন্তরে ব্যথা দিয়া সুখ অনুভব কর না ? প্রিয়জনকে ভিন্ন পৃথিবীতে কে কাহাকে ব্যথা দিয়া থাকে ? এইজন্যই এ-দারুণ নিষ্ঠুরতার মধ্যে এমন একটু সুতীব্র কোমলতা, এ-কঠোর জ্বালায় এমন করুণ আনন্দ। প্রেম জ্বালাইয়া জ্বলে এবং এই জ্বলনেই তাহার জীবন। মধ্যাহ্ন মধুর ধার ধারে না, কোমলতায় হৃদয় হরণ করে না, অন্তরের অন্তরতম নিভৃতে দারুণ জ্বালা বিদ্ধ করিয়া কেবলি দহিতে থাকে। গুঞ্জনে ও মধুরতায় যে যথাসর্বস্ব লুটিয়া লইতে চাহে আমি ত তাহার প্রেম বুঝি না। তাই প্রেমে মধ্যাহ্ন আর আমি। মধুরতায় সন্ধ্যা আছে, ঊষা আছে, ভ্রমরও আছে বৈ কি।

ইহাদের প্রেমে কি জ্বালা নাই ? কিন্তু সে-জ্বালা বড়ই মধুর। এত মধুর যে তাহাতে প্রেম জ্বলে না। সন্ধ্যার প্রেমে নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্ত ভাব, ঊষার ত জ্বালা নাই বলিলেই চলে, আর ভ্রমরের মধুতেই পরিতৃপ্তি। ভালবাসিয়া আশ মিটে না শুধু আমার আর মধ্যাহ্নের। যতই বিঁধি ততই বিঁধিতে চাহি—যতই জ্বলি ততই আরও জ্বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ-ভালবাসা ত কেহ অনুভব করে না। মধুবিহ্বল মদির-মোহই এখানে প্রেম বলিয়া চলিয়া যায়। প্রেম যেন নিতান্তই ছায়ায় ছায়ায়, একটুকু আলোক সহে না, উত্তাপ সহে না, কেবলি অতি মৃদু ললিতগলিত কোমলতা কৃষ্ণ অন্ধকার এবং ছায়ালীন অনাতপ মাত্র অবলম্বন।

কৈ আলোকে ত তোমাদের প্রেম ফুটে না। বিধাতা কালোর প্রতি তুমি বুঝি কিছু সদয়। তাই এই মর্ত্য-মানবেরাও দেখি সারাক্ষণ কোকিল, ভ্রমর আর সন্ধ্যা লইয়াই রহিয়াছে। ঐ কৃষ্ণবর্ণের সহিত কোমলতা যেন অবিচ্ছেদ্য। কেবল, গৌরাঙ্গে যে তোমাদের প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয় কি করিয়া, বুঝিতে পারি না ! আর এই পূর্ণিমানিশীথে বিমল জ্যোৎস্নালোকে এত প্রেমের গানই বা উঠে কোথা হইতে ? এ কি বিদ্রূপ ! না ছলনা ! জানি না, জ্যোৎস্নালোক অস্পষ্ট এবং ছায়াময় বলিয়া যদি তাহার মধ্যে প্রেমের রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আমার নিকট প্রেমে তীব্রতার মত আর দারুণ রহস্য নাই।

এই জন্যই মধ্যাহ্নের প্রেম সর্বাপেক্ষা রহস্যময় : দিগন্ত হইতে দিগন্ত তপ্ত স্বর্ণপ্লাবন ! যেমন তীব্রতা তেমনি প্রেম ! প্রেম নহিলে এত সৌন্দর্য টিকিয়া রহিবে কিসে ? কিন্তু কাব্যে ত সৌন্দর্য স্থান পায় না। নাই বা পাইল। আমি তোমাদের অন্তরে এই সৌন্দর্য চিরদিনের তরে বিঁধিয়া দিতে চাহি। বিধি হে, কবিকে যদি আমার মত এমনি হুল দিতে ! মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য হুল বিঁধিয়া অনুভব করিবার—জ্বলিতে হইবে কিনা। মধুরতাই যদি চাও ইহাতে কি নাই ? প্রখর যৌবনে কি আর কোমলতা অনুভব করা যায় না ? কিন্তু তাহা এই তীব্রতার মধ্যেই। হুল ফুটাইয়া যে এই তপ্ত তীব্রতা না অনুভব করিল, মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য তাহার নিকট অসম্পূর্ণ। তবু ছায়ায় দাঁড়াইয়াও হে কবি, মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য তুমি যে গাহিয়াছ, ইহাতেই তোমার কাব্যরস পানে আনন্দ পাই। তাই আরও ইচ্ছা হয়, তোমার ঐ উদার হৃদয়ে হুল বিঁধাইয়া দিই—তুমি আমাকে অনুভব কর, আমি তোমাকে অনুভব করি।

অতৃপ্ত হৃদয়ে কবিকে অনেক কথা বলি—কবিকে নহিলে আর কাহাকে বলিব ?—কিন্তু সহসা এক-একবার মনে হয় যে, তোমাদের কবিও যেন কোথায় কবে মধ্যাহ্নের তীব্রতা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু অনুভব করিলে কি হইবে,—সে কেবল ক্ষণিকের চকিত অনুভব—আমার মত এমন নীরবে সে অনলজ্বালা সহিতে পারেন নাই, জ্বালা ধরিতে না-ধরিতে ছায়ায় গিয়া হৃদয় জুড়াইয়াছেন। তাই প্রখর মধ্যাহ্নের মালিনী নদীতীরে কম্পিত তরুতলে শকুন্তলা। শকুন্তলা ছায়া। বৃক্ষান্তরাল হইতে মুগ্ধ দুষ্মন্ত উঁকি মারিতেছেন। দুষ্মন্ত প্রখরতেজ মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্ন ছায়ার প্রেমে মুগ্ধ। কবি-হৃদয়ও ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে। দুষ্মন্তের প্রখরজ্যোতি কবি নীরবে সহিতে

পারেন না। শকুন্তলায় তাঁহার হৃদয় শান্তি পায়। এই শকুন্তলার হৃদয়ে বসিয়াই তিনি দুষ্মন্তের সৌন্দর্য পান করিতেছেন। শকুন্তলা হইতে দূরে পরিপূর্ণ হৃদয়ে দুষ্মন্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে কে? তবু জগতের প্রাচীন কবি তুমি মধ্যাহ্নকে অনুভব করিয়াছ। শকুন্তলার হৃদয়ে দুষ্মন্তের প্রেম বিঁধিয়া অবধি শকুন্তলা জ্বলিয়াছে। মধ্যাহ্নের প্রেম না জ্বলিয়া ত অনুভব করিবার যো নাই। মধ্যাহ্ন ত চিরদিন জ্বলিয়া সারা।

কিন্তু এই সুন্দর মধ্যাহ্নতীব্রতায় একটা কালো ভ্রমর আসিয়া দেখা দিলে কেন? কবি, তুমি ঐ কালোরূপে বড়ই মুগ্ধ। ভ্রমরকে ছায়ায় রাখিয়া তবু কবিত্বের পরিচয় দিয়াছ বটে—সে ত আর প্রখর মধ্যাহ্ন সহিতে পারিবে না। কিন্তু যে ছায়ামধ্যাহ্নকে চায়, ভ্রমরের গুঞ্জন তাহার ভাল লাগিবে কেন? শকুন্তলা ঐ বাচাল ভ্রমরটার প্রতি বড়ই বিরক্ত—বারবার সখীদিগকে উহাকে তাড়াইয়া দিতে বলিয়াছেন। ভ্রমরের ভাগ্যে অঞ্চলতাড়না? শুধু আমার কপালে নয়? হোক হোক, মানবসমাজে বিচার আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুনিতে পাই, শকুন্তলাও নাকি মনে-মনে ভ্রমরের উপর সদয়। তাই ত মিলন হইতে-না-হইতে শকুন্তলার কপালে দারুণ বিচ্ছেদ। ভ্রমর মধুগুঞ্জনে যত বিঘ্ন ঘটায় বৈ ত নয়। কবি, আমাকে ত ডাকিবে না। ভ্রমর তোমার প্রিয়পাত্র। কিন্তু আমার হুল বিঁধিলে তোমার হৃদয় সৌন্দর্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। এইটুকু সহিতে এত কাতর? আমি যে তোমার হৃদয়ে চিরদিন মধ্যাহ্নকে জ্বালাইয়া রাখিতে পারি। আমার মত তুমিও এমনি জ্বলিবে—এ জ্বলনের অবসান নাই—চিরদিন মগ্ন হইয়া সৌন্দর্য অনুভব কর।

যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবে তখন না হয় ভ্রমরকে ডাকিও। তাহার গুঞ্জনে ঘুমঘোরে সন্ধ্যা আচ্ছন্ন হইয়া আসিবে। ঐ কালোরূপ দিয়া ত মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য অনুভব করিতে পারিবে না। ভ্রমর গুনগুন করিয়া তোমাদেরই মত সন্ধ্যায় সৌন্দর্য গাহেও বটে। গাহিবে না কেন? সন্ধ্যারই মত অন্ধকার রূপ কিনা। আমার ত তাহা নয়। মধ্যাহ্নের মত আমার সৌন্দর্য তীব্র, প্রেম তীব্র, হুল তীব্র। বিধাতা ভ্রমরকে বৃথা হুল দিয়াছ। হুলই যদি দিলে তবে অমন কালোরূপ করিলে কেন? কালোরূপে বড়ই যেন কেমন সুখের ভাব; হুলে এত সুখ সহে না। আর ভ্রমর সৌন্দর্যেরই বা কি ধার ধারে? বিস্তৃতি সৌন্দর্যের ধর্ম। কৃষ্ণ অন্ধকার ত কেবলই গুটাইয়া আসে। কিন্তু এখানে বোধ করি লোকে অন্ধ হইয়া সৌন্দর্য দেখে। তাই অন্ধকারের প্রভাবে আমি আর মধ্যাহ্ন বাদ পড়িয়া যাই। তা হৌক। এ-সৌন্দর্য ত আর অস্বীকার করিবার যো নাই। কাব্যে স্থান দিয়া সূর্যের গৌরব কেহ বৃদ্ধি করিতে পারে? না চোখ বুজিয়া সে-সৌন্দর্য হ্রাস করা যায়?

তোমাদের কাব্যে আমার হুলের জ্বালা না বিঁধিলে আর মধ্যাহ্নকে সুতীব্ররূপে উপভোগ করিতে পারিতেছ না। এখন দূর হইতে কেবল রাখাল বালকের বংশীধ্বনির উদাস কোমলতায় তোমরা মুগ্ধ। বোধ করি, যাহা কিছু বিঁধে তাহাই তোমাদের নিকট কোমল—কেবল আমার এই দারুণ হুলই বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বংশীধ্বনিতে তীব্রতা কতকটা যেন কমিয়া আসে বটে। রাখালেরা ছায়ায় বসিয়া বাজায় কিনা, তোমরাও ছায়ায় বসিয়া শুন। আর তাহারা ছায়ার প্রেম যেমন অনুভব করে মধ্যাহ্নের দারুণ ভালবাসা ত তেমন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তবু কৃষ্ণ যখন বাঁশি বাজাইতেন, রাধিকার হৃদয় কি জ্বলিত না? মধ্যাহ্নে বংশীধ্বনিতে তীব্রতার রন্ধ্রে উদাস নৈরাশ্য ফুঁ দিয়া কোমলতা বাহির করে। এইজন্য এ-কোমলতা ঔদাস্যে, মধুরতায় নহে।

মধুরতা যেমন সন্ধ্যায়! ম্লান মুখে রবি ধীরে অস্ত যায়, চন্দ্র উঠে—তাহাও মধুর। আলোক কোথাও ফুটিতে পারে না। নীল আকাশ, অস্ফুট ছায়া, প্রশান্ত নীরবতা মিলিয়া কেবলি মাধুরী রচনা করে। মাধুরী গার্হস্থ্যে। তাই সন্ধ্যার কেমন সুকুমার গৃহস্থ ভাব। ইহার মধ্যে আমরা যেটুকু ঔদাস্য অনুভব করি তাহা শান্তিপ্রধান। কিন্তু এ-মধুরতা আমার পোষায় না। মধ্যাহ্নে আমি যেন ছুটিয়া জগতের কর্মক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়ি; সন্ধ্যার জগৎ নিতান্ত মধুভাবে হৃদয় প্লাবিত করে। আমি জ্বলিতে চাহি—মধু লইয়া কি করিব? জ্বালা নহিলে সৌন্দর্য আমার নিকট ব্যর্থ।

আর সন্ধ্যাকে ত তেমন করিয়া দেখিতে পাই না। স্বপ্নালোকে সুস্পষ্ট দেখা যায় না। তাই

আজও কেহ সন্ধ্যার রঙ ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না। তোমাদের কাব্যে তাম্রবর্ণের কথাও শুনি, ধূসর বর্ণের উল্লেখও দেখি, কেহ কেহ সন্ধ্যাকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া সারিতে পারিলেও ছাড়েন না। বোধ করি, দূর হইতে যাহার যেরূপ বোধ হইয়াছে আন্দাজে বর্ণনা করিয়া সারিয়াছে। এখন তাই কোনও বর্ণনা অপর বর্ণনার সহিত ঠিক মিল খাইতেছে না। আমি ত স্বল্পালোকে তেমন দেখিতে পাই না, তবে অন্তরে তাহার প্রভাব কতকটা অনুভব করি বটে। আর ঐ আকাশের গায়ে রবির রাঙ্গা আলোটুকু যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ এইরূপ দেখিও। কিন্তু এত অল্প দেখিয়া কি কাব্যে বর্ণনা করা চলে ? তবু কিন্তু তোমাদের কবিদের বর্ণনা মর্ম স্পর্শ করে।

কিন্তু সন্ধ্যা তোমাদের এত প্রিয় কিসে ? বোধ করি, ভ্রমরগুঞ্জনেই সন্ধ্যার প্রতি তোমাদের অনুরাগ। নহিলে সন্ধ্যাকে ত আর কেহ বড় দেখে নাই। ভ্রমর পদ্মিনীর চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গুনগুন করিতে থাকে, তোমরা প্রেম অনুভব কর। কিন্তু পদ্ম ত রবিকিরণ পানে বিহ্বল—ভ্রমরের প্রতি ফিরিয়াও তাকায় না। দূর হইতের তাহা ত আর তোমরা জানিতে পাও না। তবে মধু দেয় কেন ? মধু কি আর সাধ করিয়া দেয় ? কত সাধ্যসাধনা, কত গুঞ্জন, অবসর মত ছোঁ মারিতেও ত্রুটি নাই। আর যে-গুঞ্জনে তোমরা ভুল, ক্ষুদ্রা-পদ্মিনী যে ভুলিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি ? গুণে নয়, ঐ গুঞ্জনেই ভ্রমরের ছলনা।

প্রেমে যাহারা কেবলি সুখ চাহ, ভ্রমরের গুঞ্জন শুন, ভ্রমরের পদানুসরণ কর। তোমাদের নিকটেই ত ভ্রমরের পদমর্যাদা—আদর করিয়া ষটপদ নাম দিয়াছ। জ্বালা সহিতে পার না, কাঁটার ঘায়ে কাতর, ভ্রমরই তোমাদের আদর্শ। গুনগুন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও, ফুলের মধু লুটিয়া প্রেম ব্যক্ত কর, জ্বলিতে ত হইবে না।

কবি, তুমিই কিন্তু ভ্রমরকে বাড়াইয়া দিয়াছ। না জানি কোন্ সন্ধ্যার স্বপনে কোন ফুলবনে কি শুভক্ষণেই তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলে ! সন্ধ্যার অন্ধকারে বোধ করি ঐ কালোরূপ আর ঐ আরও কালো হৃদয় সুস্পষ্ট দেখিতে পাও নাই। ঊষার মৃদু আলোকেও ত তুমি বাহির হও, একবার সে-রূপ ভাল করিয়া দেখিয়া এ-দারুণ ভুল সংশোধন করিয়া লইলে না কেন ? ভ্রমরকে দেখিতে হয় মধ্যাহ্নে—ভ্রমর আর আমি পাশাপাশি। কেবলি স্বপ্নের কাব্য রচনা ! একটুকু মধ্যাহ্নের আলো সহে না, হুলের জ্বালা সহে না ! এ-ছায়ালীন স্বপ্নরাজ্যে আমি স্থান চাহি না। যেদিন তোমার হৃদয়ে এই দারুণ হুল-জ্বালা বিদ্ধ করিতে পারিব, তোমার নশ্বর কাব্যকে অমর করিয়া দিয়া মরিব। সেদিন হইতে তোমার কাব্যে মধ্যাহ্ন জ্বলিতে থাকিবে—সেই জ্বলন্ত মধ্যাহ্নে মগ্ন হইয়া কেবলি জ্বলিয়া রহিব। আপনাকে ভুলিব, জগৎকে ভুলিব, আর তাহার পূর্বেই জগতের হৃদয় হইতে ভ্রমরের স্থান ঘুচাইব। এখন কবি তুমি হৃদয় লইয়া এস—আমি সেখানে এই হুল ফুটাইয়া দি। বোঁ-বোঁ-বোঁ-বোঁ।

"ভারতী ও বালক"। ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।

বিচরণ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের সেখানে আর এ-পাহাড়ের ঋতুপর্যায়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বসন্ত এখানে এসে-যায় শীতের আগেই দিগ্‌বিদিকে ফুলের মেলা বসিয়ে দিয়ে। আমাদের সেখানে যখন ফুলেদের বাসর-জাগবার পালা, এখানে তখন তুষারের বিছানায় ঘুমিয়ে গেছে সব ফুলগুলি। সেখানে বসন্ত দেখা দেয় শীতের আসরে শিউলি ফুল ছড়িয়ে ; এখানে শীত আসে বসন্তের সভায় সাদা চাদর টানতে-টানতে, ফুল মাড়িয়ে।

শীত গলে পড়ছে বর্ষায়, বর্ষা ফুটে উঠছে বসন্তে, বসন্ত খিন্ন হতে হতে শরতের জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে ঝিকমিক করতে-করতে তুষারের শুভ্রতায় গিয়ে শেষ হচ্ছে—এখানের ছন্দটা এইরূপ।

এখানে এসে অবধি হিমালয়কে একবার দেখে নেবার জন্যে উঁকি দিচ্ছি—এখানে-ওখানে, সকালে-সন্ধ্যায়। কিন্তু অচল সে, কুয়াশার ভিতরে কোথায় যে চলে গেছে, সপ্তাহ ধরে তার সন্ধানই পাচ্ছি না।

এ যেন একটা নীহারিকার গর্ভে বাস করছি। দিন এখানে আসছে উত্তাপহীন, অনুজ্জ্বল ; রাত আসছে অঞ্জন শিলার মতো হিম, অন্ধকার।

আমার চারিদিকে সবেমাত্র দশ-বিশ হাত পৃথিবীর গুটিকতক ফুল-পাতা নিয়ে, যেন অগোচরের কোলে এক-টুকরো জগৎ ; আর আমরা যেন এক-ঝাঁক দিশেহারা পাখি এইখানটায় আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের কাছে চারিদিক এখানও অপরিচিত রয়েছে। শিল্পী এখনও যেন তাঁর রঙ-তুলির কাজ শুরু করেন নি—সবেমাত্র কুয়াশার শুভ্রতার গায়ে পার্বত্য দৃশ্যের আমেজ একটু-একটু দেগে রেখেছেন, অসম্পূর্ণ, অপরিস্ফুট।

এই-যে পরিচয়ের পূর্ব মুহূর্তে কুয়াশার যবনিকাটি দুলছে, এপারে-ওপারে বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম ব্যবধান, একে সরিয়ে যেদিন শুভদৃষ্টি হবে, সেদিন অন্তর গিয়ে মিলবে বাহিরে, বাহির এসে লাগবে অন্তরে। এই কথাটিই এক-গোছা সবুজ পাতা আমার জানালার কাচের বাহিরে, কেবলই ঘা দিয়ে-দিয়ে জানাচ্ছে কাচের এপারে ঘরের বন্দী প্রকাণ্ড একটা পতঙ্গকে। অজানার দিক থেকে একটির পর একটি দূত—চঞ্চল একটি নীল পাখি, ছোট একটি মৌমাছি—তরুলতার কানে-কানে, অপরাজিতার ঘোমটা একটু খুলে, এই কথাই জানিয়ে যাচ্ছে। দিনের মধ্যে শতবার।

আজকের সন্ধ্যাটি শীতাতুর কালো হরিণের মতো পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল অন্ধকারের দিকে মুখ করে। কলঙ্ক-ধরা একখানা কাঁসরের মতো গভীর রাত্রিটাকে কালো ডানার ঝাপটায় বাজিয়ে তুলে মস্ত একটা ঝড় আজ মাথার উপরে ক্রমান্বয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, যেন দিশেহারা পাগল পাখি।

রাত্রি শেষে বর্ষা দিগ্‌বধূর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আকাশের নীল চোখে সরু একটি কাজল-রেখার কোণে একটুখানি অরুণ-আভা দেখা যাচ্ছে। আর, যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল দেখছি ধূসরের অচল ঢেউ দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত, আর রঙও নেই, রূপও নেই! এই অবিচিত্রিতার মধ্যে একটি মাত্র পাহাড়ি ফুলের কুঁড়ি, বসন্তের নববধূ সে, আলোব প্রতীক্ষা কবছে। প্রজাপতির পাখার চেয়ে সুকুমার এব পাপড়িগুলি, এত ছোট, এত কচি—একেই ঘিরে আজ প্রভাতের সমস্ত সুর। সুদূর গিরিশিখরে, মেঘলহরীর তীরে, বনের পাখির কণ্ঠে নীহারের যবনিকা ঠেলে বাহিরে ছুটে এসেছে পর্বতের কলভাষী দুরন্ত শিশু এই-যে জলধারা—এর ঝরে পড়ার মধ্যে।

কাঁচা সোনার একটি মাত্র আভা, বসন্ত-বাউরির বুকের পালকের অস্ফুট বাসন্তী আভা, সকালের আকাশ বিকীর্ণ হয়ে গেল। এই আলোর উপরে সর—প্রথম তুষার, আজ সে সোনার পটে যেন কাজলের লেখার মতো কালো হয়ে ফুটে উঠল।

এই কালো বরফের নিষ্কলঙ্ক ললাট! এইখানে বসন্ত-দিনের, তরুণ দিনের, প্রথম আশীর্বাদ পড়েছে; সে একটিমাত্র আলোর করকা। আর তারই আভা তুষারের সহস্র ধারায় হিমালয়ের অন্ধকার আলো করে গড়িয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে ফুল-ফোটার ছন্দটি ধরে।

আমার এ-বাগানখানি পাহাড়কে আঁকড়ে ধরে শূন্যের উপরে ঝুলে রয়েছে। এখানে এক-ঝাড় পাহাড়-মল্লিকা, এক-ঝাঁক পাখি আর আমি। এইখানটিতে তুষারের বাতাস নিয়ত গাছের ফুল, পাখির গান ফুটিয়ে তুলছে। আমার গান নেই। সকাল-সন্ধ্যায় একখানা পাথরের মতো নিশ্চল নির্বাক আমাকে বাতাস আর আলো শুধুই স্পর্শ করে যাচ্ছে।

আমাদের যারা অনেকবার পাহাড়ে এসেছে এবং যারা নূতন আগন্তুক, তাদের দেখি ওঠা-নামা চলা-ফেরার অন্ত নেই। যেখানে ইংরেজি বাদ্য, গোরার নাচ, সেই সকল মেলাতেই এরা ত্রিসন্ধ্যা যোগ দিয়ে ঘুরছে, কেবলই ঘুরছে—হয় ঘোড়ার পিঠে, নয় তো নিজের পায়ে দুই জোড়া চাকা বেঁধে। মাড়োয়ারি রাজার ফরাসি-ধরনের বৈঠকখানার চূড়োয় বাতাসের ধনুকে চড়ানো ঐ লোহার তীরটার মতো, এরা দেখি, শূন্যকে বিঁধে-বিঁধেই কেবলই ঘুরছে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে; ছুটে চলছে না, উড়েও যাচ্ছে না।

আমার চলার গণ্ডীটাও যে খুব বড়ো, তা নয়। একটি পাহাড়ের যে-পিঠে সূর্য উদয় হন আর যে-পিঠে তিনি অস্ত যান, এইটুকুমাত্র প্রদক্ষিণ করে উঁচুনিচু একটা পথ; এই পথ দিয়ে কাঁটা-দেওয়া একটা মস্ত লাঠি নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, পাথর কুড়িয়ে, গাছ সংগ্রহ করে—মাসের মধ্যে ত্রিশ না হোক, উনত্রিশ দিন তো বটেই—এই পথটিতেই সকালেব আলোয়, সন্ধ্যার ছায়ায়, দিবা দ্বিপ্রহরে, রাতের অন্ধকারে। এইখানে পাথরের গায়ে কচি শ্যাওলার নূতন সবুজ, কেলুবনের ফাঁকে নীল আকাশের চাঁদ, একটি নির্ঝরের শীর্ণ ধারা, আর পর্বত ছেড়ে দুর্গম বনের নিবিড় রহস্য; প্রাতঃসন্ধ্যায় ভ্রমরের গুঞ্জন, সায়ংসন্ধ্যায় পাখিদের গানের শেষে অন্ধকারের সেই ঝিমঝিম, যা শুনছি কি বোধ করছি বলা কঠিন।

এই পথের একটা জায়গায় একখানা প্রকাণ্ড সাইন্‌বোর্ড, তাতে লেখা আছে—'সাধারণ সড়ক নয়। অনধিকার প্রবেশে দণ্ডিত হইবে।' পর্বতের কোলে এই 'সাইন'টা আমাকে প্রথম দিন বড়ই ভয় দিয়েছিল। কিন্তু, সন্ধানে জানলেম, যাবা এই কয়েদের ভয় দিয়ে সারা পাহাড় ঘিরে নিতে চেয়েছিল তাদের মেয়াদ অনেকদিনই ফুরিয়েছে। পথটা এখন আর অনন্যসাধারণ নেই। এই সাধারণেও এই পথটার আশা অনেক দিন ছেড়ে দিয়ে এক ধাপ নিচে স্কুলবাড়ির কুয়োখানা প্রভৃতির গা ঘেঁষে আর-একটা ঘুরুনে রাস্তা—সারকুলার রোড—ক্লাব ঘর, ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড ও বাজার পর্যন্ত, জিলাপির পাকের ধরনের রচনা করে নিয়েছে। সুতরাং, এ-রাস্তাটার ভবিষ্যতেও পথ হয়ে ওঠবার কোনো আশা নেই। এ বিপথ হয়েই রয়ে গেল; মানুষের কাজে লেগে পথ হয়ে-ওঠা এর ভাগ্যে আর ঘটল না।

অনেকদিন আনাগোনায় এই বিপথটার একটা মানচিত্র আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে। পাহাড়ের পশ্চিম-গা বেয়ে প্রথমটা সে ঠিক পশ্চিম মুখে সুন্দর বাঁক নিতে-নিতে 'সহস্র-ধারা'র উপত্যকার দিকে কাত হয়ে চলেছে। ঠিক যেখানটি থেকে সূর্যাস্তের নিচে সন্ধ্যার বেগুনি আঁধার চিরে নদী একটি রুপোর তারের মতো দেখা যায়, সেখানটিতে পৌঁছে পথ স্তূপাকার পাথরের উপর হঠাৎ লম্ফ দিয়ে অকস্মাৎ আবার পুবে মোড় নিয়ে পর্বতের একটা উত্তর ঢালু বেয়ে ছুটে নেমেছে। একটু দূরে গিয়েই হঠাৎ পর্বতের পুবের দেয়াল ঘেঁষে আবার পশ্চিমে দৌড়। সেখানে একদল মহিষ চোখ রাঙিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখেই, পাহাড়ের একটা গড়ানে ভাঙন দিয়ে সে দ্রুত নেমে গিয়ে, সোজা আকাশের দিকে উঠেই, সহসা মোড় নিয়ে পর্বতের পূর্বগায়ে দিগন্তজোড়া হিমালয়ের সম্মুখে দেবদারু বনের ছায়ায় এসে লুকিয়ে পড়েছে। এই দিকটাতে সে শৈবাল-কোমল নির্ঝর-শীতল পর্বতের বাঁকে বাঁকে একলাটি খেলা করতে করতে পর্বতের পুব

পিঠে আর একটা গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে টিন-মোড়া দোকান-ঘরে দর্জি কোট সেলাই করছেন ; রাস্তার এক পাশে কাদের এক-গাড়ি জ্বালানি কাঠ খরিদ্দারের অপেক্ষায় পড়ে আছে ; হতভাগা চেহারার দুখানা ভাঙ্গা ডাণ্ডি আড্ডার দাওয়ার বাহিরে চড়ায় বাঁধা পান্‌সির মতো কাত হয়ে পড়েছে। এই পর্যন্তই বিপথের দৌড়। বাকি যেটুকু অতিক্রম করে আমাদের বাসায় উঠে যেতে হয়, সেটা বিপথ না হলেও বিপদ যে তার আর সন্দেহ নেই। মানুষ সেটাকে পর্বতশিখর পর্যন্ত এমন তিন-চারটে বিশ্রী মোচড় দিয়ে টেনে তুলেছে যে, সেখানে কোনও যানও যান না, পা-ও চান না যে চলি।

বিপথের শেষে পথের এই মোড়টা যেন ইস্কুল-মাস্টার, নয় তো ধর্ম-প্রচারক। তার বুলিই হচ্ছে, 'এইবার পথে এসো!' নয় তো সে বলছে, 'বিপথ হইতে পথে আইস।' এই যে রোড—সেইন্ট ভিন্‌সেন্ট বা তপস্বী ভিন্‌সেন্ট মহোদয়ের রাস্তা—এখানে নিরালা একটুও নেই ; মানুষের সকৌতুক তীক্ষ্ণদৃষ্টির চোরকাঁটা এখানে আমার মতো বিপথের পথিকদের জন্য শরশয্যা রচনা করে রেখেছে। পেন্‌শন্‌ভোগী এক কাবুলি আমিরের নূতন বয়ঃপ্রাপ্ত দুই-চারি বংশধর, যাদের মাথায় শিখ-পাগড়ি, গায়ে সাহেবি কোট ও পায়ে যোধপুরি পাজামা ও ডসনের বুট, তারা আজ কদিন ধরে আমার লম্বা চোগা ও গোর্খা টুপিটার উপরে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে এবং দুই বেলা আমার গা ঘেঁষেই বলাবলি করে চলেছে, 'আজব টোপি! আজব চোগা!' আজবের মধ্যে আমার দুটিমাত্র পদার্থ ; দুইটিই তিব্বতীয় এবং শীতের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু আজবের সংগ্রহ এ-গরিবের চেয়ে আমির পুত্র-কয়টির অনেক বেশি ছিল। সুতরাং যুদ্ধে আমারই হার লেখা গেল। এক মেমসাহেব শিলাতলে বসে মসুরি ভ্রমণের নোট নিচ্ছেন। তিনিও দেখলেন, আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই চট্ করে খাতায় কী-এক লাইন টুকে নিলেন। তাঁর সে-নোট ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুই-একজন নিকট বন্ধু ছাড়া আর কারুর হাতে পড়ছে না। যাই হোক, এই রকম সব ছোট-ছোট উৎপাত এড়াতে মানুষের পথে আমি চোগা ছেড়ে একটা প্রকাণ্ড সোলার টুপি ও তদুপযুক্ত চাঁদনির কোট-প্যান্ট পরিধান করে বিচরণ করে বেড়াই। তাতে মানুষেরা আমায় আর তাড়া দিচ্ছে না বটে, কিন্তু মানুষের উল্টো পিঠের জীব যারা, তারা আমাকে তরুশাখার উপর থেকে একটা আয়না দেখিয়ে ইঙ্গিত করতে ছাড়ে না। সুতরাং বলার জ্বালায় আমার চলা দুর্ঘট হয়েছে—কী পথে, কী বিপথে। অথচ ডাক্তার পরামর্শ দিচ্ছেন চলবারই।

পথে যাই কি বিপথে, চলি কি না চলি—এই দো-টানার মধ্যে যখন আমি 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় কোনো রকমে পথ-বিপথ দুইয়েরই মান রেখে দিন যাপন করছি, সেই সময় দেখি, পর্বত একেবারে আপাদমস্তক ফুলের সাজ পরে সহসা বসন্তের বাসর জমিয়ে বসেছেন। 'ফুলন ফলত ভার ভার!' যত পাতা তত ফুল! যেখানে যত ধরা ছিল—পাথরের বুকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়—সূর্যের উদয়-অস্তের যত রঙ, আজ তারা ফুল হয়ে বাহিরে এসেছে। ঋতুরাজের বাঁশির ডাকে পৃথিবীর সমস্ত সবুজ রঙটা দেখছি বিপুল হিল্লোলে মেঘ অতিক্রম করে গিরিশিখর পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। মেঘের বুক থেকে ইন্দ্রধনুর ফোয়ারা সাত রঙের পিচ্‌কারি আকাশে ছিটিয়ে দিচ্ছে। আর সন্ধ্যার কুঙ্কুমে, সকালের হলুদে হিমালয়ের সাদা আর গেরুয়া বসনের দুই পিঠই দুই বেলা রঙের প্লাবনে ডুবিয়ে দিয়ে বইছে উত্তর তীরের বসন্ত বাতাস।

বসন্তের সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচয়ের আনন্দটা আমার পথ-বিপথ দুটোরই ভাবনা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমি আজকাল যখন যে-সাজটা হাতের কাছে পাই সেই বেশেই ঋতুরাজের দরবারে ত্রিসন্ধ্যা হাজিরা দিচ্ছি, একেবারে নির্ভয়ে।

ইনি এই পর্বতের এক নামজাদা মহিলা আর্টিস্ট। আজ কদিন ধরে আমার যাবার আসবার পথ আগলে হিমালয়ের একটা দৃশ্যপট লিখতে বসেছেন। সমস্ত উত্তর দিক জুড়ে তুষারের উপরে সন্ধ্যা মুঠো-মুঠো ইন্দ্রধনুচূর্ণ ছড়িয়ে আলপনা টেনে যাচ্ছেন—মনেই ধরা যায় না, সে এমন বিচিত্র। এক টুকরো সাদা কাগজে এরই নকল নিচ্ছেন আমাদের এই মহিলা আর্টিস্ট।

উপহাসকে সেদিন আর পুরু পাহাড়ি চোগার মধ্যে ঢেকে রাখা গেল না। সে একটা অকাল বাদলের আকার ধরে বাতাসে, কুয়াশায় ও জলের ঝাপ্‌টায় চিত্রকারিণীর রঙ-তুলি-কাগজপত্র উড়িয়ে নিয়ে অবশেষে তাঁর অতি-আবশ্যকীয় রঙ-মেশাবার জলপাত্রটি পর্যন্ত উলটে দিয়ে দুরন্ত

একটা পাহাড়ি ছাগলের পিছনে-পিছনে পলায়ন করলে একেবারে গিরিশৃঙ্গে।

এই দলের এক আর্টিস্টের কতকগুলো ছবি নিয়ে একটা লোক কোন্-একটা পাহাড়ে শিল্প-প্রদর্শনী খুলছে। যিনি কবি, যিনি কর্মী, তিনি ঐ নীল আকাশপটে আলো-অন্ধকারের টান দিয়ে ছবি সৃষ্টি করছেন ; আর আমরা যারা কবিও নই, শিল্পীও নই, ঐ আসল ছবিগুলো দেখে এক-একটা জাল দলিল প্রস্তুত করে নিজেদের নামের মোহরটা খুব বড় করেই তাতে লাগিয়ে দিচ্ছি নির্লজ্জভাবে।

মানুষ যে মানুষই, বিধাতা তো নয় যে তার সৃষ্টিটা বিধাতারই সমান করে তুলতে হবে। মানুষের শিল্প মানুষকে আগাগোড়া স্বীকার করে বিশ-হাত দশ-মুণ্ড অথবা বিধাতার গড়া নরনারী-মূর্তির চেয়ে সুন্দর হয়ে যদি দেখা দেয় দিক্, তার মধ্যে প্রবঞ্চনার পাপ তো ফুটে ওঠে না। কিন্তু, তুষারপর্বত না হয়েও যেটা তুষারের ভ্রম জন্মে দিয়ে যেতে চায়, সেটাকে আমরা কী বলব ? সে যে বিধাতা এবং মানুষ দুয়েরই সৃষ্টির বাহিরে থেকে দু' জনকেই অপমান করতে থাকে।

আমাদের এ-বাগানে ফুল আর ধরছে না। প্রতিবেশী সাহেব-সুবার ছেলেমেয়েরা—তাঁদের আঁচল নেই—খড়ের টুপি ভরে ফুল লুট করে নিয়ে চলেছে। আমাদের গয়লা-মালী, তার অনেক যত্নের এ ফুল। ওই শিশু-পঙ্গপালের বিরুদ্ধে সে আমার কাছে নালিশ জানায় বটে, কিন্তু ফুলের মকদ্দমা তার দিনের-পর-দিন মুলতুবিই থাকে।

সেদিন এই গয়লার একটা কালো বাছুর খাদ্যাখাদ্য বিচার না করেই নিতান্ত ছেলেমানুষি-বশত সাহেবদের বাগানের একটা ফুলগাছ সমূলে নিঃশেষ করে ধরা গেছে। সাহেবের চৌকিদার বাছুরকে থানায় দিতে চলেছে। পথে বেচারা অবোধ জীব মানুষের এই আইনের বিরুদ্ধে বিষম আপত্তি জানাচ্ছে এবং দেখছি, তার বড়-বড় দুটো চোখ চারিদিককে কেবলই প্রশ্ন করছে সকাতরে, কী তার অপরাধ জানতে। গোরু-বাছুরের উপরে চৌকিদারের একটা শ্রদ্ধা অনুমান করেই যেন, সাহেব পুলিসের উপর একখানি জবাবি চিঠি দিয়েছিলেন ; সুতরাং উৎকোচ দিয়ে সে নিরপবাধ জন্তুটিকে খালাস করে দিই, এমন উপায় ছিল না। তখন গয়লাকে তার বাছুরের হয়ে ত্রুটি স্বীকার করে মার্জনা ভিক্ষা করতে পাঠিয়ে দিয়ে ফুলের দুটা মকদ্দমা একই দিনে নিষ্পত্তি করলেন। এমনি করেই নির্বিবাদে পর্বতে পর্বতে ফুল-ফোটার দিন অবসান হল।

যে-পর্বতটাকে ঘিরে চঞ্চল হরিণশিশুর মতো আমার চলার পথটি নৃত্য করে খেলা করে চলেছে, তারই মেরুদণ্ডের ঠিক উপরে সজারুর কাঁটার মতো ঘন দুই সারি দেবদারু। শরতের বাতাস এখান থেকে শব্দের একটা জাল নীল আকাশে দিবারাত্রি নিক্ষেপ করছে। একদিকে হিমালয়, আর একদিকে সহস্র ধারার উপত্যকা—যেখানে সূর্য-উদয় এবং যেখানে সূর্যের অস্তগমন—এ দুই দিকই আমি দেখি এইখানটিতে বসে।

ফুলের রাজত্ব শেষ হয়েছে। আকাশের চোখে রঙের নেশা আর তেমন করে লাগে না। সূর্যের আলোতে ঝরা পাতার কস্ ধরেছে। তুষারের সাদা দিনে দিনে নীল আকাশে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে চাঁদের আলোর সঙ্গে সঙ্গে।

হিমালয়ের দিনগুলিতে বিজয়ার সুর লেগেছে। এই সুর লোহার কসের মতো পাথরের গায়ে, ঘাসের সবুজে, সন্ধ্যার সিঁদুরে মিশিয়ে গিয়ে দিনান্তেরও পরপারে রাত্রির অনেক দূর পর্যন্ত আকাশের গায়ে গেরুয়ার টান দিয়ে দিয়ে বাজছে। দিন যেন আর যায় না ! শরতের চাঁদনি রাতের তীরেও নীলাকাশের বিরহী নীলকণ্ঠ আপনার একটি মাত্র সুরে বেদনার নিশ্বাস টানছে—উঃ উঃ।

আজ আমাদের সে-দেশে নবমীর নিশি প্রভাত হল। এখানে শরতের সাদা মেঘের দুখানা ডানা নীল আকাশে ছড়িয়ে আজকের দিনটি যেন কৈলাসের তুষারে-গড়া একটি শ্বেত-ময়ূরের মতো করে ফিরে-আসার পথ চেয়ে পর্বতের চারিদিকে কেবলই উড়ে বেড়াচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় দেখছি, ঠিক সহস্র ধারার উপত্যকার মুখে—পর্বতের পশ্চিম গায়ে তৃণে-গুল্মে, লতায়-পাতায়, পাথরের গায়ে, পথের ধুলায়, ফুলের মতো, আবীরের মতো, মানিকের আভার মতো একটা আলো জ্বলজ্বল করছে। মনে হচ্ছে, যেন তুষারের হৃদয়-রক্ত গলে এসে হিমালয়ের এই পশ্চিম দুয়ারের

সোপানে আলপনার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এরই উপর দিয়ে দেখছি, সন্ধ্যাতারার মতো একটি বনবিহঙ্গী—আলোয়-গড়া মোনাল পাখি সে—চলে গেল পায়ে-পায়ে গিরিশিখর অতিক্রম করে চাঁদনি রাতের প্রাণের ভিতরে। আজ দেখলেম, তুষারের শিখরে চাঁদ উঠেছে আলোর একটা সুকোমলচ্ছটা আকাশে বিকীর্ণ করে। হিমালয়ের আর সমস্তটা আজ অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। ঘরে এসে দেখছি, এ-পাহাড়ের এক ভিখারি আমার জন্যে তার শরৎকালের উপহারটি রেখে গেছে—এক-গোছা সোনালি কুশ আর কাশ। সুদূর পাহাড়ের কোন্ নিরালা পথের ধারে এরা নত হয়ে পড়েছিল, চলে যেতে কার সোনার আঁচল উড়ে উড়ে এদের স্পর্শ করে কনক-চূর্ণের বিভূতি দিয়ে এদের সাজিয়ে গেছে।

ভেঙে-পড়া দেবদারুর নির্যাসগন্ধ দিকে-দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আজকাল বরফের হাওয়া বইতে আরম্ভ হয়েছে। পথ দিয়ে ক্রমাগত কম্বল-পরা পাহাড়ির দল কাঠের বোঝা, ভালুকের আর বন-বেড়ালের ছাল নিয়ে—গহন বন থেকে মোনাল পাখির সোনার পাখা আর মৌচাকের সোনালি মধু চুরি করে ঘরে ঘরে ফেরি দিচ্ছে। কোনও দিকে কুয়াশার লেশমাত্র নেই ; দিনরাত্রি সমান পরিষ্কার। কেলুগাছের ফলন্ত শাখায় প্রশাখায় গিরমাটির একটা রঙ লেগেছে।

পার্বতী রুক্ষ রক্তবাস আপনার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে কঙ্কালিনী বেশে দেখা দিয়েছেন। অনেক দূরের একটা পাহাড় ; তার গায়ে একটি একটি গাছ দ্বিপ্রহরে চাকা-চাকা কালো দাগ ফেলেছে ; যেন প্রকাণ্ড একখানা বাঘছাল রৌদ্রে বিছানো—এরই উপরে চির-তুষারের ধবল মূর্তি সারাদিন সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটির পর একটি গিরিচূড়া হিমে সাদা করে দিয়ে শীত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছি। পর্বতে পর্বতে মানুষের জ্বালানো দীপমালা থেকে দু-দশটা করে আলোর ফুল্‌কি প্রতিদিনই দেখছি খসে পড়ছে ; আর, নীল আকাশে দীপালি-উৎসব ক্রমেই জমে উঠছে। এখানকার হাট ভাঙবার পালা শুরু হয়েছে ; পুজোর ছুটির যাত্রীরা দলে-দলে ঘোড়াতে ডাণ্ডিতে ক্রমে পর্বত খালি করে দিয়ে নেমে চলেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্তটা দৈন্য এবং অশোভনতা—দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে—তার মুরগির ঝুড়ি, আধ-পোড়া হাঁড়ি, ছিট-মোড়া ময়লা বিছানা, দড়ি-বাঁধা বাক্স, কড়ি-বাঁধা হুঁকা, হলুদের ছোপ-ধরা চিনের বাসন নিয়ে ঘর ছেড়ে আজ রাস্তায় বেরিয়েছে এবং ময়লা জলের একটা নলের মতো পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলেছে।

এই যে-কটা ঋতুর মধ্য দিয়ে শীতের আগে পর্যন্ত এই পাহাড়ে লক্ষ-লক্ষ পাখি এল, বাসা বাঁধলে, সংসার পাতলে, বাস করলে, আবার চলে গেল দূর-দূরান্তরে, আকাশ-পথে দলে-দলে,—কী সুন্দর, কী স্বাধীন এদের গতিবিধি। আর, মানুষ, যে জলে-স্থলে-আকাশে আপনার রাজত্ব বিস্তার করলে, তার যাওয়ায় কী অশোভনতা। সিন্ধবাদের বিকটাকার বুড়োটার মতো সে আপনার সঞ্চিত কাজের বাজের মূল্যবান অথচ মূল্যহীন আসবাবের আবর্জনাকে বয়ে চলেছে দেখছি, বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে। পাখি চলে গেল, সে তার বাসার একটি কুটোও নিয়ে গেল না ; আর মানুষ যেতে চাচ্ছে আস্তাবলের খড়কুটোটা এবং আস্তাকুঁড়ের ভাঙা ঝুড়িটা, এমন কি রাস্তার কাঁকরগুলো পর্যন্ত সংগ্রহ করে মোট বেঁধে নিয়ে।

প্রথমে এসে পর্বতে-পর্বতে পথ হারিয়ে আমি প্রায়ই অন্যের বাগানে অনধিকার প্রবেশ করে লজ্জিত হয়েছি, এখন সে-ভয় গিয়েছে। প্রায় অধিকাংশ বাড়িরই ফাটক বন্ধ এবং পর্বতের গভীর থেকে গভীরতম প্রদেশের পথ একেবারে খোলা হয়ে গেছে। আমি সেখানে অবাধে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছি। চন্দ্র-সূর্যের উদয়াস্তের মধ্যে দিয়ে ছবির পর ছবি, কিন্নরীর ঝাঁকের মতো চিত্র-বিচিত্র আলোর পাখনা মেলে এ-কয়দিন আমার অন্তরে-বাহিরে সকালে-সন্ধ্যায় দিন-রাতে উড়ে-উড়ে বেড়াচ্ছে। এদের ধরতে গিয়ে দেখি, এদের সমস্ত শ্রী লজ্জাবতী লতার মতো আমার আঙুলের পরশে ম্লান হয়ে গেল। শীত এসেছে। হিমের অভিযানের পূর্ব থেকেই গাছগুলো তাদের পাতার অনাবশ্যক বাহুল্য ঝেড়ে-ঝুড়ে আপনাদের সমস্ত শক্তি ভিতরে-ভিতরে সঞ্চয় করে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। বসন্তে ফুলের ভারে এরা নুয়ে পড়েছিল দেখেছি, আর আজ দুদিন পরে বরফের পীড়ন সুদীর্ঘ শীতের দিন-রাত্রিতে বহন করবে এরাই অনায়াসে—ফুলেরই মতো,

পাতারই মতো। পর্বতের সক্ষম সহিষ্ণু সন্তান এরা, পাথরের বুকের ভিতরকার স্নেহ এদের বড় করে তুলেছে ; অটুট এদের প্রাণ !

আর, মানুষ যাদের যত্নে বাড়িয়েছে সেইসব ক্ষীণপ্রাণ গাছদের মালীরা, দেখছি, আজকাল তুষারের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য কাঁচ-মোড়া গরম ঘরে নিয়ে তুলছে, শুকনো ঘাসের রক্ষা কবচ তাদের সর্বাঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে।

এখানকার পাহাড়িগুলো মোটেই পাহাড়ি নয়, তারা আসলে চাষি—যখন খেতের কাজ নেই, ডাণ্ডিতে এসে কাঁধ দেয়। পাহাড়ের পথগুলো চেনে কিন্তু পাহাড়কে চেনে না, বরফকে এরা ভয় করে। পর্বত যেখানে খেতের উপরে নদীর জলে আপনার ছায়া ফেলেছে, সেখান থেকে উঠে এসেছে এরা ; আবার সেইখানেই ফিরে যেতে চায়। আজ কদিন ক্রমাগত এরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, বরফ পড়ল বলে ! কাল আমাদের যেতে হবে ; কালো মেঘের ভ্রূকুটি বিস্তার করে একটা ঝড় দূর পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে আজ আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে। দিনের আলো নিষ্প্রভ, ধূসর আকাশ দুর্বহ হিমের ভারে যেন নুয়ে পড়েছে।

আমি পর্বতের চূড়ায় একলা বন্ধ বাড়ির বাগানে একটা উঠে এসেছি। ঠাণ্ডা দিনটির ভিতর দিয়ে একটানা বরফের হাওয়া মুখে এসে লাগছে। একেবারে ছায়ার মতো ঝাপসা কালো-কালো পাহাড়গুলোর উপরেই আজ তুষারের সাদা ঢেউ যেন এগিয়ে এসে লেগেছে—চোখের সামনেই দাঁড়িয়েছে যেন। এ-বাগানটা যাদের, তারা চলে গেছে ; টিনের ঘরে তালা দিয়ে বাগানের যত ফুলগাছ সব রেখে গেছে। এদের বুড়ো মালী একটা কেলু-গাছের তলায় কতকগুলো চারাগাছের উপর খড়ের ঝাঁপ আড়াল দিচ্ছিল। সে আমাকে তার কাজ ফেলে বাগান দেখাতে লাগল।

কাঁচের ঘরে সাহেবের যত মূল্যবান শৌখিন ফুলের গাছ, জাল দিয়ে ঘেরা ; টেনিস্ খেলার একটা চাতাল, এর উপরে এক-হাত বরফ সেবারে পড়েছিল ; এইটে মেম-সাহেবের চা-পানের মণ্ডপ ; এই রাস্তা দিয়ে সাহেবের ঘোড়া পর্বতের উপরে আসতে পারে ; ওখানে সাহেবের কাছারির তাম্বু পড়ে ; বাড়ির এই দিকটা পুরানো, ঐ দিকটা সাহেব অনেক ব্যয়ে নূতন করে বানিয়েছে। ইত্যাদি।

অনেক দেখিয়ে মালী আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে বললে, 'ঐ যে ভাঙা বাংলাটা ঐটেই যে এ-বাগান প্রথম বানিয়েছিল তার ; ওদিকে আরো অনেকটা বাগান ছিল, বরফে ধ্বসিয়ে দিয়েছে ; আমি ছোটবেলায় সেই বাগান দেখেছি।'

মালী যেদিক দেখালে, সেদিকে তুষারপর্বত পর্যন্ত নির্মল একটি শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এরই ধারটিতে সেই ভাঙা বাংলা ; ভাঙনের গা বেয়ে একটি গোলাপ-লতা ভাঙা ঘরখানার চালের উপর দিয়ে একেবারে তুষার-পর্বতের দিকে ঢলে পড়েছে—ফুলের একটা উৎস ! এর কাঁটায়-কাঁটায় ফুল,—গাঁটে গাঁটে ফুল—পর্বতের শিখরে এ-যেন একটা ফুলের স্বপ্ন। বসন্তের বুলবুল নয়, তুষারের সাদা পাখি একে ডেকেছে শূন্যতার ঐ ওপার থেকে !

"পথে-বিপথে"। ১৩২৫ বঙ্গাব্দ।

লিচুফল

শশিশেখর বসু

পশ্চিমে বলে "যৌবন, জিন্দ্গী, লিচি মেমান হ্যায়",—অর্থাৎ কুটুম্ব এরা, অল্পদিন থাকে। কুন্তী, স্বর্গের পরী, প্যারাডাইজের হাউরী এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের বিলাতে হট-হাউস (যেখানে বারো মাস লিচু ফলতো) এ-কথার অপলাপ করেছে । 'মেমান' যে অল্পদিন থাকেন তার-ই ঠিক কী । মনে আছে গল্প ? উট মানুষের ঘরের কাছে গিয়ে বলল, "নাকটি ঢুকিয়ে রাখব ? বড়ো শীত ।" কুটুম্ব বরেণ্য ভেবে মানুষ রাজি হল । তারপর উট একটা ঠ্যাং ঢোকাল, তারপর আর একটা, তারপর আর একটা, তারপর সর্বশরীর । মানুষ যখন বলল, "আমার ঘর তোমার বৃহৎ বপুতে ভরে গেল ! আমার কষ্ট হবে ভাই," তখন অতিথি বললেন, "কষ্ট হয় তো বেরিয়ে যাও" ।

লিচুকে অল্পকালের কুটুম্ব বা অভ্যাগত ভাবতে সকলেরই মনঃকষ্ট হয় । এত মনোহর ফল ক্ষণিকের অতিথি । তাই ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে কয়েকজন ধনবান বাঙালী মিলে একটা ক্যানিং কম্পানি খুললেন । ১৯০৯-১০ সালে এলাহাবাদ একজিবিসনে 'ক্যান্ড' ফলের মধ্যে এই লিচু শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করল । স্টলে চেয়ার পাতা, তাতে ভদ্রলোকেরা বসে হাঁ করত । টাটকা টিন সামনে খুলে আইস-টং-এ এক একটা বিচিশূন্য লিচু তুলে মুখে ফেলা হত । কোঁক্ করে একটি আওয়াজ হত । এ-সব 'রোজ-সেন্টেড' লিচু ; গোলাপের গন্ধ ভুরভুর করচে ।

ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে প্রিজার্ভড লিচু আইসক্রিমের মতন ঠাণ্ডা । মুখ থেকে আলজিব, সেখান থেকে কণ্ঠনালী, তারপর কলেজাতর,—তারপর 'আপনভোলা' ভাব । লিচুর পর লিচু এই রুট দিয়ে আপনার পাকস্থলীতে পৌঁছাত, পেট ভরে উঠত । ভাবতেন, বা রে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বোসের শহর !—বা-রে বাঙালীর যৌথ ব্যবসায় ! এবার বারো মাস লিচু খাব ।

বিনামূল্যে ভদ্রলোককে পেট ভরে এই বাঞ্ছিত ফল খাওয়ানো ও দেখানো একটা উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞাপন । ছাপা বিজ্ঞাপনগুলো এর কাছে হার মানে । একটা নিগ্রো টুথপাউডারের ব্যবসা করত ; হাতে কৌটাগুলো নিয়ে সাদা ধপধপে দাঁত বের করে চৌরাস্তায় দাঁড়াত । লণ্ডনবাসী তার দাঁত দেখে বুঝত ছাপা হরফের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য বিজ্ঞাপন এটা । সে অনেক টাকা করেছিল ।

কিন্তু এই লিচুর কারবার চলল না । বারো মাস লিচু খাওয়ার পরিকল্পনা অন্যান্য পরিকল্পনার মতন কল্পনায় পরিণত হলো । তা হলেও আমার হিসাবে ৫ সপ্তাহ না খেয়ে চেষ্টা করলে আমরা লিচু সাড়ে তিন মাস খেতে পারি, এপ্রিল ১৫ই থেকে জুলাই ৩১ ।

বাঙালির কারবার ফেল হয়েই থাকে । ভারতচন্দ্র বলেছেন, 'যার কর্ম তারে সাজে অন্যজনে লাঠি বাজে ।' সারকুলার রোডে এক প্রফেসরের সঙ্গে দেখা, হেসে বললেন, শুনেছেন ? সার অমুক আজ হাসিয়েছেন ; একটা মিটিং-এ বললেন, 'আমি ১২টা কম্পানির ডিরেক্টর ।' তার ১১টা তো ফেল-ই মেরেছে ।

ডায়মণ্ডহারবার লাইন থেকে কলকাতায় যা লিচু আসে সেই প্রথম আমদানি । বাংলার নতুন বৎসর আরম্ভের সঙ্গে-সঙ্গে এই 'সরু মাজা' জাতির আবির্ভাব । এপ্রিলের শেষে এর বহুল উদ্ভব । এর ধড়ের শেষে মাংস নেই বললেই হয়,—সামান্য সাদা আবরণ মাত্র । বিচি বড়ো ও শেষটা ঢাকা প্রায় নয় । বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির মতন । খুসবু আছে, রস আছে । খোলা ছাড়ালে এসব দোষ মালুম হবে । শেষটা অতি সরু ।

এই ক্ষীণ-নিতম্ব লিচুর মাথা মোটা বটে, কিন্তু বোঁটা ছাড়ালে দেখবেন, পোকা-ভরা । এ-লিচু কিনে দুঃখ করচেন, 'যেমন বোঁটা দাঁতে ছিঁড়লাম যেন একটা উড়ে গেল ।' শুনে আর একজন

বললেন, 'যেমন বোঁটা দাঁতে ছিঁড়লাম যেন একটা শালিক পাখি উড়ে পালাল।'

মে মাসের মাঝামাঝি কৃষ্ণনগর গিয়ে লিচু খান। দেখবেন, ডায়মণ্ডহারবারের লিচুর চেয়ে এই লাটু-আকৃতি লিচু ঢের ভালো। খোলা অত লাল টকটকে নয় বটে। মে মাসের ২০শে নাগাত দিনাজপুরও যান! লিচু খাবেন ও বলবেন, তোফা ফল। মে শেষে ও পুরা জুন মজঃফরপুর, দ্বারভাঙা বা সীতামারিতে মিথিলার জগৎ-বিখ্যাত লিচু খাবেন। ওয়ারেন হেস্‌টিংস এইখান থেকে নিয়ে ট্রানসপ্ল্যান্ট করেছিল বিলাতে। এই হচ্ছে ভুঁইডোল, লিচু ও সংস্কৃতির এপি-সেনটার। সীতার বাপের বাড়ির নিকটেই জনকপুর।

তারপর ডেরাডুন চলুন। সেখানে জুলাই ভর্ লিচি রহ্‌তা হ্যায়। এমন-কি আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। খুব মোটা 'মাংস'। রস কম। রং রেডিশ-ব্রাউন। 'বাংলা'র কম্পাউণ্ডে লিচুর গাছ, ফলে ঝামরে পড়েছে। 'রাখোয়া' বা ঠিকেদার যে পাহারা দেয়, সেই বিক্রি করে। 'লিচি মিলি?' জিজ্ঞাসা করেন যদি সে বলবে 'কয় মণ চাহি, বাবুজী?' সেকালে ৫০০ লিচু একদিনে কেউ-কেউ হজম করত। একটা আঁটি শেষে কোঁক করে গিলে ফেলত। এতেই সব হজম হয়ে যেত।

শুনতে পাই, এক বাগানের মালিক সে খুব বড়াই করে বলত, 'মের ঘর হ্যায় দালিয়ানওয়ালা দেহরাদন্', বাগানের ফাটকে মানুষ ওজন করত। তাবপরে তাকে 'ছড়দেওয়ালি বালা' বাগান ছেড়ে দিত। সে ঘণ্টাখানেক গাছে চড়ে লিচু খেয়ে বেরিয়ে এসে আবার ওজন হত। যদি আধ সের বাড়ত তবে এক সের লিচুর দাম তাকে দিতে হত। কলকাতায় লিচু কখনও ওজন করে বিক্রি হয় না।'

মিথিলা ও দেহরাদন্ লিচুর বিচি খুব ছোট। খোলা বিচি বাদ দিলে এক সের আধ সেরে দাঁড়ায়। সোনাবপুর লিচু এক সের ছাড়ালে এক পোয়া হয়। এই একপো এক সের ঘন দুধে ছেড়ে দেবেন। ঠাণ্ডা হলে ক্ষীব কমলা বা আতার পায়েসের চেয়ে ভালো চিজ খাবেন।

৭০-৭৫ বছর আগে আমবা মিথিলায় দই-চিঁড়ে ও লিচুর শাঁস তাতে দিয়ে ফলার খেতাম। অতি উপাদেয় উপকরণ। চিঁড়ে ভিজতে তব সইত না, মন্ত্র পড়া হত:

হবি বল মন
চিঁড়ে ভিজতে কতক্ষণ?
চট্‌কে লিচু চিনি কিছু,—
গিল্‌তে কতক্ষণ?

[অন্যান্য ফলেরও ছড়া আছে,

"আম জাম গাছে পাকে
পানিআল্‌লা হাতে পাকে"

আমলকীব মতন এই ফল দু'হাতের চেটোয় ঘুরিযে-ঘুরিয়ে মন্ত্র দ্বারা পাকিয়ে খেতে হয়। দেখতে-দেখতে লাল ও মিষ্টি হয়ে ওঠে। এই পানিআল্‌লা গাছে পাকে না, এটা দ্বারভাঙাতে হয়। একবার হগসাহেবের বাজারে দেখেছিলাম মাত্র।]

দেহরাদন্ লিচু গাছ খুব উঁচু। মিথিলাব গাছে তলা থেকেই কাঁঠালের মতো লিচু ধরে। একটা লোক শুয়ে-শুয়ে লিচু খেতে পারে। ফাটকের দু'দিকে দুটো লিচু গাছ থাকলে মে মাসে বোধহয় যেন দুটা প্রকাণ্ড তুবড়ি রাঙা টুকটুকে আগুনের ফোয়াবা ছাড়ছে।

দেহরাদন্ লিচু উঁচু ডালে ফলে। কৃষ্ণনগরের লিচু গাছে চড়ে খেয়েছি এককালে। কাঠ-পিঁপড়ে ও মৌমাছির খপ্পর বেশ মনে আছে। পশ্চিমে 'রাখোয়া' (চৌকিদার) মুখোস পরে চোখ বাঁচায়।

শুখনো রেলওয়ে কাটিং-এ তীরহুতে এক জাতের ছোট ভালুক বাস করে। তারা লিচুবাগানে গাছে মৌমাছি খায়, মধুসমেত চাক কড়মড় করে চিবায়। 'ডালু লালচিঁউটি জবান সে লপেটকে ভোজন করতা হ্যায়।' কাঠপিঁপড়ে ও মৌমাছির ভয় অনেক কমে যায়। ভালুক লিচু নষ্ট করে

না।

কিন্তু বাঁদর লিচু ধ্বংস করে। মিথিলাব একটা বীর বাঁদব যখন তার পঞ্চাশটা সহধর্মিণীর সহিত বাগানে হানা দেয় তখন বোধ হয়, সাক্ষাৎ ওয়ারেন হেস্‌টিংস সব লিচু সাবাড় করতে এসেছেন।

'মজঃফরপুর' লিচু মিথিলার সকল স্থানে ফলে, নাম হয়েছে 'মজঃফরপুর' ; 'লখনউ খরবুজা' যেমন ইউ-পির সকল জেলায় ফলে, 'বেনাবসী ল্যাংড়া' যেমন এলাহাবাদে সর্বোৎকৃষ্ট, 'বোম্বাই আম' যেমন বিহারেও ফলে।

এক বাগানে খোঁড়া মালিকের ঠ্যাং দেখে 'ল্যাংড়া আম' নাম হয়েছে। মানুষের নাম থেকে অনেক ফল ও শস্যের নামকরণ হয়, যেমন কামিনী ধান, দা(উ)দখানী চাল, সীতাফল, Adam's apple. Li Chi নামে এক চিন্যেম্যান পিকিং-এব উত্তরে বাগান করত। আর পিকিং-এর পশ্চিমে তার বন্ধু Pi Chi আপেল ফলাত তার বাগানে, লালচে হলদে গালভরা ফল। এই 'আপেল' পারসিয়া হয়ে ইউরোপে গেল। নাম হল Pichi (peach) আর Li Chi-র বাগানেব রাঙা (গায়ে wort বা কাঁটাওয়ালা) ফল ভাবতে এল, নাম হল L-i-c-h-i লি চি। বিলাতে অনেক লোক 'লি কি' উচ্চারণ করত বলে একটা 't' লাগানো হলো, বানান হলো, Litchi. [দুই লিচুখোর ওয়ারেন হেস্‌টিংস এবং মেকলে এ-বানান লিখত না ; সুবেন বাঁড়ুয্যের মতন তাবা The Bengalee, the leechee, the Bengalese লিখত।

কেউ বলেন Li Chiব বাপের নাম ছিল Fi Choo, অতএব তার ব্যাটার নাম নিশ্চয়ই Li Choo ছিলো। বাঙালি ঠিক উচ্চারণ করে 'লি-চু' ; দামু ঘোষের ব্যাটা শিশুপাল মানায় না।

বাঙালি মনে করেন 'মজঃফবপুব' লিচু বুঝি বাংলাদেশে হতে পারে না। দমদম রোডে এক কম্পাউন্ডে উৎকৃষ্ট 'মজঃফরপুর' ফলচে। সাইজও প্রায় সমান। বছবে এক কুড়ি আন্দাজ আমার জঠবে যায়।

আব Adam's apple কোথা ফলে জানেন ? খুব বেশি হুকো খেলে বা সিগারেট ফুঁকলে ছোট একটি গলগণ্ডর মতন গলার ওপোর ফলে। রাষ্ট্রভাষায় একে 'ঘেঘা' বলে।

৭০ বছর পূর্বে নর্থ বিহারে লিচু চাব আনায় হাজার বাড়িতে দিয়ে যেত। ঘবে-ঘবে দেওয়ালে গোছা-গোছা টাঙানো থাকত,—হবদম মুখ চলচে। আমরা উলোর ভোজনলোলুপ বাঙাল, কথাব ঢং বদলেছি ; কিন্তু এক ভদ্রলোক পুবানো চাল এখনও বজায় রেখেচেন। লিচুর গল্প হতেই দুঃখ করে বললেন, 'আমরা লিচু তখন গুনে খেতাম না !' দ্বারভাঙা স্টেশনে লিচুর স্পেশেল গুডস ট্রেন ছাড়ত, হাজার ঝুড়ি চালান যাচ্ছে, রাত্রেও বুকিং চলত। 'গুনে' খাবাব দরকাব কী ? 'মজঃফরপুর' লিচু আগে কলকাতায় রেফ্রিজারেটর 'কাবে' চালান আসত। টাটকা দুই একবার খেয়েছিলাম—কী ঠাণ্ডা ! এখন বারুইপুব একটু বড়ো পেলেই 'মজঃফবপুর কা লিচি হ্যায়' বলে বাজারে ঠকায়। আমদানি কমে গেছে। যা আসে হগসাহেবের বাজারেই পাওয়া যায়।

মেকলের লিচুর নামে লাল গড়াত। অন্য লোক লিচু ভালোবাসলে তার তারিফ করত—

"Warren Hasting naturalised in Worcestershire the delicious leechee, the only fruit of Bengal which deserves to be regretted even amidst the plenty of Covent Garden."

ওয়ারেন হেস্‌টিংস লিচুর কদর বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। আর কিছু দিন থাকলে ছোঁড়া সব গাছগুলো উপবে নিয়ে যেত।

কলকাতার ফেরিওয়ালা 'লিচু ফল !' হাঁকে। এটা ভাষাবিদ্‌দের অনুমোদিত নয়। এত ছোট শব্দ লোকে বুঝতে পারবে না বলে 'ফল' যোগ কবে। 'লে লিচি !' পশ্চিমে হাঁকে। অন্তত দুটো শব্দ চাই, তবে সুর তাল বজায় থাকবে।

আম কাঁঠাল লিচু আনারস জাম কোনওটাতেই 'ফল' শব্দ ন্যায্য নয়।

'ফল'যুক্ত ফল গোটাকতক আছে বটে :—পানিফল, মাজুফল, শ্রীফল, আঁশফল, মাকালফল, জায়ফল, সীতাফল, প্রতিফল এবং কর্মফল [যা রোজ ভোগ করি] ; এর আগেরটি গোল-লম্বাটে দেখতে ; রুশ-মার্কিন উভয় উভয়কে উপহার দেবার জন্য ব্যগ্র। হিন্দিতে জায়ফর্ বলে। 'ফর'

হচ্চে গ্রাম্য 'ফ্ল',—'ই কি ফর্ আঁটে ?' এক টুকরা ভেলিগুড় নিয়ে এই কথা বলে ফল মনে করে এক গাঁইওয়া ছুরি দিয়ে খোলা চাঁচতে লাগল, বলছে 'ছোলত্ ছোলত্ ছোলত্,' অর্থাৎ সব ছাড়ানো হল তবু শাঁস পেলাম না। ইংরেজীতে মোটে দুটি ফল আছে যাতে 'ফ্ল' লাগে,—Bread-fruit, Jackfruit.

হাঁ, ঠিক বটে, মনে পড়েছে। কে বলে যে লিচুর সঙ্গে 'ফ্ল' নিয়মবিরুদ্ধ ? পুরোহিতের সংস্কৃত জ্ঞান যদি আমার মতন টনটনে হয় এবং সেই কারণে তাঁকে বাংলায় মন্ত্র পাঠ করতে হয় তা হলে লিচুতে 'ফ্ল' লাগানো যুক্তিসংগত। কিন্তু একটা খাঁটি সংস্কৃত শব্দ শেষে থাকা চাই। কারণ সংস্কৃতের দাপটেই যজমান ঠকানো চলে আসচে চিরকাল।

এক তাঁতি-মায়ের পায়ে গোদ হয়েছিল। সেকালে পুরুতেই মন্ত্র পড়ে চিকিৎসা করত, নাপিত অস্ত্রোপচার করত। বাড়িতে ছিল, তাঁতি, তার বউ ও মা, আর একটা পোষা ছাগল।

পুরুতঠাকুর চার রকম ফল নিয়ে পূজায় বসলেন। সংস্কৃত ভুলে গেছেন বলে বাংলায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে মন্ত্র পড়বেন। সকলকে বললেন, আমার সামনে বস, ছাগলটাকেও আনো। আমি একটি সংস্কৃত শব্দ শিখে এসেছি, সেটি বাংলা মন্ত্রের শেষে দেব ; তিন দিনে গোদারোগ্য :

আম ফলো, জাম ফলো, কাঁটাল ফলো,
লিচু ফলো, তিন মনুষ্য এক ছাগলো ;
তাঁতির মা-এর গোদারোগ্যং করিষ্যামি !

"যুগান্তর সাময়িকী"। ১২ বৈশাখ ১৩৬১।

শিকার প্রসঙ্গ

চারুচন্দ্র দত্ত

শিকার বলতে অনেক জিনিস বোঝায়, ধাঙড়দের ইঁদুর মারা থেকে পাঠানদের দুশমন মারা পর্যন্ত। এমন কি রসিকজনের সুন্দরী সন্ধানও এই ব্যাপারের অন্তর্গত। তবে আমার অধিকার জীবজন্তু অনুধাবন পর্যন্ত। সেই কথাই বলব। মৃগয়া ব্যসনবিশেষ। কথাটা সংস্কৃত ভাষায় লেখা থাকলেও আপ্তবাক্য বলে আমার আত্মীয়-স্বজন গ্রহণ করেন নাই। কারণ, বাড়িতে যে-দোনলা গাদা বন্দুকটা ছিল, সেটা অল্প বয়সেই ছুঁড়তে শিখি। প্রথমবার আওয়াজ করবার সময় চোখ দুটো বুজে এসেছিল, আর বন্দুকের ধাক্কায় উল্টে পড়ে গিয়েছিলাম। হয়ত সকলেরই এই হয়। অর্থাৎ সাধারণ লোকের। একজনের হয় নাই, জানি। বহুকালের কথা, অরবিন্দ একদিন আমার ঠাণার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। সেদিন ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছে, বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। আমরা একটা ছোট রাইফেল নিয়ে বারান্দায় আমোদ করছিলাম। অরবিন্দকে কেউ বললেন, "আসুন ঘোষ সাহেব, আপনিও মারুন।" তিনি প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না, 'কখনও বন্দুক হাতে করি নাই' ইত্যাদি নানা ওজর দেখাচ্ছিলেন। আমরাও নাছোড়বান্দা। শেষে বন্দুক ধরলেন। সামান্য একটু দেখিয়ে দিতে হল কী করে নিশানা করতে হয়। তার পর বারবার লক্ষ্যভেদ করতে লাগলেন। লক্ষ্য কি পাঠককে বলে দিই, দেশলাই কাঠির ছোট্ট মাথাটা। ওরকম লোকের যোগ সিদ্ধ হবে না ত কি তোমার আমার হবে!

আমার প্রথম শিকার এক প্রকাণ্ড কুঁদো শেয়াল। যখন পড়ল তখন কি আনন্দ! আত্মহারা হয়ে মাংসটা রেঁধে খাই নাই, এই আশ্চর্য। একটা সাফাই গেয়ে রাখি। এ-শেয়ালটা মেরেছিলাম মায়ের হুকুমে, অন্দর বাড়িতে বড় উপদ্রব করত। লাটিনে একটি কথা আছে, নরকে নেমে যাওয়ার পথ বড় সুগম। এই শেয়াল থেকেই আমার অধঃপতন শুরু। পরে ঝাঁকে ঝাঁকে যখন নিরীহ পাখি মেরেছি, সে ত আর কর্তৃপক্ষের হুকুমে নয়! তবে কৈফিয়ত দিতে হয়, কেন এ-দুষ্কর্মে লোক প্রবৃত্ত হয়। বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াবার উৎসাহে, বন্দুক মারার আনন্দে, রক্তপাতের নেশায়, আর কতকটা খাদ্য-লোভে। আমি কিন্তু পাখির মাংস যা খেয়েছি, তার চেয়ে গালাগাল খেয়েছি ঢের বেশী। আর সে-গালাগাল খুব জোর দিয়েছেন তাঁরাই, যাঁরা সে-মাংস আমার চেয়েও তৃপ্তিপূর্বক খেয়েছেন। কিন্তু গাল খেয়েও আমি স্বধর্ম ছাড়ি নাই। শুধু তাই নয়। যখন যেখানে সুবিধা পেয়েছি ছেলেপিলেদের বন্দুক ধরতে শিখিয়ে আমার গুরুঋণ পরিশোধ করেছি। শাস্ত্র শিখলেই শেখাতে হয়, এই সনাতন বিধি, তা সে যজুর্বেদই হোক বা ধনুর্বেদই হোক। বিরুদ্ধপক্ষ হয়ত ধনুর্বেদকে চৌর্যশাস্ত্রের দলে ফেলবেন। তা ফেললেই বা, চুরি যদি করতে হয় ত আনাড়ীর মত করা কিছু নয়! মানুষের শত্রু বাঘ ভাল্লুক মারতে যে দোষ নেই, সেপাই হতেও যে দোষ নেই, এ-কথা যোগী ঋষি ছাড়া সবাই কবুল করেন। কিন্তু এই দুই কাজের সিদ্ধির জন্য রীতিমত সাধনার দরকার। কেবল চাঁদমারিতে নিশানা করতে শিখে বাঘ-শত্রু কি মানুষ-শত্রুর সামনে গেলে আত্মঘাতেরই বেশী সম্ভাবনা। আত্মঘাত করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, ত দু'পয়সার সেঁকো খেলে সস্তাও পড়ে, কষ্টও কম। কিন্তু শত্রুনাশ করতে হলে অব্যর্থ লক্ষ্য থাকা চাই, আর শরীরটাও রীতিমত রোদ-জল-সহা হওয়া চাই। বনে পাহাড়ে নদীর চরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করাই এর সোজা উপায়। এই আমার গীতোক্ত অভ্যাসযোগ। এই ঈশোপনিষদের অবিদ্যার উপাসনা, যা নইলে অমৃতাশনের কোন আশা নেই। ছেলে বখানোর কৈফিয়ত যথাসাধ্য দিলাম। একটা কথা বলি, আমার দুচারজন কাক-শালিক-মারা শিষ্য এখন রীতিমত শের আফগান হয়েছেন।

শিকার করলে শুধু শরীর শক্ত হয় তা নয়, নানারকম শিক্ষাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। রক্ত

দেখলে গা ছমছম করা বন্ধ হয়ে যায়। দেশের গরীব চাষী, কাঠুরে প্রভৃতির সঙ্গে ভাল করে চেনাশুনো হয়। এই সমস্ত লোক, যারা আমলামাত্রকেই ভয় করে, ভদ্রলোককে দূরে ঠেলে রাখে, তারা শিকারীদের সঙ্গে এত অসঙ্কোচে মেশে যে, আশ্চর্য! আনাড়ীর মতন নিশানা চুকলে সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দেয়, বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করে না। এই সম্বন্ধে দুই-একটি মজার গল্প বলি। একবার গোবরডাঙার জ্ঞানদাবাবু দুই হাকিম সাহেবকে নিয়ে স্নাইপ (কাদাখোঁচা) মারতে গেছলেন। স্নাইপ খুব জোর ওড়ে, মারা ভয়ানক কঠিন কাজ। সাহেব দুটি নিতান্ত Green, অর্থাৎ কাঁচা শিকারী ছিলেন। তবু, সাহেব ত, খুব কেতা করে দড়াম দড়াম করে টোটা ওড়াতে লাগলেন। চিন্তা নেই, টাকা গৌরী সেনের! প্রায় পনরো মিনিট পরে, যখন পাখি একটাও পড়ল না, জ্ঞানদাবাবুর বুড়ো শিকারী ভয়ানক চটে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবু, এগুলোকে ঘুঘু মারতি নিয়া যান।" সাহেবদের অর্থ-বোধ হল, কারণ বাংলায় Higher standard পরীক্ষা পাস করেছিলেন। মেজিস্ট্রেটকে এ-রকম বলা এক গান্ধীজী বলতে পারেন, আমাদের কর্ম নয়। আমার অদৃষ্টে একবার এই রকম স্তুতিবাদ মিলেছিল। এক প্রকাণ্ড বিলে হাঁস মারতে গেছি। গাদা-গাদা শর কেটে একসঙ্গে বেঁধে ভেলা তৈরি হয়েছিল। তাতেই শিকারী-সরদারকে সঙ্গে নিয়ে বসেছি, আর গ্রামের লোক চারিদিকে ডিঙ্গিতে ঘুরে ফিরে হাঁস ওড়াচ্ছে। তার আগের হপ্তায় একদল সাহেব এসে অজস্র পাখি মেরে নিয়ে গেছলেন, তাই আমার পাখিগুলো খুব উঁচুতে আর ভীষণ বেগে উড়ছিল। আমি আন্দাজ পাচ্ছিলাম না। এক-একবার গুলি যেই ফসকে যায়, শিকারীগুলো কোরাস গেয়ে ওঠে, "রাম রাম বলে চলে-এ-এ গেল।" একে নিজের যথেষ্ট বিরক্তি, তার উপর এই কোরাস গান, মনের অবস্থা কী হচ্ছিল বুঝতেই পাবছেন। হঠাৎ দৈব সদয় হলেন। আন্দাজ পেয়ে গেলাম। পরে পরে গোটা কয়েক হাঁস ফেলার পরে শিকারীদের কৃপা হল, সবদার বলে উঠল, "হ্যাঁ, আজ পাখিগুলো বড়ো বেয়াড়া রকম উড়ছে বটে।" এই আশ্বাস পেয়ে আরও কয়েকটা পাখি ফেলে সে যাত্রা মান বাঁচালাম। আমি তখন ম্যাজিস্ট্রেট, শিকার আমার এলাকাব মধ্যেই হচ্ছিল, তবু এই ব্যাপার!

আর একবার এর চেয়েও বিভ্রাট ঘটেছিল। কারণ, নায়ক স্বয়ং পুলিস সাহেব। সেটা ছিল এক পাহাড়ে দেশ, কিন্তু জঙ্গল পাতলা, কাজেই জানোয়ারও খুব কম। কোনও কোনও জায়গায় দু-চারটে হরিণ মাত্র। নানারকম তোড়জোড় করে শিকার করতে হত। হয়ত একটা সমস্ত পাহাড় হাঁকা করে একটি হরিণ বের হবে। সেটি ফস্কালে সারা সকাল রৌদ্রে হাঁটাই সার। আমি দুই-একবার কপালজোরে একটু কারদানী দেখাতে পেরেছিলাম, তাই আমাকে গাঁয়ের লোকে খাতির করত। একদিন এই পুলিস সাহেবটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, আর পাটিলকে বিশেষ করে বলে দিলাম যে এঁকে একটা হরিণ দেওয়াই চাই। সুতরাং জঙ্গল ভাঙবার সময় সব চেয়ে ভাল জায়গাটায় তাকে বসালে। কিন্তু বেচারার সেদিন নসীব খারাপ। দু-দুবার হরিণ এল একেবারে কাছে, সে আওয়াজও করলে, কিন্তু গুলি লাগল না। এতে সত্যি লজ্জার কিছু নেই! আর একটা হরিণ বের হলে হয়তো ঠিকই পেত। কিন্তু বেলা বারটা পর্যন্ত মানুষে কুকুরে সারা বনটা তোলপাড় করলে, আর কিছুই দেখা গেল না। শ্রান্ত হয়ে এক গাছতলায় সবাই বসে আছি, এমন সময় পাটিল বোধ হয় আশ্বাস দেবার অভিপ্রায়ে বললে, "আসছে বার, সাহেব, তোমার কাছে হরিণ বেঁধে এনে দেব।" সবাই হো হো করে হেসে উঠল। পাটিল আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি, বাবা, অত দূরে কেন বসলে? আমাদের আজ মাংস একটু জুটল না।" সাহেবটি বিমর্ষভাবে বললে, 'I didn't know I was such a rotten shot.'' (এত বড় আনাড়ি আমি, তা জানতাম না।) হয়ত এই পাটিলই গ্রামে কি শহরে হলে পাঁচ মিনিট অন্তর সাহেবের পায়ের ধুলো নিত। কিন্তু এ যে বন, এখানে সবাই সমান! বনের এই শিক্ষাটা আমাদের সকলের হওয়া ভাল নয় কি!

একটা ভালুক শিকারের গল্প বলি। Bad shot, অর্থাৎ বে-আন্দাজি গুলি মারা কতটা লজ্জার কথা, পাঠক তা বুঝবেন। আমার পরিচিত এক সাহেব তাঁর দুই বন্ধু নিয়ে পশ্চিমে সুলেমান পর্বতে ভালুক মারতে গেছলেন। তিনজনেই পাকা শিকারী, কিন্তু সারা সকাল পাহাড়ে-পাহাড়ে মহুয়া ও বাদাম গাছের তলায় ঘুরে একটাও ভালুক দেখতে পেলেন না। তখন কতকটা শ্রান্ত ও

বিরক্ত হয়ে টিফিন বাক্স নিয়ে বসে পড়লেন পাহাড়ের গায়ে এক সরু তাকের উপর। সাহেবদের একটু ক্ষিদে বেশী, রসদের গোলযোগ হলে কাজ পণ্ড হয়ে যায়, এ-কথা সবাই জানেন। আমার সাহেবরা যখন রুটি-মাখন, নানারকম পশুপক্ষীর মাংস ও পানীয়ের বোতল নিয়ে বেশ জমে বসেছেন, খুব গল্প চলেছে, তখন হঠাৎ পাহাড়ের ফাটল থেকে এক বিশাল কালো ভালুক বেরিয়ে এল। যেই বেরোন কি, তিন সাহেবই চক্ষের নিমিষে বন্দুক তুলে দুম দাম দুম করে তার উপর তিন আওয়াজ। ঋক্ষরাজ তাক থেকে গড়িয়ে, একেবারে খাদে পড়ে গেলেন। তখন তিনজনে মহা তর্ক লেগে গেল। এ বলে আমার গুলি লেগেছে, ও বলে আমার গুলি। তিনজনের বন্দুকের ফাঁদল তিন মাপের, সুতরাং জানোয়ার দেখলেই ত বোঝা যাবে, কার গুলি লেগেছে। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনজনেই খাদে নেমে গেলেন! গিয়ে দেখলেন ভালুকটা মরে পড়ে রয়েছে বটে, কিন্তু তার গায়ে কোথাও গুলির দাগ নেই, পুচ্ছাগ্রে মাত্র একটা জখম। তখন তিনজনে আবার তর্ক। এ বলে ও তোমার গুলির দাগ, ও বলে ও তোমার। কেউই সে-চমৎকার লক্ষ্যবেধের জন্য দায়ী হতে চায় না। শেষে মিটমাট হল। স্থির হল তিনজনেই নিশানা চুকেছেন, পড়বার সময়ই কোনও কাঁটাগাছে লেগে ভালুকের ল্যাজের ডগা ছিঁড়ে গেছে।

ইংরাজিতে যাকে sport বলে, তাতে নীচতা বা বীরধর্মের অবমাননা কিছু নেই। সাহেবরা বসা পাখি মারেন না। কেউ মারলে তাকে pot shot (হাঁড়ী ভরাবার জন্য শিকার) বলেন। হাতির উপর থেকে বা মাচানের উপর থেকে বাঘ মারতে শিকারীর বিপদের অন্ত নেই, তাই সেটাও sport বলেই গণ্য। কিন্তু কোথাও-কোথাও রাজোয়াড়াতে কোঠাবাড়ির মধ্যে বসে যে বাঘ মারা হয়, সেটা খুন-খারাবির সামিল। সেই রকম, মোটরে বসে ভীষণ ঝকঝকে আলো ফেলে জানোয়ারের চোখ অন্ধ করে দিয়ে তাকে গুলি মারা, সেও আমার মতে কসাইয়ের কাজ। সত্যি, স্বীকার না করে উপায় নেই যে যথার্থ মরদের মত বাঘ মারা পায়ে হেঁটেই হয়ে থাকে। ইতিহাসের শের আফগান সম্মুখযুদ্ধেই শের মেরেছিলেন। আমাদের একালে যতীন মুখুয্যেও মল্লযুদ্ধে বাঘ মেরে 'বাঘমারা যতীন' নাম পেয়েছিলেন। অবশ্য, বাঘকে ভগবান যেমন নখদন্ত দিয়েছেন তাতে শিকারীর হাতে অস্ত্র থাকায় পরাক্রমের লাঘব হয় না। একবার এক মস্ত জাঁদরেল ইন্দোরের শিবাজীরাও হোলকারের দরবারে উপস্থিত হয়ে শের মারা সম্বন্ধে নানা গল্পগুজব করছিলেন। হোলকার জিজ্ঞেস করলেন, "সাহেব, তুমি কী রকম শের মার?" বেচারা সেনানী জবাব দিলেন যে মাচানই তাঁর মতে প্রশস্ত উপায়। রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তুমি না জাঁদরেল, গাছের উপর থেকে লুকিয়ে বাঘ শিকার কর!" সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ, আপনি তবে কী করে মারেন?" রাজা উত্তর করলেন, "শের কে সাথ শের কী লড়াই। চলিয়ে সুবোকো মেরে সাথ, বাতায়েঙ্গে।" সাহেব গেছলেন কি না, আমি শুনি নাই। এই হোলকার নাকি পাগল ছিলেন। সিংহাসন ছাড়ার পর কিছুদিন মাথেরান পাহাড়ে থাকতেন। একদিন এক পারসী ছোকরা খুব জোর সাহেবী কাপড় পরে মহাকায়দায় তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল। ঘোড়াটা কিন্তু তার খোঁড়াচ্ছিল। হোলকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখে ডাক দিলেন "পারসী, এই পারসী! ইধার আও।" সে বেচারা প্রাণপণ চেষ্টায় তার সোলাটুপীর মর্যাদা রক্ষা করছিল, ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। রাজাও ছাড়বার পাত্র নয়, সেপাই পাঠিয়ে তাকে ঘোড়াসুদ্ধ ধরিয়ে আনালেন। হিন্দিতে হুকুম করলেন, "উতর যাও, ঘোড়ে কা পায়ের দেখো।" দেখা গেল এক পায়ে ঘা, তাই ঘোড়াটা খোঁড়াচ্ছিল। রাজা চটে গেলেন। চার জন লোক সঙ্গে দিয়ে পারসীটিকে বললেন, "ঘোড়ার মুখ ধরে আস্তে আস্তে আস্তাবলে নিয়ে যাও। পথে যদি ঘোড়ায় চড়তে চেষ্টা কর, ত আমার সেপাইরা তোমায় খাদে ফেলে দেবে। আব ফের যদি কোন ঘোড়াকে কষ্ট দাও, ত তোমার ঠ্যাঙ ভেঙে দেব।" পাগল বই কি, নইলে বাঘের জন্য, ঘোড়ার জন্য এত দরদ!

হরিণ শিকারে বড় আনন্দ পাওয়া যায়, যদিও তাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। পাঠক আমাকে হঠাৎ কাপুরুষ বলে বসবেন না যেন। হরিণগুলো যে-রকম নির্মমভাবে ক্ষেতের শস্য ধ্বংস করে, তা দেখলে বুঝবেন যে তাদের মেরে ফেলা অস্ত্রধারীর একটা কর্তব্যের মধ্যে। বরাহ আর হরিণ কৃষকের এত বড় শত্রু বলেই মৃগ-মাংস ক্ষত্রিয়ের প্রশস্ত খাদ্য বলে নির্ধারিত

হয়েছিল। Sport-এর জন্য হরিণ শিকার পায়ে হেঁটেই হয়। দূর থেকে হরিণ নজর করে নিয়ে, আস্তে-আস্তে, কখনও ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে, কখনও বুকে হেঁটে, সন্তর্পণে, বন্দুকের পাল্লার মধ্যে গিয়ে পৌঁছান যে কত আনন্দ তা বর্ণনা করে বোঝান সম্ভব নয়। তার পরে ঠিক জায়গাটিতে গুলি না লাগাতে পারলে হরিণ হস্তগত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নাই, কারণ সে এক ছুটে ক্রোশখানেক বেরিয়ে যাবে। ক্ষেতের শস্য নষ্ট করাতে কিন্তু সেরা হচ্ছে গণ্ডার। একা একটা গণ্ডার এক রাত্তিরের ভেতর বেশ আট-দশখানা ক্ষেত বিধ্বস্ত করে দিতে পারে। তাই উত্তর বঙ্গের হিন্দুরা গণ্ডার মাংসকে অতি পবিত্র মনে করে। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের সময় এই মাংস পেলে শ্রাদ্ধ না কি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়! আগে ঐ দেশে অজস্র গণ্ডার ছিল। ক্রমশ খুব কমে গেছে। শুনলাম সম্প্রতি বাঙলা সরকার নাকি গণ্ডার বাঁচাবার জন্য আইন করেছেন। এই দরদটা সময়ে হলে, আজ অতিকায় megalosaurus ও dinosaurus পথে পথে ঘুরে বেড়াত। বাড়ি বাড়ি টিয়া পাখির বদলে লোকে Pterodactyl পুষত। তারা ত সব গেল, এখন গণ্ডারটা বাঁচলেই পৃথিবীর সৌন্দর্য কায়েম থাকবে। কী দয়ার শরীর মানুষের!

যদি পাঠকেব মনে এ-রকম কোনও কুসংস্কার থাকে যে, জাতিবিশেষের শিকার বিষয়ে একটা জন্মগত অধিকার আছে, তা হলে আমি মিনতি করি যে, সেটা বর্জন করুন। কি লক্ষ্যভেদে কি সাহস পরাক্রমে অমুক দেশের লোকের প্রাক্তন সংস্কার আছে, তা বলা যায় না। সবটাই আবেষ্টনের কথা। মৃগয়া অর্থ-সাপেক্ষ আমোদ। অজস্র টোটা না ওড়ালে সিদ্ধিলাভ হয় না। তবে সিদ্ধি নানারকমের। রাজা-রাজড়াদের শিকারক্যাম্প কতকটা political (মতলবি) ব্যাপার। তাই অতিথি এলে তাঁকে তুষ্ট করার রীতিমত বন্দোবস্ত রাজবাহাদুরদের থাকে। খুব মহামান্য অতিথির খাতিরে মাংসে আফিম মিশিয়ে বনে রেখে দেওয়া হয় এ-রকম নিন্দাবাদও শুনেছি। এটা বাড়াবাড়ি, হয়ত সত্যি কথা নয়। কিন্তু আর এক রকম ব্যবস্থার কথা অনেকেই জানেন। রাজা খুব হুঁশিয়ার দেখে বেছে একজন A. D. C-কে অতিথির হাওদায় বসিয়ে দেন, আর খুব শক্ত তাকীদ দিয়ে রাখেন, "এঁকে আজকের বাঘটা দেওয়াই চাই, বুঝলি? ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে বন্দুক আওয়াজ করবি, আর বলবি যে তার গুলি লাগে নাই।" ফলে অতিথির ব্যাঘ্র হনন নির্বিবাদে সমাধা হয়। আরও যে কত রকম ফন্দী আছে বলা শক্ত। পাঠক হয়ত জানেন আমাদের দেশে দাড়িওলা সিংহ এখন আর নাই। কাঠিয়াবাড়ে গীর জঙ্গলে এক রকম নেড়া সিংহ আছে মাত্র। একবার এক রাজা কোনও মহাপুরুষকে খুশি করবার জন্য লুকিয়ে বারটা দাড়িওয়ালা সিংহ আফ্রিকা থেকে আনিয়ে বনে ছেড়ে দিয়েছিলেন। হয়ত সে-সময় তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল, কিন্তু পরে সব কথাটা জানা-জানি হয়ে যায়। হলেই বা কি! জানেন ত, দুকানকাটা গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে যায়! এ সব কিন্তু sport নয়, sport-এর নামে ধাপ্পাবাজী।

"পুরানো কথা"। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

ভেজাল ও নকল

রাজশেখর বসু

নন্দ গোয়ালা দুধে খুব জল দিচ্ছে। আপত্তি জানালে আকাশ থেকে পড়ে উত্তর দিলে, বলেন কী বাবু, আপনি পুরনো খদ্দের, আপনাকে কি ঠকাতে পারি ? পাপ হবে যে।

বললাম, দেখ নন্দ, দুধে অল্প স্বল্প জল থাকলে আমি কিছুই বলি না, কিন্তু এখন বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তোমার সঙ্গে আমার বহু কালের সম্পর্ক। সত্যি কথা বলে ফেল।

নন্দ লোকটি সজ্জন। মাথা চুলকে বললে, আজ্ঞে সের পিছু মোটে আধ পো জল দিই, পরিষ্কার কলের জল। আমার কাছে তঞ্চকতা পাবেন না।

—নন্দ, আর একটু সত্যি করে বল।

—আজ্ঞে, এক পোর বেশী জল কোনও দিন দিই না, আমার এই গলার কণ্ঠির দিব্যি।

এবারে বোধ হল, নন্দ সত্য কথা বলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা একবারে খাঁটি দুধ কী দরে দিতে পার ?

—আজ্ঞে, টাকায় তিন পো দিতে পারি।

—বরাবর খাঁটি দেবে তো ? হাত সুড়সুড় করবে না ?

—তা কি বলা যায় হুজুর ? মাঝে মাঝে একটু জল না দিলে চলবে কেন, গরিব লোক।

—আচ্ছা, যদি সরকার আইন করে দেয় যে দুধের দাম যত খুশি বাড়াতে পার, কিন্তু জল একদম দিতে পাবে না, দিলে মোটা জরিমানা বা জেল হবে, তা হলে কী করবে ?

—তা হলে তো ভালই হবে বাবু। টাকায় আধ সের বেচব, আমাদের লাভ বাড়বে।

—কিন্তু নামজাদা ডেয়ারির খাঁটি দুধ তো টাকায় এক সের পাওয়া যায়।

অবজ্ঞার হাসি হেসে নন্দ বললে—খাঁটি কোথায়, মোষের দুধে জল মিশিয়ে দেয়।

—আচ্ছা, টাকায় আধ সের হলে তুমি আর জল মেশাবে না তো ?

নন্দ ঘাড় নীচু করে হাসতে লাগল।

—মনের কথা বলে ফেল নন্দ।

—তবে বলি শুনুন বাবু। সুবিধে মতন জল দিতেই হবে, এ হল ব্যবসার দস্তুর। আবার ইনস্পেক্টারকে খাওয়াতে হবে, মাঝে মাঝে জরিমানাও দিতে হবে। ছা-পোষা গরিব মানুষ, এ-সব খরচ যোগাতে হবে তো !

এইবারে ব্যাপারটি বোধগম্য হল। ব্যবসার দস্তুর অনুসারে গোয়ালা সনাতন প্রথায় যথাসম্ভব জল দেবেই। যতই ইনস্পেক্টার থাকুক, শহরের সমস্ত দুধ পরীক্ষা করা অসাধ্য। অবশ্য মাঝে মাঝে ভেজাল ধরা পড়বে, তখন ইন্সপেক্টারকে খুশী করতে হবে, সে বিমুখ হলে জরিমানাও দিতে হবে। অতএব, এইসব সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের জন্যে, আরও জল দিতে হবে। দাম বাড়ালে বা আইন করলে বা অনেক ইনস্পেক্টার রাখলেও সর্বদা নির্জল দুধ মিলবে না। কয়েকজন ভাগ্যবান যাঁরা নিজের চোখের সামনে দুইয়ে নিতে পারেন তাঁদের কথা আলাদা।

শিউরাম পাঁড়ে এক কালে আমার বাড়িতে রাঁধত, এখন স্বাধীন ব্যবসা করে। একদিন একটা টিন এনে বললে, বাবু বড়িয়া ভইসা ঘিউ আনিয়েসি, সস্তা আছে ছে টাকা সের, লিয়ে লিন।

ঘি খুব সাদা, শক্ত, একটু গন্ধও আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ভেজাল কতটা দিয়েছ ?

—বনস্পতি ? আরে রাম রাম।

—দেখ পাঁড়ে, তোমার টিকি আছে, জনেউ আছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে তিলকও আছে। মিথ্যা বলো না, পাপ হবে।

শিউরাম সহাস্যে বললে, গাঁওসে আনিয়েসি, গোয়ালা কী করিয়েছে সে তো মালুম নেহি।

বাকী সে ভালা আদমী, সেরে আধ পোয়ার বেশী মিশাবে না।

—তার পর তুমি কত মিশিয়েছ ?

—সচ্ বাত বলছি বাবু, হামি এক সেরে এক পৌয়া মিশিয়েছি।

—চেহারা আর গন্ধ দেখে মনে হচ্ছে সেরে সাড়ে তিন পোয়ার বেশী ভেজাল আছে। এ-রকম ঘি আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারি, তাতে সওয়া তিন টাকায় এক সের হবে।

—এ ছিয়া ছিয়া ! আপনে ভেজাল ঘিউ বানাবেন ?

—দোষ কী, বেচব না তো। সজ্ঞানে নিজেরাই খাব।

দুধ-ঘি-এর কালবাজার নেই, ভেজাল দিয়েই লাভ করতে হয়। নকল দুধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি, তাই যথাসম্ভব জল মেশানো হয়। ঘি-এর নকল আছে, কিন্তু শিউরাম পাঁড়ের বিদ্যে কম, তার ভেজাল সহজেই বোঝা যায়, স্বাভাবিক ঘিয়ের মতন রং নয়, বেশী জমাট, গন্ধ অতি কম। সেকালে যখন চর্বির ভেজাল চলত, তখন চেহারা আর গন্ধ খাঁটি ভয়সা ঘিয়ের সঙ্গে অনেকটা মিলত। আজকাল ওস্তাদ ঘি-ব্যবসায়ীরা একটু নরম ঘনতেল (hydrogenated oil) কিনে তাতে ঈষৎ হলদে রং এবং রাসায়নিক গন্ধ মিশিয়ে বেচে। ঘি-এর এসেন্স বাজারে খোঁজ করলেই পাওয়া যায়। তার গন্ধ অতি তীব্র, একটু পচা ঘি-এর মতন, এক সেরে কয়েক ফোঁটা দিলেই সাধারণ ক্রেতাকে ঠকানো যায়। সরষের তেলের এসেন্স আরও ভাল, রাই সরষের মতন প্রচণ্ড ঝাঁঝ। চীনাবাদাম, তিল, তিসি—যে-তেল যখন সস্তা, তাতে অতি অল্প এসেন্স দিলেই কাজ চলে। যাদের সাহস বেশী তারা আরও সস্তায় সারে, অপাচ্য প্যারাফিন বা মিনারল অয়েলে অল্প গন্ধ দিয়ে বেচে। সরষের সঙ্গে শেয়ালকাঁটা বীজের মিশ্রণ সম্ভবত ইচ্ছাকৃত নয়।

মাঝে-মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায়, ভেজাল ঘি তেল বেচার জন্য আদালতে অমুক অমুক লোকের জরিমানা হয়েছে। যাদের নাম ছাপা হয়, তারা প্রায় অখ্যাত দোকানদার। বড় কারবারী যারা, কদাচিৎ দণ্ড পেলেও তাদের নাম প্রকাশিত হয় না, রিপোর্টারদের ঠাণ্ডা করতে তারা জানে। যদি সমস্ত দণ্ডিত লোকের নাম সরকারী বিজ্ঞাপনে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করা হয়, তবে বদনাম আর খদ্দার হারাবার ভয়ে ভেজাল-কারবারীরা কতকটা শাসিত হতে পারে। সরকারী কর্তারা যদি এইটুকু ব্যবস্থাও না করতে পারেন, তবে লোকে তাঁদেরও সন্দেহ করবে।

রেশনে যে-বিদেশী ময়দা পাওয়া যায় তা আমাদের চিরপরিচিত ময়দার সঙ্গে মেলে না, লুচি বেলবার সময় রবারের মতন টান হয়। এই স্থিতিস্থাপকতা কি কানাডা-অস্ট্রেলিয়ার ময়দার স্বাভাবিক ধর্ম, না কিছু মিশানোর জন্য ? সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করা কর্তাদের উচিত। আটা কি শুধু গম-যবের মিশ্র থেকে তৈরি হয়, না অন্য শস্যও তাতে থাকে ? রেশনের আটার ভুসির পরিমাণ অত্যধিক। কোথা থেকে তা আসে ? চালের সঙ্গে অনেক সময় এত পাথরকুচি আর ভুসি পাওয়া যায় যে তাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। এই ভেজাল কোথায় দেওয়া হয় তার খবর সরকারী কর্তারা নিশ্চয়ই রাখেন। তাঁরা কি প্রতিকারে অসমর্থ, না ওজন বাড়াবার জন্যই ভেজালে আপত্তি করেন না ? অনেক রেশনের দোকানে ভাল চালের বস্তা আড়ালে থাকে, বাছা বাছা খদ্দেরকে দেওয়া হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও আটার কলে বিস্তর সোপ-স্টোন পাওয়া গিয়েছিল, কয়েক গাড়ি তেঁতুল-বিচিও একবার আটক করা হয়েছিল। এই সব খবর সাড়ম্বরে খবরের কাগজে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তার পরেই চুপ। অনুসন্ধানে ফল প্রকাশ করলে কী ক্ষতি হত ? গুজবের উপর জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস। ছেলেধরা, শিল-নোড়ার বসন্ত রোগ, কেরোসিন তেলে জল, কলের জলে সাপ প্রভৃতি নানারকম গুজবে লোকে ক্ষেপে ওঠে। খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিন্ত করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

নিত্যব্যবহার্য বহু জিনিসের ভেজাল বা নকল দেখা যায়। অসময়ে বাজারে স্তূপাকার সবুজ মটরের দানা বিক্রি হয়। শুকনো মটর সবুজ রঙে ছুবিয়ে বস্তাবন্দী করা হয়। পাইকারেরা সেই রঙিন মটর আড়ত থেকে কেনে এবং দরকার মতন জলে ভিজিয়ে ফুলিয়ে বিক্রি করে। অজ্ঞ লোকে তা কাঁচা মটরশুঁটির দানা মনে করে কেনে। যে-রং দেওয়া হয় তা বিষ কি অবিষ কেউ ভাবে না। মিউনিসিপ্যালিটি উদাসীন, মার্কেটে অধ্যক্ষদের সামনেই এই অপবস্তু বিক্রি হয়।

মিষ্টান্নেও নানারকম রং থাকে, তা নির্দোষ কিনা দেখা হয় না। ময়রাকে যদি বলা হয়—রং দাও কেন ? সে উত্তর দেয়—খদ্দের যে রং না থাকলে কেনে না। কথাটা সত্য নয়। রঙের প্রচলন ময়রার বুদ্ধিতেই হয়েছে। নির্বোধ খদ্দের মনে করে রং থাকাটাই দস্তুর বা ফ্যাসান-সংগত। পাশ্চাত্য দেশে খাদ্যের জন্য বিশেষ-বিশেষ নির্দোষ রঙের বিধান আছে, অন্য রং দিলে দণ্ড হয়। এদেশে যত দিন তেমন ব্যবস্থা না হয় তত দিন খাবারে রং দেওয়া একেবারে বন্ধ করা কর্তব্য। সরকারী আর মিউনিসিপ্যাল কর্তাদের উচিত, বার বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সাধারণকে সতর্ক করা।

চায়ের দোকানে এবং হোটেলে যে-চায়ের ছিবড়ে জমা হয়, তা শুকিয়ে অন্য চায়ের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। এলাচ লবঙ্গ দারচিনি থেকে অল্পাধিক আরক (essential oil) বার করে নেবার পর বাজারে ছাড়া হয়। সবচেয়ে বেশী ভেজাল আর নকল চলছে ঔষধে। কুইনীন, এমেটিন, আড্রেনালিন প্রভৃতির লেবেল দেওয়া জাল ঔষধে বাজারে ছেয়ে গেছে। শিশি-বোতল-ওয়ালারা বিখ্যাত দেশী ও বিলাতী ঔষধ এবং প্রসাধন দ্রব্যের খালি শিশি ও টিন বেশী দাম দিয়ে গৃহস্থের বাড়ি থেকে কেনে, জালকারী তাতেই ছাইভস্ম পুরে বিক্রি করে। অনেক ভদ্র গৃহস্থ জেনে শুনে এই পাপ ব্যবসায়ে সাহায্য করে। পাকিস্তানেও এই কারবার অবাধে চলেছে।

ভেজাল ও নকল এ-দেশে নূতন নয়। দেশী বিক্রেতার সাধুতায় আমাদের এতই অনাস্থা যে, অনেক ক্ষেত্রে খাঁটি জিনিসের জন্য 'সাহেব-বাড়ি'র দ্বারস্থ হতে হয়। এই জাতিগত নীচতায় আমরা গ্লানি বোধ করি না। যুদ্ধের পর এবং স্বাধীনতালাভের সঙ্গে-সঙ্গে দেশে যে মহাকলিযুগের আরম্ভ হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়া বেড়ে গেছে। সম্পূর্ণ প্রতিকার সরকারের সাধ্য নয়। জনসাধারণের অধিকাংশেরই সামাজিক কর্তব্যবোধ কম, একজোট হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার উৎসাহ নেই। সম্প্রতি আমাদের দেশে অনেক বীর পুরুষের উদ্ভব হয়েছে। এরা ট্রাম বাস পোড়ায়, বোমা ফেলে, পুলিসকে মারে, মান্যগণ্য লোককে আক্রমণ করে, শ্রমিক ও স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের খেপায়, কিন্তু ভেজাল, নকল, কালো-বাজার প্রভৃতি দুষ্কর্ম সম্বন্ধে পরম নির্বিকার। শুধু অশান্তির প্রসারই এদের কাম্য।

কোনও অনাচার যখন দেশব্যাপী হয় এবং সাধারণে নির্বিবাদে তা মেনে নেয়, তখন অল্প কয়েকজন সমাজ-হিতৈষীর উদ্‌যোগেই তার প্রতিকার আরম্ভ হতে পারে। সতীদাহ-নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ প্রভৃতি এইপ্রকারে হয়েছে। ভেজাল ও নকল নিবারণের জন্য কয়েকজন নিঃস্বার্থ উৎসাহী লোকের প্রয়োজন। তাঁরা যদি প্রচার দ্বারা সাধারণকে উদ্‌বোধিত করেন এবং বিশুদ্ধ জিনিস বেচবার জন্য সমবায়-ভাণ্ডার খোলেন, তবে, দাম বেশী নিলেও ক্রমশ সাধারণের আনুকূল্য পাবেন। তাঁদের প্রভাবে অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও তাদের দস্তুর বদলাতে বাধ্য হবে।

দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র প্রাণরক্ষার জন্য কুকুরের মাংস খেতে গিয়েছিলেন। আমাদের অভ্যস্ত অন্নের অভাব হলে অনুকল্প খুঁজতেই হবে, নিকৃষ্ট খাদ্যে তুষ্ট হতে হবে। জনসাধারণ অবুঝ, অনভ্যস্ত খাদ্যে সহজে তাদের প্রবৃত্তি হবে না। যাঁরা ধনী ও জ্ঞানী তাঁদের কর্তব্য নূতন বা নিকৃষ্ট খাদ্য নিজে খেয়ে সাধারণকে উৎসাহ দেওয়া। সরকার এইরূপ খাদ্যের উপযোগিতা প্রচার করবেন, কিন্তু অত্যুক্তি আর মিথ্যা উক্তি করবেন না, তাতে বিপরীত ফল হবে। মিথ্যা প্রিয় বাক্যের চাইতে অপ্রিয় সত্য ভাল। কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও খাদ্যবিশারদ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই ঘাস থেকে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হবে। সরকার যদি এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রচারে প্রশ্রয় দেন, তবে সাধারণের শ্রদ্ধা হারাবেন। চাল আটা দুর্লভ হলে লাল-আলু টাপিওকা প্রভৃতির উপযোগিতা প্রচার করতে হবে ; সঙ্গে-সঙ্গে বলতে হবে যে, চাল-আটার সমান পুষ্টিকর না হলেও এইসব খাদ্যে জীবন রক্ষা হয়, স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও বিশেষ কিছু নেই ; খরচ বেশী পড়তে পারে, কিন্তু এই দুঃসময়ে গত্যন্তর নেই।

সম্প্রতি সরকারী খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, কোন এক ল্যাবরেটারিতে ভুট্টা টাপিওকা ইত্যাদি

থেকে সিন্থেটিক চাল তৈরির চেষ্টা সফল হয়েছে। আজকাল অনেক রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে, যেমন নীল (ইণ্ডিগো), কর্পূর, মেন্থল। কিন্তু রাসায়নিক বা অন্যবিধ কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় কোনও শস্য, ফল বা প্রাণী প্রস্তুত করা এখনও বিজ্ঞানের অসাধ্য। আমড়া থেকে আম, অথবা ব্যাং থেকে মাছ তৈরি যেমন অসম্ভব, ভুট্টা-টাপিওকা থেকে চাল তৈরিও সেইরকম। সরকার যে-বস্তুর কথা বলেছেন তাকে সিন্থেটিক রাইস বললে সত্যের অপলাপ হয়, তা ইমিটেশন রাইস বা নকল চাল, যেমন সোনার নকল কেমিক্যাল সোনা। টাপিওকা থেকে যেমন নকল সাগুদানা তৈরি হয়, সম্ভবত সেইরকম পদ্ধতিতে চালের মতন দানা তৈরি হচ্ছে, হয়তো প্রোটিনের মাত্রা সমান করার জন্য কিছু চীনাবাদামের গুঁড়োও মেশানো হয়েছে। দেখতে চালের মতন হলেও হয়তো দরিদ্র লোককে ভোলানো যেতে পারবে, খেলে পেটও ভরবে, কিন্তু এই জিনিসের গুণে চালের সমান হবে না। সরকারী প্রচারে অসতর্ক উক্তি একেবারে বর্জন করতে হবে। সত্যমেব জয়তে—এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদাহানি যেন কদাপি না হয়।

"দেশ"। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

গণেশ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

সর্ববিঘ্নহর ও সর্বসিদ্ধিদাতা বলে যে-দেবতাটি হিন্দুর পূজা-পার্বণে সর্বাগ্রে পূজা পান, তাঁর 'গণেশ' নামেই পরিচয় যে, তিনি 'গণ' অর্থাৎ জনসঙ্ঘের দেবতা। এ-থেকে যেন কেউ অনুমান না করেন যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজের যাঁরা মাথা, তাঁরা জনসঙ্ঘের উপর অশেষ ভক্তিমান ও প্রীতিমান ছিলেন। যেমন আর সব সমাজের মাথা, তেমনি তাঁরাও সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তিকে ভক্তি করতেন না, ভয় করতেন। 'গণেশ' দেবতাটির আদিম পরিকল্পনায় এর বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আদিতে 'গণেশ' ছিলেন কর্মসিদ্ধির দেবতা নয়, কর্মবিঘ্নের দেবতা। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির মতে, এঁর দৃষ্টি পড়লে রাজার ছেলে রাজ্য পায় না, কুমারীর বিয়ে হয় না, বেদজ্ঞ আচার্যত্ব পান না, ছাত্রের বিদ্যা হয় না, বণিক ব্যবসায়ে লাভ করতে পারে না, চাষীর ক্ষেতে ফসল ফলে না। এই জন্যেই 'গণেশে'র অনেক প্রাচীন পাথরের মূর্তিতে দেখা যায় যে, শিল্পী তাঁকে অতি ভয়ানক চেহারা দিয়ে গড়েছে। এবং গণেশের যে-পূজা, তা ছিল এই ভয়ংকর দেবতাটিকে শান্ত রাখবার জন্য ; তিনি কাজকর্মের উপর দৃষ্টি না দেন, সেজন্য ঘুষের ব্যবস্থা। গণ-শক্তির উপর প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কর্তাদের মনোভাব কী ছিল, তা গণেশের নরশরীরের উপরের জানোয়ারের মাথার কল্পনাতেই প্রকাশ।

কিন্তু এ-মনোভাব প্রাচীন হিন্দুর একচেটিয়া নয়। সকল সভ্যতা ও সমাজের কর্তারাই জনসঙ্ঘকে 'লম্বোদর গজানন' বলেই জেনেছেন। ওর হাত-পা মানুষের, কিন্তু ওর কাঁধের উপর যে-মাথাটি তা মানুষের নয়, মনুষ্যেতর জীবের। আর ওর উদর এত প্রকাণ্ড যে, তাকে যথার্থ ভরাতে হলে, যাদের কাঁধের উপর মানুষের মাথা, তাদের সুখ-সুবিধার উপকরণ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং সব দেশের যারা বুদ্ধিমান লোক, তারা, মগজে মানুষের বুদ্ধির পরিবর্তে জানোয়ারের নির্বুদ্ধিতা রয়েছে ভরসায়, ওর বিরাট উদরের যতটা খালি রেখে সারা যায়, সেই চেষ্টা করে এসেছে। সেইজন্য কখনও তাকে অঙ্কুশে ক্লিষ্ট, কখনও-বা খোসামোদে তুষ্ট করতে হয়েছে। কারণ আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত কোনও 'পলিটিশ্যানের পলিটিক্যাল খেলা' এ-দেবতাটির সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয়নি। অথচ সে-সাহায্য পেতে হবে বিশেষ খরচের মধ্যে না গিয়ে। অর্থাৎ গণদেবতাদের পূজায় ভোগের উপকরণের দৈন্য সকলেই মন্ত্রের বহরে পূরণ করেছে ;—'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা,' 'গণবাণীই ভগবদ্বাণী,' 'সুরাজ থেকে স্বরাজ শ্রেষ্ঠ,' 'জননায়ক হচ্ছে জনসেবক,' ইত্যাদি। এবং সকলেই 'লম্বোদর গজেন্দ্রবদনে'র সৌন্দর্য বর্ণনায় শ্লোক রচনা করে তাকে তোষামোদে খুশি করেছে।

যারা গণদেবতাকে খোসামোদে ভুলিয়ে নিজের কাজ হাসিল করতে চায় না, চায় ওই দেবতাটির নিজের হিত—তাদের এ-কথা মেনে নেওয়াই ভালো যে, এ-দেবতার মানুষের শরীরের উপর গজমুণ্ডের কল্পনা একেবারে মিথ্যা কল্পনা নয়। কোন্ শনির কুদৃষ্টিতে এর নরমুণ্ড খসেছে সে-ঝগড়া আজ নিরর্থক। কোন্ দেবতার শুভদৃষ্টি এর মুণ্ডকে মানুষের মাথায় পরিণত করবে, সেইটি জানাই প্রয়োজন। কারণ, খোসামুদেরা যাই বলুক, মানুষের কাঁধে হাতির মাথা সুন্দর নয়, নিতান্ত অশোভন।

যে-দেবতার সুদৃষ্টি এই অঘটন ঘটাতে পারে, তিনি হচ্ছে বীণাপাণি, যিনি জ্ঞানের দেবতা। এক জ্ঞানের শক্তি ছাড়া গজমুণ্ডকে নরমুণ্ডে পরিবর্তনের ক্ষমতা আর কিছুরই নেই। সুতরাং গণদেবতার যারা হিতকামী, তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে দেবতাটির মাথার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের তড়িৎ সঞ্চালন করা। জনসঙ্ঘকে সভ্যতার ভারবাহী মাত্র না রেখে, সভ্যতার ফলভোগী করতে হলে, প্রথম প্রয়োজন জনসাধারণকে জ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা।—আকাশে বিস্তৃত বিশ্ব ও

তার জটিল কার্যকারণজাল, কালে প্রসৃত মানুষের বিচিত্র ইতিহাস, ও এই দেশ ও কালের মধ্যে বর্তমান মানুষের গতি ও পরিণতির জ্ঞান, আজকের দিনে পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের, এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ, ধন উৎপাদন ও বিতরণের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এমন অদ্ভুত জটিল ও বহুবিস্তৃত হয়ে উঠছে যে, অজ্ঞান জনসাধারণকে মাঝে মাঝে সঙ্ঘবদ্ধ করে বুদ্ধিমান লোকের নিজের হিত খুব সম্ভব হলেও, জনসাধারণের হিত একেবারেই সম্ভব নয়। বাইরের পরামর্শে গড়া ওই সব সাময়িক উত্তেজনার দল, সঙ্ঘের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের অন্তর্দৃষ্টির অভাবে ক্রমাগত ভেঙে যায় ; আর যতদিন টিকে থাকে, ততদিনও ওই পরামর্শদাতাদের ক্রীড়নক হয়েই থাকে।

জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে তার নিজের হিতের পথ নিজেকে চিনতে শেখানো কেবল বহুকষ্টসাধ্য ও অনেক সময়সাপেক্ষ নয়, ওই দীর্ঘ ঘোরানো পথ ছেড়ে, খাড়া সকল পথে তার হিতচেষ্টার প্রলোভন দমন করাও দুঃসাধ্য। এই নিরন্ন বঞ্চিত মানুষের দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করে, কেবলমাত্র সংখ্যার জোরে তাদের ন্যায্য দাবি আদায় করিয়ে দিতে কোন্ জন-হিতৈষীর না লোভ হয়! কিন্তু মানুষের প্রকৃতি ও সমাজের গতির দিকে চেয়ে এ-লোভ দমন করতে হবে। অজ্ঞান মানুষের খুব বড়ো দলও চক্ষুষ্মান মানুষেব ছোট দলের বিরুদ্ধে অনেক দিন দাঁড়াতে পারে না। এবং পৃথিবীর সব দেশে যে-অল্পসংখ্যক লোক জনসাধাবণের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থেব বিরোধী মনে করে তাকে চেপে রেখেছে, তারা আর যা-ই হোক, অতি কৌশলী ও বুদ্ধিমান লোক। এদের সঙ্গে লড়তে হলে, ভেবে না বুঝলে একদিন ঠেকে শিখতে হবে যে, সরল পথই সোজা পথ নয়।

কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার এইটিই একমাত্র, এমন-কি প্রধান প্রয়োজন নয়। জ্ঞান যে বাহুতে বল দেয়, জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠ ফল নয় ; জ্ঞানের চরম পরম ফল যে তা চোখে আলো দেয়। জনসাধারণের চোখে জ্ঞানের সেই আলো আনতে হবে, যাতে সে মানুষের সভ্যতার যা-সব অমূল্য সৃষ্টি,—তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তার কাব্যকলা—তার মূল্য জানতে পারে। জনসাধারণ যে বঞ্চিত, সে কেবল অন্ন থেকে বঞ্চিত বলে নয়, তার পরম দুর্ভাগ্য যে সভ্যতার এই সব অমৃত থেকে সে বঞ্চিত। জনসাধারণকে যে শেখাবে একমাত্র অন্নই তার লক্ষ্য, মনে সে তার হিতৈষী হলেও, কাজে তার স্থান জনসাধারণের বঞ্চকের দলে। পৃথিবীর যে-সব দেশে আজ জনসঙ্ঘ মাথা তুলছে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারেই তা সম্ভব হয়েছে। তার কারণ কেবল এই নয় যে, শিক্ষার গুণে পৃথিবীর হালচাল বুঝতে পেরে জনসাধারণ জীবনযুদ্ধে জয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছে। এর একটি প্রধান কারণ, সংখ্যার অনুপাতে জনসাধারণের সমাজে শক্তিলাভের যা গুরুতর বাধা, অর্থাৎ সভ্যতালোপের আশঙ্কা, শিক্ষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে সে-বাধার ভিত্তি ক্রমশই দুর্বল হয়ে আসে। জনসাধারণের বিরুদ্ধে আভিজাত্যের স্বার্থের বাধা সভ্য মানুষের মনের এই আশঙ্কার বলেই এত প্রবল। এই আশঙ্কার মধ্যে যা সত্য আছে, তা যতটা দূর হবে, জনসাধারণের শক্তিলাভের পথের বাধাও ততটা ভেঙে পড়বে। উদরসর্বস্ব গজমুণ্ডধারী গণদেবের অভ্যুত্থান স্বার্থান্ধ মানুষ ছাড়া অন্য মানুষের কাছেও বিপৎপাত বলেই গণ্য হবে। গণ্যদেবতা যেদিন নরদেহ নিয়ে আসবে, সেদিন তার বিজয়যাত্রার পথ কেউ রুখতে পারবে না।

"শিক্ষা ও সভ্যতা"। আশ্বিন ১৩৩৪।

ক্যাবলের পত্র

সুকুমার রায়চৌধুরী

রাম বাঞ্ছারাম
উন্নতিশীলেষু—

তুমি যে আমার কোন চিঠি পাওনি তার একটা কারণ এই যে, আমি তোমায় চিঠি লিখিনি। কারণ ছাড়া যখন কার্য হয় না, তখন চিঠি না লেখবারও অবিশ্যি একটা কারণ থাকা উচিত। তবে কিনা, চিঠি না-লেখাটাকে কার্য ব'লে ধরা যায় কি না, সেটা একটু ভাবা দরকার। কিছু না-করাটাও যদি একটা কাজ হয়, তবে তোমরা পৃথিবীতে কেজো মানুষ আর অকেজো মানুষ ব'লে যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছ সেটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে পড়ে। তোমরা করেছ বলছি এইজন্যে যে ও দ্বন্দ্বটিকে আমি বরাবরই অস্বীকার ক'রে এসেছি। আমার ধারণা এই যে, আমসত্ত্ব হলেই যেমন আমের আমসত্ত্ব, তেমনি মানুষ মানেই কাজের মানুষ। ক্রিয়া এবং অস্তিত্ব এ-দুটোর মধ্যে তফাতটা কেবল কৃ-ধাতু আর অস-ধাতুর তফাত—আর ব্যাকরণ-মতে সব ধাতুই ক্রিয়াবাচক। "আমি আছি" এই তত্ত্বটিকে ফুটিয়ে বলার নাম কার্য এবং প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মই এই যে, সে আপনাকে প্রকাশ করে অর্থাৎ ফুটিয়ে বলে। জলকে ফোটাতে হলে তাকে আগুনে চড়িয়ে গরম করতে হয়—কিন্তু তাই বলে ফুলকে ফোটাবার পক্ষে ও-উপায়টি খুব প্রশস্ত না হতে পারে। জীবনটাকে কাজের মধ্যে দিয়ে যাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা টানাটানি করেন, তাঁরা এই সহজ কথাটি বুঝেন না যে, ওতে করে জীবনটা ফুটে বেরোয় না,—কেবল প্রাণটাই ছুটে বেরোয়।

উপনিষদ্ বলেছেন আত্মা অব্যয়, আর ব্যাকরণেও দেখতে পাই যে, অব্যয়ের রূপ নাই। কিন্তু জীবনের একটা রূপ আছে, সেটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ। কেননা, জীবনের ক্রিয়া সমাপ্ত হলেই মৃত্যু এবং মৃত্যুটা আর যাই হোক সেটা জীবন নয়। অসমাপিকা হলেও ক্রিয়া পদটি অকর্মক নয়, কারণ ওর একটি উদ্দিষ্ট কর্ম আছে এবং সেই কর্মটাই হচ্ছে আর্ট। রোসো, আগেই তর্ক করো না। আর্ট কাকে বলছি সেইটে আগে বুঝবার চেষ্টা কর। তুমি বলতে চাচ্চ যে, বিজ্ঞান, পলিটিকস্ বা ফিলসফি প্রভৃতি ভারি ভারি কর্মগুলো কি কর্ম নয়? আমার মতে, ওগুলো হচ্ছে ক্রিয়ার উপসর্গ মাত্র। "উপসর্গস্য যোগেন" ক্রিয়ার অর্থ যে ওলট-পালট হয়ে যায়, এটা ব্যাকরণের বিজ্ঞতা এবং সংসারে অভিজ্ঞতা এই দুই তরফেরই সাক্ষী। জীবনের ক্রিয়ার ওপর ওরা মোচড় দেয়, কিন্তু কোথাও আঁচড় দিতে পারে না। জীবনের উপর আঁচড় দেওয়া, অর্থাৎ আপনার ছাপ এঁকে দেওয়া, অর্থাৎ এক কথায় নতুন ক'রে রূপ সৃষ্টি করা, এই জিনিসটাই হচ্ছে আর্ট—অর্থাৎ ব্যার্গসঁ যাকে বলেছেন—Creative evolution

আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি, বাংলাদেশে কেউ ব্যাকরণ পড়ে না এবং পড়তে জানে না। অর্থাৎ আমাদের দেশে রসবোধ ছাড়াও আর-একটি বোধের বিশেষ অভাব রয়েছে—সেটা ঐতিহাসিক বোধ নয়, সেটা হচ্ছে মুগ্ধবোধ। তার কারণ, আমাদের দেশে ইতিহাসের মালমশলা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন, মাল এবং মশলার পার্থক্য তাঁরা বোঝেন না। ব্যাকরণের মধ্যে তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মশলা দেখেন—কিন্তু ইতিহাসের মাল দেখতে পান না। অথচ, এটা অস্বীকার করবার জো নেই যে, ও-বস্তুটি হচ্ছে জাতীয় খোসখেয়ালের আস্ত একটি তোষাখানা। সকলেই জানি, ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সবচাইতে বড় তফাত হচ্ছে, আকারের তফাত। অর্থাৎ, তারা আত্মসর্বস্ব আর আমরা আত্মাসর্বস্ব; ওদের টাকা মাত্র ভরসা, আমাদের টাক মাত্র ভরসা। ইংরেজের ব্যাকরণে ও আচরণে first person হচ্ছেন আমি এবং আমরা। কিন্তু আমাদে দেশে ব্যাকরণটাও বেদাঙ্গ, সুতরাং তাতে পরমার্থ না থাকুক পরার্থতত্ত্বের কোন অভাব নেই। তাই, আমাদের প্রথম পুরুষ হচ্ছেন, ইনি এঁরা তাঁরা। এর মধ্যে দীনতা থাকলেও কোনরকম হীনতা

নেই, কারণ আমি-ব্যক্তিটিকে আমরা বরাবর উত্তমপুরুষ বলেই প্রচার করে আসছি। এইখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের আসল তফাত। ওরা অহঙ্কারী বলেই স্বার্থপর হয়ে থাকে আর আমরা পরার্থপর বলেই অহঙ্কার করতে পারি।

অধ্যাপক Kuhmre তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, মিথ্যেটাই হল সাহিত্যের আসল সৃষ্টি—কেননা, সত্যকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। কেবল এইটুকু না বলে তিনি আরও বলতে পারতেন যে, আর্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেটা সৃষ্টি-ছাড়া সেইটেকে সৃষ্টি করা! বিজ্ঞানের সব সত্যিই যে সত্যি, এইটে দেখানোই হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যবসা। সত্যিটার যে কোন সত্তা নেই আর মিথ্যেটা যে মিথ্যে নয়, এইটেই হচ্ছে দর্শনের সাক্ষী। কেবল আর্টের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সত্য-মিথ্যার স্বত্বসাব্যস্তের কোন বালাই নেই, কেননা সাহিত্য হচ্ছে সত-মিথ্যার সব্যসাচী। অর্থাৎ এক কথায়, বিজ্ঞান না পড়েই বোঝা যায়, দর্শন পড়লেও বোঝা যায় না, আর সাহিত্যের বেলা বোঝা-পড়ার কোন প্রয়োজনই হয় না। একেই আমি বলেছিলুম, "সাহিত্যের অনাসক্তি।" দুর্ভাগ্যক্রমে কথাটা কারও প্রাণে লাগেনি, অর্থাৎ কানে লাগেনি। কেননা, আমাদের দেশের বয়ঃপ্রাপ্ত পণ্ডিতেরাও পড়াশোনা করেন না, তাঁরা কেবল লেখা-পড়াই করে থাকেন। আর তাতে করে যে জিনিসটা গজায়, সেটা আক্কেল নয়, সেটা হয় টাক নয় টিকি— অর্থাৎ, হয় নাস্তিকতা নয় অদ্বৈতবাদ।

দেখ, কোথাকার কথা কোথায় গড়িয়ে পড়ল। কথা বলবার একটা মস্ত অসুবিধে এই যে, বেশী কথা বললে কেউ শুনতে চায় না, আবার অল্পের মধ্যে সংকীর্ণ করে বললেও কেউ বুঝতে পারে না। এ-সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, অল্প কথার মধ্যে যতটা বাহুল্য থাকে, বেশী কথায় ততটা থাকে না। তাই সাহিত্যের একটা বড় কাজ হচ্ছে, সামান্য কথাকে চালিয়ে চালিয়ে, অর্থাৎ exercise করিয়ে তার বাহুল্য নষ্ট করা। এক্ষেত্রে, যাঁরা সংযমের উপদেশ দিতে আসেন, তাঁদের এই সহজ তত্ত্বটি বুঝিয়ে বলা একেবারেই অসম্ভব যে, সাহিত্যের শব্দকে মেরে ভাষাকে জব্দ করা যায়, কিন্তু ও-কাজটি সম্যকরূপে যমের উপযুক্ত হলেও তাকে সংযম বলা চলে না।

আমাদের গুরুমশাইরা বলেন যে, ভাষাটার বাড়াবাড়ি হলে গুরুত্ব থাকে না, কেননা তাতে করে ভাষাটা হয় ভাসা-ভাসা, অর্থাৎ হাল্কা। ও-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ভাষার মধ্যে যে-জিনিসটা যথার্থই ভাসে, অর্থাৎ আপনাকে প্রকাশ করে, তাকে ডুবিয়ে দিলে যে ডোবা সাহিত্যের—অর্থাৎ বোবা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাকে শোভন বলা আর মূর্খ বলা একই কথা, কেননা সে "কিঞ্চিন্ন ভাষতে"। ওর মধ্যে আরেকটু কথা আছে, সেটা আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনলাম না। সে-কথাটা এই যে, যে-টাকা বাজে সেই টাকাই চলে, যেটা বাজে না সেটা অচল ; সুতরাং সাহিত্যের বাজারে বাজে কথাই চলে ভালো—অর্থাৎ সেই কথাটাই চলে, যার শব্দের জোর আছে। তুমি ভাবছ, এটা নেহাত বাজে কথা। তা হওয়া খুবই সম্ভব, কেননা কথাটা সত্যি।

আমার একটি প্রসঙ্গে আমি বলেছিলুম যে, সাহিত্যের উক্তির মধ্যে যুক্তি থাকলেই তার মুক্তি হয় না—তাতে সাহিত্যর বিস্তার হতে পারে, কিন্তু তার নিস্তার হওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি আমি এই কথাটির একটি চমৎকার উদাহরণ আবিষ্কার করেছি। "পল্লী-সাহিত্য" বলে একটা কথা আমি অনেক দিন ধরে শুনে আসছি, কিন্তু-ও বস্তুটা যে কী তা আমার জানা নেই, অর্থাৎ কাল পর্যন্ত জানা ছিল না। সেই জন্য কাশীরাম পণ্ডিতের পল্লী-সাহিত্য প্রবন্ধটি আমি আগ্রহ করে—অর্থাৎ নিজের পয়সা খরচ করে কিনে এনেছিলুম। কিন্তু প্রবন্ধটি পাঠ করে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, ওতে করে আসল যে-কথাটি বলা হচ্ছে, সেটা ওর মধ্যে কোথাও বলা হয়নি। বলা কথাটির অর্থই হচ্ছে কিছু কথা বলা, কিন্তু কথার উপর অসামান্য বল-প্রয়োগ করলেই যে বলা কাজটি খুব ভালো করে সম্পন্ন হয়. আমার অন্তত এরকম বিশ্বাস নেই। সাহিত্যকে তাজা করাবার জন্য পণ্ডিতমশাই যে-রকম তেজ প্রকাশ করেছেন,—তাতে তাঁর প্রবন্ধটিকে পল্লী-সাহিত্য না বলে মল্লীসাহিত্য অর্থাৎ মেয়েলি কুস্তির সাহিত্য বলা উচিত ছিল—কেননা, ওর মধ্যে প্রতাপের চাইতে প্রলাপের মাত্রাটাই বেশী।

পণ্ডিতমশাই বলতে চান যে, সাহিত্যটাকে শহরের বদ্ধ বাতাসে আবদ্ধ না রেখে, তাকে "সহজ সুস্থ পল্লীজীবনের সংস্পর্শে আনা প্রয়োজন" অর্থাৎ তাকে ঘন ঘন হাওয়া খেতে পাড়াগাঁয়ে

পাঠানো দরকার। পণ্ডিতমশাই বলেন, "আমি মনে করি ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব।" প্রস্তাবের মাঝখানে, "আমি মনে করি" বলে উত্তম পুরুষের অবতারণা করলেই যে প্রস্তাবটা উত্তম হয়ে পড়ে, এ-রকম যুক্তির জন্য ন্যায়শাস্ত্রে অনেক উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা আছে। পণ্ডিতমশাই ভরসা করেন যে, তাঁর ব্যবস্থা-মত চললে পরে সাহিত্যের ভাব এবং ভাষা হৃষ্ট এবং পুষ্ট হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঠিক তার উল্টো। শহুরে সাহিত্যকে গ্রামের হাওয়া খাইয়ে gram-fed করে পুষতে গেলে যে-জিনিসটা পুষ্টিলাভ করে, সেটা 'গ্রামার' নয়, সেটা হচ্ছে গ্রাম্যতা।

ব্যার্গর্স বলেছেন, মানুষের হাত পা কাটলেও সে বেঁচে ওঠে, কিন্তু তার মুড়োটা কেটে ফেললে আর সে বাঁচতে পারে না। মাথাটা যে ঘাড়ের ওপর থাকে, ঘাড়ের পক্ষে তা আপত্তিকর সন্দেহ নেই। কিন্তু ও-বস্তুটি যদি ওখানে না থাকত, তাহলে তাতে করে দেহটা লঘু হলেও আপত্তি আরও গুরুতর হত। কতকগুলো ইংরেজিপড়া মাথাকে বাংলা-সাহিত্যের ঘাড়ের উপর বসতে দেখে, পণ্ডিতমশাই তার মুণ্ডপাত করতে চান, কিন্তু এটা তিনি ভেবে দেখেননি যে, তাতে তাঁর নিজের প্রবন্ধকেই তিনি কবন্ধ করে ফেলেছেন। যা হোক, এ-প্রবন্ধের একটা গুণ আছে, সেটা আমি অস্বীকার করিনে—সেটা এই যে, সাহিত্য বলতে পণ্ডিমশাই কী বোঝেন সেটা না বুঝলেও, তিনি কী না-বোঝেন সেটা ওতে খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যায়।

আমার কোনও-কোনও সমালোচক বলেন যে, আমার ভাষাটা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার অর্থ বোধ হয় এই যে, আমার লেখাটা পড়লে তাঁদের প্রাণটা জ্বলে, কিন্তু জল হয় না। তাই শুনলুম, সেদিন একজন আক্ষেপ করে বলছেন যে, আমার কথাগুলো নাকি "সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না"। বোঝা যে যায় না, এই কথাটুকু একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্য, কেননা সংসারের কোনও বোঝাই আপনা থেকে যায় না—তাকে কষ্ট করে বয়ে নিতে হয়। কিন্তু সহজ বুদ্ধি বস্তুটা যে কী আমি আজ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারলুম না। আমার বরাবর ধারণা এই যে, বুদ্ধি জিনিসটাই সহজ—অর্থাৎ ও-বস্তুটি ভগবান যাকে দেন তাকে জন্মের সঙ্গেই দিয়ে দেন। এ-বিষয়ে যাঁদের কিছু-কমতি আছে, তাঁরা বোধ হয় এইটে বোঝেন না যে, ঐ অভাবদোষটা তাঁদের স্বভাবদোষ।

ক্যাবল

"প্রবাসী"। ভাদ্র ১৩২৫।

অভিসার

দিবাকর শর্মা

বি-এ ফেল করিয়া ঘর ছাড়িলাম। মাতৃকুল পিতৃকুলের ত্রি-সীমানায় কেহ ছিল না ; সুতরাং গতি আমার অবাধ।

ফেল করিয়া দুঃখ করি নাই ; সংবাদ শুনিয়া কবিতার খাতার প্রথম পাতা খুলিয়া কহিলাম, "ওগো তোমারই জন্যে এই-যে ব্যর্থতা—এ তো আমার পুরস্কার। কোনো দুঃখ কোন ক্ষোভ নাই!" অক্ষরগুলি কথা কহিল না ; কিন্তু যাহার উদ্দেশে রচিত এই ছন্দের মালা, তাহার প্রসন্ন উজ্জ্বল, তৃপ্তি-ভরা চক্ষু দুটি স্পষ্ট খাতার পাতায় ফুটিয়া উঠিল।

সে আমার কৈশোরের আনন্দের স্বপ্ন—মঞ্জুলতা। মঞ্জুলা বলিয়া ডাকিতাম। আমার প্রতিবেশিনীর তেরো বৎসরের কন্যা। এনট্রান্স পাস করিয়া শহরে গেলাম। এফ-এ পাস দিয়া ফিরিয়া শুনিলাম, মঞ্জু অপরের গৃহ আলো করিতে চলিয়া গেছে। সে দিনের সেই আঘাত! সে কী নির্মম!

কবিতার মধ্যে স্বস্তি খুঁজিলাম। দিনের পর দিন বিচিত্র ছন্দে আমার খাতার পাতায় জীবনেব এই মূর্তিমতী কামনার স্তব ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। শুধু এই খাতাখানি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও বন্ধন ছিল না। কলেজের বাহির দিকে চাহিতেই মনে হইত ইহাদের জন্যই মঞ্জুকে হারাইয়াছি। পুঁথির পাতায় মন বসিত না। বি-এ ফেল করিলাম।

দুই

ঘর ছাড়িয়া যেদিন বাহির হইলাম, সেদিন প্রদোষে কেবল প্রথম দক্ষিণের হাওয়া মুকুলিত তরুলতাকে আন্দোলিত করিয়া গেছে। সন্ধ্যার শেষে জ্যোৎস্না রাত্রে বাহির হইলাম। দূর হইতে ফিরিয়া একবার পিছনে চাহিলাম—নিরুদ্দেশের যাত্রী জীবনে আর এ-গৃহে ফিরিব কি না জানি না। যদি কখনও মঞ্জুকে ভুলিতে পারি...কিন্তু সে-ব্যর্থ প্রয়াস কেন? আজ এই মরুজীবনেব যাহা কিছু আনন্দ, সে তো তাহারই কল্পনায়। মঞ্জু আজ ষোল বছরের। ষোলটি বসন্তের রূপ ও আনন্দের অপূর্ব সঞ্চয় আজ অপরের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া আছে। শুধু আমি রিক্ত, আমি নিঃস্ব, আমি একা। কোনও লক্ষ্য ছিল না। দুই বৎসর ভারতের নানাস্থানে ঘুরিলাম। হৃদয়ের রিক্ততা ঘুচিল না, শুধু কবিতার খাতা মঞ্জুলতার নব-নব রূপ-বন্দনায় ভরিয়া উঠিল।

মাঝে-মাঝে মনে-মনে একটি খোঁচা লাগিত—মঞ্জু পরস্ত্রী। পরমুহূর্তেই মনের এ-দুর্বলতা মুছিয়া ফেলিতাম। শাস্ত্র আর হৃদয়ের বিরোধ চিরকালকার। জানিতাম, হৃদয় যাহাকে চাহে, শাস্ত্র তাহার বিচিত্র বিধিনিষেধের যবনিকা দিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিতে চায়। তারপর প্রেম! সে কোনও বন্ধন, কোনও সংস্কার, কোনও নিষেধ মানে না। মঞ্জু আজ পরস্ত্রী, দুর্লভ। মনে ভাবিতাম, ইহাই বিধাতার বিধান...আমার হৃদয়কে ব্যর্থতায় ভরিবার জন্য, আমার কবিতাকে সার্থক করিবার জন্য।

দিনগুলি কাটিত এক রকমে, কিন্তু রাত্রি? সে তার অপার নিস্তব্ধতা দিয় বাঞ্ছিতার অঞ্চলের মত আমাকে ঘিরিয়া রাখিত। কখনও গভীর নিশীথে আবিষ্টের মত উঠিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া ডাকিতাম, "ওগো এসো, এসো! দুর্বহ এ-জীবন তোমা ছাড়া!"

হৃদয়ের ক্ষুধা যখন অসহ্য হইয়া উঠিত, তখন কাব্য খুলিয়া বসিতাম। উচ্চকণ্ঠে পড়িতাম কিনা জানি না। তবে একদিন বাড়ির মালিকের মুখে শুনিলাম যে, আমার নৈশ অধ্যয়ন অপর সকলের অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছে। কথা কহিলাম না, আনন্দে হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল! ভাবিলাম ধন্য আমি! যুগ-যুগ-সঞ্চিত রস-আনন্দে ভরা এই যে কাব্য, ইহার উপভোগের

সৌভাগ্য, শুধু আমার একেলার ! কি সৌভাগ্য ! কি গৌরব !!

সে-গৃহ ছাড়িলাম ।

তিন

নগাধিরাজ হিমালয় ! তাহারই সানুদেশে এক নিভৃত পল্লীতে আসিয়া বাস লইলাম মুদীয়ানীর গৃহে। মুদীয়ানীর দোকানের পাশে একটি চালা ঘর প্রবাসী তীর্থযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেই ঘর অধিকার করিলাম। মুদীয়ানীর বিগতজীবনের কাহিনী শুনিলাম—সংক্ষিপ্ত অথচ করুণ। সাহারানপুরে তাহার পিতৃগৃহ হইতে প্রথম যৌবনে এক বালবিধবাকে যে-পুরুষ ভুলাইয়া আনিয়াছিল, তাহার ক্ষুধা নারীর যৌবন ফুরাইতেই ফুরাইয়া গেল ; আজ সে কোথায়, হতভাগিনী তাহা জানে না। মুদীয়ানী চক্ষু মুছিল। আমার জীবনের কাহিনী তাহাকে বলিলাম। সে কহিল, "তাহাকে পাইবে বাবু। স্বপ্নে, কল্পনায়, ধ্যানে আজ যাহাকে পাইতেছ, সত্য হয় যদি তোমার প্রেম, তবে একদিন নিশ্চয় তাহাকে পাইবে।" সার্থক হোক নারী, তোমার আশীর্বাদ।

গিরিমূলের সেই নিভৃত চালাঘরে মঞ্জুলতার ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইত যেন মঞ্জু আসিতেছে—সুদূরের পথ বাহিয়া আসিতেছে সে, কত মরু অরণ্য পার হইয়া আমারই এই কুটিরখানির দিকে। মুদীয়ানীকে কহিলাম। সে কহিল, "এ-কথা সত্য বাবুজী, এমন ব্যাপার পূর্বেও ঘটিয়াছে। এই গ্রামেই..." তারপর গ্রামেরই এক বিরহী গোপ প্রণয়ীযুগলের মিলনের ইতিহাস। সে এক জ্বলন্ত প্রেমনিষ্ঠার কাহিনী।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দেখিতে-দেখিতে চলিয়া গেল। সেই কৃষ্ণ গিরিমালার প্রতিচ্ছবি আকাশের দর্পণে ফুটিয়া উঠিল আষাঢ়ের মেঘে, গিরি-কদম্বের শাখা-প্রশাখা ফুলে-ফুলে শিহরিয়া উঠিল। অশ্রান্ত বর্ষণ ! প্রকৃতির কি অভিনব চমৎকার রূপ এ ! যক্ষ বিরহীর মিলন ঘটিয়াছিল, সেও কি এমনই বর্ষায় ? প্রতিদিন মনে হইতে লাগিল, এ-বর্ষা ব্যর্থ যাইবে না, মিলন হইবেই। এই পুঞ্জ কদম্বকেশর দিয়া রচিত হইবে আমাদের মিলন-শয়ন গিরি-পল্লীর এই নিভৃত কুটীরে ! রাত্রিতে যেন মঞ্জুর কিঙ্কিণী ধ্বনি শুনিতাম, প্রতিদিনই যেন সে ধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া আসিতে লাগিল।

সেদিন শ্রাবণসন্ধ্যায় গিরি-বনানী পূরব হাওয়ার তাণ্ডব তালে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, তরু আর লতায় নিয়ত আলিঙ্গন, মেঘ আর বিদ্যুতে সঙ্গ, গিরিনদীটির নব যৌবনস্রোতে উপলখণ্ডগুলি ডুবিয়া মরিতে চাহিতেছে। শুধু আমি একা ! আমি একা !

এই মিলন-চঞ্চল প্রকৃতির মধ্যে সে কি আসিবে না ? ক্ষুধিত রহিয়া যাইবে এই বুক, শূন্য রহিয়া যাইবে এই শয়ন !

মুদীয়ানী কহিল, "এমন রাতেই মিলন হয় বাবুজী। আশা ছাড়িও না।"

মঞ্জুর কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ; সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। গভীর রাত্রি। শব্দ কিসের ! টুং টুং ! এ যে তাহারই কিঙ্কিণী ধ্বনি, এতো আমি চিনি ; আমি চিনি ! শৈশব হইতে এ-শব্দ আমি চিনিয়াছি। টুং-টুং-টুং ! ওগো এসো ! ওগো এসো ! যে-বাহু আলিঙ্গিয়া ও-কনক-কিঙ্কিনী ধন্য হইয়াছে, সে-বাহু আমার কণ্ঠে জড়াইয়া দাও, ওগো এসো !

রাত্রি দ্বিপ্রহর। টুং-টুং-টুং ! সেই ধ্বনি একেবারে আমারই গৃহতলে ! এত কাছে ! আনন্দের শিহরন জাগিয়া উঠিল সর্ব অঙ্গে ; আবিষ্টের মত উঠিলাম, বাহু মেলিয়া কহিলাম, "যদি আসিয়াছ, তবে আর কেন লজ্জা, কেন দ্বিধা। বুকে এসো, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হোক !"

আবার সেই কিঙ্কিণীর ধ্বনি অতি স্পষ্ট, অতি মধুর, আমারই দ্বারপ্রান্তে। দুয়ার খুলিয়া কহিলাম, "এসো ! এগো এসো, এই মুক্ত দ্বারপথে—মুক্ত হৃদয়ের পথ দিয়া এসো।"

টুং-টুং ! এবার স্পষ্ট শুনিলাম, এই কিঙ্কিণী-ঝনৎকারে বাঞ্ছিতার আমন্ত্রণ ! বাহিরে আসিলাম, গভীর অন্ধকার ! আমার ঘরের বারান্দায় এক কোণে তাহাকে দেখিলাম, অতি সঙ্কুচিতা, আসন্ন মিলনের আনন্দলজ্জায়। আবার কিঙ্কিণী ধ্বনিয়া উঠিল—টুং-টুং-টুং টুং !

আর পারি না গো, আর পারি না ! একটি চুম্বনে আজ সুদীর্ঘ ব্যথাতুর বিরহের সমাপ্তি হোক। বাহু মেলিয়া চির-বাঞ্ছিতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া, আনন্দ-উদ্বেল স্বরে কী কহিলাম জানি না।

এমন সময় মুদীয়ানী বাহিরে আসিয়া ডাকিল, "বাবুজী ?"

স্বপ্নাচ্ছন্ন চক্ষু দু'টি মেলিয়া প্রদীপের স্তিমিত আলোকে দেখিলাম—আমার দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধকণ্ঠ মুদীয়ানীর বিরাট শ্বেত রামছাগলটি। বেচারী তখনও মুক্তির জন্য ছটফট করিতেছে, তাহার গলার ঘণ্টা বাজিতেছে, টুং-টুং-টুং।

আমার ঘরের পিছনে এটা বরাবর বাঁধা থাকিত। আজ ঝড়ের উৎপাতে বারান্দায় উঠিয়া আসিয়াছিল।

সেই অবধি রাত্রে কাব্য-চর্চার অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছি।

"দিবাকরী"। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

বৈকালী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল বৈকালের দিকে বেলেডাঙার বট-অশ্বত্থের পথটা বেয়ে বেড়াবো বলে কুঠীর মাঠের পথটা দিয়ে চললুম সেদিকে। মাঠে পড়েই অবাক হয়ে পশ্চিম আকাশে চেয়ে রইলুম—মুগ্ধ আত্মহারা হয়ে গেলুম। সারা বেলেডাঙার বনশ্রেণীর ওপর ঘন কালো কালবৈশাখীর ঝোড়ো মেঘ জমেছে। অনেকটা আকাশ জুড়ে অর্ধচন্দ্রাকার মেঘচ্ছটা, আর তার ছায়ায় চারিধারের বাঁশবন, ঘন সবুজ শিমুল ও বটগাছের সারি, নিচের আউশের ক্ষেত, বাঁওড়—সবটা জড়িয়ে সে এক অপরূপ মূর্তি ধরেছে। বিশেষ করে ছবি দেখতে মারাত্মক রকমের সুন্দর হয়েছে এক শিমুল ডালের—তার সোজা মগডালটা মেঘের ছায়া ও উড়নশীল ঘন কালো-মেঘে-ঢাকা আকাশের পটভূমিতে কোন দেবশিল্পীর আঁকা মোহনীয় ছবির মত অপূর্ব। সেইটি দেখে চোখ আর আমার ফেরে না। কেমন যেন পা আটকে গেল মাটির সঙ্গে, অবশ হয়ে গেলুম, মুগ্ধ হয়ে গেলুম, দিশাহারা হয়ে পড়লুম। ওঃ ! সে-দৃশ্যটার অদ্ভুত সৌন্দর্যের কথা মনে এলে এখনও সারা গা কেমন করে ওঠে।

তার পরই সাঁ-সাঁ রবে ওপরের দিক থেকে বিরাট ঝড় উঠল। দৌড় দৌড় দৌড়। হাঁপাতে হাঁপাতে যখন গেঁয়োখালি আমতলাটায় পৌঁছেছি, আমাদের গ্রামের কোলে তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। জেলি আর প্রিয় জেলের ছেলে আম কুড়ুচ্ছে। একটি দরিদ্র যুবককে আগ্রহ সহকারে আম কুড়ুতে দেখে চোখে জল এল। কী দিয়েছে জীবন এদের ? অথচ এরা মহৎ, এদেব দারিদ্র্যে এরা মহৎ হয়েছে। অতিরিক্ত ভোগে ও সাচ্ছল্যে জীবনের সরল ও বন্ধুর পথটাকে হারায়নি।

স্নান সেরে এসে বকুলতলার ছায়ায় বসে ওপরের কথাগুলো লিখলাম। মাথার ওপর কেমন পাখিরা ডাকছে—ফিঙে, দোয়েল, চোখ-গেল। আর একটা কি পাখি—পিড়িং পিড়িং করে ডাকছে, কত কি অস্ফুট কলকাকলী—কি ভালই লাগে এদের বুলি।...

আজ বৈকালে হাট থেকে এসে কুঠীর মাঠে গিয়ে অনেকক্ষণ বসলুম। শিমুল গাছের এত অপরূপ শোভা তা তো জানতাম না। ঝোপের মাথায় মাথায় কি নতুন কচি লতা সাপের মত খাড়া হয়ে আছে। মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল সৌন্দর্যের ভারে। চারিধারে চেয়ে এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখির গানের সঙ্গে, মানুষের সুখ-দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। গ্রাম-প্রান্তের সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন-বেণুবনশীর্ষের দিকে চেয়ে মনে হল, ওদের সঙ্গে কত দিনের কত স্মৃতি যে জড়িত। সেই বর্ষার রাতে দিদির কথা, মায়ের কত দুঃখ, আদুরী ডাইনির ব্যর্থতা, পিসিমা,, ইন্দির ঠাকরুন। কত সমুদ্রে যাওয়ার স্মৃতি—সেই পিটুলিগোলা পানকারী দরিদ্র বালকের, পল্লীবালা জোয়ানের, কতকাল আগের সে-সব ইংরেজ বালক-বালিকারা, গাং চিল পাখির ডিম সংগ্রহ করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল—Cape Wan-এর ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরেনি—কত কী, কত কী !

নদীজলও আজ লাগল অদ্ভুত। শান্ত সন্ধ্যা, কেউ নেই ঘাটে। ওপারের গাছপালায় ধূসর সন্ধ্যা নেমেছে। একটি নক্ষত্র উঠেছে মাথার ওপর, কোন্ অনন্ত দেশের বাণীর মত এই শত দৈন্য সংকীর্ণতাময় সংসারের উর্ধ্বে জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে।

এখানকার বৈকালগুলো কি অপূর্ব ! এত জায়গায় তো বেড়িয়েছি, ইসলামপুর, ভাগলপুর, আজমাবাস—কিন্তু এখানকার মত বৈকাল আমি কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না ; বিশেষ করে বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্যমাসের মেঘহীন বৈকালগুলি যেদিন সূর্য অস্ত যাবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলোকটুকু পর্যন্ত বড় গাছের মগডালে হাল্কা সিঁদুরের পোঁচের মত দেখা যায়, সেদিনের

বৈকাল। গাছের ও বাঁশবনের ঘন ছায়ায় চাপা-আলো, ডাঁসা খেজুর ও বিল্বপুষ্পের অপূর্ব সুরভি মাখানো, নানা ধরনের পাখি-ডাকা, মিষ্ট সে-বৈকালগুলিতে কত অদ্ভুত ভাব মনে এনে দেয়। দু-একটা পাখি ধাপে ধাপে সুর উঠিয়ে কোথায় নিয়ে তোলে। কি উদাস করুণ হয়ে উঠে তখন চারিদিকের ছবিটা। বিশেষ করে আমি যখন আমাদের ভিটে ও ঠাকুরমাদের বেলতলাটায় গিয়ে খানিকক্ষণ বসেছিলাম—তার আর কোনো বর্ণনা দেওয়া যায় না।

আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, কিন্তু এখনও বিল্বপুষ্পের গন্ধ সর্বত্র। পাখির ডাকের তো কথাই নেই। সোঁদালি ফুল এখনও আছে, তবে পূর্বাপেক্ষা যেন কিছু কম। আমাদের বাগানে এখনও আম আছে, আজ সকালে নদী থেকে আসবার পথে লক্ষ করে দেখলাম এখনও লোক তলায় তলায় আম কুড়ুচ্ছে।

এ-সৌন্দর্য ছেড়ে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া, ভেবে দেখলাম, যত স্থানে বেড়িয়েছি, আনন্দ সবচেয়ে বেশি গাঢ় ও উদাস ভাবে আমি পাচ্ছি শুধু এই এখানে। কোনও Cosmic thoughts আটকায় না বরং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়, খুব ভাল করে ফোটে। তবে এই অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকা যায় বলেই এখানে কোনও শ্রমজনক কাজ করা সম্ভব হয় না দেখলুম। বিকেল হতে না-হতে কেবল মন আনচান করে, রাত্রিতে কাজে মন বসে না। এ যেন Land of Lotus-eaters, কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এখানে সম্ভবপর নয়। সেই জন্যই কলকাতা ফিরতে চাচ্ছি দু-একদিনের মধ্যে। আজকাল দিনগুলো একেবারে মেঘমুক্ত, রাত্রি জ্যোৎস্নায় ভরা, সকালগুলি স্নিগ্ধ, পাখির ডাকে ভরপুর। আর বৈকাল তো ওই রকম স্বর্গীয় অপরূপ, এ-পৃথিবীর নয় যেন। তবে আর লিখি কখন ?

মনে-মনে তুলনা করে দেখলুম, এ-ধরনের বৈকাল সত্যি কোথাও দেখিনি। এই তো পাশেই চাল্‌কী, ওখানে এ-রকম বৈকাল হয় না। এত পাখি সেখানে নেই, এ-ধরনের এত বেলগাছ নেই, সোঁদালি ফুল নেই। বনজঙ্গল বড় বেশি, কাজেই অন্ধকার। এমন চাপা আলোটা হয় না—এ একটা অপূর্ব সৃষ্টি। এতদিন তত লক্ষ করিনি, কাল লক্ষ করে দেখে মনে হল সত্যিই তো এ-জিনিস আর কোথাও দেখিনি তো! দেখবও না। কেবলমাত্র সেখানে দেখা যাবে সেখানকার অবস্থাগুলি এর পক্ষে অনুকূল। ইসমাইলপুর, আজমাবাদ লাগে না এর কাছে। সে অন্য ধরনের প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য। সেখানে কারুকার্য কম—বিপুলতা বেশি, মুখরতা বেশি।

ভাগলপুর লাগেই না। কতকগুলো বিশেষ ধরনের পাখি, বিশেষ ধরনের বন-বিন্যাস, বিশেষ ধরনের গাছপালা থাকাতে এ-অঞ্চলেই মাত্র ঠিক এই ধরনের বৈকাল সম্ভব হয়েছে। সোঁদালি ফুল তার মধ্যে একটা বড় সম্পদ। মাঠে ও অরণ্যে ওর ঝাড় যখন ফুটে থাকে, তখন বনের চেহারা একেবারে বদলে যায়, বনদেবীর সাজির একটা অযত্নচয়িত বনফুলের গুচ্ছের মত নিঃসঙ্গ মনে হয় ওকে। এই নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য ওকে যে শ্রী ও মহিমা দান করেছে, তা আর কোনও ফুলে দেখলাম না।...

বৈকালে নলে জেলের নৌকাতে বেড়াতে গেলুম মোল্লাহাটীর দিকে। ছ'টা'র সময় আমাদের ঘাট থেকে নৌকাখানা ছাড়া হল। নদীর দু'ধারে অপরূপ শোভা। কোথাও বাব্‌লা গাছ ফুলের ভারে নত হয়ে নদীর ধারে ঝুঁকে আছে, দু'ধারে ঘাস-ভরা নির্জন মাঠ। ঝোপে-ঝাড়ে ফুল ফুটে আছে, গাঙ-শালিকের দল কিচ্‌মিচ্ করছে। বাঁ ধারে ক্রমাগত জলের ধারে ধারে নলবন, ওক্‌ড়া ও বন্যেবুড়োর গাছ। মাঝে মাঝে চাষীদের পটোল ক্ষেত, বেলেডাঙার ঘোষেরা যে-নতুন ক্ষেতটাতে পটোল করেছে, তাতে টোকা মাথায় উত্তুরের মজুরেরা নিড়েন দিচ্ছে। ওদিকে কুমড়োর ক্ষেত—ঢালু সবুজ ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁয়ে আছে, গোরু চরছে। বাঁকের মোড়ে দূরে খাব্‌রাপোতা গ্রামের বাঁশবন, সুবৃহৎ Lyre পক্ষীর পুচ্ছদেশের মত নতুন বাঁশের আগা—একটু-একটু রোদ মাখা। নদীর জলের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বেরুচ্ছে, মাথার ওপরকার আকাশ ঘননীল, কিন্তু পশ্চিম দিগন্তে গ্রাম সীমায় শিমুল ও কদম গাছের মাথায় মাথায় অপরূপ মেঘস্তূপ, মেঘের পর্বত। মেঘের গিরিবর্ত্মের ফাঁকটা দিয়ে অস্ত সূর্যের ওপারের দেশের খানিকটা যেন দেখা যায়।

খানিকটা গিয়ে একধারের পাড় খুব উঁচু। বন্য নিমগাছের সারি, পাড়ের ধারে গাঙ্‌শালিকের

গর্ত, নীল মাছরাঙা পাখি শ্যাওলার ধারে-ধারে মাছ খুঁজতে-খুঁজতে একবার ওঠে, একবার বসে। খেজুর গাছ, গাবভেরান্ডা, বৈঁচি, ফুলে ভর্তি সাই বাবলা, আকন্দের ঝোপ, জলের ধারের নলবন কাশ, ষাঁড়া, নোনা, গুলঞ্চলতা-দোলনা শিমুল গাছ, শালিখ পাখি, খেঁকশিয়ালী, বাঁশঝাড়, উইঢিবি, বনমুলার ঝাড়, বকের দল, উঁচু ডালে চিলের বাসা, উলুঘাস, টোকা-পানা দাম। সামনেই কাঁচিকাটার খেয়াঘাট, দু'খানা ছোট চালাঘর, জনকতক লোক পারের অপেক্ষায় বসে। ডানধারের আকাশটায় অপূর্ব হীরাকসের রং ধরেছে—গাঢ় নীল।

আবার দু'পাড় নির্জন। এক-এক স্থানে নৌকা তীরের অত্যন্ত নিকট দিয়ে যাচ্ছে যে, কেলেকোঁড়া ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। বেলা আরও পড়ে এল। চারিদিকে শোভা অপরূপ, লিখে তা প্রকাশ করা যাবে না। ডাইনে ঘন সবুজ ঘাসের মাঠ, বামে আবার উঁচু পাড়, আবার বাব্‌লা গাছ, শিমুল গাছ, ষাঁড়া গাছ, পাখির দল শেষ-বেলায় ঝোপে ঝোপে কলরব করছে। দূরে গ্রামের মাথায় মেঘস্তূপটা পেছনে পড়েছে, এক-এক স্থানে নদী-জল ঘোর কালো, নিথর কলার পাখির মত পড়ে আছে; দেখাচ্চে যেন গহন, গভীর, অতলস্পর্শ। বাঁকটা ঘুরেই অনেকখানি আকাশ একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম আকাশের কোলে যেন আগুন লেগেছে। অনেকখানি দূর পর্যন্ত মেঘে আকাশে গাছের মাথায় মাথায় যেন সে আগুনের আভা। খাব্‌রাপোতার ঘাটের পাশে কোন্ দরিদ্র কৃষক-বধূ জলের ধারের কাঁচড়াদাম শাক কোঁচড় ভরে তুলছে, আর মাঝে-মাঝে সলজ্জভাবে আমাদের নৌকার দিকে চাইছে।

আরও খানিক দূর গেলাম, আবার সেই নির্জনতা। কোথাও লোক নেই, জন নেই, ঘর-বাড়ি নেই, শুধু মাথার ওপর সন্ধ্যার ধূসর ছায়াচ্ছন্ন আকাশ আর নিচে সেই মাঠ ও গাছপালা দু'ধারে। বুড়ো ছকু মাঝি ছেলে সঙ্গে নিয়ে দু'খানা ডিঙি দোয়াড়ি বোঝাই দিয়ে চূর্ণী নদীতে মাছ ধরতে যাচ্ছে, তিন দিনে সেখানে নাকি পৌঁছুবে বললে। একদিকে ঘন সবুজ কাঁচা কষাড়ের বন, নীচু পাড়, জলের খানিকটা পর্যন্ত দাম-ঘাসে বোঝাই, কলমীশাক অজস্র, আর কলমীব দামে জলপিপি ও পানকৌড়ি বসে আছে। মাথার ওপরকার আকাশটা বেয়ে সবাইপুরের মাঠটার দিক থেকে খুব বড় এক ঝাঁক শাম্‌কুট পাখি বাসায় ফিরছে; বোধ হয় জটামারির বিল থেকে ফিরল, পাঁচপোতার বাঁওড়ে যাবে। সেইখানটাতে আবার নলে মাঝি কাস্তে হাতে ঘাস কাটতে নামল। কি অপরূপ শোভা! সামনে খাব্‌রাপোতার ঘাটটা—একটা শিমুল গাছের পিছনের আকাশে পাটকিলে রঙের মেঘদ্বীপ, চারিধারে এক অপূর্ব শ্যামলতা। কি শ্রী, কি শান্তি, কি স্নিগ্ধতা, কি অপূর্ব আনন্দেই মন ভরিয়ে তোলে। নলে কাস্তে হাতে ঘাস কাটছে। কাঁচা কষাড়ের মিষ্ট, সরস, জোলো গন্ধ বার হচ্ছে, আমি শুধু হেলান দিয়ে বসে দূরের আকাশটা ও গাছপালার দিকে চেয়ে আছি।

জীবনটাকে উপভোগ করতে জানতে হয়। মাত্র আট আনা খরচ হল— তাই কি? তার বদলে আজ বৈকালে যে-অপূর্ব সম্পদ পেলাম, তার দাম দেয় কে? আমাদের গ্রামের কেউ আসত পয়সা খরচ করে খামোকা নৌকায় বেড়াতে? কেউ গ্রাহ্য করে এই অপরূপ বনশোভা, এই অস্তদিগন্তের ইন্দ্রজাল, এই পাখির দল, এই মোহিনী সন্ধ্যা? কেউ না। এই যে সৌন্দর্যে দিশেহারা হয়ে পড়ছি, মুগ্ধ, বিস্মিত, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছি, এই সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে থেকেও এরা কেউ চোখ খুলে চায়? আমি এ-সব করি বলে হয়তো আমাকে পাগল ভাবে।

যে-জাতির মধ্যে সৌন্দর্যবোধ দিন-দিন এত কমে যাচ্ছে, সে-জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব সন্দেহ হয়। শহর বাজারের কথা বাদ দিলাম, এই সব পাড়াগাঁয়ে যেখানে আসল জাতিটা বাস করে, সেখানকার এই কুশ্রী জীবন-যাত্রার প্রণালী, দৃষ্টির এই সঙ্কীর্ণতা, এই শিল্পবোধের অভাব মনকে বড় পীড়া দেয়।

এবার জ্যোৎস্না উঠল—আজ শুক্লা একাদশী। নলবন বাতাসে দুলছে, জ্যোৎস্না পড়ে দু'পাশের নদীজল চিকচিক করছে। ঘাসের আটি বেঁধে নিয়ে নলে মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল।

এত পাখি, গাছপালা, নীল আকাশ, এই অপূর্ব সৌন্দর্য এসব যেন আমারই জন্যে সৃষ্ট হয়েছে। এ-দেশেই তো এ-সব ছিল, এতদিন কেউ তো দেখেনি, কেউ তো ভোগ করেনি! কতকাল পরে আমি এদের বুঝলাম, এদের থেকে গভীর আনন্দ পেলাম, এদের রসধারা পান করে তৃপ্ত হলাম। এই জ্যোৎস্না, এই আকাশ, এই ইছামতী নদী আমারই জন্য তৈরি হয়েছে।

অনেকদিন পরে আমাদের ঘাটে দুপুরে স্নান করতে গিয়েছিলুম। স্নান সেরে এই রৌদ্রদীপ্ত নদী, দূরের ঘুঘু-ডাকা বনানী, উষ্ণমণ্ডলের এই অপূর্ব বনসম্পদ, স্বচ্ছ জলের সন্তরণশীল মৎস্যরাজি, নির্মেঘ নীল আকাশ—আমার শিরায়-শিরায় মাদকতা সৃষ্টি করল।

একটি ছেলের ছবি মনে এল—সে এমনি Tropics-এর সৌন্দর্য, রৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথ্বী, নীল দিক্‌চক্রবালের উদার প্রখরতার মধ্যে এই জলধারা পান করে, দিনরাত গায়ক পাখিদের কাকলী, শৈশবে মানুষ হয়েছিল গ্রামের কত দুঃখ-দারিদ্র্য কত বেদনা, কত আনন্দ, কত আশা, কত ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। সে মানুষ হয়ে উঠে এদের গান গেয়ে গেল—এই গাছপালা, লতা, পাখি, ফুলফল, সূর্য,—এদের,—এরাই তাকে কবি করেছিল।

বৈকালে হাট থেকে এসে বইখানা নিয়ে নিজের ভিটেতে গিয়ে খানিকটা পড়ে এলুম। তারপর গেলুম জটামারির পুলটাতে। ঝিরঝিরে বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। তারপর এত বড় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল, এমন এক অপূর্ব আনন্দে মন ভরে উঠল, সারা গা এমন শিউরে উঠল যে সে-পুলকের, সে-উল্লাসের তুলনা হয় না। গত কয়েক মাসের কেন, সারা বৎসরের মধ্যে ও-রকম আনন্দ পাইনি।

আজ চলে যাব, তাই বিদায় নিলুম। বিদায় জ্যাঠামশায়ের পোড়ো ভিটে, বিদায় আমার গ্রাম, বিদায় ইছামতী। আবার তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে জানিনা, আর দেখা হবে কি না তাও জানিনা। কিন্তু তোমার ফলে-জলে পুষ্ট হয়েছি, তোমার অপরূপ সৌন্দর্য এমন স্বপ্ন-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিল দশ বৎসরের বালকের চোখে, তোমার গাছপালার ছায়াতলে, তোমার পাখির কল-কাকলীতে জীবন-নাট্যের অঙ্ক শুরু। বিদায় বিদায়—যেখানে থাকি তোমাদের কথা কি কখনো ভুল্‌বো ?...

স্টোভ

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বর্তমান সভ্যতার, বিশেষত বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক হল স্টোভ। নানা পথ দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এই প্রবন্ধে গোটাকয়েক পথের নির্দেশ থাকবে। সভ্যতার পথগুলি স্বর্গাভিমুখী পথের মতন বাঁকা ও বন্ধুর, কিন্তু সেজন্যে আমি দায়ী নই। অনেক পথই বাঁকাচোরা, ধরা পড়েছে শুধু সারপেনটাইন লেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, বাঁকের মুখের চিহ্নগুলি সুস্পষ্ট। এখন বর্তমান সভ্যতা বলতে আমরা রুশিয়ার ইতিহাস এবং স্ত্রী-পুরুষের নতুন সামাজিক সম্বন্ধ বুঝি। স্টোভের সঙ্গে একধারে রুশিয়ার ও অন্যধারে স্ত্রী-পুরুষের নতুন সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। এই দুমুখো যোগাযোগ দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। ছোট কাজের মধ্যেই যেমন মানুষের চরিত্র ফুটে উঠে, তেমনি ছোট্ট একটি যন্ত্রে কিংবা অনুষ্ঠানের মধ্যে সভ্যতার রূপ মূর্ত হয়। ছোটকেও শ্রদ্ধা করতে হয়, বিজ্ঞানের মারফত আমাদের সে-শিক্ষা হয়েছে। নচেৎ পরমাণু ও ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম এক হত না।

প্রথমে রুশিয়ার কথাই ধরা যাক। রুশিয়া আমাদের চা কেনে, অত বড় খরিদ্দারকে আমাদের ভালোবাসতেই হয়। রুশিয়াকে ভারত-সরকার বরাবরই ভয় করে এসেছে, তাই রুশ-প্রীতি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আধুনিক বাংলা সাহিত্য রুশ-সাহিত্যের কাছে ঋণী। আমি নিজে জানি রবীন্দ্রনাথ তুর্গেনিভ ভালো করে পড়েছেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন এ-তথ্যটি লক্ষ করেছেন দেখে অনেক তরুণ সাহিত্যিক আশ্বস্ত হয়েছেন। আমার যুবা বয়স থেকে 'সেন ব্রাদার্স' পুস্তক-বিক্রেতার দৌলতে বাঙালি যুবক সম্প্রদায় তুর্গেনিভ, টলস্টয়, গোগল, পুশকিন, গর্কীর অনুবাদ পড়তে শুরু করে। (তারপর আমাদের সাহিত্যের নব্বুইজীয়ান যুগ আসে।) সত্যই রুশিয়ান নভেল আমাদের ভালো লাগত। মানুষ, বিশেষত দলিত ও পতিত মানুষের (উভয় লিঙ্গের) প্রতি অমন প্রগাঢ় সহানুভূতি আমাদের অতি সহজেই আচ্ছন্ন করত। সব সাহিত্যেই সহানুভূতির প্রয়োজন, নচেৎ সাহিত্যই হয় না। ইংরাজি সাহিত্যেও আছে কিন্তু সেটা এত সংযত এবং দেশকাল ও শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে তার সহজ স্ফুরণ সেখানে অসম্ভব। স্কটের রোমাঞ্চ তোলার অদ্ভুত ক্ষমতা, ডিকেন্সের ভাবালুতা ও হাসাবার শক্তি, থ্যাকারের অদ্ভুত লিখনভঙ্গি সে অভাব পূরণ করতে পারত না। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল আমাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়েছিলেন। আমরা বাঙালি, চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের অবতার, সাহিত্য আমাদের বৈষ্ণবী, চরিত্র আমাদের ভাবপ্রবণ, চণ্ডীদাসের উক্তিই হল আমাদের ধর্মের মূলকথা, আমারা এক কথায় humanist, আমাদের দেবতা নর-নারায়ণ, বিবেকানন্দের দেবতা দরিদ্র-নারায়ণ এই নর-নারায়ণের অংশ মাত্র। আমরা দেখলাম যে রুশ সাহিত্যও এই আদর্শ ও এই ধর্মের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। অতএব রুশ-সাহিত্য আমাদের ধাতে বসে গেল। আর সমগ্র ভারতবাসী ত রুশ জাতির মতো পতিত ও দলিত।

এই মানবকতা (কি বিশ্রী কথা!) যে ভাবে রুশ সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছিল সেটি আমাদের নিতান্তই মনোজ্ঞ। রুশ সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার মধ্যে নিষ্ফলতা, ছটফটানি, অস্বাভাবিকতা ও অসংযম প্রভৃতি দোষগুলি পর্যন্ত আমাদেরই। এবং আমাদের বলেই সে-দোষগুলিকে আমরা বড়ই স্নেহ করতাম।

আমরা ভাবতাম—এ-দোষগুলি আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়; এ-দোষ সমাজের, রাষ্ট্রের, অতএব দোষমুক্তির প্রতি নিজেদের দায়িত্বের অপেক্ষা পরের দায়িত্বই বেশি। ইতিমধ্যে, পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা যেমন 'কি করা', করবো আর কী? কথা কইব, কেবল কথা, কইব। বড়-বড় বিষয়ে কথা কইব যেমন আত্মা, স্বদেশ, ভগবান, স্বাধীনতা, সমাজ, শাসন-তন্ত্র, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ,

জগতের যাবতীয় সমস্যা। কথা কইব হ্যামলেটের মতন, কিংবা তাঁর রুশিয়ান বংশধর আইভানফ, রাজারফ, নেলুডফ, লেভিনের মতন। অর্থাৎ সবই হবে প্রাণের কথা, ফরাসীরা যেভাবে কথা কয় সেভাবে নয় ; কথা কইবার জন্য নয়, সবই সমস্যা নিরাকরণের জন্য। তবে সমস্যা যেকালে গুরুগম্ভীর, ভাষাও তখন হবে অস্পষ্ট, point of view-ও হবে হ্যামলেটের মতন subjective। এই হ্যামলেটিয়ানার রুশিয়ান সংস্করণই হল, বিনয় সরকারের ভাষায়, নয়া বাংলার অর্থাৎ ১৯০৫ সালের পরের যুগের বাংলার গোড়াপত্তন।

কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের মূল কথাটি বাদ পড়ল। সেটি হল কথার সঙ্গে চা পান, অনর্গল কথার সঙ্গে অনর্গল চা পান। সেই সঙ্গে সিগারেট। এই সময় অলিতে গলিতে চা-এর দোকান খোলা হয় ; সকালে-বিকেলে আড্ডা, বাজে আড্ডা নয়, সে আড্ডায় যেসব বিষয় আলোচনা হত সে-বিষয় এখন 'পরিচয়ে'র বৈঠকেও রোজ আলোচিত হয় না। এই চা-ই হল আমাদের সেই যুগের প্রধান খাদ্য। ঠিক যেমন রুশিয়ানদের, রুশ নায়ক-নায়িকাদের ছিল। রুশদের ছিল 'সামোভার', আমাদের ছিল খোলা উনুন। সামোভারের হিস্ হিস্ শব্দ সাহিত্যের বস্তু, আমাদেব ছিল ওই শব্দের অভাব। খোলা উনুনেব ধোঁয়া নিয়ে সাহিত্য হয় না। একটা শব্দের অভাব আমরা বড়ই অনুভব করতাম। গুড়গুড়ি আমরা পরিত্যাগ করেছিলাম, চায়ের পেয়ালাতে আর কতটুকু কবিত্ব সম্ভব! জোর জাপানী কবিতা! আজ স্টোভের দৌলতে শব্দের অভাব পূরণ হয়েছে বলেই আমরা কম্যুনিজম্ পর্যন্ত গলাধঃকরণ করতে প্রস্তুত হয়েছি। গত পঁচিশ বছরের বাংলা তথা ভারতের যৌবনের ইতিহাস হল দেশাত্মবোধ থেকে কম্যুনিজমে পরিণতি। সেই পবিণতির চিহ্ন হল খোলা উনুনের পরিবর্তে স্টোভের প্রসার। একজন চক্ষুষ্মান বিদেশী পর্যটক নব্য রুশিয়ায় সমাজ সম্বন্ধে লিখেছেন,—"রুশিয়ান আজ তিনটে জিনিসের প্রচার দেখে বোঝা যায় যে রুশিয়ানরা একদম বদ্‌লে গিয়েছে। প্রত্যেক বাড়িতে স্টোভ, প্রত্যেক যুবক-যুবতীর হাতে attache case কিংবা wallet, প্রত্যেক শহরবাসীর মুখে পাইপ ও গ্রামবাসীর মুখে সূর্যমুখীর বিচি।" আমাদের দেশে স্টোভ এসেছে, যদিও silencer আসেনি, attache case-ও আসছে, ফাউনটেন পেন ও বিড়ি এসে গিয়েছে। বাকিটা আসতে কত দেরি পাঠক নিজেই বুঝবেন। "ভারত তবু কই"-এর উত্তর বোধহয় এত দিনে মিলল। রুশিয়ার মতন এই গ্রাম-প্রধান পঞ্চায়েৎ-শাসিত নিরক্ষর, ধর্মপ্রাণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিপীড়িত দেশের সুদিন এসেছে—শপথ করে বলতে পারি—নচেৎ স্টোভ আসত না। ওধারে রুশিয়া, এধারে ভারতবর্ষ, দুই মহাদেশ মিলে হবে নতুন জগত। তখন লীগ অব নেশনস নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। স্টোভের পাশে বসে গা ঘামলেই world state আপনা থেকে তৈরি হবে। ওয়েলস্ সাহেব এই স্টোভের নামে এক মহাকাব্য লিখতে পারতেন, যদি না তিনি হতেন—'what a bourgeois!'

এতটা যা লিখলাম তা হল খাঁটি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ; অর্থাৎ পাকা ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত সাবধানী সিদ্ধান্ত। ভবিষ্যৎ বাণীটুকু রুশিয়ান আদর্শবাদ ও হিন্দুর দিব্যদর্শনের সংমিশ্রণ। স্টোভের মূল্য নির্ধারিণ এইবার করব। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতবর্ষের বর্তমান সভ্যতার স্টোভটি স্বাস্থ্যের চিহ্ন, না রোগের চিহ্ন? যদি স্বাস্থ্যের চিহ্ন হয়, তা হলে স্টোভ কিনব, দেশের লোককে কেনাব, যদি অস্বাস্থ্যের চিহ্ন হয় তাহলে ট্যারিফ বোর্ডের কাছে ভিক্ষা চাইব, দেশী স্টোভ-ব্যবসা রক্ষা করতে। তাহলে স্টোভটা অহিন্দু যন্ত্র বলতে হিন্দুসভাকে বাধ্য করব। অন্যান্য উপায়ও আছে। এক চটকায় দেখতে গেলে মনে হয় যে স্টোভ আমাদের অনেক উপকার করেছে—বিশেষত পুরুষজাতির। বাড়ির মেয়েদের আর রান্নাঘরে যেতে হয় না, তাঁদের শাড়িতে ধোঁয়ার গন্ধ থাকে না, ড্রয়িংরুমে একই শাড়িতে আসতে পারেন, এতে গৃহকর্তাব ও তাঁর বন্ধুদের সৌন্দর্যজ্ঞান অটুট থাকে, পয়সার সাশ্রয় হয়, বাড়িরও লক্ষ্মীশ্রী থাকে।

স্টোভ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হবার জন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ মধুরতর হয়ে উঠেছে। পূর্বে ছিল অন্দর-মহলের একপ্রান্তে রান্নাঘর এবং সে-ঘর নিতান্তই অপরিচ্ছন্ন। রান্নাবান্নার জন্য যতটা সময় লাগত যত শ্রম খরচ হত তার অনুপাতে কাজ হয়ত ততটা পরিপাটি হত না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ দুর্লভ হত, যখন সাক্ষাৎ হত তখন পট্টবস্ত্রেব পরিবর্তে বসনের হরিদ্রা-রঞ্জনে বুভুক্ষু হৃদয়ও রঙিয়ে উঠত না। এখন বিকেলের জলখাবার আধঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়, রান্নাঘরে

না গিয়ে ড্রয়িংরুমের পাশেই সে-কাজ সম্ভব হয়। Theoretically, বাদামভাজা, পেস্তার বরফি প্রভৃতি (সবগুলির নাম জানবার জন্য মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যের বদলে মণীন্দ্রলালের নভেল পড়তে পাঠিকাবর্গকে অনুরোধ করছি) শৌখিন টুকি-টাকি স্টোভেতেই প্রস্তুত হতে পারে। খোলা উনুন আর চিংড়ির কাটলেট এ-দুটো পরস্পর-বিরোধী। সেইজন্য আজকালকার বিধবা শাশুড়িরা বৌমাদের স্টোভ কিনে দিয়ে হিন্দু পরিবারের শান্তি রক্ষা করেন। ভূদেববাবু যদি আজ সশরীরে জীবিত থাকতেন, তিনি অন্য শরীরে এখনও বর্তমান, তাহলে পারিবারিক প্রবন্ধের নতুন সংস্করণে শাশুড়িকে বৌমাদের স্টোভ কিনে দিতে এবং বৌমাদের সেই স্টোভে রেঁধে দেবরবৃন্দকে খাওয়াতে বলতেন,—এটি শপথ করে বলতে পারি না, কেননা—ভূদেববাবুর আদর্শ পরিবারে স্বামীর বন্ধুদের জন্য চিংড়ি মাছের কাটলেট কবে, ফলসা রং-এর শাড়ি পরে, সেই কাটলেট হাতে নিয়ে, মৃদু-মৃদু হাসতে-হাসতে ড্রয়িংরুমে আপ্যায়িত করবার সুযোগ মিলত না। মোদ্দা কথা এই, ভূদেববাবুর আদর্শ পরিবার না মিললেও, আজকালকার আদর্শ পরিবারে সে-সুযোগ মেলে। ভগবানকে ধন্যবাদ, এ-সুযোগ আমরা পাচ্ছি। স্বামী আজকাল জমিদার নন, স্ত্রীও শুধু প্রজা নন, সম্বন্ধটিও মালেকানা সম্পত্তির নয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ও সঙ্গ আজকাল বহুবচনে। সেটা কাম্য। যদি তাই হয়, তাহলে স্টোভের গুণগান করতেই হয়। স্টোভ এই ভদ্র যুগের, এই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার যুগের টোটেম ; নিদর্শন কিংবা প্রতীকের চেয়েও বেশি।

কিন্তু সত্য বলে একটা জিনিস আছে, তার খাতির করতেই হয়। এই সত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল আমার মাসিমার বাড়ি, দ্বিতীয়বার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, ঠিক হাসপাতালে নয়, মর্গে (Morgue) ; এ দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মাসিমার বাড়ি সাহিত্যসভা। রস, রূপ ও ভাবের আলোচনায় সুহৃদবৃন্দের খিদে বেড়ে গেল, একজন মুখ ফুটে বলেই ফেললেন, 'একটু চা হলে চলে না?' মেসোমশায় ব্যস্ত হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি ভিতরে গিয়ে দেখলাম, পাশের ঘরের দরজা বন্ধ, পাখা বন্ধ, মেঝের ওপর বসে বৌদি। সামনে স্টোভ। হিস হিস্ শব্দ হচ্ছে, অথচ নীল আলো নেই। বৌদি একটু রেগে পাম্প করতেই হঠাৎ এক ঝলক আগুন প্রায় হাত তিনেক উঁচুতে লাফিয়ে উঠল। বৌদি বল্লেন—রতনের কাণ্ড কেরোসিন তেল কেনা থেকে এক পয়সা লাভ করতে জল মিশিয়েছে। বৌদি আজকালকার মেয়ে, ছাড়বার পাত্র নন, তিনি মুখ খুলতেও জানেন, খোলাতেও জানেন। তাই মাথার কাঁটা দিয়ে স্টোভের মুখ পরিষ্কার করে আবার নিজ কার্যে মনোনিবেশ করলেন। স্ত্রীজাতিকে নিরস্ত করবার অক্ষমতা সম্বন্ধে পুরুষজনোচিত অভিজ্ঞতা আমার ছিল। বাইরে এসে মেসোমশায়ের দিকে কাতর নয়নে চাইলাম। মেসোমশায় লোহার ব্যবসায়ে বড়লোক হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সব বুঝে আমাকে সাহিত্যালোচনা চালাতে ইঙ্গিত করে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমিও কথা চালালাম, দেশের ভবিষ্যৎ কী করে উজ্জ্বল হবে যদি বর্তমান সাহিত্যের ধুরন্ধরগণ এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন? এই ছিল আমার প্রশ্ন। সবের মুখে উত্তর না শুনতে শুনতেই রতন খাবার নিয়ে এল—লুচি, হালুয়া, আলুর দম। সভাভঙ্গের পর বাড়ির ভেতরে গিয়ে শুনলাম বৌদি স্নানের ঘরে, এবং দেখলাম মাসিমা রান্নাঘরের দরজায়। ব্যাপারটা বুঝলাম। বৌদির দেরি দেখে মাসিমা নিজে উনুন জ্বালিয়ে, লুচি, হালুয়া. আলুর দম বানিয়ে পাঠিয়েছেন। সেই থেকেই আমি মহাত্মাজীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাবান হয়েছি। গোরুর গাড়ি একটা নতুন মোটর টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে আগে তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা হয়েছিল, সেটি ক্ষণস্থায়ী, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে তার কিছু পূর্বে। তখন স্নেহলতা দেবীর মৃত্যুর দৃষ্টান্তে সামাজিক কল্যাণসাধনের গতিতে একটু ভাটা পড়েছে। নতুন ঝড় ও ফ্যাসান উঠবার পূর্বে একটা lull আসে। বাঙালি সমাজ তখন মন্দমধুর হাওয়ায় উল্টা বইছে। এমন যুগের এক অশুভ মুহূর্তে তলব এল—হাসপাতালে যেতে হবে। ব্যাপার কী? বন্ধুর স্ত্রী স্টোভের আগুনে শাড়ি ধরিয়ে ফেলেছেন, তার সোনার অঙ্গ ঝলসে গিয়েছে। ছুটতে হল হাসপাতালে! বীভৎস দৃশ্য! ঘন্টাখানেক পরে তিনি মারা গেলেন, নার্সের হাতে মাথা রেখে। নার্স ছিলেন ইঙ্গবঙ্গ সমাজের, তাই হিন্দু স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে দেননি। তারপর আমরা শব নিয়ে যেতে চাইলুম।

পেলাম না। শব থাকল মর্গে, পরের দিন করোনার্স কোর্ট, তার পরের দিন বন্ধু বেকসুর খালাস পেলেন, লাসও খালাস হল। সে কী দুর্গন্ধ! চার শিশি ইয়ুকালিপটাসেও সে-গন্ধ দূর হয়নি। এখনও আমার সে-গন্ধ নাকে আসে। আর মনে পড়ে বন্ধুর একটা ছোট্ট চিঠির কয়েক ছত্র। "আমি ভাই তাকে শুধু ঠাট্টা করেছিলাম। অফিস যাবার সময় সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত হাতে দুটি পান নিয়ে। আমার কী কুবুদ্ধি হল, আমি বল্লাম—যাত্রার সময় কটা চোখ দেখতে নেই।" এ-চিঠিটার কথা করোনার জানতেন না। তাঁর রায় ছিল—স্টোভের দুর্ঘটনায় মৃত্যু। এই official version-টাই নেওয়া যাক। আমার বক্তব্য হচ্ছে, স্টোভে দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে। লাভের মধ্যে এইটুকু স্বামীদের জেলখানা যেতে হয় না। কিন্তু দেশবাসীর জেলভীতি আরও কমে গেলে এ-লাভটুকুর মূল্য আরও কমে যাবে ভয় হয়।

তা হলেই হল—স্টোভ সামাজিক আদর্শের টোটেম, প্রতীক ও কষ্টিপাথর। যিনি মহাত্মাজীর আদর্শ গ্রহণ করেন, যিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার, অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে সহজ সম্বন্ধ-স্থাপনের বিপক্ষে, অর্থাৎ যিনি স্ত্রীদের রান্নাঘরের খোলা উনুনের কাছে বসিয়ে রাখতে চান, তিনিই স্টোভের শত্রু। বিপরীত দিক থেকে বলা যায়, যিনি যন্ত্র-সভ্যতা তথা কম্যুনিজমে বিশ্বাসী তিনিই স্টোভের স্বপক্ষে। খোলা উনুনের কয়লার ধোঁয়ায় মৃত্যু এবং স্টোভ ফেটে মৃত্যু মেয়েদের পক্ষে উভয় সভ্যতাতেই সম্ভব। পার্থক্য শুধু এই, একপ্রকার মৃত্যু ধীরে ধীরে, স্বাস্থ্য হারিয়ে, অনেকটা অন্তরীণ-বাসীদের মৃত্যুর মতন; অন্যপ্রকার মৃত্যু আকস্মিক, স্বাস্থ্য বজায় রেখে, অনেকটা জালানওয়ালাতে গুলির আঘাতে মৃত্যুর মতন। একটি দেওয়ানি, অন্যটি ফৌজদারি। অতএব স্টোভ সুস্থ সভ্যতার চিহ্ন হলেও মরণের কারণ হতে তার বাধে না। শুধু তাই নয়, যিনি নিয়তিকে বিশ্বাস করেন, যেমন হিন্দু ও অহিন্দু মার্কসিষ্ট, হাসিমুখে যিনি বলতে পারেন accidents will happen in best regulated families, কিংবা গম্ভীর মুখে বলতে পারেন the proletariat shall win, তিনিই স্টোভের মিত্র। গীতার কর্মবাদের সঙ্গে এবং হেগেলিয়ান মতবাদের সঙ্গে এইখানেই স্টোভতন্ত্রের সংযোগ। বাঙালি 'নয়া-হিন্দু' পাঠকের কাছে স্টোভের স্বপক্ষে এর বেশি বলবার আর কী প্রয়োজন থাকতে পারে?

'উত্তরা'। আষাঢ় ১৩৪৫

জ্যোতির্ময় ঘোষ

বাংলা ভাষায় গণিত ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তক রচনার যে-চেষ্টা ও উদ্যোগ ইহতেছে তৎসম্বন্ধে জনৈক বন্ধুর সহিত আলোচনাকালে তিনি বলেন, "দেখুন, হয় ইংরাজি রাখুন, না হয় বাংলা করুন, একটা খিচুড়ি করিবেন না"। গণিত ও বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পরিভাষা সংকলন ও পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে যে-সকল প্রশ্ন, সমস্যা ও মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। শুধু উপরোক্ত বন্ধুবরের উক্তি সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিব।

ডাল ও ভাত রান্না আমরা আগে শিখিয়াছি, পরে খিচুড়ি রাঁধিতে শিখিয়াছি, ইহা বোধহয় ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং খিচুড়ি ডাল ও ভাতের উন্নত সংস্করণ হওয়াই সম্ভব। তা ছাড়া ব্যঞ্জনাদির অভাবে অগত্যাই যে আমরা খিচুড়ির ব্যবস্থা করি তাহা নহে, যখন কোনও কারণে শরীর ও মন উৎফুল্ল ও পুলকিত হয়, তখন আমরা মেসের ঠাকুরকে বা বাড়ির গৃহিণীকে খিচুড়ির অর্ডার দিয়া থাকি। সুতরাং খিচুড়ি যে ডাল ও ভাত হইতে অপকৃষ্ট পদার্থ, তাহা মনে করিবার হেতু নাই। বরং এই খিচুড়ির যে সকল বিভিন্ন রন্ধনরীতি উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং ইহাকে অধিকতর উপভোগ্য করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, ডাল ও ভাতের বেলায় তাহা হয় নাই। অতএব আমাদের রন্ধনশালায় খিচুড়ির স্থান ডাল ও ভাত অপেক্ষা উচ্চেই থাকিবে।

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেও ক্রমাগত আমরা খিচুড়ির দিকেই চলিয়াছি, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। আমরা যে পোশাক পরি, তাহা বাঙালি, পারসি, পাঞ্জাবি, ভারতীয় ও অভারতীয় পোশাকের খিচুড়ি। আমরা সকালে উঠিয়া গুড় দিয়া বিস্কুট এবং জ্যাম দিয়া আটার রুটি খাইয়া থাকি। ঝাল চচ্চড়ি ও অম্বলে আমাদের যেরূপ তৃপ্তি হয়, চপ কাটলেট ও কোর্মা কোপ্তাতে তাহা অপেক্ষা কম হয় না। আমাদের আহারের তালিকা দেশীয় ও বৈদেশিক রীতির সংমিশ্রণে ক্রমশ কীরূপ খিচুড়ি পাকাইতেছে, তাহার বেশী দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক এবং এই সংমিশ্রণে যে শুধু অপকারই হইতেছে তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। অপকারই হউক আর উপকারই হউক, সংমিশ্রণ যে অনিবার্য তৎসম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নাই।

পরিবারের মধ্যে বিধবা মাসিমা নিরামিষাশিনী এবং উপবাসপূজা-পার্বনাদিনিরতা ; বৃদ্ধ জ্যেঠামহাশয় আফিমের নেশায় ভরপুর ; ছোটমামা ডাম্বেল ও মুগুর ভাঁজেন ; পিসেমশাই ইজি-চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে নারাজ ; খুকী পেঁয়াজের গন্ধে বমি করে ; খোকা পেঁয়াজের ফুলুরি পাশ্লে ডবল ভাত খায় ; কর্তা মুরগি ভালবাসেন, গৃহিণী মুরগি স্পর্শ করেন না ; ইত্যাদি নানাপ্রকার রুচির এবং অভ্যাসের খিচুড়ি এক বাড়িতেই দেখিতে পাই। ইহা অনিবার্য।

একই পরিবারের মধ্যে কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ পৌত্তলিক, কেহ নিরাকারবাদী, কেহ কোনো বাদীই নহে, এরূপ দৃষ্টান্ত সর্বত্র। এইরূপ মতবাদের খিচুড়ি হইবেই। শুধু তাহাই নহে, একই ব্যক্তির জীবনে একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদের খিচুড়ি বিরল নহে। মাছ খান, মাংস খান না ; কালীপূজা করেন, বলিদান করেন না ; পৈতা আছে, টিকি নাই ; টিকি আছে, পৈতা নাই ; সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন, জুয়াচুরিও করেন ; সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন না, জুয়াচুরিও করেন না ; ইত্যাদি নানাপ্রকারের মনোভাবের খিচুড়ি সর্বত্র।

আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে কী দেখিতে পাই ? তাহাদের জীবনও আমাদের মতো খিচুড়ি নয় ? বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কার্য, বিভিন্ন ব্যবসায় বিভিন্ন আচার ব্যবহার অনুসরণ তো করিতেছেই। একই ব্যক্তির জীবনও নানা আপাত-বিরোধী কার্য ও ভাবসমূহের বোঝা নিত্য বহিতেছে। একই ব্যক্তি বাস-কণ্ডাক্টর, ঘটক, বাড়ি ও জমির দালাল এবং জ্যোতিষী ; এক ব্যক্তি

সকালে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, দুপুরে কেরানি এবং বৈকালে ইনশিওরেন্স এজেন্ট ; প্রবীণ অধ্যাপকেরাও হয়তো বিচক্ষণ শেয়ার ব্যবসায়ী ; ঠাকুর মহাশয় রন্ধনাদি করেন, সুযোগ পাইলে পূজার্চনাও করেন ; এইরূপ বিভিন্ন মত ও কার্যের সমন্বয় বা খিচুড়ি অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে সমাজের যে অপকারই হইতেছে, ইহা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

আমাদের আসবাব দেশি ও বিলাতির খিচুড়ি। ফরাস ও তাকিয়ার পাশে অনেক স্থলেই আজকাল সোফা ও চেয়ার শোভা পায়। তক্তাপোশের পাশে ড্রেসিং টেব্‌ল অনেক বাড়িতেই পাওয়া যাইবে। সাবান দিয়া হাতে মাটি এবং টুথপেস্ট দিয়া দাঁতের মাজন আমরা অনেকেই করি। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের জীবনের আশে-পাশে যে খিচুড়িরই স্তূপ বিরাজমান, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন ?

আমরা যাহাকে উন্নতি বলিয়া থাকি, তাহা কি খিচুড়িরই নামান্তর নয় ? নৌকা ও স্টিম এঞ্জিনের খিচুড়িকেই আমরা স্টিমার বলিয়া থাকি। মোটরকার এবং নৌকার খিচুড়িকে মোটরলঞ্চ বলে। আবার মোটরলঞ্চ এবং এরোপ্লেনের খিচুড়ি হাইড্রোপ্লেন। ফটোগ্রাফ এবং গ্রামোফোনের খিচুড়ি টকি-সিনেমা। ফটোগ্রাফি আবার রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং গণিতের খিচুড়ি ম্যাগনেট ও চুম্বক ও বিদ্যুতের খিচুড়ি। এক কথায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মাত্রই এক একটি বিরাট খিচুড়ি।

বহিঃপ্রকৃতিটাই কি খিচুড়ি নয় ? শুভ্র সূর্যরশ্মিটি সাতটি বিভিন্ন রং-এর খিচুড়ি নয় কি ? একটি ফুলের বাগানের দিকে চাহিলে কি অগণিত রং-এর ও রূপের খিচুড়িই চোখে পড়ে না ? ময়ূরপুচ্ছ বহুবর্ণের খিচুড়ি বলিয়াই এত রমণীয়। ভূপৃষ্ঠটি নদী, পর্বত, অরণ্য, প্রান্তর প্রভৃতির একটি বিশাল খিচুড়ি বলিয়াই এত উপভোগ্য। নির্মল, স্বচ্ছ, স্বাদহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন জলকণাটিও হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের খিচুড়ি।

মানুষের ভিতরে-বাহিরে আশে-পাশে সর্বত্রই যখন খিচুড়িরই রাজত্ব তখন শুধু তাহার ভাষা সম্বন্ধে একটা অনির্দেশ্য পবিত্রতার প্রতি এত মোহ কেন ? মানুষের ভাষা খিচুড়ি হইতে বাধ্য—অতীতে হইয়াছে, বর্তমানে হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এ-স্রোত রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। টেবিল, চেয়ার, স্ক্রু, মোটরকার, রেডিও, টেলিগ্রাম, পোস্ট অফিস প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ বাংলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এবং ক্রমাগত যাইতেছে। সেদিন একটি মিস্ত্রী বাসায় কাজ করিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল সে আলমারি প্রস্তুত করিতে পারে কি না। সে উত্তর দিল, "আজ্ঞে ওসব ফাইন কাজ আমরা করি না।" সেদিন একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, "Smooth মানে কি ?" আমি বলিলাম, "Smooth মানে—মানে—মসৃণ—মানে সমান, যাতে উঁচু নীচু নেই।" ছেলেটি বলিয়া উঠিল, "ও বুঝেছি, প্লে—ন।" এ-রূপ হইবেই। ইহার উপায় নাই। এ-জন্য কোনোরূপ দুঃখ করিলে চলিবে না। পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে 'জলমোটর' ও 'ডাঙা মোটর' জলে-স্থলে এবং লোকমুখে নিয়মিত চলিতেছে। ইহার জন্য কোনও পরিভাষা সমিতির আবশ্যক হয় নাই। 'মাস্টার' শব্দটি ইংরাজি হইলেও 'মাস্টারনী'কে ত্যাগ করা সহজ হইবে না। এরূপ খিচুড়িতে বিরক্ত হইলে জীবন দুর্বহ হইবে। বাংলা পরিভাষার অভাব সত্ত্বেও সেমিজ, ব্লাউজ, পেটিকোট, বডিস, ব্রেস্‌লেট, সেপটি-পিন প্রভৃতি বাঙালি তরুণীর রমণীয়তা বৃদ্ধিই করিতেছে। 'গ্রামোফোন' কথাটা বিদেশি হইলেও উহার গান আমাদের ভালোই লাগে। সন্ধ্যার পরে কিছুক্ষণ 'রেডিও'ই বা মন্দ কী ? 'টেলিফোন' সকলের বাড়িতে না থাকিলেও 'টেলিগ্রাম' সব বাড়িতেই আসে। অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত অ্যাসিডিটি পূর্ণ ও অজীর্ণান্তক পাউডারে যদি অসুখ সারে, তাহা হইলে ঔষধের নামে কী আসে যায় ? দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। ঘরে বাহিরে সর্বত্রই খিচুড়ি ভাষা চলিতেছে।

যদি কেহ বলে, "এলগিন রোডের মোড়ে ট্রামে উঠিয়া কণ্ডাক্টরের নিকট টিকেট লইয়া সামনের সীটে গিয়া বসিতেই ট্রামখানি লোয়ার সারকুলার রোডের জংশনে আসিয়া পড়িল এবং পূর্ব দিক হইতে আগত, একখানি ট্যাক্সির সঙ্গে ভীষণ কলিশন হইল। একটি তরুণীকে আহত অবস্থায় ট্রাম লাইনের উপর ছিটকাইয়া পড়িতে দেখিয়াই আমি ট্রাম হইতে নামিয়া একখানি ট্যাক্সি করিয়া তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে লইয়া গেলাম এবং অনেক কষ্টে ওখানকার সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ইনডোর পেসেন্ট ভাবে অ্যাডমিট করাইলাম। হোস্টেলে ফিরিয়া

দেখি সুপারিনটেন্‌ডেন্ট রোল করলে সময়ে আমাকে অ্যাবসেন্ট করিয়া রাখিয়াছেন। পরদিন হইতে ভিজিটিং আওয়ার্সে নিয়মিত তরুণীটিকে দেখিতে যাইতাম। অসুখ সারিয়া আসিলে তিনি তাঁহার বাসার ঠিকানা দিয়া আমাকে চা খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে ক্রমশ তরুণীটির সহিত ইত্যাদি," তাহা হইলে তাহাকে চালিয়াৎ বা মিথ্যাবাদী বলিতে পারেন, কিন্তু তাহার ভাষা যে অস্বাভাবিক তাহা বলা চলে না, বিশুদ্ধ বাংলায় উক্ত কথাগুলি বলা যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তাহা করিলে বড়বাজার হইতে হাওড়া স্টেশনে যাইবার সময়ে বিদেশীয় ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রপাতি দ্বারা নির্মিত হাওড়ার পুলের উপর দিয়া না গিয়া স্বদেশীয়গণ কর্তৃক বাহিত ডিঙিতে অথবা পবিত্র গঙ্গাজলে সাঁতার কাটিয়া নদীপার হইবার মতোই হইবে।

সাহিত্যে উক্তরূপ খিচুড়ি ভাষার সমর্থন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্যের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা আবশ্যক এবং তাহার ভার কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক এবং অন্যান্য সাহিত্যিকগণ লইবেন।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কার্য ও ভাবের খিচুড়ি হইলেই যে তাহা শুভ ও শ্রেয় হইবে, ইহাও আমার বক্তব্য নহে। মাংসের সহিত পরমান্নের খিচুড়ি সুস্বাদু হইতে পারে না। ইউরোপীয় জাতির সহিত ভারতীয় জাতির মিশ্রণে যে-ওয়েলেসলি সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহা শুভ হইয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন না, তবে খিচুড়ি হইলেই যে তাহা অপকৃষ্ট হইবে তাহা ঠিক নহে, ইহাই আমার বক্তব্য।

সাহিত্যিক যতই চেষ্টা করুন, বিদেশি শব্দ ক্রমাগত বাংলার সহিত মিশিতে থাকিবে। তৎসত্ত্বেও যথাসম্ভব ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা তাঁহাদের একান্ত কর্তব্য। নতুবা বাঙালির দেশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার হানি হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পক্ষে খিচুড়িই প্রশস্ত। যাহাতে সেই খিচুড়ি সুপক্ব ও সুস্বাদু হয় এবং তলায় ধরিয়া গিয়া দুর্গন্ধ না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

লেখা। ১৯৪০।

আমার সুন্দর

কাজী নজরুল ইসলাম

আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। "ধূমকেতু", "লাঙল", "গণবাণী"তে, তারপর এই "নবযুগে" তাঁর শক্তি-সুন্দর প্রকাশ এসেছিল ও এল রুদ্র-তেজ বিপ্লবের, বিদ্রোহের বাণী হয়ে। বলতে ভুলে গেছি, যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈনিকের সাজে দেশে ফিরে এলাম, তখন সর্বপ্রথম এই হক্ সাহেবেরই "দৈনিক নবযুগে"ই কি লেখাই লিখলাম, আজ তা মনে নেই, কিন্তু পনর দিনের মধ্যেই কাগজের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

এই গান লিখি ও সুর দিই যখন, তখন অজস্র অর্থ, যশঃ-সম্মান, অভিনন্দন ফুলমালা—বাংলার ছেলেমেয়েদের ভালবাসা পেতে লাগলাম। তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ মাত্র। এই সম্মান পাওয়ার কারণ, সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই, জেলে গিয়ে চল্লিশ দিন অনশনব্রত পালন করি, রাজবন্দীদের উপর অত্যাচারের জন্য। এই অপরাধে আমাকে জেলের নানারকমের শৃঙ্খলবন্ধন ("লিঙ্ক-ফেটার্স", "বার-ফেটার্স", "ক্রস-ফেটার্স", প্রভৃতি) ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদী মালা পেয়ে আমি জেলের সর্ব জ্বালা-যন্ত্রণা অনশন-ক্লেশ ভুলে যাই। আমার মত নগণ্য তরুণ কবিতা-লেখককে কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তিনি জানেন। আমিও কোনদিন জিজ্ঞাসা করি নাই, তিনিও বলেন নাই। আজ এই প্রথম মনে হল, তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার "সুন্দরের" আশীর্বাদ এসেছিল, জেলের যন্ত্রণা-ক্লেশ দূর করতে। তখন কিন্তু একথা মনে হয়নি।

তখনো একথা ভাবতে পারিনি, এ লেখা আমার লেখা নয়, এ লেখা আমারি মাঝে আমার পরম বন্ধুর, আমারি সুন্দরের, আমারি আত্মাবিজড়িত আমার পরমাত্মীয়ের।

জেলে আমার সুন্দর শৃঙ্খলের কঠিন মালা পরিয়েছিলেন হাতে পায়ে, জেল থেকে বেরিয়ে এলেই আমার অন্তরের অন্তরতম সুন্দরকে সারা বাংলা দেশকে দিয়ে দিলেন ফুলের শৃঙ্খল, ভালবাসার চন্দন, আত্মীয়তার আকুলতা। আট বৎসর ধরে বাংলা দেশের প্রায় প্রতি জেলায়, মহকুমায়, বড় গ্রামে ভ্রমণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গেয়ে. কখনো-কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাংলা দেশকে ভালবাসলাম। মনে হল, এই আমার মা। তাঁর শ্যামস্নিগ্ধ মমতায়, তাঁর গভীর স্নেহ-রসে, তাঁর উদার প্রশান্ত আকাশের কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা নীলে আমার দেহমনপ্রাণ শান্ত উদার আনন্দ-ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে উঠল। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ-সুন্দর রূপে, আমার জননী জন্মভূমি রূপে। আমি সেদিনের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও নেত্রীদের আহ্বানে বাংলা দেশ পরিক্রমণ করেছি, আমি তরুণদের সাথে মিশেছি বন্ধু বলে, আত্মার আত্মীয় মনে করে, তারাও আমায় আলিঙ্গন করেছে বন্ধু বলে, ভাই বলে—কিন্তু কোনোদিন আমার নেতা হওয়ার লোভ হয়নি, আজও সে-লোভ হয় না। আমার কেবলই মনে হত, মানুষকে ভালবাসতে পেরেছি। জাতিধর্মভেদ আমার কোনোদিন ছিল না, আজও নেই, আমাকে কোনোদিন তাই কোনো হিন্দু ঘৃণা করেননি। ব্রাহ্মণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। এই আমি প্রথম আমার যৌবন-সুন্দর, প্রেম-সুন্দরকে দেখলাম।

তারপর আমার সুন্দর এলেন শোক-সুন্দর হয়ে। আমার পুত্র এল নিবিড় স্নেহ-সুন্দর হয়ে। বাহিরের মমতার মোমের মত ছিল সে সুন্দর, মমতার মধু-মাধুরী রস-সুরভি ছিল তার অন্তরে।

সে আমাকে আত্মার মত জড়িয়ে ধরল। যেখানে যেতাম, সে আমার সাথে যেত। আমার সাথেই খেলত, মান-অভিমান করত। যে-সুর শিখতাম, সে-সুর দু'বার শুনেই সে শিখে নিত। তখন তার তিন বছর আট মাস বয়স। একদিন রাত্রে বলল, "বাবা, চাঁদের মধ্যে কে একটি ছেলে আমাকে বাঁশি বাজিয়ে ডাকছে।" হঠাৎ আমার দেহে মনে কি যেন বিষাদের বিরহের বেদনার ঢেউ দুলে উঠল। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। সেই রাত্রে তার প্রবল জ্বর এল। ভীষণ বসন্তরোগে ভুগে হাসতে-হাসতে আনন্দধামের শিশু আনন্দধামে চলে গেল!

আমার সুন্দর পৃথিবীর আলো যেন এক নিমেষে নিবে গেল। আমার আনন্দ, কবিতা, হাসি, গান যেন কোথায় পালিয়ে গেল, আমার বিরহ, আমার বেদনা সইতে না পেরে। এই আমার শোক-সুন্দর।

এই আমার প্রথম প্রশ্ন জাগল—কোন্ নিষ্ঠুর এই সৃষ্টি করে, কেন সে শিশু-সুন্দর কেড়ে নেয়? এই শোকের মাঝে জেগে উঠল স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রগাঢ় অভিমান, সেই অভিমান ঘনীভূত হয়ে আমার সর্ব অস্তিত্বে দেখা দিল ভীষণ মৌন বিদ্রোহ হয়ে, বিপ্লব হয়ে। চারিদিকে কেবল যেন ধ্বনি উঠতে লাগল, "সংহার কর! ধ্বংস কর! বিনাশ কর!" কিন্তু শক্তি কোথা পাই, কোথায় কোন্ পথে পাব সেই প্রলয়-সুন্দরের, সংহার-সুন্দরের দেখা? আমি বসে চিন্তা করতে লাগলাম। কোথা হতে একজন সাথী এসে বললেন—"ধ্যান কর, দেখতে পাবে।" আমি বললাম, "ধ্যান কী?" তিনি বললেন—"একমনে তাঁকে ডাকা ও তাঁর চিন্তা করা।" এই প্রথম এলেন আমার ধ্যান-সুন্দর! মাঝে-মাঝে ভাল লাগত, মাঝে-মাঝে লাগত না। মাঝে-মাঝে ভ্রান্তি মায়া আমাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাতে লাগল। তারা বললে, আমরা তোমার প্রলয়-সুন্দরের প্রলয়-শক্তি; আমার সাথে পথ চল, তাহলে স্রষ্টাকে দেখতে পাবে—তাকে আমাদের শক্তিতে সংহার করতে পারবে। আমার যে সহজ-সাবলীল আনন্দ-চঞ্চলতা, যৌবনের মদির উন্মাদনা, গান, কবিতা ও সুরের রসমাধুরী ছিল, এদের সাথে পথ চলে যেন সে-সব শুকিয়ে গেল। আমি আমার প্রলয়-সুন্দরকে প্রাণপণে ডাকতে লাগলাম, "পথ দেখাও, তোমার পথ দেখাও।" কে যেন স্বপ্নে এসে বলল, "কোরান পড়, বেদান্ত পড়, ওতে যা লেখা আছে, তা পড়লে তোমার প্রলয়-সুন্দরকে—আমারও ঊর্ধ্বে তোমার পূর্ণতাকে দেখতে পাবে।" আমি নমস্কার করে বললাম, "তুমিই কি আমার কবিতায় লেখায় বিদ্রোহ হয়ে, বিপ্লব-বাণী হয়ে আমার কল্পনায়, আমার চেতনায় প্রকাশিত হয়েছিলে?" তিনি আমায় বললেন, "হ্যাঁ, আমি তোমারই পূর্ব-চেতনা, 'প্রিকন্‌শাস্‌নেস'।" ইংরিজিতে বললেন, বোধ হয়, আমি যদি পূর্ব-চেতনার অর্থ না বুঝি। আমি বললাম, "আবার তোমার সাথে দেখা হবে?" তিনি বললেন, "আমি যে নিত্য তোমার মাঝে আছি—আমি যে তোমার বন্ধু!" তিনি চলে গেলেন। সুখ-স্বপ্ন ভেঙে গেল, শিরায়-শিরায় অনুপরমাণুতে সেই আনন্দ-অমৃতের শিহরন সর্ব অঙ্গে জড়িয়ে রইল প্রিয়ার পুষ্প-মালার মত হয়ে।

গোপনে পড়তে লাগলাম বেদান্ত, কোরান। আমার পৃথিবীর আকাশ যেন কোন্ বজ্রনাদ ও তড়িৎলেখার তলোয়ারে বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি যেন আরো ঊর্ধ্বে যেতে লাগলাম। দূর হতে দেখতে পেলাম অপরূপ স্বর্ণ-সুন্দর জ্যোতি! এই আমার স্বর্ণ-জ্যোতি-সুন্দরকে প্রথম দেখলাম।

সহসা যেন কোন করাল ভয়ঙ্কর শক্তি আমায় নীচের দিকে টানতে লাগল। বলতে লাগল, "তোমার মাতৃ-ঋণ,—তোমার স্বদেশের ঋণ শোধ না হতে কোথায় যাবে উন্মাদ?" আমি বললাম, "সাবধান! আমার মাঝে আমার প্রলয়-সুন্দর আছেন!" সেই ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধশক্তি প্রবল বেগে নিম্নপানে টানতে লাগল। বললে, "সেই প্রলয়-সুন্দর তোমার মত অজ্ঞানোন্মাদ নন, তোমার সেই পৃথিবীর ঋণ, ভারতের ঋণ, বাংলার ঋণ, মানবরূপী তোমার আত্মার আত্মীয়ের ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ না করে তুমি যেতে পারবে না।" আমি বললাম, "তুমিই কি কোরানে লিখিত অভিশপ্তশক্তি শয়তান?" সে হেসে বললে, "হাঁ, চিনতে পেরেছ দেখে আনন্দিত হলাম! কোরানে কি পড় নাই, আমার ঋণ শোধ না করে তুমি স্রষ্টার কাছে যেতে পারবে না, তাকে দেখতে পাবে না! আমার বাধাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না!" অনুভব করতে লাগলাম, আমার প্রলয়-সুন্দর আর যেন সাহায্য করছেন না। মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে এলাম। এই

'পৃথিবীর মাটির মায়া আমাকে মায়ের মত প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরলেন, চুম্বন করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন। আমি বিদ্রোহ করে এই বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে, সেই ভয়ঙ্কর শক্তি পৃথিবীর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ভীষণ প্রহার করতে লাগলেন। আমার সহধর্মিণী অর্ধাঙ্গিনী শক্তিকে অর্ধপঙ্গু করে শয্যাশায়ী করে দিলেন। অর্থ কমিয়ে দিলেন, ভীষণ ঋণ দেনার রজ্জুবন্ধন করে প্রহার করতে লাগলেন।

আমার পৃথিবী এসে আমাকে ধরে আমার জ্বালা জুড়িয়ে দিলেন। এমন সময় এলেন আমার এক না-দেখা বন্ধু। তিনি, তাঁর বন্ধু, আমার এক বিদ্রোহী বন্ধুর মারফতে আমায় অপরূপ চৈতন্য দিলেন। আমি আবার এই প্রথম ধরিত্রী-সুন্দর মাকে ভালবাসলাম, জড়িয়ে ধরলাম। আমার সকল জ্বালা যেন ধীরে-ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল। আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল। আমি পৃথ্বিমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাংলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম, দৈন্যে, দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুরের, পীড়নে জর্জরিতা হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে-চোখে আনন্দ নাই, দেহে শক্তি নাই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈত্যদানব রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বললাম, "আমি ব্রহ্মা চাই না, আল্লাহ্ চাই না, ভগবান চাই না। এই সব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি নিজে এসে দেখা দেবেন। আমার বিপুল আছে, আমার অপার অসীম এই ধরিত্রী-মাতার ঋণ আছে। আমার বন্দিনী মাকে অসুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে আমার পূর্ণশ্রী-সুন্দর আনন্দ-সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নাই, আমার শান্তি নাই।"

ভয়ঙ্কর শক্তি আনন্দে হেসে উঠল। আমি বললাম, "এ তোমার অভিনয়!" সে বললে, "এই আমি প্রথম তোমার কাছে সত্যি করে হাসলাম, অভিনয় করিনি।" চেয়ে দেখি আমার পানে চেয়ে পৃথিবীর ফুল আনন্দে ঝরে পড়ল। আমি মাটি থেকে তাকে বুকে তুলে বললাম, "কেন তুমি ঝরলে?" ফুল বললে, "আমার মা লতাকে জিজ্ঞাসা কর, আমার রূপ-রসসুরভি-মধুকে জিজ্ঞাসা কর! তুমি যে এই পৃথিবীর সুন্দব মানুষ, তোমার মাঝে আমার সুন্দর আছেন, এই সুন্দরকে দেখে আমি আনন্দে ঝরে পড়লাম!" আমি ফুলকে চুম্বন করলাম, অধরে, বক্ষে, কপালে রেখে আদর করলাম। ফুল বলল, "আমার সুন্দরকে পেয়েছি, আমার এই রূপ-রস-মধু-সুরভি নিয়ে তোমার মাঝে নিত্য হয়ে থাকব।" এই আমি প্রথম পুষ্পিত-সুন্দরকে দেখলাম। এইরূপে চাঁদের আলো, সকাল-সন্ধ্যার অরুণ কিরণ, ঘনশ্যাম সুন্দর বনানী, তরঙ্গ-হিল্লোলিতা ঝর্ণা, তটিনী, কুলহারা নীল-ঘন সাগর, দশ-দিক-বিহারী সমীরণ আমায় জড়িয়ে ধরল, আমার সাথে মধুর ভাষায় বন্ধুর মত সখার মত কথা কইল। আমায় "আমার সুন্দর" বলে ডাকল।

সহসা এল ঊর্ধ্ব গগনে বৈশাখী ঝড়, প্রগাঢ়-নীল কৃষ্ণ মেঘমালাকে জড়িয়ে। ঘন-ঘন গম্ভীর ডমরু ধ্বনিতে, বহ্নি-বর্ণা দামিনী নাগিনীর ত্বরিত-চঞ্চল সঞ্চরণে আমার বাহিরে অন্তরে যেন অপরূপ আনন্দ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। সহসা আমার কণ্ঠে গান হয়ে সুর হয়ে আবির্ভূত হল—"এল রে প্রলয়ঙ্কর-সুন্দর, বৈশাখী ঝড় মেঘমালা জড়ায়ে।" আমি সজল ব্যাকুল চীৎকার করে উঠলাম। "তুমি কে—কে?" মধুর সজল কণ্ঠে উত্তর এল—"তোমার প্রলয়-সুন্দর বন্ধু।" আমি বললাম—"তুমি ত আমায় ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলে, আবার কী জন্য এলে?" সে আমার আত্মাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "তুমি স্রষ্টাকে সংহার করে তোমার মাকে সংহার করতে, মাতৃহত্যা করতে চেয়েছিলে, আত্মা-সংহার করতে চেয়েছিলে। তাই আমি তোমার দু'ধারী তলোয়ার কেড়ে নিয়ে অভিমানে ফিরে গেছি। তোমার চৈতন্য ফিরে এসেছে। তোমার মাঝেই তোমার স্রষ্টাকে দেখতে পাবে আজ সৃষ্টিতে, পৃথিবীতে আকাশে-বাতাসে, রস-ভরা ফলে, সুরভিত ফুলে, স্নিগ্ধ মৃত্তিকায়, শীতল জলে, সুখ-দায়ী সমীরণে তোমার সৃষ্টি-সুন্দরকে, প্রকাশ-স্বরূপে দেখেছ। তোমার না-দেখা পরম প্রিয়তম পরম বন্ধুকে বিপুল অসহ তৃষ্ণা-স্বপ্ন-সাধ-কল্পনা বাধা-না-মানা অসীমের পানে প্রবল প্রবাহ নিয়ে উজান গতিতে ঊর্ধ্বের পানে চলেছিলে, আজ সেই পরম পূর্ণতার, পরম শান্তির পরম মুক্তির আনন্দ-বাণী নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি তোমার বন্ধু হয়ে। এই পৃথিবীতেই তাঁর সঙ্গে তোমার অপরূপ পূর্ণ মিলন হবে। তার আগে তোমাকে এই অসুন্দর পৃথিবী সুন্দর করতে হবে, সর্ব অসাম্যভেদকে দূর করতে হবে। মানুষ যে তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তারপর হবে তোমার সুন্দরের সাথে

পরম-বিলাস পরম-বিহার। আমি অপরূপ আনন্দে মাভৈঃ ধ্বনি করে বললাম, "তবে দাও বন্ধু দাও আমায় দু'ধারী তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষাণ-শিঙা, দাও আমায় অসুর সংহারী ত্রিশূল ডম্বরুধ্বনি। দাও আমায় ঝঞ্ঝা জটিল জটা, দাও আমায় বাংলার সুন্দরবনের বাঘাম্বর। দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, দাও আমার জটাজূটে শিশু শশীর স্নিগ্ধ হাসি। দাও আমার তৃতীয় নয়ন, দাও সেই তৃতীয় নয়নে অসুর-দানব সংহারের শক্তি। দাও আমার কণ্ঠে এই পৃথিবীর বিষ, কর আমায় বিষ-সুন্দর নীলকণ্ঠ। দাও আমায় দামিনী-তড়িতের কণ্ঠমালা। দাও আমার চরণে নটরাজের বিষম তালের নৃত্যায়িত ছন্দ!"

বন্ধু হেসে বললেন, "সব পাবে, তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নাই! আর কিছুদিন দেরী আছে, তুমি অভিমান করে বিদ্রোহ করে নিজের কী ক্ষতি করেছ, নিজে কি কখনো চেয়ে দেখেছ? তুমি অরণ্যকণ্টক-কর্দমাক্ত পথে নিজের সর্বাঙ্গকে ক্ষত-বিক্ষত শক্তিহীন করে ফেলেছ। তোমার এইসব অপূর্ণতা পূর্ণ হোক, তখন তোমার প্রলয়-সুন্দর তোমার সর্বদেহে আবির্ভূত হবেন। তোমার সুন্দরকে তুমি লতার মত জড়িয়ে ধরবে, তাঁর না-শোনা বাণী তোমার লেখায় ফুলের মত ঝরে পড়বে।" আমি বললাম, "তথাস্তু।" বন্ধু বললেন, "সাধু! সাধু! তথাস্তু!"

"দৈনিক নবযুগ"। ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২।

বিজ্ঞাপন

পরিমল গোস্বামী

খবরের কাগজে খবর থাকে, বিজ্ঞাপনও থাকে। কিন্তু এমন লোকের কথা শোনা যায়, যিনি খবর পড়েন না শুধু বিজ্ঞাপন পড়েন। তাঁর কৈফিয়ৎ হচ্ছে খবর রোজ একই থাকে। ঘটনা যা ঘটে, প্রতিদিন সব একই ঘটে, শুধু যাদের নিয়ে ঘটে, তাদের নাম থাকে আলাদা। পঁচিশ বছর আগে ভজহরি ট্রেনে কাটা পড়েছিল। আজও সেই ট্রেনে কাটার খবর, নামটা শুধু ভজহরি নয়, কেষ্টহরি। প্রত্যেক দিন নাম বদলে বদলে ওই একই খবর তাঁর পড়তে ভালো লাগে না। তাই তিনি বিজ্ঞাপন পড়েন। তা ছাড়া খবরের একটা চেহারা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। তা থেকে দেশকে ঠিক চেনা যায় না। দেশের নাড়ির খবর তাতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় বিজ্ঞাপনে।

সাহিত্য যদি জীবনের প্রতিবিম্ব হয়, তা হলে একমাত্র বিজ্ঞাপনই সেই সাহিত্য যাতে সমাজ-জীবনের সম্পূর্ণ ছবিখানি দেখা যায়। অনেকেরই এই মত। একজন বলেন—ধরো না কেন, এই সোনার বাজারের বিজ্ঞাপন দেখে আমি দুনিয়া কোন পথে চলেছে তা বুঝতে পারি। যখন দেখি সোনার দর চড়ে যাচ্ছে তখন বুঝি যুদ্ধ এগিয়ে আসছে। সোনার দর কমলেই বুঝি যুদ্ধের ভয় আপাতত কমে গেল।

কিন্তু এ-তো গেল দুনিয়ার মতিগতি। দেশকেও জানতে পারি বিজ্ঞাপন পড়ে। পঁচিশ বছর আগের একটি বিজ্ঞাপন আজও আমি ভুলতে পারিনি। তাতে ছিল একজন গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক চাই—যিনি ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস এবং ভূগোল এই পাঁচটি বিষয়ে স্ট্রং। বেতন পঁচিশ টাকা। পাঁচটি বিষয়ে স্ট্রং বা শক্তিমান হবে, বি-এ পাশ করবেন এবং পাবেন পঁচিশ টাকা। সমাজের মর্মান্তিক একটি দিকের চেহারা। একটি যুবক পাঁচটি বিষয়ে স্ট্রং হয়ে বি-এ পাশ করেছে। কত আশা-আকাঙ্ক্ষা তার ছিল। স্কুলে পড়বার সময় তার জীবনের লক্ষ্য কী তা নিয়ে নিশ্চয় সে রচনা লিখেছে, সে বড়-একটা কিছু হবে। জজ ম্যাজিস্ট্রেট বা ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হবে বা ওই রকম চাকরি বা ব্যবসা অবলম্বন করবে। সে-জন্য এতগুলো বিষয়ে সে স্ট্রং হয়েছে। তারপর কী হলো ? তার স্বপ্ন ভেঙে গেল। এখন সে কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়েপড়ে আবেদন পত্র পাঠাচ্ছে।

তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পঁচিশ টাকা মাসে ? মন্দ কী ? কিন্তু সে-চাকরিও কি সে পাবে ? হয়তো পাবে না। হয়তো যে পাবে সে ছ-বিষয়ে স্ট্রং। ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে দেহ। শক্ত পেশী তার সর্বাঙ্গে। সে ছেলেদের শরীর চর্চা করাবে অতিরিক্ত, তাই সে পাবে। তার জানা আছে, এ-রকম বিজ্ঞাপনে অন্তত পাঁচ-শ আবেদনপত্র আসে। এই নির্দিষ্ট পদটির জন্যও ওই রকমই হয়েছিল। তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন। শুধু দরখাস্ত নয়, আবেদনকারীরা সবাই নির্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হয়েছিল। এবং হাতাহাতি পর্যন্ত করেছিল নিজেদের মধ্যে। হয়তো চাকরিটি জুটেছিল ছ-বিষয়ে স্ট্রং ব্যক্তির ভাগ্যেই।

পঁচিশ বছর আগে শিক্ষকদের বিজ্ঞাপন অনেক বেশি থাকত। বি-এ পাশের দর পনেরো টাকা পর্যন্ত নেমেছিল। এখন শিক্ষকদের বিজ্ঞাপন আগের মতো নেই। বেতনও আগের চেয়ে বেশি।

বিয়ের বিজ্ঞাপনও এখন বদলে যাচ্ছে। আগে ঘটকের বিজ্ঞাপন থাকত বেশি। এখন বিবাহার্থী নিজেই বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বেশি। আগে মোটামুটি একটা পণের অঙ্ক লেখা থাকত। চাকরির বাজারে যার দাম পঁচিশ টাকা, বিয়ের বাজারে তার দাম পাঁচ হাজার টাকা প্রায় বাঁধা ছিল। এখন পণের প্রস্তাব অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট থাকে। তার মানে মেয়েদের প্রতি আগে যে

একটা কৃপার ভাব ছিল, সেটা এখন অনেকখানি কেটে গেছে, এখন একটু যেন চক্ষুলজ্জা এসেছে। মেয়েরা শিক্ষিত হওয়াতে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়াতে বিজ্ঞাপনে এই রকম অপমানকর ভাষা এখন ক্রমেই কমে আসছে। মেয়েদের দিক থেকেও অনেকখানি উন্নতি দেখা যায়। পঁচিশ বছর আগেও যদি কোনও দেবতা এসে কোনও মেয়েকে বলতেন, মা লক্ষ্মী, আমি বর দিতে এসেছি, কী বর চাও ?—তা হলে বিনা দ্বিধায় মা-লক্ষ্মী বলত : আই-সি-এস বর চাই।

মেয়েদের দৃষ্টিতে এখন বাইরের আকর্ষণ, এমন-কি টাকার আকর্ষণও যেন কমে আসছে। এখন মানুষে মানুষে মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। এই পরিচয়ই হয়তো এখন বেশি দামী।

পরিবর্তনশীল সমাজের খাঁটি চেহারা এইভাবে ফুটে ওঠে বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। সমাজের আর একটি স্তরের পরিচয়ও বেশ পাওয়া যায়, এই স্তরে আছে চোরদের দল। চোরদের বিজ্ঞাপনও কাগজে দেখা যাবে নিয়মিত। যেমন, কোনও তেলের সঙ্গে দশ-বিশ রকম উপহারের বিজ্ঞাপন। এই উপহারের তালিকায় টয় রিস্ট-ওয়াচ নামক একটি লোভনীয় হাতঘড়ির উল্লেখ থাকে। টয় রিস্ট-ওয়াচ। ইংরেজি অনভিজ্ঞ মনে করে 'টয়' বোধ হয় প্রস্তুতকারকের নাম। টয় কথাটি অনেক দিন চলেছিল বাংলাদেশেই। তারপর যখন সাধারণ লোকেরা বার বার প্রতারিত হয়ে 'টয়' মানে খেলনা বুঝতে পারল, তখন টয়ের বদলে চলল ডামি রিস্ট-ওয়াচ। ডামি মানেও তাই, অর্থাৎ অকেজো, নকল। বেশ কিছুকাল চলল ডামি কথাটা। তারপর প্রতারিতরা ডামি কথাটিরও অর্থ বুঝে ফেলল। তখন ডামি কথাটি অচল হল এবং তার বদলে এল মিউট রিস্ট-ওয়াচ। মিউট মানে মূক, নির্বাক। মিউট ঘড়ি মানে যে-ঘড়িতে কোনও শব্দ হয় না। টয়ের যুগ গেল, ডামির যুগ গেল, এখন মিউটের যুগ চলছে। চোরের কৃপায় সাধারণ লোকের মধ্যে এই ভাবে ইংরেজি ভাষার প্রসার হচ্ছে অবশ্যই।

এই বিজ্ঞাপন থেকে আরও একটি বিষয় জানা যায়। সেটি হচ্ছে এই যে, বাংলার চোর টয় ও ডামি পর্যন্ত এগিয়ে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। তারপর থেকে অর্থাৎ মিউট শব্দ থেকে এ-ব্যবসা গেছে অন্যপ্রদেশের হাতে। এখন মিউট ঘড়ির যত বিজ্ঞাপন দেখা যায় তা সবই বাইরের। এটাই এখন একমাত্র সান্ত্বনা যে, বাঙালি এ-ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। আগে কলকাতার চোরেরা মফস্বলের লোকদের ঠকাত, এখন মফস্বলের চোরেরা কলকাতার লোককে ঠকাচ্ছে।

ভাগ্য-গণনা বা মাদুলির বিজ্ঞাপন থেকেও দেশের চেহারা খুব চমৎকার জানা যায়। যখন দেখা যায় এই জাতীয় বিজ্ঞাপন খুব বেড়ে গেছে, তখন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, লোকের দুর্দশা চরমে উঠেছে। যখন বুদ্ধিতে আর কিছু সে করতে পারে না, দিশেহারা হয়ে পড়ে, তখনই তো তার দৈব নির্ভরতা। চিন্তাশক্তি যখন প্রায় লুপ্ত, তখন ভাগ্যগণনা ও মাদুলি ভিন্ন গতি নেই।

বিজ্ঞাপনের সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য এত। যত দিন যাবে ততই সমাজ-বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকেরা পুরাতন বিজ্ঞাপন ঘাঁটবেন সমাজ ইতিহাসের মাল-মশলা সংগ্রহ করতে। বিজ্ঞাপন এ-বিষয়ে সচেতন, তাই তার সংখ্যাও দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। তাই খবরের কাগজে খবরের চেয়েও বিজ্ঞাপন বেশি হবার দিকে ঝুঁকেছে। শুধু কাগজে নয়, পথে, ঘাটে, গাড়িতে, বাড়িতে, দেয়ালে, গাছে, ল্যাম্প-পোস্টে, সর্বত্র বিজ্ঞাপন। চোখ চাইলেই চোখে পড়বে ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, উপরে, নীচে সব জায়গায় বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন কাগজবাহিত হয়ে ঘরে ঢুকছে, দেশলাইয়ের বাক্সবাহিত হয়ে পকেটে ঢুকছে। ঘরে-বাইরে গোপনতম এমন কোনও স্থান নেই, যেখানে সে যায়নি। প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর সকল দেশ থেকে বিজ্ঞাপন এদেশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করছে। এই বিজ্ঞাপন না থাকলে অন্তত শহরের চেহারা বদলে যেত, খবরের কাগজ কেউ কিনত কিনা সন্দেহ। শহরের পথে-পথে এমন বিচিত্র বিজ্ঞাপন চোখে না পড়ে উপায় নেই এবং এই বিজ্ঞাপনের জন্যই পথের দৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে এ-কথা বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে বার করেছেন। আগে বিজ্ঞাপনহীন পথের এক মাইল যেতে যত সময় লাগত, এখন বিজ্ঞাপনশোভিত পথের এক মাইল যেতে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে। কেন লাগে তা যে কেউ একটু ভাবলেই

বুঝতে পারবেন।

সব বিজ্ঞাপনই আবার নীরব নয়। সন্ধ্যাবেলা দেখা যাবে, অনেক ওষুধ বিক্রেতার মুখে বিজ্ঞাপন শব্দায়িত হয়ে উঠেছে। রেলগাড়িতে তো সর্বক্ষণ সশব্দ বিজ্ঞাপন রেলযাত্রীর জীবনে বৈচিত্র্য আনছে। ভাগ্যিস শহরের সকল বিজ্ঞাপন শব্দায়িত নয়। কিন্তু যদি হত, দৈবাৎ সকল বিজ্ঞাপন একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠার ক্ষমতা লাভ করত, তা হলে সেই দিনই শহর ধ্বংস হয়ে যেত কিনা কে জানে।

"ম্যাজিক লণ্ঠন"। শ্রাবণ ১৩৬২।

গোরুর গাড়ি

প্রথমনাথ বিশী

ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষের মতিগতি লক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অচল প্রাচ্য এবারে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পশ্চিমের লোকের চোখে এ-দেশকে যে অচল মনে হয় তার প্রধান কারণ, ও-দেশের চেয়ে এ-দেশের গতির তাল স্বতন্ত্র। এ-দেশ অচল নয়, মন্থর। যে-ব্যক্তি এরোপ্লেন উড়িয়া চলিয়াছে, তার কাছে মাটির গোরুর গাড়িটাকে অচল বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু গোরুর গাড়ি তো অচল নয়—মন্থর মাত্র। এতদিনে সেই সনাতনী ভারতবর্ষীয় গোরুর গাড়িও বুঝি লোপ পায়। যন্ত্রবাহন, যন্ত্রবহুল ইউরোপের নিরন্তর কর্মব্যস্ততার হাঁসফাঁস আমাদের শান্ত জীবনের মধ্যে অনেক পরিমাণে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আমরা ইউরোপের মেল গাড়িখানার পিছনে বাঁধা অনিচ্ছুক মালগাড়িখানার মতো ছুটিতে বাধ্য হইতেছি। নাগরিক ভারতবর্ষ ইউরোপের Parody হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন সত্তা এখনও আছে পল্লী-ভারতের; স্বাধীন গতি এখনও আছে এ-দেশের গোরুর গাড়ির; পল্লীগ্রামের ধমনীর তাল এখনও স্পন্দিত ওই গোরুর গাড়ির গতিতে। গোরুর গাড়ির পরিবর্তে এদেশের পল্লীর শত সহস্র অখ্যাত জটিল পন্থায় একবার মোটর গাড়ি চালু করিয়া দাও। ব্যস্, আর কিছুই করিতে হইবে না। দেখিতে-দেখিতে এখনও যেটুকু ভারতবর্ষীয়ত্ব আছে, তাহা লোপ পাইবে—আমরা সর্বতোভাবে ইউরোপের Parody হইয়া উঠিব। সেই আশঙ্কাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধ উপলক্ষে যে সব মার্কিন মিস্ত্রি এদেশে আসিয়াছে তন্মধ্যে একজন ভারতবর্ষের গোরুর গাড়ি দেখিয়া বড়ই হতাশ হইয়াছে। বোধ করি গোরুর কষ্ট দেখিয়া লোকটা গোরুর প্রতি অনুকম্পান্বিত হইয়া স্থির করিয়াছে, শীঘ্রই একপ্রকার উন্নত ধরনের গোরুর গাড়ি তৈয়ারি করিয়া আনিয়া এদেশে চালু করিবে। মানুষ যখন বিশেষ করিয়া পশুর প্রতি সমবেদনাপরায়ণ হইয়া ওঠে, তখন দেখা যায়, তার ফলে, পশুর দুঃখ তো কমেই না—বরঞ্চ মানুষের দুঃখ বাড়িয়া যায়—প্রকৃষ্টতম উদাহরণ, পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি। এই মার্কিন মিস্ত্রির সমবেদনার প্রস্তাবের ফলে প্রতিদিন আশঙ্কায় কাটিতেছে—কবে বা উন্নততর ধরনের গোরুর গাড়ি এ-দেশের সনাতনী গোরুর গাড়িকে কোণঠাসা করিয়া পথঘাট জুড়িয়া বসে। এই উন্নততর গোরুর গাড়ি ঠিক কী রকম হইবে জানি না—তবে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বস্তুটা নিম্নতর ধরনের মোটর গাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, ও-দেশের জখমী মোটর গাড়িগুলিকেই নূতন ধরনের গোরুর গাড়ি বলিয়া এ-দেশে চালাইয়া দেওয়া হইবে—কেবল তাহাতে Horse Power-এর বদলে Bullock Power যোগ করা হইবে। এদেশের গোরুর দুঃখ যে কমিবে—এমন অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তবে এদেশের কারখানার মালিকদের কিছু ঘাটতি কমিলেও কমিতে পারে। আর এ-দেশের যেসব কারিগর গোরুর গাড়ি তৈয়ারী করিয়া জীবিকা অর্জন করিত তাহাদের বৃত্তিহীন হইবার আশঙ্কাও অল্প নয়।

কিন্তু এ সব তো গেল অর্থনীতির হিসাব। এ-ছাড়া আর একটা হিসাব আছে, যাহাকে বলা যাইতে পারে, পরমার্থ নীতির হিসাব। সেই পরমার্থ বা গোরুর গাড়ির বিশেষ তত্ত্বটি কী? এ-দেশের শাসনযন্ত্রটার চালক যাহাতে ভারতবর্ষীয় লোক হয়, সেজন্য বৃটিশ গভর্নমেন্টের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে। ভারতীয়দের দ্বারা শাসনকার্য চালিত হইলে দেশের কিছু উন্নতির আশা করা একবারে অবাস্তব নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি ভারতীয়দের মন ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া গিয়া থাকে, অর্থাৎ এমন যদি হয় যে, তাহারা দেহে ভারতীয় আর মনে ইউরোপীয়, তবে সে-রকম চালকের, দ্বারা শাসনযন্ত্র চালিত হইলে এমন কী লাভ হইবে? ক্ষতি হওয়াও বিচিত্র নয় চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, আমাদের মন কি ধীরে-ধীরে পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে

না ? মানুষের চেয়ে কলের উপরে আমাদের ভরসা কি ক্রমেই প্রবল আকার ধরিতেছে না ? এ-দেশের গোরুর গাড়িতে যে-মোহ আছে, সৌন্দর্য আছে, তাহার ধীরমন্থর গতিতে ভারতবর্ষের ধীরমন্থর জীবনের যে-স্পন্দন আছে তাহা কি আর তেমন করিয়া আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে ? সংস্কারের ঝোঁকে কি আমরা সংস্কৃতিকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলি নাই ? ভাঙনের নেশায় কি আমরা ভাঙিবার হাতুড়িটা পর্যন্ত ভাঙিয়া বসি নাই ? কালাপাহাড় আমাদের চেয়ে চতুর, সে হাতুড়িটা কখনও ভাঙে নাই।

ভারতবর্ষের প্রতীক ভারতবর্ষের সনাতন গোরুর গাড়ি ! আমি যদি চিত্রকর হইতাম—আর, কখনও ভারতবর্ষের একটি প্রতীকী চিত্র আঁকিবার প্রয়োজন হইত—তবে আর কিছু না আঁকিয়া একখানি গোরুর গাড়ি আঁকিতাম। উদার প্রান্তরের বুক চিরিয়া সরু একটি পথের ফালি, উচ্চাবচ তরঙ্গিত হইয়া নিরুদ্দেশের মুখে ধাবিত হইত, সেই পথের উপরে একখানি গোরুর গাড়ি। গাড়োয়ান মাথায় জীর্ণ গামছা বাঁধিয়া একটি বাঁশের বাঁশি বাজাইতেছে। তাহার মুখে চোখে কিছুমাত্র ত্বরা নাই ; গাড়ির মন্থর তালের সঙ্গে বাঁশির সুর মিশিয়া রৌদ্রদীপ্ত নীল আকাশের গায়ে-গায়ে সৌন্দর্যের আলোকলতা বয়ন করিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর শ্যামল মরকতের পাত্রের উপরে রৌদ্রে-মাজা আকাশের নীলার মুখাবরণ, আর তার উপরে বাঁশির সুর আর রোদের টানা-পোড়েনে-বোনা খুঞ্চাপোষটি কাহার নিপুণ হাতে সযত্নে টানিয়া দেওয়া !

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রাভিষেক অতিক্রম করিয়া কোন্ সন্ধ্যার স্বর্ণতোরণের অভ্যন্তর দিয়া নক্ষত্রভাস্বর নিশীথের অভিমুখে সেই গোরুর গাড়ির নিরুদ্দেশ যাত্রা ! তাহার ত্বরা নাই, তাহার বিশ্রাম নাই। "Without haste, without rest!" ভারতবর্ষের পরিজ্ঞাত ইতিহাস, অর্ধজ্ঞাত পুরাণ ও অজ্ঞাত কিংবদন্তীকালের এমন প্রতীক আর কী হইতে পারে জানি না ! এ-গোরুর গাড়ির আবিষ্কার কে করিয়াছিল কেহ জানে না। আর্যগণ আসিবার আগে আর্যেতর সভ্যতা ছিল, তারও আগে হইতে ছিল গোরুর গাড়ি। গোরুর গাড়ি ও বিন্ধ্যপর্বত ভারতের প্রাচীনতম বস্তু। আর্যবংশোদ্ভূত অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বতের মহিমাকে খর্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু লোপ করিতে পারেন নাই। আর্যরাজাদের পুষ্পক রথ গোরুর গাড়িকে দ্রুত অবজ্ঞায় অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু সে-পুষ্পক আজ কোথায় ? বিন্ধ্যপর্বতের খর্বোন্নত অনাড়ম্বর অঙ্গমালা। ধীর-মন্থর গমনে ভারতবর্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত—গোরুর গাড়িও গুজরাট হইতে আসাম পর্যন্ত আপনার চলমান অধিকার স্থাপন করিয়াছে। রেল, মোটর, এরোপ্লেন তাহার রাজ্যের প্রত্যন্তে আসিয়া বাধা পায়—প্রবেশ করিতে পারে না।

এবারে তাই কলের গাড়ি নাম ভাঁড়াইয়া গোরুর গাড়ির রাজত্ব আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে ? মোটর গাড়ি এবার গোরুর গাড়ি সাজিয়া সমুদ্র-পার হইতে আসিতেছে। মার্কিনী পরিকল্পিত এই নূতন গোরুর গাড়ি যানবাহনের রাজ্যে 'পঞ্চম বাহিনী'। এবারে তাহার হাতে রক্ষা পাওয়া ভার।

ইতিহাসের যাত্রাপথে ভারতবর্ষের আর-একটি সঙ্গী আছে—চীনদেশ। চীনের প্রতীক : গোরুর গাড়ি। পৃথিবীর ইতিহাসে দুইখানি গোরুর গাড়ি পাশাপাশি চলিয়াছে—চীন আর ভারতবর্ষ। গোরুর গাড়ির মানদণ্ডে দুইট সভ্যতম দেশ আবার মোটর গাড়ির মানদণ্ডে দুইটি অসহায়তম, পশ্চাদ্‌গামী-তম দেশ। মোটর গাড়ির প্রচুর ধূলিজালে গোরুর গাড়ি অর্ধচ্ছিন্ন—বিকৃতভাবে চোখে পড়িতেছে। এরোপ্লেন বিদ্যুৎগতিতে উড়িয়া যায়—ওই গতির দ্রুতিই গোরুর গাড়িকে দেখিবার অন্তরায় ; ওই গতির দ্রুতিতেই গোরুর গাড়িকে অচল বলিয়া মনে হয়। এই মানদণ্ডেই ভারতবর্ষ এবং চীন অসভ্য।

চীন আর ভারতবর্ষ যত দুর্গতি সহ্য করিয়া জীবিত আছে, এমন আর কোনও জাতি নয়। এর চেয়ে অনেক কম দুর্দশায় অনেক জাতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ! এই চিরজীবিতা সভ্যতার প্রধান প্রমাণ। আর এই চিরজীবিতার কারণ, চীন ও ভারতবর্ষ গোরুর গাড়ির তত্ত্বকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিল। গোরুর গাড়ি প্রস্তুত করা সহজ ; নষ্ট হইলে মেরামত করা কঠিন নয়, আর তাহাকে চালনার কোনরূপ কৌশলের প্রয়োজন নাই। ক্ষেতের একটা গাছ আর খামারের দুটো গোরু, এই তো তার সরঞ্জাম ! এই দুই প্রাচ্য দেশ জীবনযাত্রার 'গর্ডন গ্রন্থি' গোড়া ঘেঁষিয়া ছেদন করিয়া

দিয়াছে, সেই জন্যই বহু আততায়ী জাতি এই দেশকে জয় করিয়াছে, কিন্তু কেহই বশ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ তাহার প্রাণকে সাত লক্ষ ভাগে দেশের সাতলক্ষ গ্রামে ছড়াইয়া দিয়াছে। সে প্রাণপুরুষকে পুঞ্জীভূত করিয়া নগর গড়ে নাই। ভারতবর্ষের সভ্যতার লক্ষণ বিকেন্দ্রীকরণ ; তাহার প্রাণ গ্রামে, আর গোরুর গাড়িতে গ্রামের রক্ত চলাচল করে।

ইউরোপ সভ্যতাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া শহর গড়িয়াছে। একটি শহরে দেশের প্রাণ পুঞ্জিত, সমস্ত দেশ সেখানে পৌঁছিতে চায়, কাজেই আবশ্যক তার দ্রুতি। আর এই চাহিদার ফলেই দ্রুত বাহনের সাধনায় সে রেল, মোটর, এরোপ্লেন আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু এই ঐকান্তিক কেন্দ্রীকরণই তার মৃত্যুর কারণ। একটি শহরের পতন হইলেই কেন যে একটি দেশের পতন হইবে তা ভারতবর্ষ বুঝিতে পারে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লন্ডন ও দুই চারটা শহরের পতন ঘটিলেই ইংলন্ড জার্মানি-কবলিত হইত। প্যারিসকে রক্ষা করিতে গিয়া ফ্রান্স গেল। বার্লিনের পতনের পরে আর জার্মানীকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না। নেপোলিয়ান মস্কো অধিকার করিয়াও রাশিয়াকে পদানত করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তারপর হইতে রাশিয়া কেন্দ্রীকরণের সাধনায় নিরত। এবারে মস্কো অধিকৃত হইলে যে তাহার পতন ঘটিত না, এমন মনে করিবার কী হেতু আছে ? এ-কথা আর কেহ জানুক বা না জানুক, স্ট্যালিন বিলক্ষণ জানিতেন। তাই জার্মানীর মস্কো-অভিযান সমস্ত পণে তিনি ঠেকাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ-সমস্তের মূলেই ওই কেন্দ্রীকরণের আতিশয্য। কেন্দ্রীকরণ কাচের ন্যায় কঠিন, কিন্তু ভঙ্গুর। কেন্দ্রীকরণ দেশকে প্রবল করে, কিন্তু যখন ভাঙে তখন আর রক্ষা নাই। বিকেন্দ্রীকরণ রবারের মতো, নরম কিন্তু স্থিতিস্থাপক। তাহা দেশকে প্রবল করে না, কিন্তু সহিষ্ণুতার বল দান করে। মোটর দৌড়ায় খুব, কিন্তু একবার ভাঙিলে তাহাকে ঘাড়ে করিয়া বহন ছাড়া গত্যন্তর নাই। আর মন্থর গোরুর গাড়ি ভাঙিতে পারে সত্য, কিন্তু সারাইতে কতক্ষণ !

পাঠক, এ-সব কথা হয়তো তোমার ভাল লাগিবে না, খুব সম্ভব বুঝিতেও পারিবে না। কিন্তু এত গোলযোগে প্রয়োজন কী ? শীতের রাত্রে দীর্ঘপথ গোরুর গাড়িতে করিয়া কখনো গিয়াছ কি ? প্রচুর খড়ের গাদির উপর বিছানাপাতা, দু'দিকে মোটা পর্দা টানিয়া দিয়া, পথের তালে-তালে দুলিলে-দুলিতে যদি কখনও যাত্রা করিয়া থাকো—তবে বুঝিবে গোরুর গাড়ির মহিমা ! তার কাছে রেল, মোটর তুচ্ছ। গরুর গাড়ির মন্থরতায় একপ্রকার নবাবী আছে, যাহার অধিকাংশই দিল্লীশ্বর বাদশাহী অম্বুরী তামাক প্রভৃতির সঙ্গে গত হইয়াছে। এই নবাবী প্রাচ্যের স্বভাব-সিদ্ধ। ব্যস্ত-বাগীশ পশ্চিম এরোপ্লেনে চড়ে তো চড়ুক। এসো পাঠক, আমরা উদ্দেশহীন গোরুর গাড়ির লক্ষ্যহীন যাত্রায় বাহির হইয়া পড়ি। প্রচুর অবকাশের ঢিলে-জামাটা গায়ে জড়াইয়া আসর জমাইয়া বসি। পশ্চিমের অচলতার অপবাদের উত্তরে আমরা বলিব—ওরা চঞ্চল, ওরা নিতান্তই ছেলেমানুষ। এত হাঁসফাঁসের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের ত্বরা নাই, আবার বিরামও নাই।

"বিচিত্র উপল"। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

চিত্রকলা

শিবরাম চক্রবর্তী

সঙ্গীত-বিদ্যা হচ্ছে স্বতস্ফূর্ত। সকলেই গাইতে পারে। স্বরকে নাকের ভিতর দিয়ে ছাড়লেই সুর। স্বভাবতই ঋ ঐ এবং ঔ বাদে আকারাদি যে কোনও স্বর নাসারন্ধ্রের পথ ধরলেই রাগরাগিণীর আকার ধারণ করে। হ্রস্বদীর্ঘের বালাই নেই। কেবল প্লুতস্বর হলেই হল— নিজগুণেই তা সঙ্গীত রসে আপ্লুত হয়ে ওঠে। সরস্বতী নাকের গোমুখী দিয়ে নামলেই সুরধুনী। কে ঠেকায়? তখন আপনি গুনগুন করেও গাইতে পারেন, আবার আপনার গানের গন্‌গনে আঁচও দেখা যেতে পারে। গুঞ্জনই হোক আর গঞ্জনাই হোক, আপনি তখন গাইয়ে। সুর নাড়তে থাকুন, (হাতি কিংবা গণেশের মতো) ঐশ্বরিক অবলীলায়— গানের ঐশ্বর্য আপনার গলায়। আপনিই গল্‌ছে অথবা আপনিই গলাচ্ছেন।

গানকে ছিপের মতো একান্তে একজনের উদ্দেশেও ফেলা যায়, সেখানে একটি মাত্র উৎকর্ণকে খেলিয়ে তোলাই হবে লক্ষ্য। কেবল দেখতে হবে, যেন সে পালিয়ে না যায়। গাঁথা যেন ভালো হয়। এই কারণেই গীতকে অনেক সময়ে গাথাও বলা হয়ে থাকে।

আবার গানকে সুরের জালের মতো বিস্তার করে একটা এস্‌পার-ওস্‌পার কাণ্ডও করা যেতে পারে! একসঙ্গে অনেকের কানান্ত করতে হলে সেইটেই রেওয়াজ। গান হচ্ছে কুরুক্ষেত্র ব্যাপার, একটিই হোক বা একাধিক হোক, কর্ণবধেই তার সার্থকতা।

ছিপের মতন ছাড়ুন বা জালের মতোই ছড়ান, সুরের ছলনাই হল আসল। শুঁড়ের জালিয়াতি। সুর আর শুঁড়—একই নাকের সীমান্ত থেকে হামলা দিতে বেরয়। নাসিকের ঢোল কর্ণাটে সহরৎ হতে থাকে। সভ্যতার বর্তমান সঙ্কটে তথাকথিত ভদ্রসমাজে হাতের সুখের জন্য কারও কান মলতে পাওয়ার সুবিধে নেই— কান প্রায় পরস্ত্রীর মতই— একজনের কান অপরজনের নাগালের বাইরে। এক্ষেত্রে কেবল সুর বাড়িয়েই পরের কান পাকড়ানো যায়। পরকীয়া পরথের এইটিই পথ। আর এ-যুগের কানাইরা ওই ভাবেই জমিয়ে থাকেন!

অবিশ্যি আপনার গানের পটুতাই অপরকে পটানোর পক্ষে যথেষ্ট না হতে পারে— শ্রোতার-কর্ণপটাহও জোরালো হওয়া দরকার। 'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে!' কেবল গাইয়ের নয়তো দুধ, গোয়ালারও কিছুটা বইকি। কালাপাহাড়ের কাছে কালোয়াতির কোনও কদর নেই। না-কালাকে নাকাল করতে পারাতেই তার ওস্তাদি। গাইয়ে আর শুনিয়ের— নিজেদের নাকে-কানে খৎ দিয়ে, ক্ষত সৃষ্টি করে নিজেদের এই যে সাজা দেওয়া, বিবাহিত জীবনের বাইরে এমন মজা, ঈদৃশ সমঝদারি দুর্লভ।

কিন্তু গাইতে পারা যেমন সোজা, আঁকতে পারা তেমন না। আঁকের জগতে দুয়ে-দুয়ে চার এবং গোরুর বাঁটে দুয়ে-দুয়ে দুধ হতে পারে কিন্তু আঁক আর আঁকা এক নয়। আঁকিয়ের কাছে দুয়ে-দুয়ে বাইশ। দুটি রেখায় লেখমালার মধ্যে কেবল দুটি মাত্র কথা নয়, আরও বিশটা কথা মুখর হয়ে উঠলেই সেটা ছবি। তাতে কুলো-পানা চক্করও যেমন, বিষও তেমনি।

অঙ্ক-বিদ্যা আর অঙ্কন-বিদ্যা এক নয়। একই কাগজের পিঠে উভয়ে ফলাও হলেও দুয়ের ভেতর ভয়ঙ্কর ফারাক। কাগজ এক হলেও ওদের আঁকবার ধরনও এক রকমের না। যদিও আঁকের মতই, আঁকারও অনেক সময় ফল মেলে না।—আঁকিয়েরা বলে থাকেন, তাহলেও, সমান নিষ্ফল হলেও, ওরা এক জাতের গাছ নয়। ওদের বীজ-গণিতে অঙ্কুরে আর পাতাবাহারে পার্থক্য আছে।

অঙ্কের হচ্ছে কষাঘাত, আর ছবির কাজ বশীকরণ। শিল্পীর স্থান আঙ্কিকের উপরে। আঁক

কথার চেয়ে তুলি কসানো কঠিন। এমন কি আপনার গীতিকারের চেয়েও। কেবল নাক থাকলেই গাওয়া যায়, কিন্তু ছবি আঁকার knack থাকা চাই।

আঁকি-বুঁকির চর্চায় আমার অনেক আয়ু গেছে। আর্টিস্ট হিসেবে আমি কোন্ স্কুলের তা বলা হয়তো একটু দুরূহ হলেও ইস্কুলে পড়বার কালেই যে এই বিদ্যায় অধমের হাতে খড়ি, তা জানাতে আমার সঙ্কোচ নেই। অঙ্কের খাতায় আঁকের বদলে আঁকের মাস্টারকে অঙ্কিত করেই এর সূত্রপাত হয়েছিল। তারপরে অবিশ্যি আমি হেড পণ্ডিতকেও এঁকেছিলাম— হাত আর একটু পাকলে পরে।

তারপর থেকে আঁকার বদভ্যাস আমি বরাবর বজায় রেখেছি। এঁকে চলেছি— এঁকে, ওঁকে, তাঁকে। লেখা আর রেখা চালিয়ে এসেছি সমানে। এখনও আমি ছবি আঁকি— এঁকে থাকি— সভাযাত্রার সুযোগে। সভাসমিতিতে গেলেই আমাকে আঁকতে হয়। সাধারণত সভাসমিতিই হচ্ছে ছবি আঁকার শ্রীক্ষেত্র।

লক্ষ করে দেখেছি, বক্তাদের বাগাড়ম্বরের কালে ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছুই তেমন করবার থাকে না। তখন ওই হচ্ছে একমাত্র কলা যার কারবার চলে। জুত করে ফলানো যায়। কারও বক্তৃতার ফাঁকে আপনি গান গাইতে পারেন না—পারলেও খুব কদাচ। অথচ কাগজ-পেনসিল নিয়ে ওই অবকাশে অনায়াসেই ছবি আঁকা যায়। এন্তার— যতখুশি এবং আমিও ঠিক তাই করে থাকি। আমি যে চিত্রশিল্পে সিদ্ধহস্ত একথা বলি না, তবে আর কয়েকটা সভাসমিতিতে যোগ দিতে দিতেই পারদর্শী হতে পারব এমন আশা রাখি।

কাগজ-পেনসিল বগলে নিয়ে সভায় তো গেলেন, কিন্তু আঁকবেন কী ? আঁকবেনই বা কখন ? কখন ? যখন দেখবেন সভা বেশ জমজমাট, আর বক্তৃতাও কিছুদূর গড়িয়েছে, তখনই আঁকা শুরু করতে পারেন। আর, কী আঁকবেন ? কেন, মানুষ। সবার উপরে মানুষ সত্য—এমন কি চিত্রকলাতেও। মানুষকে চিত্রিত করাই সব আর্টিস্টের প্রথম দায়। খোদ সভাপতিকে নিয়েই আপনি শুরু করতে পারেন। বক্তাদের আঁকতেও বাধা নেই। শ্রোতাদের ভেতর থেকেও পছন্দ করে আঁকা যায়। অবিশ্যি এঁদের অনেকেই মানুষ কি না সে-বিষয়ে আপনার সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। আমার তো মশাই মানুষ নিয়েই কারবার— যা কিছু কারুকাজ ! প্রথমে তার মাথা নিয়েই আমি আরম্ভ করি। সব আগে তার কপাল আঁকি (শোনা যায় বিধাতা পুরুষও ঠিক তাই করে থাকেন। কপাল থেকেই তাঁরও নাকি রেখায়ন। আর শিল্পী— যেকালে স্রষ্টার সগোত্র, খোদার মতই তার খোদকারি হবে, কিছু বিচিত্র নয়।) তারপর কপালক্রমে শুরু করে একেবারে তার চিবুক পর্যন্ত নেমে আসি। নিজের স্বচ্ছন্দে এঁকে যাই— এঁকে বেঁকে চলে যাই।

তারপর বহির্দৃশ্য শেষ হলে তার চোখ নিয়ে পড়ি। মানুষকে চোখা করে তোলাই সব চেয়ে শক্ত কাজ। চক্ষুদান করাই অঙ্কন বিদ্যার সর্বাপেক্ষা কষ্টকর অংশ। চোখটা যে কোথায় বসবে, সহজে ঠিক করা যায় না। যদি ঠিকমত না বসে, বেখাপ্পা দেখায়, তখন সেই বিসদৃশ ব্যাপার থেকে একমাত্র বাঁচোয়া হচ্ছে মানুষটাকে চশমা পরানো। তাতে চোখের দোষ কেটে গিয়ে তাকে বেশ চৌকস দেখাতে থাকে। মানুষকে খাপ-সুরৎ করতে মশাই, চশমার তুল্য আর নেই।

মাথার সম্মুখভাগ শেষ হলে তখন তার বাদবাকি। কিন্তু মাথার পশ্চাদ্দিক আঁকাটা তত সহজ নয়। অনেকখানিই তার অনিশ্চিতের গর্ভে। অনেকটা জুয়াখেলার মতই। বেশির ভাগ লোকটার বরাতের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তা হলেও দক্ষশিল্পীর হাতযশ নেহাত ফ্যালনা নয়। তবু সামনের সঙ্গে পিছন মেলানো, ভালো নাপিতের বাহাদুরির মতই, দুর্লভ কীর্তি। রীতিমত অধ্যবসায়-সাপেক্ষ।

এর পরের কাজ হচ্ছে, লোকটির প্রতি কর্ণপাত করা। তার কান বানানো। কানের কাজটা সারতে পারলেই বাকিটা তখন বিলকুল কিছু না। কিন্তু কান দেওয়া সহজ নয়, চোখ দেওয়ার চেয়েও কঠিন। আরও এক প্রকাণ্ড ব্যাপার, কানটাকে আমি ঠিকমত টানতে পেরেছি বলেই মনে করি। একটু ডানদিক-ঘেঁষা বলে ধারণা হতে পারে, কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে, চারা নেই ! একবার কান দেবার পরে আর ফেরানো যায় না। ফেরার পথ তখন রুদ্ধ। পুরাকালের কর্ণও, অযথাস্থানে রয়েছেন জেনেও, ফিরতে পারেননি—মহাভারতে তার প্রমাণ আছে।

এইবার চুলের পালা। এটা বেশ আরামের কাজ—ফুর্তির সঙ্গেই করা চলে। খুব ঝাঁকড়া ঝাঁকড়াও করতে পারেন, কুচকুচে কালো করতেও বাধা নেই, আবার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অতিশয় বিরল করাও কিচ্ছু শক্ত নয়। ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদামের জন্য বেশি দামের নরম পেনসিল নিতান্ত জরুরি। মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপিত মেয়েটির মতো, আমিও নিজে ঘন কালো চুল ভালোবাসি ; কেন না তা হলে তার মধ্যেকার সিঁথির রেখা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চুল না-আঁকা পর্যন্ত মানুষের মাথা যে কত বড়, তার কোনও ধারণাই গজায় না। চুল শুধু মাথার বাড় নয়, মাথাকে বাড়িয়ে বৃহৎ করে দেখানোও তার একটা কাজ। ও হচ্ছে মাথার মহাভারতে একাধারে বনপর্ব আর বিরাটপর্ব। চুল আঁকতে গিয়ে গোটা একটা বক্তৃতা কাবার হয়ে যায়— এমন কি, সভাপতির অভিভাষণ পর্যন্ত এই চুলেই চলে যেতে পারে। (চুলোয় নয়, এখানে মুদ্রাকর-প্রমাদ হওয়া অবাঞ্ছনীয় হবে। ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য)।

এবার অন্য চিত্র। এত কাণ্ড করে যে-আদমিটিকে আমি আমদানি করলাম, তাকে একবার দেখা যাক। গোড়াতেই বলে রাখি, এটি আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়। (এর চেয়েও ভালো মানুষ আমার হাতে এসেছে— ঢের ঢের ভালো মানুষ। খারাপ মানুষও অবিশ্যি কিছু কম আসেনি। কিন্তু সে উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক) বক্ষ্যমাণ লক্ষ্যটির দিকে তাকালে প্রথমেই ওর কানের খুঁত চোখে পড়বে। কানটা যেন একটু দক্ষিণাপথ নিয়েছে। কানটাকে ভারি পাতলা বলে জ্ঞান হবে— আমাদের নেতারা সচরাচর যেমন কান-পাতলা হয়ে থাকেন। তারপর এর চোখ। কালবিলম্ব না করে এই লোকটির চশমা নেওয়া উচিত ছিল বলেই আমি মনে করি। দৃষ্টি এতই সূক্ষ্ম, আছে কি নেই বোঝাই দায়। কিন্তু চশমা নিলে সম্ভবত ওকে আধুনিক কবির মতো দেখাতে পারত এবং নেহাত মন্দ দেখাত না। সেক্ষেত্রে, চুলচেরা ভাবে খতিয়ে, আরেকটা বৃহত্তর বাগ্মিত্যের সুযোগে, আধুনিক কবির চশমার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর খাতিরে ওর কেশ কলাপকেও ফলাও করে আরও একটু বেশি জাহির করার প্রয়োজন হয়তো ছিল মনে হয়।

আমার শিল্পকীর্তির পরাকাষ্ঠা, বেশির ভাগ মানুষই, আমি দেখেছি, পশ্চিম দিকে মুখ করে জন্মায়। কেন যে, সে-রহস্য এখনও আমার অজানা। অনেকটা আমাদের দেশের সেরা মানুষদের মতই— পশ্চিমদিকে মুখ ফেরানো। সাবেক কঙ্গরসিক, প্যান্ ইসলামিক বা আধুনিক মস্কো-পন্থী— পূর্ব এবং অপূর্ব-যুগের— জাতীয় ও বিজাতীয় যাবতীয় নায়কের মতই এগুলি যেন পশ্চিমদিকে মুখিয়ে রয়েছে।

পরিপ্রেক্ষিত ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। ও-আঁকার সবচেয়ে সোজা উপায় হচ্চে, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মত লম্বা আর ফাঁকা একটা রাস্তা টানা। আর তার ধার-বরাবর টেলিগ্রাফের তার লাগানো সারি-সারি দাঁড়ি খাড়া করে দেয়া। আমি আবার সেই সাথে রাস্তার এক পাশে লম্বা বেড়া বেঁধে দিই। খুব মজবুত বেড়া হয়নি যদিও। নিসর্গদৃশ্য প্রধানত পাহাড়, উপত্যকা, গাছপালা ইত্যাদি অবলম্বনে আঁকতে হয়। তার মধ্যে গাছগুলিই হচ্ছে সবচেয়ে মজার।

অবিশ্যি এই ধরনের মাস্টার-পিস রচনা করতে দস্তুর মতো সময় লাগে ; মহতী সভার অধিবেশন আর বৃহৎ পেনসিল ছাড়া এরূপ মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়।

খতম করার আগে আরেকটি কথা বলা আমি আবশ্যক বোধ করি। কখনও যেন সামনে মুখ-করা কোনও মানুষ আঁকতে যাবেন না। ও আঁকাই যায় না।

"আমার লেখা"। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

গদ্য আর পদ্য

ইন্দ্রজিৎ

গদ্য আর পদ্য—এই দুই নিয়ে সাহিত্যের সংসার। আবার সকল ভাষার সকল সাহিত্যেই পদ্য আগে, গদ্য পরে। এও এক মজার কথা বলতে হবে। মানুষরে মুখে ভাষা প্রথম ফুটেছে গদ্যে। শত শত বছর ধরে ওই গদ্যেই সে মনের কথা বলছে। পদ্য এসেছে বহু কাল পরে। গদ্য বহু যুগের প্রাচীন, পদ্য সেদিনের অবচীন। অবচীনের যা স্বভাব, উড়ে এসে জুড়ে বসে। পদ্য তাই করেছে, সেজে-গুজে রং চং মেখে নাচের ভঙ্গিতে এসে হাজির। আর মানুষের স্বভাবও বড় বিচিত্র। নতুন কিছু যদি পেল তবে তাই নিয়েই মেতে উঠল। ছন্দোবদ্ধ পদ দুদিনেই সকলের মন কেড়ে নিল। সুসজ্জিতা সুভাষিণীর নতুন নাম হল কবিতা। তাতে কৌলীন্য আরেকটু বাড়ল। ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে নতুন আখ্যা পেল—সাহিত্য। ওই মর্যাদাসূচক আখ্যাটি জুটল শুধু পদ্যের ভাগ্যে। গদ্য বেচারী যেমন ছিল তেমনি দিন-মজুরির কাজেই নিযুক্ত থাকল। যে জিনিস নিত্যদিনের ব্যবহারে লাগে, আমরা তাকে বলি আটপৌরে। তার কোনও সামাজিক মর্যাদা নেই। সাহিত্যের রাজ্যে গদ্যকে কেউ আমলই দেয়নি। পদ্যই সেখানে সুয়োরানি. গদ্য দুয়োরানি। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে তার বহুকাল কেটেছে অনাদরে, তাচ্ছিল্যে।

এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে সাহিত্যের সূচনা তখনই হয়, ভাষা যখন সাক্ষর হল। অক্ষর পরিচয়টা প্রথমে হয়েছিল পদ্যের ; কাজেই পদ্য দিয়েই সাহিত্যের শুরু। গদ্য বহুকাল নিরক্ষর, সাহিত্যের আসরে তার ডাক পড়ল না, স্থান হল না। সকল দেশের সকল ভাষাতেই এই ব্যাপারটি ঘটেছে। আমাদের বাংলা ভাষাতেই দেখুন না, সাক্ষরা সালংকারা পদ্যভূষণা কাব্যসুন্দরীর শুভাগমন হয়েছে আজ থেকে হাজার বছর আগে। ওদিকে সাহিত্যের অঙ্গনে বাংলা গদ্যের সসংকোচ প্রবেশ মাত্র শ' দুই বছর আগে, তাও ইংরেজের হাত ধরে। এই যে পুরো আটশ বছর পিছিয়ে ছিল, সে কি ওর দোষ ? উঁ হুঁ, দোষ ওই কবিদের। তারা ভেবেছেন, ওকে দিয়ে কি হবে ? ওর ভাব ভঙ্গি গেঁয়ো, চলনে বলনে ছিরি ছাঁদ নেই। কাব্য-সাহিত্য হল শখের জিনিস, সে কি যেমন তেমনভাবে হয় ? চাল-চলনে দুরস্ত হবে, চেহারাটা সাফ সুরত হবে, তবে তো।

কাব্যের ওই নাক উঁচু ভাবটা কোনও কালেই আমার ঠিক বরদাস্ত হয়নি। গলায় পৈতে ঝুলিয়ে সমাজপতি সেজে বসেছে, গদ্যকে জাতে ঠেলে অচ্ছুৎ করে রেখেছে। আমি সাহিত্যের ছাত্র, ইংরেজি সাহিত্য পড়তে গিয়ে দেখি সেখানেও ওই একই ব্যাপার। গদ্যকে জল-চল হতে বহু বিলম্ব ঘটেছে। ওর হয়ে কেউ মুখ ফুটে একটি কথা বলেনি। আজকের দিনে হলে 'দলিত' আখ্যা দিয়ে একটা পতিতোদ্ধারী আন্দোলন হতে পারত। গদ্যের ভাবনা গদ্যকেই ভাবতে হয়েছে। ভয়ে ভয়ে গুটি গুটি পায়ে একদিন সাহিত্যের অঙ্গনে সে প্রবেশ করেছে। আজ থেকে প্রায় ছ'শ বছর আগে প্রথম যখন ইংরেজি গদ্য দেখা দিল তখন সে না-গদ্য, না-পদ্য। অর্থাৎ পদ্যের ধমকে ও মাথা তুলতে পারেনি। সংস্কৃত সাহিত্য অতি প্রাচীন, প্রাচীন হলেও যথেষ্ট পরিণত। সেখানে বহু পূর্বেই গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল, এমন কি উপন্যাস জাতীয় গদ্যে রচিত আখ্যায়িকার সৃষ্টি হয়েছিল। বাণভট্ট রচিত কাদম্বরী কাহিনী সেকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু কাদম্বরীর ভাষা এতই কবিত্বপূর্ণ যে গদ্য কাহিনী হলেও লোকে বলত কাদম্বরী কাব্য। কাজে-কর্মে, আচারে-ব্যবহারে-ভাবে-ভঙ্গিতে, সাজে সজ্জায় গদ্য আর পদ্য যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের জিনিস, মনে হয় লেখকদের মনে সে ধারণাটা খুব স্পষ্ট ছিল না। তাঁরা ভাবতেন, সাহিত্য শখের জিনিস, আর কিছু না হোক্, সাজে-সজ্জায় একটু পারিপাট্য না থাকলে চলবে কেন ? কবিতা যেমন অলংকৃতা বনিতা, গদ্যও হবে তেমনি গহনা-বিলাসী গদ্‌গদভাষিণী। প্রকৃত

পক্ষে কেজো মানুষের স্বভাব যা, গদ্যের স্বভাব ঠিক তাই। ফাই-ফরমাস খাটতে সদাই প্রস্তুত। কাজের অন্ত নেই। কোথায় কি ঘটেছে বার্তা বহন করে আনে, নানা ব্যাপারে তত্ত্ব তল্লাসি করে, তর্ক করে, অপরের মত খণ্ডন করে। বেশ-ভূষার দিকে নজর দেবার সময় কোথায়? ব্যস্তবাগীশের মূর্তি—জামার হাতা গোটান, তৈল-বিহীন মাথার চুল উস্কো খুস্কো। শুধু ব্যস্তবাগীশ নয়, বাক্যবাগীশও বটে।

গদ্যের স্বভাবটা ঠিক বুঝতে পারেননি বলেই আদি যুগের লেখকরা গদ্যের প্রতি অকারণ অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। মহাকাব্য রচয়িতা মিলটন কিছু গদ্য পুস্তক পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন। প্রত্যেকটি পুস্তকই গভীর মননশীলতার পরিচায়ক। বিশেষ করে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে রচিত তাঁর এরিয়োপেজিটিকা নামক গ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত। তথাপি মিলটন বলতে কসুর করেননি যে, গদ্য রচনা ঠিক কবিজনোচিত কাজ নয়। ভাবটা যেন এতে তাঁর মান খোয়া গিয়েছে। সোজাসুজি বলেছেন—গদ্য তাঁর বাঁ হাতের রচনা। আজকের পাঠকের এ অবজ্ঞা দুর্বোধ্য।

সুখের কথা বাংলা গদ্যের এবম্বিধ অবমাননা আমাকে স্বচক্ষে দেখতে হয়নি। আমার জন্মের পূর্বেই তার শতবর্ষপূর্ণ হয়েছে। সে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমের প্রতিভা তার অঙ্গে মনে যৌবনের সমারোহ এনে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি হয়েও গদ্যকে অবহেলা করেননি। বঙ্কিমের প্রতিভা বাংলা গদ্যে যৌবনশ্রী এনে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে তার দেহের সৌষ্ঠব, মনের পুষ্টি অনেক বেড়েছে। ভেবে উৎফুল্ল বোধ করেছি যে এমন জ্বলজ্বলে ঝলমলে ভাষা সংসারে খুব বেশি নেই। সত্যি বলতে কি, বালক বয়সে রবীন্দ্রকাব্যের চাইতে রবীন্দ্রনাথের গদ্যই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। বলতে বাধা নেই, পরবর্তীকালেও আমি কবি রবীন্দ্রনাথের চাইতে গদ্যরচয়িতা রবীন্দ্রনাথকে উচ্চতর স্থান দিয়েছি। অনেকদিন আগে একটি প্রবন্ধে বলেছিলাম, সতেরো বছর বয়সে লেখা য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে বালক রবীন্দ্রনাথ গদ্য রচনায় যে পরিণতির পরিচয় দিয়েছেন, সে তুলনায় ওই বয়সে, এমন কি তার চার-পাঁচ বছর পরেও কাব্যরচনায় সে পরিণতি লক্ষ্যগোচর নয়। অপর একটি প্রবন্ধে বলেছিলাম রবীন্দ্রকাব্যে ছন্দের বৈচিত্র্য প্রচুর কিন্তু কাজের ভাষার বৈচিত্র্যের অভাব। প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত এমন কি অন্তিম পর্বে যখন মিল ছেড়ে গদ্য রীতিতে কাব্যরচনা করেছেন তখনও পদলালিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহের কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। এজন্যে আধুনিক কবিরা তাঁকে ঠিক তাঁদের দলভুক্ত বলে মনে করেননি। ওদিকে রবীন্দ্রনাথের গদ্য ক্রমাগত মোড় ঘুরেছে, চাল-চলন ভাবভঙ্গি বদলেছে, ধার বেড়েছে, ঝাঁঝ বেড়েছে। শেষ দিকের গল্পে উপন্যাসে—শেষের কবিতা, চার অধ্যায়-এর বাক্যচ্ছটায় বিদ্যুতের চমক, হাসির ঝলক। তেমন তেমন তীক্ষ্ণধী পাঠকরাও হতবাক। গদ্যের এমন সূর্যকরোজ্জ্বল দীপ্তি বিদেশী গল্প উপন্যাসেও এতখানি লক্ষ্যগোচর হয়নি।

গদ্যে দিগ্বিজয় করলে কি হবে, কাব্যে আধুনিক কবিরা তাঁকে আমল দেননি। কবিতার নাক-উঁচু ভাবটার কথা আগেই বলেছি। আধুনিক কবিতা আদ্যিকাল থেকে অদ্যাবধি সমস্ত কাব্যকলাকেই নাকচ করে দিয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার হামবড়া ভাবটি ঠিক বজায় রেখেছে। নতুনে পুরাতনে, নবীনে প্রবীণে কোন কালেই বনিবনা নেই। নবীন হল নিজ কালের যুবরাজ, সিংহাসনের দাবি তারই। অ-ন্যায্য দাবি বলব না। কাজেই আধুনিকতার গর্বে নাক উঁচু করে একটু চড়া গলায় যদি কথা বলে, সেটা খুব একটা দোষের কথা বলে আমি মনে করি না। কিন্তু আধুনিকরা একটি কথা ভেবে দেখেননি। কাল বড় পরিহাসরসিক, সে কীর্তিনাশা। কোনও কিছুকেই নতুন থাকতে দেয় না, পুরাতন করে দেয়। এই তো আমরা আজকের মানুষরা একবিংশ শতকের দোরে এসে পৌঁচেছি। অতি প্রাচীন কালকে বাদ দিলেও সহজ হিসাবে কুড়িটি শতাব্দী আমরা পার হয়ে এসেছি। মজার কথা এই যে এর প্রতিটি শতাব্দীই নিজকালে আধুনিক ছিল। Self-styled কিন্তু ওই সব Self-styled আধুনিক শতাব্দীর প্রত্যেকটি-ই কালগ্রাসে পতিত হয়েছে। সত্যি বলতে কি, আধুনিক বড় ক্ষীণজীবী, স্বল্পায়ু। কে যে কখন তাকে গদিচ্যুত করবে, তার ঠিক নেই। নিত্য নতুনের তাগিদ মেনে চলতে হলে অনেক সময়ে নিজের জিনিসে তুষ্ট থাকতে হবে। অমিত রায় যেমন বলেছিল, 'ফজলি আম ফুরোলে বলব না, আনো

ফজলিতর আম।' বলব, 'নতুন বাজার থেকে বড় দেখে আতা নিয়ে এস তো হে।'

আধুনিক জিনিসটা প্রধানত স্বাদ বদল, সাধের বদলও বলতে পারেন। তবে সাধ যতখানি, সাধ্য ততখানি নয়। আধুনিক জীবন সাধ্য-জাত। সে সাধ্য বিজ্ঞানের দান। আধুনিক কবিতায় বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কতটুকু ? যাকগে এ তর্কের শেষ নেই। তা ছাড়া আমার নালিশটা আধুনিকের বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা কবিতার বিরুদ্ধে। বহুকাল ধরে ও যে গদ্যকে দাবিয়ে রেখেছিল তাতেই ওর প্রতি আমার মনটা বেঁকে আছে। কিন্তু এর চাইতেও বড় কথা হল, ভাষা যদি হয় মানুষে মানুষে যোগাযোগের মাধ্যম তাহলে গদ্যকেই বলতে হবে মানুষের ভাষা। যে ভাষায় জীবনযাত্রা সংসারযাত্রা নির্বাহ হয় সেটিই প্রকৃত ভাষা। কবিতার ভাষা ভাব প্রকাশের ভাষ, অর্থাৎ পোশাকি জিনিস, হাটে-বাজারে ব্যবহার করা চলে না। চাঁদের আলো জগৎ আলো করে কিন্তু লোকের ঘর কি আলো হয় ? সেখানে কেরোসিনের ডিবে জ্বালাতে হয় । পরশুরাম বলেছিলেন—চাঁদের আলোয় কাঁথা কি শুকোয় ? সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না। সে কথাটা মনে থাকলে কবিতার স্বভাবটা একটু বিনয়-নম্র হত।

যাই বলুন, কবিতার স্বভাবে একটা ছেলেমানুষি ভাব আছে। সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি। তিলকে তাল করে এমন কথা বলছি না। কিন্তু সাজ-গোজের উপর এত বেশি নজর যে তিলকে তিলোত্তমা করে ছাড়ে। আরেক মস্ত দোষ, ঘুরে ফিরে এক কথাই বলতে থাকে, শুনে-শুনে বিরক্তি ধরে যায়। একে বলে পৌনঃপুনিকতা দোষ। প্রেমের কবিতা, প্রেমের গান লেখা হয়েছে লক্ষ লক্ষ কিন্তু তাতে নতুন কথা ক'টা ? ভক্তি গীতির বেলায়ও তাই। ধর্মকথায় লোকে রস পায় না, প্রেমের কথায় পায়। তাহলেও বলব, হাতের লেখা প্রেমপত্র পাঠ করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, ছাপার অক্ষরে প্রেমের কবিতা পাঠ করে কি সে আনন্দ পাওয়া যায় ? ভুললে চলবে না যে প্রেমের চিঠি লোকে গদ্যেই লেখে কবিতায় নয়। প্রেমিক-প্রেমিকা একে অন্যের প্রতি যে প্রেমনিবেদন করে, তাও গদ্যেই করে। কবিতায় প্রেমালাপ করতে গেলে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে হাস্যকর হয়ে উঠবে। এত কথার পরে বুঝতে আর বাকি থাকে না যে গদ্যই প্রেমের ভাষা। আরো দেখুন না, অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসই প্রেম-ঘটিত কাহিনী, কিন্তু গল্প-উপন্যাস মাত্রই গদ্যে রচিত।

কবিতার বিরুদ্ধে এত কথা বলার পরে আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন, আমি কবিতার বিরুদ্ধে একটা জেহাদ ঘোষণা করেছি। মোটেই তা নয়। আমি কাব্যপ্রেমিক মানুষ, কাব্যপাঠে আনন্দ পাই। আমার স্বভাবে একটা স্ব-বিরোধের ভাব আছে। অর্থাৎ আমি মানুষটা যা, প্রকাশ পায় ঠিক তার উল্টোটা। ভাবি এক, হয় আর। সত্যি বলতে কি, বালক বয়স থেকে নিজেকে একজন ভাবী কবি হিসাবে কল্পনা করে রোমাঞ্চ বোধ করেছি। কিন্তু সাধ থাকলে কি হবে, সাধ্যে কুলোয়নি। কাব্যলক্ষ্মীর অনুরাগী ছিলাম বটে, কিন্তু পদ্মাসনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থেকেছি। অতএব পদ্য ছেড়ে গদ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু কাব্যও যে গদ্যবিমুখ নয়, আজ তা প্রমাণিত হয়েছে। কবিরা এখন গদ্যেই কাব্য রচনা করেছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে গদ্যের কবিত্ব শক্তি আছে। আছে বৈকি। কবিদের কথা ছেড়েই দিন। ইন্দ্রজিৎ যে রম্যরচনা লিখে থাকেন পাঠকদের মুখে শুনেছি, তার মধ্যে একটু আধটু কবিত্বের আমেজ ফুটে ওঠে। শুনে আমি গর্ব বোধ করি। বালক বয়সে মাইকেলকে শুধু কবি হিসাবে নয়, সর্ব বিষয়েই হিরো জ্ঞানে পুজো করতাম। নিজেকে দত্তকুলোদ্ভব কবির জ্ঞাতি গণ্য করে মহাকাব্য রচনার স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে অচিরে। পদ্য রচনা করতে গিয়ে পদস্খলন হয়েছে পদে পদে। রণে ভঙ্গ দিয়ে পদ্য ছেড়ে গদ্যের আশ্রয় নিয়েছি। মনে পড়ছে কোথায় যেন বলেছি—মহাকাব্য সে অভাব্য দুর্ঘটনায় যত্র-তত্র ছড়িয়ে আছে আবোল-তাবোল রচনায়।

শুধুক কবিতা নয়, কবিদের প্রতিও আমার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। ভাবতাম, কবিরা ক্ষণজন্মা মানুষ কিন্তু ক্ষীণজীবী। তাঁরা দীর্ঘজীবী নন ; দীর্ঘ জীবনটা যেন তাঁদের মানায় না। শেলি কীটস বায়রন যে অতি অল্প বয়সে জীবন শেষ করেছেন, মনে হত সেটা কবিজনোচিত কাজই হয়েছে। মাইকেল মহাজীবন যাপন করেছেন। মহাকাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু আয়ুষ্কাল পঞ্চাশটি বছরও নয়। আর সত্যেন দত্তর চল্লিশ বছরেই জীবন অবসান। অবশ্য

আমাদের কবিদের মধ্যে সকলকে হার মানিয়েছেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। মাত্র একুশ বছর বয়সে জীবন দীপ নির্বাপিত। অতিদুঃখের ব্যাপার, তথাপি ভাবতে ভাল লাগে। মনে হয়, এরূপ জীবন একটি যেন লিরিক কবিতা—স্বল্প পরিসরে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অবশ্য কবিকুলে সব চাইতে বড় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন ইংরেজ কবি চ্যাটারটন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি আত্মঘাতী হয়েছিলেন। কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে চোবা কারবার, জাল-জালিয়াতি ঘটে না, এমন নয়। অপরের রচনা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা কখনো সখনো হয়েছে বৈকি। চ্যাটারটন করেছেন এর উল্টোটি—আপন কাব্য অপরের বলে প্রচার করেছিলেন। চ্যাটারটন পুরোনো দিনের কাব্য-কাহিনী পড়তে ভালবাসতেন, তাই দিয়েই মজেছিলেন। লিখেছেন ঠিক সেই ধাঁচে। বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথ যেমন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের আদলে লিখেছিলেন ভানুসিংহের পদাবলী, এও ঠিক তাই। তবে কবি ভানুসিংহ যে তিনি নিজেই, সে কথা রবীন্দ্রনাথ গোপন করেননি। কিন্তু চ্যাটারটন ভেবেছেন, নিজের রচনা বললে কেউ তা বিশ্বাস করবে না। তাই দিব্যি একটি গল্প তৈরি করে বললেন, ব্রিস্টলের এক গির্জায় কাগজ-পত্র ঘাঁটতে গিয়ে তিনি তিনশ বছর আগের টমাস রাউলি নামক পঞ্চদশ শতকীয় এক কবির একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছেন। ভাষাটাতে সাধ্য মতো একটু প্রাচীনতার ছোপ লাগিয়েছিলেন। Rowley Poems প্রথমটায় বেশ খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু অল্পদিন পরেই অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা বলতে লাগলেন, এর মধ্যে এমন সব শব্দ এবং বাক্য রীতির প্রয়োগ আছে যা পঞ্চদশ শতকে প্রচলিত ছিল না। কাজেই জিনিসটা খাঁটি নয়, এটা জাল। তাই নিয়ে আবার সাহিত্যিক মহলে মস্ত হইচই। ধরা পড়ে গিয়ে বালক কবি বিষম লজ্জিত, বিব্রত। উপায়ন্তর না দেখে আত্মহত্যা করলেন। এদিকে সমজদার সাহিত্যিকদের বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে ভাষায় কিছু কারচুপি থাকলেও ওই বালক অসাধরণ কাব্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সত্যি বলতে কি, উনিশ শতকীয় ইংরেজি সাহিত্যে রোম্যান্টিক রিভাইভেল নামে যা পরিচিত, চ্যাটারটন তার অন্যতম পথিকৃৎ বলে আজ পরিগণিত। কীটস তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটি চ্যাটারটনের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন। বলেছেন—To that marvellous boy Chaterton.

প্রতিভার অকালমৃত্যু নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক, তাহলেও, আগেই বলেছি এ মৃত্যু যথার্থই কবিজনোচিত। বৃদ্ধ হওয়াটা কবিদের ঠিক মানায় না। তাঁরা চিরনবীন, চিরসবুজ। চুল পাকলে কি হবে, মন পাকে না। মনটা কাঁচাই থাকে, রবীন্দ্রনাথের যেমন ছিল আশি বছর বয়সেও। তাহলেও বলব, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ আশি বছর বেঁচে থেকে খুব ভাল কাজ করেননি। মনটা কাঁচা থাকলে কি হবে, কাব্যটাতে পাক ধরে! ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর অন্তিম পর্বের কাজকে লোকে বলেছে wooden poetry অর্থাৎ কি না—শুষ্কং কাষ্ঠং, রসকষ বিহীন। রবীন্দ্রনাথের বেলায় বলেছে—উল্টোটি—অতিমাত্রায় মিষ্টি মিষ্টি কথা, অনেক শুনেছি, আর ভাল লাগছে না। তবেই দেখুন কবিদের পক্ষে শেলি কীটস্ এর মতো পঁচিশ তিরিশেই জীবননাট্য সাঙ্গ করা শ্রেয়।

সত্য কথা কবুল করতে দোষ নেই। আমি কবি এবং কাব্য দুয়েরই ভক্ত। তবে, আগেই বলেছি, কাব্যের আত্মম্ভরি ভাবটা আমার ঠিক মনে ধরেনি। সহজ সরল স্বভাবের গদ্যকেই ঢের বেশি আপন বলে মনে হয়েছে। ওকে দিয়ে অনেক সহজে কথা বলানো যায়। কবিতার বড় গুমোর, একটুতেই তার মান খোয়া যায়। পদে পদে সাধাসাধি, মান ভাঙানো পোষাবে না বলে আমি আর ও-পথে পা দিইনি। গদ্যের সঙ্গে তবু একটু বোঝা-পড়া হয়েছে। এখন আমি একজন গদ্যলেখক। গোড়ার দিকে মনে একটু খুঁতখুঁতুনি ছিল। ভাবতাম, গদ্য জিনিসটা গদার মতো খুব মোটা রকমের একটা অস্ত্র। কর্ণ, অর্জুনের তূণে কত রকমের বাণ, ভীমের হাতে শুধু গদা। ভীম যেমন যোদ্ধা নয় গদা তেমনি অস্ত্র নয়। গদ্যকে ঠিক সাহিত্যকর্মের উপযোগী বলে মনে হত না। পরে ভুল ভাঙল; আসল কথা, শিল্প মাত্রই শিল্পী নির্ভর। যিনি কুশলী শিল্পী তিনিই জানেন মাল-মশলা কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। চিত্রশিল্পী রং-এ রেখায় কথা বলেন, সংগীত শিল্পী কথা বলেন সুরে-তালে, সাহিত্য শিল্পীও তেমনি কথার পর কথা সাজিয়ে মনের কথা প্রকাশ করেন। ওস্তাদের হাতে পড়লে হাতিয়ার যে কতখানি ওস্তাদি দেখাতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল অচিরে। আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে যখন বঙ্কিমের প্রবেশ তখনও বাংলা গদ্য যথোচিত

পুষ্টি লাভ করেনি, অপরিণতই বলতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের সোনার লেখনী স্পর্শে রূপকথার রাজকন্যার মতো বাংলা গদ্য দীর্ঘ দিনের ঘুম থেকে জেগে উঠল। যে-ভাষা ছিল নাবালিকা সে দেখতে দেখতে পূর্ণযৌবনা হয়ে উঠল। তার মুখে স্মিত হাস্য। চোখে অপাঙ্গ দৃষ্টি। সে প্রেমের কথা বলতে শিখেছে। শুধু কি তাই? কিছুই আর বাকি থাকল না, যখন বঙ্কিম বিজ্ঞানরহস্য উদ্‌ঘাটন করতে লাগলেন, ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

বঙ্কিমের পরে রবীন্দ্রনাথ। ভাষার দেহসৌষ্ঠব বাড়তে লাগল দিনে দিনে, বর্ণ সম্ভারে কল্পনার জগৎ অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হল। ভাষার এক দিকে আছে ভার—যুক্তি, তর্কে তথ্যে তত্ত্বে; অপর দিকে ধার—বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে, বাকচাতুর্যে। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গল্প-উপন্যাসে শাণিত বাক্য পাঠকের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। হাস্যে-কৌতুকে ভাষার চাকচিক্যে তা বানার্ড শ-এর নাটকের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে। সত্যি বলতে কি, বাংলা ভাষার যে কী অপরিমেয় শক্তি তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের গদ্যে যতখানি, কাব্যে ততখানি নয়। তিনি মহৎ কবি, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। তবে আমার মতে তিনি মহত্তর গদ্য রচয়িতা। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বুঝে নিয়েছেন যে গদ্যই মানুষের ভাষা, কাব্য ছদ্মবেশী ভাষা। ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজা সাজা যায়, কিন্তু ছদ্মবেশী রাজাকে কেউ রাজা বলে মানে না। কারওই বুঝতে বাধা নেই যে কাব্যের সেই খ্যাতি প্রতিপত্তি আজ আর নেই। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্যের আসর জমিয়ে রেখেছে গদ্য। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই জনপ্রিয়তায় শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের পরে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, সমরেশ বসু প্রমুখরা সাহিত্যের বাজার মাৎ করে রেখেছেন। উল্লেখযোগ্য প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিক এঁরা ছাড়া আরও অনেক। কাব্যমহলে ভিড় আছে বটে কিন্তু তেমন জমজমাট নয়। আধুনিক কবিতাকে লোকে শিরোধার্য করেছে কিন্তু কণ্ঠে ধারণ করেনি। কাব্যকে শুধু গ্রন্থস্থ হলে চলবে না, তাকে কণ্ঠস্থ হতে হবে। লেখনীমুখে উৎসারিত কবিতা যখন লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হবে তখনই সে সার্থক।

আমি যখন লেখায় একটু-আধটু হাত মকস করতে শুরু করেছি, সেই তখনই বাংলা গদ্য সাজানো বাগান। ভিড় জমছে সেখানেই। আমি ঠেলে ঠুলে সেই ভিড়ের মধ্যেই এক কোণে একটু ঠাঁই করে নিয়েছিলাম। সেখানে কোনওদিন পাকা রকমের আস্তানা জুটবে এমন কথা ভাবিনি। তথাপি কাব্যের মোহিনীমায়ায় না ভুলে যে গদ্যের গড্ডলিকা প্রবাহে গা এলিয়ে দিলাম তার প্রধান কারণ অবশ্যই কাব্য রচনায় অক্ষমতা, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে এ ছাড়াও একটা কারণ ছিল, সেটা শুনলে আপনারা নিশ্চয় কৌতুক বোধ করবেন। বহু কবির অকাল মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে আমি বলেছিলাম, এই বেশ, দীর্ঘ জীবনটা অ-কাব্যিক ব্যাপার, কবিকে তা মানায় না। অকাল মৃত্যুই কবিজনোচিত মৃত্যু। গোড়াতেই যখন বুঝে নিয়েছিলাম যে কাব্যচর্চাটি আমার ঠিক আয়ত্তের মধ্যে নয় তখনই ভাবলাম, ভালই হল, কবিতা লিখতে গিয়ে অকালে প্রাণটা দিয়ে লাভ কি? তার চাইতে বেঁচে থাক গদ্য। আমিও বেঁচে থাকি। গদ্য রচনা, আর যাই হোক প্রাণান্তকর ব্যাপার নয়। সত্যি বলতে কি গদ্য আয়ু বৃদ্ধি করে। প্রমাণ রেখেছেন বার্নার্ড শ ৯৪ বছর বেঁচে থেকে। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁকেও ছাড়িয়েছেন, তিনি বেঁচে থেকেছেন, লিখেছেন ৯৮ বছর অবধি।

আমি আমার কবিবন্ধুদের বলি, বাঁচতে চান তো কাব্য ছেড়ে গদ্য ধরুন। লোকে বলে, প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত; আমি তো দেখছি, কাব্য রাখতেই প্রাণান্ত। মনে রাখবেন, সবার উপরে জীবন সত্য, তাহার উপরে নাই। প্রাণে বাঁচলে তবে তো অন্য কথা। সেই কবে পড়েছিলাম ডিকেন্সের পিকউইক পেপারর্স। সেখানে স্যাম ওয়েলার-এর কোচোয়ান পিতা পুত্রকে কি বলছেন শুনুন। ছেলেকে সাবধান করে দিচ্ছেন, খবরদার, কবিতা-টবিতা কখনও লিখতে যেও না। কবিতা অতি অস্বাভাবিক জিনিস। বুদ্ধি বিবেচনা যাদের আছে, তারা কখনও ও ভাষায় কথা বলে না। বাকিটুকু ওর মুখের কথাতেই বলি—'I never know'd a respectable coachman as wrote poetry, 'cept over as made an affection' copy of verses the night afore he was hung for a highway robbery.' লোকটি আমার চাইতে ঢের বেশি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। কাজেই তার

কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বলতে বাধা নেই এ উপদেশ আমার উপরেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করেছে। গোড়ার দিকে কবিতার প্রতি যে দুর্বলতা ছিল, তা হ্রাস পেয়েছে, গদ্যের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি, গদ্যের কৃপায় দীর্ঘ জীবন লাভ করেছি। ইদানীংকালে কবিরা যে ছন্দ মিলের বেড়াজাল টপকে বেরিয়ে এসেছেন, এটি শুভবুদ্ধির পরিচায়ক। মিলের ধার ধারছেন না, কবিতা লিখছেন গদ্যছন্দে। এই যে গদ্যের ছোঁয়াটুকু লেগেছে তাতেই পদ্যের দেবতা তুষ্ট হবেন। অকালমৃত্যুর যে খড়্গটা মাথার উপরে ঝুলছিল, সেটা আস্তে আস্তে সরে যাবে। আমার তো মনে হয়, আধুনিক কবিরাও আমাদের মতো প্রাচীন পন্থী গদ্য লেখকদের ন্যায় দীর্ঘজীবী হবেন। হ্যাঁ, এই সূত্রে আরেকটি কথাও বলছি। ওই 'আধুনিক' কথাটা বড় দুর্বল, এর মধ্যে মনে হয় একটু কনফিডেন্সের অভাব প্রকাশ পাচ্ছে। কবিরা বোধকরি একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন—আমাদের এ কবিতাকে লোকে কবিতা বলবে তো? সে জন্যে খুব জোর গলায় ঘোষণা করেছেন এ কবিতার নাম আধুনিক কবিতা। আমি বলি, 'আধুনিক' কথাটা এ মুহূর্তে বর্জন করে স্পষ্ট করে বলা উচিত—আমাদের এ কবিতা হাড়ে-মাংসে মজ্জায় কবিতা, এর আর অন্য কোনও পরিচয় নেই। আধুনিক সংগীত সম্পর্কেও ওই একই কথা। সংগীতের মোহিনী মায়া সব সময়েই মানুষের মনকে মুগ্ধ করবে, তাকে আধুনিক সাজতে হবে না, মুখ ফুটে বলতে হবে না— চেয়ে দেখ, আমি নবীনা, আমি আধুনিকা। সংগীত সাহিত্য স্বভাবধর্মেই চিরনবীন। ওই যে কবি এ যুগের আধুনিকাকে উদ্দেশ করে বলেছেন, সাজে সজ্জায়, চলনে বলনে হাল আমলের হলে কি হবে, 'তবু দেখ সেই কটাক্ষ আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য যেমনটি ঠিক দেখা যেত কালিদাসের কালে।' অর্থাৎ কিনা এ কালের বিনোদিনীদের তুলনায় সে কালের নিপুণিকা চতুরিকারা কিছু কম আধুনিকা ছিলেন না। লক্ষ্য করবার বিষয় যে বিদ্যাসাগর বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ যে গদ্যরচনা রীতি শিখিয়ে গিয়েছেন, আজকের গদ্য রচয়িতারা সেই গদ্যই লিখছেন, তবে ঠিক তাঁদের মতো করে নয়। লিখছেন নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ বলেননি, আমরা 'আধুনিক' গদ্য লিখছি। তাহলে কবিতা এবং গানের এ দুর্মতি হল কেন? কবির আনুগত্য কাব্যের প্রতি—আধুনিকতার প্রতি নয়। ঋতুর পরিবর্তনে প্রকৃতি যেমন সাজ বদলায়, কালের গতিতে কাব্য সাহিত্য সংগীতও তেমনি ঢং বদলায়। এটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার, ঘটা করে ঘোষণা করবার মতো ঘটনা নয়। সেজন্যই বলছিলাম, কবিতা এবং গান নিজ গায়ে 'আধুনিক' ছাপাটা জুড়ে দিয়ে মিছি মিছি নিজের ডিগনিটি হানি করেছে।

"দেশ"। ১৭ আষাঢ়, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

বিরল মুহূর্ত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পৃথিবীকে আজ আমার হঠাৎ ভারি ভালো লাগল, বিরল, বিরমমাণ এই মুহূর্তে। পৃথিবীকে মানে, সমস্ত কিছুকে, অথচ বিশেষ কোনও একটা জিনিসকে চোখ দিয়ে চিহ্নিত করতে পারছি না। তবু ভালো লাগল অস্তিত্বের নীরব, শীতল প্রবহমানতায়। ভালো লাগল। যেন ইজরেলাইটদের তাঁবুর দুয়ারে মান্না পড়ল ঝরে। কেননা, ভালো আমাদের লাগে না, ভালো লাগা আমাদের কথা নয়।

কী যে কারণ, চেষ্টা করলুম খুঁজতে। টাকার ভীষণ দরকার, এক লাইনও লিখতে পারছি না, মাথাটা ফাটা বেলুনের মতো শূন্য, কাল রাতে নিটোল ঘুম হয় নি, অর্থের অনটনে ভালো একটা স্বপ্নও দেখি না আজকাল, এখন একটু গড়িয়ে নিতে কে আমাকে বাধা দেয়, তবু এত সব দুঃখকর অনিবার্যতার মধ্যেও আমার ভালো লাগল। আমার কী আছে বা নেই, কী আছি বা হইনি, কি সাম্প্রত বা অসাম্প্রত, তার ধূমহীন ঊর্ধ্বে এই অনির্বাণ ভালো লাগা। নিরাধার, অশরীরী একটা শিখার মতো। বুঝতে পারছি ভালো লাগছে ; অথচ কেন যে লাগছে, তার স্পর্শসহ কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না বলে বেশি লাগছে বিস্ময়। আমাদের বিস্মিত হওয়াও বারণ। আমরা অবাক হই, আমরা বুঝি না, সেটা দস্তুরমতো ক্রিমিন্যাল। অথচ এমনই আশ্চর্য, পৃথিবীতে আর সব ঘটনার তুমি কারণ পেতে পারো, কিন্তু পৃথিবীকে ভালো লাগবার কোনও কারণ নেই।

এমনি চুপ করে একা বসে ছিলুম। কলকাতার আকাশে বাদুড়ের ডানার মতো দীর্ঘ সন্ধ্যা ঝুলছে : মনে করো সেই সন্ধ্যা, যখন তুমি বাড়িতে বসে থাকতে পারো না, অথচ বাড়ি থেকে বেরুবার মুহূর্তেও জানো না কোথায় তুমি যাবে— সেই ভারময় ধাতব বিবর্ণতা : যেতে পারো না সিনেমায়, যেখানে সমস্ত ছবিই একটি নির্ভুল সমাপ্তিতে এসে শেষ হয় ; যেতে পারো না থিয়েটারে, উঃ, বাঙালী থিয়েটারে, যেখানে অভিনেতার চীৎকারের সঙ্গে মা'র বুক থেকে শিশু উঠছে চীৎকার করে ; যেতে পারো না কোনও আড্ডায়, যেখানে ভাসমান হাসির তলায় লুকিয়ে থাকে ঈর্ষা, সবুজ সূক্ষ্ম সাপের মতো, যেখানে বন্ধুর দুঃখে মৌখিক সমবেদনা তোমার আন্তরিক সমর্থনের নামান্তর ছাড়া কিছু নয়— এমন কি মাঠেও একটু গিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারো না, মনে হবে নেহাতই তুমি স্বাস্থ্যসঞ্চয় করছ। আজও তেমনি বিকেল করে এসেছিল, মনে রেখো, কলকাতার সেই বিকেল : আলম্বমান, আতঙ্কিত একটা ছায়া, ডেমোক্লসের খড়্গের মতো : সেই কর্মহীনতার ধারাবাহিক ক্লান্তি। এবার কী করব, কোথায় যাব কিছুই আমার ঠিক ছিল না, কালকের সন্ধ্যাটা কী করে কাটিয়েছি তা-ও স্পষ্ট মনে নেই, এই সময় হঠাৎ আমার পৃথিবীকে ভালো লাগল। ভারি আশ্চর্য, অদ্ভুত, একটু-বা বে-আইনি শোনাচ্ছে : পৃথিবীকে আমার ভালো লাগল। কাউকে সে-কথা বলতে সাহস পেলুম না। পাছে তারা তার একটা কারণ জানতে চায়, যুক্তিসহ, পরীক্ষেয় কোনও কারণ ; পাছে তারা কৌতূহলী হয়ে জিগগেস করে বসে, কত টাকা পেলুম, বা কোন মেয়ে ইত্যাদি। কারণটা না পেয়ে খানিক আগে আমি নিজেও খুশি হচ্ছিলুম না। তাদেরই বা কী দোষ।

এমনিতেই ভালো লাগল। ভালো লাগল আমি এখনও বেঁচে আছি, চোখে সদ্য দেখতে পাচ্ছি দিনের এই ধূসর ম্লান হয়ে আসা, ভালো লাগল কোনও কাজ না করার অচেষ্ট এই অলসতাটিকে। সমস্ত আকাশ যেন বিশাল, ঠাণ্ডা একটা গুহা, সারা দিনের শিকারের পর শ্লথকায়, শ্রান্ত পশুর মতো কলকাতা ফিরছে সেই গুহাতলে— মনে-মনে তেমনি একটা গম্ভীর ছায়া দেখলুম বলে। কিংবা টেবিলে মাথা গুঁজে আর আমাকে এখন লিখতে হবে না, মস্তিষ্কের স্নায়ু থেকে শব্দ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে, তারই একটা ভদ্র অজুহাত পেয়েছি, কিংবা শীতের ধোঁয়াটে

স্যাঁতসেঁতে আকাশে এসেছে নতুন উষ্ণতার আভা।

তবু একটা আমার কারণ চাই। এই হচ্ছে আমাদের সভ্য মানুষের ধরন— কোনও কিছুকে আমরা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারি না, তাতে আমাদের শিক্ষাই রইল অসম্পূর্ণ। আমাদের বিচারে ভার্জিন কখনও মা হতে পারেন না : কখনও কোনও ঘোড়ার থাকতে পারে না পাখা। ফুল কেমন করে ফুটল তার কারণটা জানবার জন্যে তার প্রতিটি পাপড়ি আমরা সূক্ষ্ম নখ দিয়ে চিরে-চিরে দেখছি। কারণটা না জানা পর্যন্ত আমরা ফুলের ফুল হয়ে ফুটে ওঠাকে বিশ্বাস করিনে।

সত্যি এ বিস্ময়—এ আমার অকারণ ভালো লাগা। কিন্তু এই বিস্ময়ও আজ আমারই একলার। আসলে ভালো না-লাগা, অবিচ্ছিন্ন অবিমিশ্র ভালো না-লাগাই হচ্ছে সভ্যতা। আর, তুমি মানুষের আফিঙের নেশা ছাড়িয়ে দিতে পারো, কিন্তু সাধ্য কি তুমি তার সভ্যতার নেশা ছাড়াও! আমাদের ভালো লাগে না, ভালো লাগলেই তো আমরা থেমে গেলুম। ভালো লাগে না, তবু বলতে পারো, তাই আমাদের বাঁচতে হবে— বাঁচাটা আমাদের কাছে তির্যক, ধাবমান একটা পিপাসা, আশ্রয় থেকে ক্রমান্বিত আশ্রয়ে ছুটে যাবার দীর্ঘায়মান অবিশ্রান্তি। বাড়ি, বাড়ি-ফিরে-আসা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আনন্দ, প্রেম, স্বামী, স্ত্রী—ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যমণ্ডিত এই কথাগুলির উপর আর আমাদের কোনও মোহ নেই : আমরা তার মায়া কাটিয়ে উঠেছি। বাড়ি এখন আমাদের কাছে বাস করবার একটা যন্ত্র হয়ে উঠেছে, জীবন হয়ে উঠেছে একটা বিধিবদ্ধ একঘেয়েমি। তুমি বাড়ি ফিরে আসো, মানে রাতের ক'টা ঘণ্টা ঘুমে কাটিয়ে দিতে আসো মাত্র। আত্মীয়-পরিজন হচ্ছে অবান্তর একটা জনতা ; মা বলতে আমাদের প্রাণ আর আনচান করে ওঠে না। আর কে তোমার বন্ধু-বান্ধব? যাকে আমরা আমাদের মূল্য হিসেবে খাটাই সে-ই আমাদের বন্ধু, যার দর্পণে আমরা নিজের মুখ দেখি। তাই বলে মনে কোরো না কখনও সমানে-সমানে বন্ধুতা হয়। যে আমাকে শ্রদ্ধা করে, একটু-বা স্তাবকতা করে, শুধু তাকেই আমি বন্ধু বলে গ্রহণ করি : আর যাকে আমি করি শ্রদ্ধা, বুদ্ধিমান হলে আমি তার বন্ধুতার ধার দিয়েও ঘেঁষি না। আর যেখানে সমানে-সমানে দাঁড়িয়ে আছি কাঁধে কাঁধ দিয়ে, সেইখানে আমরা গাঢ় করে টেনে দিচ্ছি লম্বা মুখোশ, পাশ ফিরে যখন অন্য লোকের সঙ্গে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলছি তখনই পাওয়া যাচ্ছে আমাদের সত্যিকারের মুখের আভাস। বন্ধুতাটাও আমাদের যান্ত্রিক একটা উদ্ভাবন, আমাদের চলমান বিজ্ঞাপনের। আর আনন্দ! আনন্দকে নিয়ে এসেছি আমরা স্ফূর্তিতে, একটা অতিকায় উন্মাদনায়। তুমি যে সুখী, মাংসল একটা প্রমাণ না পেলে আমরা তা স্বীকার করব না ; আর পরকে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখাতে পারলেই বা তোমার আনন্দ কোথায়? অপচয় ছাড়া ঐশ্বর্য কোথায় অবকাশ পাবে? সারা গায়ে আবির মেখে শহরের রাস্তায় হুলুস্থূল না করলে কী করে জানব আজ বসন্ত-পূর্ণিমা? অন্য সব জিনিসের মতো আনন্দও আমাদের আজকাল টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে : নিজের দারিদ্র্য ঢেকে রাখবার জন্যে যেমন আমরা গলায় আঁটি সোনার বোতাম, তেমনি সভ্যতা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে, সভ্যতারই খাতিরে অহরহ আনন্দের খরচ জুগিয়ে চলেছি। গাছের সঙ্গে আঠা দিয়ে কোটি-কোটি জোনাকির পাখা আটকে রেখে আমরা আলোকিত করছি বিশাল অরণ্য। দুঃখ পর্যন্ত আমাদের ভালো লাগে না, তার সেই প্রখর উলঙ্গ তীব্রতা, তাই তাকে তাড়াতাড়ি ভুলে ফেলি, ভোলবার জন্যে করি আরও দুঃখকরতর আয়োজন। প্রেম—প্রেম আমাদের কাছে এমন একটা জিনিস যাতে দরকাব হয় অনেক কৌশল, অনেক চাতুরী, সূক্ষ্ম ও সুচারু। অনেক বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা। মার্জিত মার্জার-বৃত্তি : জল না ছুঁয়ে মাছ ধরার কৃতিত্ব। প্রেম—প্রেম আমাদের ভালো লাগবে কেন? আমাদের কই এত সময় বসে-বসে তার পরিপক্কতার প্রতীক্ষা করব? ততক্ষণে চলার বেগে অন্যত্র ছিটকে পড়েছি, অন্যতর রোমাঞ্চে। স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের সমৃদ্ধির একটি পৃষ্ঠা, তার সামাজিক অবস্থার মানদণ্ড, প্রসাধনের উপাদান : আর স্বামী হচ্ছে স্ত্রীলোকেব এমন একজন লোক, যে তার খাতিরে তার জন্যে একটা মোটা দেখে লাইফ-ইন্সিওরেন্সের পলিসি রেখে যাবে। বিয়ে হচ্ছে ওদের কাছে চাকরি, আমাদের কাছে সুবিধে। কিছুতেই আর আমরা শিহরিত হই না। সে-সব ভাব এখন শব্দের কঙ্কালে পরিণত হয়েছে নীরক্ত, নির্মাংস কঙ্কাল। আমরা এখন শুধু সেই হাড় দিয়ে বাজনা

বাজাচ্ছি।

আমরা এত সভ্য যে আমাদের শরীর, যা আমাদের বাঁচবার উজ্জ্বলন্ত উদাহরণ, সেই শরীরকে পর্যন্ত আমাদের ভালো লাগে না। দৈব এই দেহকে মনে করি অশ্লীল একটা আবর্জনা, তার উপরে চাপাই মনের অত্যাচার, মৃত ভারের মতো। আমরা আলোড়িত হই মাথায়, মূলে নয় : রঙে নয়, রক্তে। শরীরকে আমরা নিয়ে এসেছি শুধু একটা যান্ত্রিক উদ্দীপনার কেন্দ্রে, শরীর থেকে চলে এসেছি আমরা শিরায়। এই শরীরও আমাদের কাছে বিস্বাদ হয়ে উঠেছে— শুধু অস্থিময় একটা আধার আমাদের আয়ুর ক'টি ধূলিকণা সঞ্চিত করে রাখবার জন্যে। আমরা শরীরের জন্যে বাঁচি না, বাঁচবার জন্যে শরীরটাকে বহন করে চলেছি মাত্র। কী করে আমাদের ভালো লাগবে!

ভালো আমাদের লাগে না, ভালো আমরা লাগাই। যেমন করে হোক, যেখান থেকে পারি। প্রেতায়িত, অন্ধ একটা ছায়ার মতো মুহূর্তের শ্মশানে আমরা ঘুরে বেড়াই। কোথায়, কিসে আমাদের ভালো লাগবে? আনন্দ না থাক, রোমাঞ্চের সন্ধানে। নইলে সময় কাটবে কী করে? আবিষ্কার করে বেড়াই নতুনতর রোমাঞ্চ, একই রেখায় পৌনঃপুনিক অনুবর্তনাটা গতির ধর্ম নয়, নয় এই শতাব্দীর সভ্যতা। আমরা ভাবছি চলেছি দীপ্যমান দীর্ঘ দ্রুত রেখায়, কেবলই সামনে, কেবলই সোজা, কিন্তু হায়, চেয়ে দেখি কখন আবার একটি বৃহৎ বৃত্ত এসেছি সম্পূর্ণ করে, যেখানে ছিলুম সেইখানেই এসেছি ফিরে। যেমন যুগে, তেমনি প্রাত্যহিকতায়। যেখানে ছিলুম সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি। ভালো লাগে না, ভালো লাগে না। মরা আরশুলার শুঁড়ে ইলেকট্রিকের তার দিয়ে যেমন তাকে নাড়িয়ে দেয়া যায়, তেমনি করে আমরা রোমাঞ্চে সাময়িক সঞ্চালিত হচ্ছি। অস্ত্রোপচার করে কুঞ্চিত মুখে যৌবনের আভা আনছি ফিরিয়ে। ভালো লাগে না, ভালো লাগে না। শূন্যতার সমুদ্রে আমরা রাতের পর রাত জ্বালিয়ে ধরেছি নির্জন লাইট হাউস : যাতে দূরগামী জাহাজ থেকে দেখা যায়, আমরা ঠিক জ্বলছি, আমরা এখনও নিবি নি।

এই সময়টায় আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে জাঁকিয়ে একটা সাহিত্যিক আড্ডা দিই। বুঝতে পারি, কাকে বলে ভালো না লাগা। বৈজ্ঞানিক, পুঙ্খানুপুঙ্খ, আণবিকতম বিশ্লেষণ— ক্ষুরের প্রান্তের মতো সূক্ষ্ম। আমাদের জিহ্বার ধারে সব ক্ষয় হয়ে যায়, কারও কোনও লেখাই আমাদের ভালো লাগে না, যদি বা একটু লাগে, তবে এরই জন্যে লাগে যে সেটা আরও ভালো হতে পারত। আমরা, সমালোচকরা, বাস করছি আমাদের উদ্ধত, উত্তুঙ্গ নাসিকায় ; আমাদেব দুই চোখে নিষ্ঠুর নির্বাস্পিতা, আমাদের দাঁতে অপক্ষপাত ঔদাসীন্যের হাসি। ভালো আমাদের কী করে লাগবে? ভালো লাগলেই তো আমরা নেমে এলুম, ছোট হয়ে গেলুম তার কাছে, যার লেখা আমাদের ভালো লাগল। বরং যে বিদেশী, যাকে হয়তো জীবনে কোনওদিন দেখতে পাব না, তার লেখা ভালো লাগে বললে আমাদের সামাজিক সম্মানের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই ; কিন্তু যাকে আমি বাইরে তাকালেই দেখতে পারি, তার লেখা ভালো লাগা মানে তার কাছে হার মেনে নেয়া : বুদ্ধিতে তার কাছে খাটো হয়ে যাওয়া। লেখকের যেমন স্পর্ধা থাকে : আমি পাঠকের সম বাধ্যতায় নেমে আসব না কখনও, তেমনি সমালোচকেরও অহঙ্কার থাকে প্রচণ্ড. সাহিত্যে এমন কিছু নেই যা আমি বুঝতে পারব না। কেননা তার হাতে আছে অমোঘ অস্ত্র, তার নাকে আছে শাণিত নিষ্ঠুরতা, জিহ্বায় আছে বিষাক্ত সমাপ্তি : আমার ভালো লাগে না। আমরা যে সব জানি তা অবিশ্যি স্বীকার করি না, স্বীকার করতে সাহস হয় না বলে, কিন্তু আমরা যে সব বুঝি তাতে কে সন্দেহ করবে?

সাহিত্যিক আড্ডাতে আরও অবিশ্যি অনেক কথা হয় : সাহিত্যিক আড্ডাতে পরনিন্দা ছাড়া আর কী কথাই বা হবে। আর পরস্পরের প্রতি প্রচ্ছন্ন নিন্দাটা সেখানে আপাতত উহ্য থাকে। পরকে নিন্দা করেই আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা ও পবিত্রতা রক্ষা করি।

আমরা যে এখনও জীবনের খানিকটা সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি, একদিন থাকব না যে এই পৃথিবীতে, জীর্ণ এই শরীরের সভ্য সীমাবদ্ধতায়, দাঁড়াবে এসে যে মানুষতর নতুন জীব মৃত্যুর নির্জন, শেষ, শান্ত মোহানায়— যেন এই শুধু আমাদের আশা। মানুষ যেন হারিয়ে ফেলেছে সেই অনির্বচনীয়ের ভাষা, মাটির সঙ্গে সেই তার শৈশব-নৈকট্য। হাউইর মতো বহুদূর উঠে

গেছে সে আকাশে, হাহাকারের মতো দীর্ঘ, ক্ষিপ্র বর্ণচ্ছটায় : তারপর আবার নতুনতর আরম্ভের অন্ধকার। ভয় নেই, সেই দিনও এমনি সন্ধ্যা নামবে মন্দায়মান বিস্তীর্ণ আলস্যে, এমনি ওখানে গাছ থাকবে দাঁড়িয়ে তার শাখায়-শাখায় বলিষ্ঠ নিস্তব্ধতা নিয়ে—সেদিন, সেদিনও কেবল আমাদেরই ভালো লাগবে না।

তবুও, আজ, এইখানে বসে, এই মুহূর্তটি আমার ভালো লাগল। এই আমার যথেষ্ট, এই আমার অনেক। জানি, পরের মুহূর্তটি এর প্রতিবেশী হলেও আত্মীয় নয় ; জানি এ স্রোতের ফুলের মতো আবার ভেসে যাবে। তবু এই দোদুল্যমান মুহূর্তে আমি যে বেঁচে ছিলুম, মনোহীন এই শরীরের বিশ্রামে, আমার এই অকূল অচেষ্টতায়—সমস্ত জীবনে এই আমার যথেষ্ট, এই আমার অসীম।

"শতাব্দী"। ফাল্গুন ১৩৪০।

খোকার খেলনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আজ সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর চোখ মেলতে গিয়ে আমি আতঙ্কে অভিভূত হয়ে গেলান। মনে হল অপসৃয়মাণ ঘুমের সমুদ্রের ঢেউই বুঝি বাস্তবতার বালুবেলায় ভয়ঙ্কর কোনও দুঃস্বপ্নকে ভুলে ফেলে গিয়েছে; স্বপ্নের কোনও বিভীষিকাই বুঝি মুহূর্তের অসতর্কতায় জাগরণের জগতে আটকা পড়ে গিয়েছে।

ঘুম আর জাগরণের মধ্যে যে-গোধূলি-ছায়ার অস্পষ্ট জগৎ, সেইখানেই সবে তখন আমি প্রবেশ করেছি। কিন্তু যে-জগৎ সাধারণত আলস্যের মধুর অবসাদে আচ্ছন্ন থাকে, রাত্রের সুরভি যা থেকে সহজে মিলোতে চায় না, সেই জগৎ আমার কাছে তখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

নিদ্রাজড়িত অর্ধনিমীলিত চোখে, অস্পষ্ট অন্ধকারে আমি দুটি অগ্নিময় চোখের তীব্র জ্বালা প্রথম অনুভব করলাম। তারপর বুঝতে পারলাম, আমার বুকের ওপর অপার্থিব কোনও ভয়ঙ্কর জীব চেপে বসেছে। পৃথিবীর কোনও প্রাণীবিশেষের সঙ্গে তার সুদূর সাদৃশ্য হয়তো আছে। কিন্তু সেই নামমাত্র সাদৃশ্যই তাকে দিয়েছে বিকটতম ব্যঞ্জনা; যেন শয়তানের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গনিপুণ হাতে বিধাতার সৃষ্টির সৌষ্ঠবরেখা বেঁকে গিয়েছে উন্মত্ত ভীষণতায়।

সে-জীবকে শুধু ঘোড়ার মতো বললে যেন সমস্ত অশ্ব-জগৎকে নিদারুণ অভিশাপ দেওয়া হয়। দেহের প্রতি রেখায় অশ্বত্বের সীমাকে সে দানবীয় বীভৎসতায় প্রসারিত করে দিয়েছে। যদি তুরঙ্গ হয়, তাহলে সে প্রলয়-সায়াহ্নের তুরঙ্গ; চোখে তার ধ্বংসের সেই দাবানল, ভঙ্গিতে তার সংহারের ক্ষিপ্রতা।

ধর্মবিশ্বাস আমার গভীর না হলে মনে করতে পারতাম যে, যুগান্তরের সন্ধিক্ষণ বুঝি অকালে এসে পড়েছে, সৃষ্টিকে তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত হবার সুযোগ না দিয়েই শুরু হয়েছে শেষ সংহারলীলা, ঝঞ্ঝা-ধূসর দিগন্ত আড়াল করে কল্পান্তের প্রলয়-নায়ক কল্কিরই বাহন আছে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু এ-আতঙ্কের দুর্বলতাকে আমি শেষ পর্যন্ত জয় করলাম, যেমন করে সমস্ত মিথ্যা বিভীষিকাকেই জয় করতে হয়।

আমি ভালো করে চোখ খুলে তাকালাম এবং সেই মুহূর্তে ফুটো-করা বেলুনের মতো চুপ্‌সে, সেই বিরাট বিভীষিকা অকিঞ্চিৎকর সামান্য একটা খেলনা হয়ে দাঁড়াল।

আমার বুকের ওপর খোকার খেলবার একটা রঙিন কাঠের ঘোড়া। খানিক আগে আমার ঘুমেব সুযোগে সে আমার বুকটাই খেলবার উপযুক্ত স্থান হিসাবে বোধ হয় নির্বাচন করেছিল। খেলা সাঙ্গ করে খেলনাগুলি সে ভুলে ফেলে গিয়েছে। বুকের ওপর তাই কাঠের ঘোড়া দাঁড়িয়ে! খেলাঘরের বন্দুক প্রভৃতি পাশে রয়েছে সাজানো!

প্রলয়-সায়াহ্নের তুরঙ্গকে খেলনার কাঠের ঘোড়াতে রূপান্তরিত হতে দেখে আমার কিন্তু ঠিক হাসি পেল না। আমার মনে হল, এতদিনে যেন খেলার সত্যকার গূঢ় অর্থ আমার কাছে ধরা দিয়েছে। সহসা আমি সমস্ত খেলা ও খেলনার মানে বুঝতে পেরেছি।

আমাদের কাছে খেলনা মাত্রেই কেমন একটু মজার। তার ভেতর জীবনের অনুকরণের চেষ্টা একটু হাস্যকর। যেমন হাস্যকর শিশুর আধো-আধো ভাষা। কাঠের ঘোড়া আধো-আধো ভাবে সত্যিকারের ঘোড়া হতে চায় এবং সেই জন্যেই সে কৌতুকের বস্তু। আড়ষ্টতার ফলে সে বাস্তবতাকে ধরি-ধরি করেও ঠিক নাগাল পায় না, তা দেখলে আমাদের হাসিই পায়। কিন্তু হাসি জিনিসটা বদলে যায়। খেলনার হাসি অনায়াসে অট্টহাসি হয়ে উঠতে পারে।

আসলে খেলনা মাত্রই ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর তার বাস্তবতার বিকৃতিতে, ভয়ঙ্কর তার সম্ভাব্যতার

বিস্তৃতিতে। নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যে-যুক্তিহীন আকারহীন অন্ধকার অসীমতা আছে, তারই ইঙ্গিত সে করে। সীমায় সঙ্কীর্ণ হয়ে না থাকলে জীবনে সবকিছু মূল্যবান জিনিস যে সেই অসীমতায় বিকৃত, বিপুল, বীভৎস হয়ে উঠতে পারে, ধর্ম আর নীতি, আদর্শ আর পথ যে সীমার নিষ্ঠাতেই সত্য হয়ে থাকে, খেলনা হয়তো ভয়ঙ্কর ইশারায় সেই কথাই জানায়।

খেলনার এই ভীষণতা আমাদের বয়স্ক অজ্ঞতায় আমরা না জানতে পারি কিন্তু তার দীপ্ত সারল্যে শিশু তা জানে। খেলনাকে সে বড় হতে দেয় না, কারণ, সে জানে, লঘুভাবে নাড়াচাড়া করবার জিনিস এ নয়, অসীম তন্ময়তা দিয়ে তার সাধনা করতে হয়। শিশুর প্রতিভা ও গভীর তন্ময়তা আমাদের নেই বলেই খেলনা আমাদের ব্যবহারের অযোগ্য। ব্যবসা চালানো থেকে নগর-নির্মাণ বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতো ছোট সহজ কাজ আমরা করতে পারি, কিন্তু খেলা করার গুরুতর দায়িত্ব শিশুর জন্যে বরাদ্দ রাখাই আমাদের পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচয়। বাস্তবতা যেখানে তার সীমা লঙ্ঘনে উদ্যত, সেই অকূল অনির্দিষ্ট ছায়াময় জগতের ব্যাপার সামলাতে প্রত্যাদিষ্ট শিশুর সারল্যই পারে।

এই সত্য, মোহাচ্ছন্ন মনের আধ-অন্ধকারে যেদিন আমরা ভুলে যাই, সেদিনই হয় সর্বনাশের সূত্রপাত। আমাদের খেলনা হঠাৎ সমস্ত সঙ্গতির গণ্ডি ছাড়িয়ে বিভীষিকাময় অট্টহাসি করে ওঠে। আমাদের খেলা হয়ে ওঠে আত্মঘাতী উন্মত্ততা।

খোকার খেলানাগুলি তাই আমি সভয়ে সশ্রদ্ধায় সরিয়ে রেখে দিলাম। সে-খেলনা নাড়াচাড়া করতে আমার সাহস হয় না। আমি জানি, বড়দের আনাড়ি হাতে খোকার কাঠের ঘোড়া সহসা বিপুল অশ্বারোহী-বাহিনী হয়ে শ্যামল-প্রান্তর বিধ্বস্ত করে চলে, খোকার খেলার বন্দুক বিশাল হাউইট্‌জার হয়ে মৃত্যু বর্ষণ করেও তৃপ্ত হয় না, আরও পৈশাচিক হত্যালীলার জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে।

মাত্রা রাখতে না জেনে খেলনার উন্মত্ত বিভীষিকাকে যেদিন আমরা হাতছাড়া করে ফেলি, নিজেদের খেলার ভয়ঙ্কর পরিণামে যেদিন আমরা আতঙ্কে শিউরে উঠি, সেদিন ভালো করে চোখ মেলে আমাদের উপলব্ধি করা দরকার যে, খোকার খেলনায় ভুল করে আমরা হাত দিয়েছি।

খোকার খেলনা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। নিরাপদ পৃথিবী ছেড়ে খোকার রহস্যময় খেলাঘরে আমরা যেন অনধিকার প্রবেশ না করি।

"বৃষ্টি এল"। অগ্রহায়ণ ১৩৬১।

চিঠির কথা

অন্নদাশঙ্কর রায়

চিঠি পেতে আমার এখনও ভালো লাগে, কিন্তু লিখতে ? লিখতে ভালো লাগে না বললে বাড়িয়ে বলা হয়, অথচ ভালো লাগে বলতেও বাধে। অনেকদিন থেকে শরীরে একপ্রকার ক্লান্তি বোধ করে আসছি, বোধ হয় দোষটা তার। অথবা মনের, কেননা মনেও এক প্রকার নির্লিপ্ত ভাব। এমন হুজুগ বেশি নেই, যা আমাকে উস্‌কে দিতে পারে। আর সমস্যা যা আছে, তা যত সোজা ভেবেছিলুম তত নয়, সমাধান শোনাতে যাওয়া ছেলেমানুষী। এই, ধরুন, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা। এককালে এর জন্যে যত রক্ত ক্ষয় করেছি তা প্রায় রক্তপাতের সমান, সেসব চিন্তা চিতার মতো আমাকেই জ্বালিয়েছে, আর আমার প্রবন্ধ পড়ে পক্ষপাতী পাঠক-পাঠিকারা জানিয়েছেন, "এর চেয়ে একটা গল্প লিখলে পড়ে তৃপ্তি হত।"

দেহ-মনের এই অবস্থায় চিঠি লিখতেও উৎসাহ পাইনে। অবশ্য যে-চিঠি সরকারী বা দরকারী, তার জবাব দিতে হবে, তার বাঁধা ভাষা আছে, লিখতে কষ্ট যেটুকু হয় সেটুকু মানসিক নয়, শারীরিক। সরকারী হলে তো কোনও কষ্টই নেই, স্টেনোগ্রাফার আছেন, তিনিই শারীরিক ক্লেশ থেকে বাঁচান।

কিন্তু যেসব চিঠি নেহাত অদরকারি, তাদের বেলায় আমার হাতের চেয়ে মাথার ঝঞ্ঝাট বেশি। একদা আমি অকাতরে চিঠির তুলো উড়িয়েছি, ওই যেমন শিমুলের তুলো উড়ছে তেমনি। তখনকার দিনে সব বিষয়েই আমার একটা তৈরী মত ছিল। আইনস্টাইন থেকে শুরু করে গ্রেটা গার্বো পর্যন্ত যে-কোনও মানুষের সম্বন্ধে, তত্ত্বের সম্বন্ধে দু'কথা লিখতে ভীত হতুম না, গায়ের জোরে তর্ক করতুম ও কলমের জোরে কাগজ কালো করতুম। ধৈর্যও ছিল অসীম, কেউ যদি না বুঝত, আমি চিঠির পর চিঠি লিখে বোঝাতুম। সেসব দিন গেছে।

এখন যে আমার তর্কের ঝোঁক নেই, তা নয়। মত জাহির করার রোগও আছে। সেদিন এক বন্ধুর সঙ্গে বারো বছর পরে দেখা হল, যতক্ষণ একত্র ছিলুম দু'জনে তুমুল বকেছি, কেউ কাউকে ভজাতে পারিনি, সেই তো দুঃখ। কিন্তু শতং বদ, মা লিখ। সেই বন্ধু যদি চিঠি লিখতেন, আমার অন্য রূপ দেখতেন। কেননা এই বারো বছরে আমি যেমন লিখতে শিখেছি, তেমনি না লিখতেও শিখেছি।

আমার কোনও কোনও চিঠি বন্ধুজনের নির্বন্ধে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর থেকে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, চিঠিরও সাহিত্যিক মূল্য থাকতে পারে। তেমনি ভয়ও জেগেছে যে, আমার যেসব চিঠি ছাপাবার মতো করে লেখা নয়, ফুর্তি করে লেখা, সেসব চিঠিও একদিন ছাপার হরফে উঠতে পারে। এখন চিঠি লিখতে বসলে অমনি সতর্ক হই, পাছে এমন কিছু লিখি যা ছাপার হরফে ধরা পড়লে আমাকে সুদ্ধ ধরা পড়িয়ে দেবে। পাঠকরা ভাববেন, "কই এঁর বই পড়ে যেমন মনে হয়, চিঠি পড়ে তো তেমন হয় না।" এতদিনের সাধনায় আমার যে-সাহিত্যিক রূপটি দেশের পাঠকদের চোখে পরিচিত হয়ে এসেছে, একখানি চিঠি তাকে একদিনেই ধূলিসাৎ করতে পারে। অতএব শতং বদ, মা লিখ।

তারপর আরও আপদ আছে। সাহিত্য রচনার একটি উৎকর্ষ মান আছে, সেই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবার একটা প্রয়াস আছে, সে প্রয়াস তো চিঠির বেলায় স্থগিত রাখতে পারিনে। দরকারী বা সরকারী চিঠি হলে অন্য কথা, কিন্তু যে-চিঠি কেবলমাত্র পড়বার জন্যে লেখা হয়েছে, তা সাহিত্যের স্বজাতি, কেননা সাহিত্যও কেবলমাত্র পড়বার জন্যে লেখা। তাহলে সাহিত্যের মান চিঠির উপরও আরোপিত হয়, চিঠিও হয়ে উঠে সাহিত্য। তফাৎ শুধু এই যে, চিঠি লেখার একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা আছে, সাহিত্যের তা নেই। অর্থাৎ প্রবন্ধ বা গল্প একমাস পরে লিখলেও চলে,

চিঠি ফেলে রাখলে চলে না। পত্র-লেখকরা পত্রপাঠ উত্তর প্রত্যাশা করেন। আমি এ-সমস্যার সমাধান খুঁজে পাইনে, এ-সমস্যা হিন্দু-মুসলিম সমস্যাকেও ছাড়িয়ে যায়। যদি আমি রবীন্দ্রনাথ হতুম, তবে যাই লিখতুম তাই হত উৎকৃষ্ট, কিন্তু আজ যা লিখি, কাল তা পছন্দ হয় না। সেই জন্যে, আমার চিঠি যেদিন লেখা হয়, সেদিন ডাকে না গেলে পরদিন ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে যায়। যাঁরা আমার চিঠি পান, তাঁরা জানেন না যে, হয় ওঁর চিঠি কোনওমতে ডাকঘরে গিয়ে জান বাঁচিয়েছে, নয় ওর বহু জন্ম অতীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে-চিঠি হয়তো আমার মনের মতো হয়নি। কী করি, একেবারে জবাব না দিয়ে তো পারিনে।

ফল হয়েছে এই যে, আমাকে চিঠি লিখলে আমি তিন মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত নিরুত্তর থাকি। এটার মূল কারণ কুঁড়েমি, কিন্তু সেই একমাত্র কারণ নয়। চিঠির যদি সাহিত্যিক মূল্য থাকে আর চিঠিতে যদি কেউ সাহিত্যের স্বাদ আশা করেন, তবে তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে, উপায় নেই। দরকারী কাজ থাকলে জবাব লেখা দরকারের নিয়ম মেনে চলে, কিন্তু যেখানে দরকারটা কাজের নয়, ভাবের, সেখানে মনোভাবের মর্জির উপর নির্ভর করা ছাড়া গতি নেই। ভাবুকের চিঠি ভাবের অপেক্ষা রাখে, ভাব যদি তিন মাস আগে না আসে তবে ভাবের অভাব কি ভাষা দিয়ে পূরণ করা যায়? কিংবা মামুলি কুশল সম্ভাষণ দিয়ে?

তাই আমার চিঠিতে প্রায়ই দেখা যায়, "উত্তর দিতে দেরি হল বলে লজ্জিত।" দেরি না হলেও লজ্জার কারণ হত, সে-লজ্জাপত্র, পাঠকের কাছে না হোক, নিত্যকালের পাঠকের কাছে। কে জানে কোন চিঠির দৌড় কতদূর! কোন চিঠি কবে ছাপা হবে, কার চোখে পড়বে! এমন করে লেখাই শ্রেয়, যাতে লেখার দিক থেকে ত্রুটি নেই, যা রসের তালিকায় লেখা। তার জন্যে যদি তিন বছর দেরি হয়ে যায়, তবে নাচাব।

কিন্তু সামাজিক মানুষের লোকভয় আছে। যিনি চিঠি লিখছেন, তিনি কেন মার্জনা করবেন! তাঁর আত্মসম্মান আছে! সসীম সময়ের মধ্যে উত্তর না পেলে তিনি ধরে নেবেন যে, লোকটা ভদ্রলোক নয়, চিঠি লিখলে চিঠির জবাব দেয় না। সেই ভয়ে যাহোক একটা কিছু লিখে দিতে হয়। নইলে চিঠির পাহাড় নিয়ে আমি করি কী। এই তো ইতিমধ্যে একটি স্তূপ জড়ো হয়েছে। একদিন বসে যত পারি লিখব ও ছিঁড়ব, অন্তত জনকয়েকের কাছে ভদ্রতা বজায় থাকবে।

লিখব, "উত্তর দিতে দেরি হল বলে মনে কিছু করবেন না।" লিখব, "আপনার চিঠি অনেক দিন আগে পেয়েছি, কিন্তু আমার শরীর মন ভালো ছিল না।" মিথ্যা নয়। তবু সত্যও নয়। সত্য হচ্ছে এই যে, শিল্পীমন সজাগ থাকে না সব দিন। যেদিন জাগে, সেদিন হয়তো তিনমাস বিলম্ব হয়ে গেছে। সে-মন ভদ্রলোকের মন নয়, তাই ভদ্রলোক তার জন্যে লজ্জিত।

হাঁ চিঠি পেতে আমার এখনও ভালো লাগে, মনের সঙ্গে মনের ছোঁয়াছুঁয়ি এখনও মধুর। এমন কি ঠোকাঠুকিও আমার মন্দ লাগে না। আমি মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত হতে দিই নে, অতটা Self-righteousness আমার সাজে না। কিন্তু চিঠি লিখতে বসলে আমি হয় ভদ্রলোক, নয় ভাবুক। ধরা-ছোঁয়া দিতে সাহস হয় না, ফূর্তি করে লেখা বন্ধ। এর জন্যে দায়ী আমার সাহিত্যিক খ্যাতি, এ হচ্ছে খ্যাতির খেসারৎ! ছাপাখানার ভয়ে আমি আড়ষ্ট।

"জীয়ন কাটি"। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

বই কেনা

সৈয়দ মুজতবা আলী

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত, সে-কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায় আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকত, তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এক সঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায় এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দু'টি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক-একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ-বাড়াবার পন্থাটা কি ? প্রথমত বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসার জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, ভবযন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশি হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শনে কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কী।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কী প্রকারে ?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,—

> Here with a loaf of bread
> beneath the bough,
> A flask of wine, a book of
> verse and thou,
> Beside me singing in the wilderness
> And wilderness is Paradise now,

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশতের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে-বাণী মুহম্মদ শুনতে পেয়েছিলেন, তাতে আছে 'আল্লাম বিল কলমি', অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই— বই par excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক— The Book.

যে-দেবকে সর্বমঙ্গল কর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ওই এক কথা, 'অত কাঁচা পয়সা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব ?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য— কনিষ্ঠা পরিমাণ— লুকানো রয়েছে। সেটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে, ব্যস। এর বেশি আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম যদি আরও কমানো যায়, তবে আরও অনেক বেশি বই বিক্রি হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই, যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে, 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাব কী করে ?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাংলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ-ভাষায় বাংলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচসিকে দিয়ে যে-কোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন ?'

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোনও ভালো বই এক ঝট্‌কায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশি ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি ?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ-চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে ? প্রকাশক না ক্রেতা ? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ওই দিয়ে সে পেটের ভাত জোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। সে এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ— দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনও দেউলে হয়নি ; বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিন গুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত একগাদা নূতন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে, বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, তারপর চেখে-চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা, যার দরুণ সকালবেলা চোখের সামনে সারে-সারে গোলাপী হাতি দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কী করি ? আমি একাধারে Producer এবং Consumer— তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে Producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই Consumer। আরও বুঝিয়ে বলতে হবে ? আমি একখানা বই Produce করেছি। —কেউ কেনে না বলে আমিই Consumer, অর্থাৎ নিজেই মাঝে-মাঝে কিনি।

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত— পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, "বইগুলো নষ্ট হচ্ছে ; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন ?"

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, "ভাই, বলছ ঠিকই— কিন্তু লাইব্রেরিটা যে-কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে-কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে।

শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।”

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে, আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরত না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না, সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত। তার কারণটা কী ?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, “ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সব চেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সব চেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর ? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি। কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হল টাকা। সে-ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে, পশ্য, পশ্য, জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে-ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না। —বই পড়তে পারে না।”

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ. ই. ডি দিয়ে, “অতএব, সপ্রমাণ হল, জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।”

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাংলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইং-রুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা পাড়ে, কিন্তু গরবিণী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, “তবে একখানা ভালো বই দিলে হয় না ?” গরবিণী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, “সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।”

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ওই জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন, আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য। তাই, যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জৎ করতে চায়, তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে-মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন— অধিকাংশই নাম-করা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদে'র পিছনে— গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদে'র প্রাণ অতিষ্ট করে তুলল। কিন্তু আশ্চর্য, জিদে'র লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ করে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদে'র হয়ে লড়লেন না। জিদে'র জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল, জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটল নিলামখানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষু স্থির।

যে-সব লেখক জিদে'র হয়ে লড়েননি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষরসহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে-অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে

বসে শুনতে পেয়েছিলুম— কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন— জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনের দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন-আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা-কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাংলা দেশে নাকি একবার এ-রকম টিকি বিক্রি হয়েছিল।)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনও ক্ষমা করেননি।

আর কত গল্প বলব ? বাঙালীর কি চেতনা হবে ?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকত। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালি যদি হটেনটট হত, তবে কোনও দুঃখ ছিল না। এ-রকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখিনি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনও-কোনও বেশরম বলে, "বাঙালীর পয়সার অভাব। বটে ? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা ? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কিউ থেকে ?

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরবোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

"পঞ্চতন্ত্র"। আষাঢ় ১৩৫৯।

হট্টশ্রী

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

হট্টশ্রী কথাটি আমারই মনের একটা মোলায়েম প্রচেষ্টা মাত্র।

সাধারণ ব্যবহারে আমরা হাট-বাজারেরই উল্লেখ করে থাকি। আর সে-হাট-বাজারে না আছে শ্রী, না আছে ছাঁদ। বরঞ্চ আছে এমন একটা আবহাওয়া যেটা শিষ্টতার অনুকূল নয়, ব্যবসায়িক কদর্যতাকেই যেন পুষ্ট এবং প্রসারিত করে দেয়। আগেকার দিনের হট্টের মধ্যে যেটুকু শ্রী ছিল, সেটুকু আজকাল লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন আছে শুধু গোল। কেন এই রূপান্তর হয়েছে, কথাটা বলি।

'হাটে-বাজারে' কথাটিকে আমরা এতই ব্যবহার-মলিন করে ফেলেছি যে, ওর সঙ্গে বীমা আর ছালা আর থলের জটিল দুর্গন্ধের ঘনিষ্ঠ অন্বয় ভনভনে মাছি এবং পচা ফল ও চিটে গুড়ের গাঢ় অবলেপ। কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে আসে একটা অনৈকতানের আদিম হট্টগোল, সের-বাটখারার মরচে-ধরা আওয়াজ, দরাদরির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক তীক্ষ্ণ প্রয়াস—এবং, সর্বোপরি, মাছের আঁশটে জল, ডাবের খোলা এবং কলার খোসার স্তূপীকৃত আবর্জনা বাঁচিয়ে কনুই ঠেলে পিছিল পথে অগ্রসর হওয়ার করুণ চিত্র। এ-সবের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন কষ্টের ছবিটা এতই বিশ্রী রকমের পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, সেই দুঃস্থ মনোভাবকে আমরা সযত্নে এড়িয়ে যেতে চাই। সাহিত্যে তো নয়ই, জীবনেও তার পুনরাবৃত্তি অনর্থক, অরুচিকর এবং গ্লানিকর।

তাই যে-সব নাগরিক গার্হস্থ্য জীবনের নিত্য বিড়ম্বনা এবং তারই আনুষঙ্গিক বাস্তব পরিবেশটুকু বরদাস্ত করতে পারেন না, তাঁরা আশ্রিত আত্মীয়-অনাত্মীয় অভাবে ঠাকুর-চাকরদের হাতে দোকান বাজারের ভার ছেড়ে দিয়ে সকালে উঠে চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগজেই মনোনিবেশ করেন। অপটু, অনভিজ্ঞ এবং অদীক্ষিত বলে তাঁরা গঞ্জনা শোনেন মাত্র, কিন্তু সংসারের ক্লান্তিকর ঝামেলা থেকে তাঁরা একরকম রেহাই পেয়ে যান। ঘাড় পেতে রাখলেই কর্তব্য আর সংসারের যাবতীয় কাজ ঘাড়ে আপনি এসে চেপে বসবে। তাই মেরুদণ্ডহীন হয়েও মেরুদণ্ড সোজা রাখা একটা বিশিষ্ট শিল্প। আমি এই শিল্পসাধনা করে অপবর্গ লাভ করেছি। কেউ আর আমাকে এখন কোনও কাজ করতে অনুরোধ জানায় না, পাছে সব ভণ্ডুল করে দিই। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি হলেই হয় না, চক্ষুর স্তিমিত এবং মুদ্রিত ব্যবহার আত্মশান্তির পক্ষে অপরিহার্য। তা ছাড়া, প্রত্যেক ঘরেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তি আছেন, নিঃশব্দ পরোপকারের চেয়ে সঘোষ শিক্ষাদানেই যাঁর পারমার্থিক আনন্দ। ভেবে দেখুন, ঘরে যদি ছোটমামা, সেজকাকা অথবা মেজোপিসেমশাইয়ের অযাচিত অকৃপণ সাহায্য সুলভ হয়, তা হলে কোনও ভদ্রসন্তান সকালে দ্বিতীয় দফা চা-পানান্তে বেলা নটা পর্যন্ত কিছুই না করে বিশুদ্ধ স্ফূর্তিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে না ওঠেন? নিদেনপক্ষে, সর্বকর্মপটীয়সী গৃহিণী তো আছেন। তা হলে দেখবেন, দশটার মধ্যে খাওয়া শেষ হয়েছে এবং ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আপনি যথাসময়ে কর্মস্থলে প্রেরিত হয়েছেন।

কিন্তু যাঁরা নিরুপায়, নিঃসহায় এবং নিরভিভাবক, তাঁদেরই সহ্য কবতে হয় হাট-বাজার করার প্রাণান্ত দুর্ভোগ। তাঁদের কাছে হাট-বাজারের অর্থই হল একটা বিশ্রী রকমের দৈনন্দিন দায়িত্ব, যেটা উদরের ইন্ধনস্বরূপ হলেও রসনায় ঠিক রস সঞ্চার করে না। যাঁদের বাজারে বেরুবার দরকার করে না অথবা প্রথম দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যাঁরা সরকার দরোয়ান নিয়ে মোটরে মার্কেটে গিয়ে আপনারই হাতে-গড়া আভিজাত্যটুকু অক্ষুণ্ণ রাখেন, তাঁদের দৃষ্টিটা হল স্বতন্ত্র, দুনিয়ার উপর অনুকম্পার দৃষ্টি। আর যাঁরা দুই দলের মাঝামাঝি অর্থাৎ ফরমায়েসমতো শৌখিন

'শপিং' করেন আবার প্রয়োজন হলে ঝি-চাকর-পালানোর দুর্দিনে সন্ধ্যায় কাঁচা সব্‌জির বাজার সেরে রেখে সকালে উঠে দাড়ি না কামিয়েই মাছের পাত্রটা হাতে করে বাজারে ছুটতেও তেমন দ্বিধাবোধ করেন না, তাঁদের মনোভাবটা হল খাঁটি মধ্যবিত্তের— অর্থাৎ কিছুটা বিব্রত, কিছুটা নির্বিকার, খানিক বিরক্তির, খানিক কৌতুকের। হরেক রকম ঝকমারির বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হলেও, এঁদের চোখে থাকে তির্যক সহিষ্ণুতা, মনটাও থাকে জাগ্রত। তাই এঁরা দেখেন ও শেখেন বেশি।

এই অভিজ্ঞতার মূল্য নিতান্ত কম নয়। হাটে-বাজারে নিত্য চলন্ত আর জীবন্ত মানুষের সংস্পর্শে এসে কত দৃশ্য ও চরিত্র বাস্তব ও মূর্ত হয়ে ওঠে। যাঁরা পাকা ব্যবসায়ী, বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাঁরা তো এই হট্ট-লব্ধ মানব-চরিত্রজ্ঞানকেই মূলধন হিসেবে ব্যবহার করেন। আর যাঁরা রচনাকুশলী, হট্টশ্রীতে আস্থাবান, তাঁদের ভাবনার ও রচনার অনেকখানি খোরাক তো মিলবে এইখানেই। হট্টমনের বিচিত্র স্পন্দন যাঁরা ঠিকমতো ধরতে পাবেন, তাঁরাই তো সত্যিকারের জননায়ক। আর যাঁরা নিখিল হট্টমন্দিরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁরাই তো নির্জাতিক যাযাবর, খাঁটি মুসাফিব।

বর্তমান হাটের চরিত্রেও বৈশিষ্ট্য অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হয়েছে। সভ্যতার বিবর্তনের এটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। পণ্যই যখন মুখ্য, মানুষ তখন গৌণ। রূঢ় দ্রব্য যখন কারু-পণ্যে পরিবর্তিত হয়, হট্টশ্রী তখন রূপান্তবিত হয় বিপণি-সজ্জায়। তাই হাট-বাজাব আর দোকান-পসারের মধ্যে আছে অনেকটা পার্থক্য। প্রথমটায় আছে গতির আভাস, দ্বিতীয়টিতে স্থিতিব। একটি হল যাযাবর মানুষের ও মনের প্রতীক; অপবটি হল স্থাণু, নিশ্চিত ও নিরাপদ মনেব পবিচয়। একটিতে পাই ধুলো আব মাটি আব খোলা আকাশ; অপবটিতে গদি অথবা কেদারা এবং বিজলী পাখা। শতবার হাটে ঘুরে বেড়ালেও তাকে আমরা বাঁধতে পাবি না, আয়ত্ত করতে পারি না তার সমগ্র সরণশীল সত্তাকে। কিন্তু দোকানকে আঁকড়ে রাখি তালা-চাবি, সাইন-বোর্ড আর 'নিয়ন' লাইট দিয়ে। হাট যখন ভাঙে, গোধূলিব আলোয় তার ভাঙা চেহারা মনে আনে কাব্যের আবহ। নিস্তব্ধ প্রান্তরে বট-পাকুড়েব শাখায় বাদুড়েব কিচিমিচি, জনহীন হাটের প্রাঙ্গণে-প্রাঙ্গণে শূন্য গুড়ের কলসিগুলোব গড়াগড়ি, আলকাতরা-মাখানো জীর্ণ দু-একটি দরজায় বাতাসের অদ্ভুত আওয়াজ আর ঘনায়মান অন্ধকাবে উপুড়-করা কালো-কালো মেটে হাঁড়িগুলো এমন একটি অতিনৈসর্গিক বিক্তভাব ছবি ফুটিয়ে তোলে, যেটি ঘুমন্ত শহবের নির্জনতম পথে বন্ধ দোকান-পাটেব গায়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা শুধু প্রকৃতি-পটভূমির গুণ নয়, দ্রব্যেরই গুণ। হাট যতক্ষণ বেঁচে থাকে, প্রচুর কোলাহলের মধ্য দিয়েই তার জীবন-ঘোষণা; আবাব মৃত্যু যখন নামে, সম্পূর্ণ তার পরিসমাপ্তি— নীরন্ধ্রভাব অবলুপ্তিব অন্ধকার। দোকানপাট কিন্তু মবেও মরে না, তাদের চেহারা ভয়াবহ বকমেব নিঃস্ব লাগে না। তাবা মূৰ্ছিত মাত্র; নাগরিক জীবনের স্তিমিত ধারায় তারা ঝিমিয়ে থাকে। একটিতে রয়েছে গ্রাম্যতার সরল স্পর্শ; অপরটিতে আছে নাগরিকতার জটিল ছাপ।

দু-জায়গাতেই অবশ্য দরাদরি চলে। কিন্তু যে-মানুষ হাটে গিয়ে ঝিঙের দর আগুন বলে ফড়েকে হুমকি দেয় কিংবা মেছুনিকে সোনার নিক্তিতে ওজন করতে দেখে ঝাঁ করে দুটো কুচোচিংড়ি থলের মধ্যে পুরে নেয়, সেই ব্যক্তিই দোকানে গিয়ে বাঁধা দরের অতিরিক্ত সেলামি দিয়ে কেনে যৌতুকের বাসন, আদ্দির থান অথবা বিলিতি সিগারেট। রসিদ চাইবার দরকাবও বোধ করে না। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে দাম কষাকষি চলে, কিন্তু দু-এক পয়সা নিয়ে অভব্যতা কিংবা হট্টগোলের সৃষ্টি খুব কমই হয়ে থাকে। তা ছাড়া হাটে গেলে মেলে প্রাণের ও প্রকৃতিব পরিচয় মানুষের মুখে আর সবুজের ডালায়,—চাষীদের স্বেদসিক্ত পেশীবহুল দেহে আর নধর আনাজের শ্যাম-শোভায়। সেখানে ছড়ানো থাকে পসরা, চলে বেসাতি। দোকানে মজুত থাকে মাল। নিখুঁতভাবে সাজানো থাকে প্রসাধনের ডালি। সেখানে কোলাহল নেই, কিন্তু অন্তরঙ্গতার অভাব। হাটে গেলে আমরা হাঁটি, ভদ্র-অভদ্র-নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে নিছক ঘুরে বেড়াই। গণতান্ত্রিক বিচরণের ফাঁকে অবসর-মতো জিনিস দেখি, দর শুনি, যাচাই করি। তারপর মনের মতন সওদা না পেয়ে হয়তো শুধু হাতেই ঘরে ফিরি। দোকানে কিন্তু জিনিস

কিনতে এসে আমরা ভদ্রমাফিক কায়দায় কথা বলি, দাড়িয়ে অপেক্ষা করি, শো-কেসের কাঁচের পাল্লায় দেখি নিজেরই লোলুপ প্রতীক্ষমাণ দৃষ্টি। দরদস্তুর একটু-আধটু করি বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আর, কিছু না কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে আসবার ভরসা রাখি না। তা হলে স্বল্পায়তন পকেটের সঙ্গে গড়ের মাঠের বিস্তৃত সাদৃশ্যের অবারিত ইঙ্গিত শোনবার সম্ভাবনাই ষোল আনা।

এ-কাজ বরঞ্চ পারেন এবং দু-একবার দেখেছি, করেও থাকেন মেয়েরা। দোকানদার হয়তো একটার পর একটা জিনিস মেলে ধরছেন কোনও মহিলার সামনে। কিন্তু কিছুই পছন্দ হচ্ছে না তাঁর। কাঁচা সেলসম্যান মরিয়া হয়ে এটা পাড়ছে, ওটা দেখাচ্ছে আর মনোরঞ্জনের আশায় অজস্র বাক্য ব্যয় করছে। কিন্তু খদ্দেরের অন্যমনস্ক চোখে কোনও রঙই ধরছে না। অবশেষে স্তূপাকার জিনিস পাড়িয়ে নাড়াচাড়া করে একটা বেছে নিয়ে বললেন : "এর চেয়ে ভালো আর কিছু নেই নতুন ধরনের ? দামটাও সস্তা মনে হচ্ছে যেন—কী জানি, খেলো জিনিস ব্যবহার করিনি তো কখনও।" হল অ্যান্ড অ্যান্ডার্সনে অ্যাকাউন্ট আছে জেনে আর সেজোভাইয়ের পিস্‌শ্বশুর হাইকোর্টের জজ শুনে সেলসম্যান যখন অভিভূতপ্রায়, তখন অনুকম্পার হাসি হেসে হয়তো মহিলাটি বলে ওঠেন : "দিন ঐটেই। কী আর করা যাবে ! সরেস জিনিস কিন্তু স্টক করবেন এবার থেকে। নজরের কাছে দামের প্রশ্ন কিসের ?"

তারপর ক্যাশ-মেমো যখন লেখা হয়ে গিয়েছে, হাতব্যাগটা সশব্দে বন্ধ করে তিনি ঝাঁজিয়ে ওঠেন : "আবার সেল ট্যাক্স ধরছেন কেন ? এই তো জিনিস আর এই দোকানের ছিরি... !" বলেই অত্যন্ত বিরক্তিভরে বেরিয়ে যান।

কাউন্টারের পিছন থেকে ক্যাশবাবু নিকেলের চশমাখানি নামিয়ে অপসৃয়মাণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করেন : "তুমিও যেমন ছোকরা ! এখনও অনেক শিখতে বাকি তোমার, বুঝলে হ্যাঁ...।"

তরুণ সেলসম্যান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জিনিসগুলো সরিয়ে গুছিয়ে রাখে। পুরুষ খরিদ্দার হলে ব্যাপারটা কী রকম অপ্রীতিকর দাঁড়াত, তাই ভেবে শিহরিত হই আর মহিলাটির নিপুণ দুঃসাহসে চমৎকৃত হই।

পুরুষরাও কিছু বাদ যান না। নিজ-নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ হয়ে থাকে। মেয়েদের যেমন নিজস্ব ডিপার্টমেন্ট আছে— শাড়ি বাসন কিংবা গহনার দোকানে দেখি তাঁদের নিত্য আনাগোনা, পুরুষদেরও তেমনি স্বকীয় বিভাগ আছে— যেমন জামাকাপড, জুতো, বই, সিগারেট কিংবা মনোহারী দোকান ! সেখানে দেখি তাঁদের দরদস্তুর করবার ক্ষমতা এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে লম্বা বিলের পাওনা না মিটিয়ে হাওয়া হয়ে যাবার অস্বাভাবিক নৈপুণ্য।

কিন্তু সে-কথা থাক। বর্তমান যুগে, নাগরিক সভ্যতার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে হাটের হট্টচরিত্র ঘুচে গিয়ে যেমন বাজারে পরিণত হয়েছে, আর ঝাঁপ-লাগানো দোকান রূপান্তরিত হয়েছে কোল্যাপসিবল-গেট-দেওয়া ফ্যাশনেবল মার্ট বা মার্কেটে, তেমন সেই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, শপিং-এর ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের এলাকা আর পৃথকভাবে চিহ্নিত নেই। প্রৌঢ়া মহিলারা সন্ধ্যার পর অনায়াসেই বাজার করতে বেরোন। বেশভূষাটা পুরুষদের চেয়ে বেশী ভদ্র এবং মার্জিত এই যা তফাত। পিছনে ঝুড়ি-হাতে চাকর কপি মুলো আলু পটল আর লাউ কুমড়ো এবং বোঝার উপর শাকের আঁটি বয়ে বেড়ায়। একটি পয়সাও দস্তুরি বাবদ ট্যাঁকে যেতে পায় না। অবিশ্যি এক হিসেবে এ-ব্যবস্থা ভালোই বলতে হবে। কী দিয়েই বা সকালের রান্না আর কোন্-কোন্ তরকারি রাতের বরাদ্দি, পুরুষদের আর মেয়েদের জন্য কী রান্না আলাদা হবে বা হওয়া উচিত, কোন্ অনুপানের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ ব্যঞ্জনের উপকরণ নেওয়া যায়, এটা মেয়েরাই তো বেশি বোঝেন। প্লানিং-এর অঙ্গ-স্বরূপ ছকটা তাঁদেরই হাতে। তা ছাড়া, লাউ রান্না হবে আমিষ বা নিরামিষ, আমিষ হলে ঝটকা-চিংড়ি অথবা কাঁকড়া সহযোগে, এ-সব কথা পুরুষেরা কী করে জানবেন ? তাঁরা জানবেন হাটের দর, রাখেন হাটের খবর। কিংবা ছোটো বৌ ট্যাংরা মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না, বড়ো গিন্নী শিম-বেগুন-বড়িভাতে খেতে ভালোবাসেন, আর সেজদি মন্ত্র নেবার পর থেকে কাঁকড়া ছোঁন না— এত গুহ্য ঘরের খবর মনে রাখবেন কী করে ?

তা ছাড়া, আমি লক্ষ করে দেখেছি মেয়েরা সত্যিই হাট-বাজার করেন ভালো। বাজে পয়সা

নষ্ট না করে একসঙ্গে অনেক সবজি না কিনে এবং সংসারের সাশ্রয় করে তাঁরা যেমন পরিপাটি বাজার করেন, পুরুষরা তেমন পারেন না। পুরুষ বাজারে যান আসেন যন্ত্রের মতো। একই সজনের ডাঁটা অথবা থোড়-বড়ি কিনে নিয়ে রোজই বাড়ি ফেরেন পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই। নারী চলেন ধীরে মন্থরে। পাঁচটা জিনিস দেখেন-শোনেন, যে-পটলওয়ালা ডাকে সেখানেই দাঁড়িয়ে যান, দর করেন, মনে-মনে ভেবে দেখেন, তারপর হয়তো বলেন : "এই পটল বাছাই করে দিলুম। সাত আনার বেশি সের দেব না—আগে থাকতে বলে রাখছি কিন্তু। তোলো পাঁচ পো।" 'পাষাণ ঠিক আছে মা', বলতে গিয়ে পটলওয়ালা গৃহিণী-সুলভ ভ্রূকুটির এমন ধমক খায় যে, সেই নির্মম পাষাণদৃষ্টির সামনে নতমুখে পাল্লা ফিরিয়ে ওজন না করে সে পথ পায় না। দাম নেবার সময় দেওয়া হল ন' আনা। বাকি পয়সাটা ফেরৎ না নিয়ে তিনি পাশের ডালাখানির দিকে ইঙ্গিত করবামাত্র বেচারি তাড়াতাড়ি এক মুঠো কাঁচা লঙ্কা তুলে দিতে বাধ্য হয়। তবুও হয়তো মনঃপূত হল না— যদিও তাতে জন পাঁচেক বলিষ্ঠ পুরুষের পাকস্থলী অনায়াসেই জর্জরিত হয়ে যেতে পারে।

যে-সব পুরুষ নিত্য হাট-বাজার করে থাকেন, তাঁরা সব্জি কিনতে গিয়ে এক-আধ পয়সা বাঁচানো কিংবা অযথা সময় নষ্ট করা ভালোবাসেন না। তাঁদের নজরটা মাছমাংস এবং ফল-মূলের ওপরই যেন বেশি। অনেক বাড়িতেই অবসরপ্রাপ্ত কর্তা-ব্যক্তি বা অভিভাবক আছেন। আজকালকার ছেলেছোকরাদের সাংসারিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব-জ্ঞানের উপর তাঁদের প্রচুর অবজ্ঞা। নিত্য বাজার এঁরা নিজ হাতেই করে থাকেন। সে-ভারটি আর কাউকে প্রাণ ধরে বিশ্বাস করে ছাড়তে পারেন না। পচা ভাদ্দরে বেশি রোদ্দুর লাগলে ব্লাড-প্রেশার বাড়বে বলে তাঁরই শরীরের খাতিরে দাপট-যুক্তা গৃহিণী যদি বাজারে বেরুতে তাঁকে কোনওদিন অনুমতি না দেন, তাহলে সারাটা দিন তাঁর মেজাজ খারাপ থাকে আর সন্ধ্যার পরই মাথাটা কেমন টিপ-টিপ করছে বলে শুধু একটু দুধ খেয়েই শুয়ে পড়েন।

বাজার করার মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি যে-প্রকৃতির মানুষ, তিনি সেই রকম জিনিস কিনে থাকেন। অর্থাৎ যাঁর অগ্নিমান্দ্যের প্রকোপ এবং বায়ুপ্রধান ধাত, তিনি নিত্যই কাঁচা পেঁপে, পাকা বেল, ওল, পলতা এবং সরু জিয়ল মাছ কেনেন। আর যাঁর স্বাস্থ্য ভালো, হজমশক্তি অটুট, তিনি পোস্ত, এঁচড়, ডিম, মাংস এবং ইলিশেরই পক্ষপাতী। কেউ বা দৈনিক বরাদ্দের মধ্যেই কাটা পোনার টুকরো সমেত গুছিয়ে বাজার করেন, অধিকন্তু ফেরবার পথে মোড়ের পানের দোকান থেকে গৃহিণীর জন্য পান আর আচারটুকু নিতে ভোলেন না। কেউ বা আবার একটু বে-হিসাবী, লুকিয়ে পকেট থেকে ডেফিসিট পুষিয়ে দেন। সতরো সিকের ভোম্বল-মার্কা কাতলাটাকে হাসি-হাসি মুখে সতরো আনার পরোয়ানা দিয়ে বেপরোয়া ফেলে দেন বাড়ির উঠোনে। সস্তায় মাছ কেনার কৃতিত্বে এবং ধরা পড়ার ভয়ে তাঁর মন তখন খাবি খাচ্ছে। এই কম দামে জিনিস পাওয়া আর আড়ৎ থেকে মাল কিনে আনার মোহ অনেক ভদ্রসন্তানের মধ্যেই আছে। এরই আকর্ষণে শ্যামপুকুর থেকে বাঁড়ুজ্যে মশাই ছোটেন চিৎপুরের তামাক আর বড়বাজারের দরে ঝাড়াই মসলা, ডাল, সুপারি আর বালতি-কড়াই কিনতে। ভবানীপুর থেকে হালদারমশাই পাড়ি দেন বেলগেছের খালধারে চুন আর ভুষি মাল খরিদ করার জন্যে, আর চাঁপাতলা থেকে নন্দীবাবু হাতকাটা ফতুয়া পরে আর কোমরে গেঁজে বেঁধে ধাওয়া করেন চেতলার হাটে মশারির থান, বিচলি, সরু চিঁড়ে আর বঁড়শির শক্ত সুতোর সন্ধানে। বালিগঞ্জ কিংবা রিজেন্টস্ পার্কের মিঃ বাসুকেও কখনও কখনও ছুটতে হয় বইকি ঘরো।া তাগিদে হাওড়ার হাটে সস্তায় গামছা এবং তাঁতের রকমারি শাড়ির নতুন নতুন পাড়ের আশায়।

আজকাল দেখতে পাই—মেয়েরা যাচ্ছেন সব্জির বাজারে, মাংসের স্টলে কিংবা জামাকাপড়ের দোকানে পুরুষদের জন্য শার্ট স্যুটের বায়না দিতে। পুরুষরা যাচ্ছেন শাড়ি, গহনা কিংবা ক্রকারি কিনতে। কখনও একলা, কখনও যুগলমূর্তি। যদি হাতে কাজ না থাকে এবং পরিচিত দোকানে গিয়ে একটু বসবার সুযোগ-সুবিধা থাকে, দেখবেন নজর করে ঈশ্বরের কী বিচিত্র সৃষ্টি! কত হরেক রকমের 'টাইপ' ও 'ক্যারেকটার' আপনার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানবচরিত্রের ভিন্নমুখী প্রকাশ নিত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। কত স্বার্থপরতা, লোলুপতা, প্রবঞ্চনা

আব্রার ভদ্রতা ও সততার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে হাটে-বাজারে, দোকান-পসারে। দোকানে ঢুকে দাঁড়ানো আর কথা বলার ভঙ্গি থেকেই আপনি সেই মানুষটির ব্যক্তিগত স্বভাব, মেজাজ, মুদ্রাদোষ প্রভৃতি দুর্বলতা অনুমান করতে পারেন। কত পারিবারিক সংবাদ, এমন কি অনেক গোপন তথ্য পর্যন্ত আলোচিত হচ্ছে অনুচ্চ কণ্ঠে দুই খরিদ্দারের আলাপ-সূত্রে। এক কাঠিম সুতো কিনতে গিয়ে বাজারে শুনতে পাবেন অনেক কিছু, চোখ খুলে রাখলে দেখতে পাবেন তারও বেশি। স্থানীয় পাঠাগার ও চায়ের দোকান থেকে শুরু করে পাড়ার মাতব্বরদের সমালোচনা, রেস এবং ফুটবল খেলা, স্বদেশের মুদ্রাস্ফীতি ও বিদেশের গূঢ় রাজনীতি পর্যন্ত অনেক কিছুই আলোচিত হয়ে থাকে বেশ তারস্বরেই। স্ত্রী পুরুষের কত বিভিন্ন ধরনের হাসি বা চলার ভঙ্গি, কত লাস্যলীলা, কত মূর্খ গাম্ভীর্য, অসহিষ্ণুতা, চতুরতা অথবা চটুলতার নমুনা পাওয়া যায় প্রকাশ্যভাবে। তাই হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়ানো কিছু পরিমাণ ক্লান্তি ও বিরক্তিকর হলেও জীবনযাত্রার দৃশ্যমান ছবি এরই মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে নাকি, খানিকটা মজার, খানিকটা ভেবে দেখবার ?

হাট কথাটার মধ্যে রয়েছে এমনি একটি স্থূল বাস্তবের স্পর্শ যে, আমরা একে এড়িয়ে যেতে চাই। ওর মধ্যে আছে অবিশ্বাস্য গুজব আর উড়ো খবর, দাঁও কষা কিংবা লাটে ওঠা— অর্থাৎ বণিক-বৃত্তির অপ্রীতিকর অংশটা। এক কথায় ওর মধ্যে দিয়ে যেন ফুটে ওঠে আমাদের প্রাণধারণের যাবতীয় গ্লানি আর কায়ক্লেশ জীবিকার যত-কিছু জটিলতা এবং অসহায়তা। কিন্তু হাট জিনিসটা কি সত্যি অতখানি তাচ্ছিল্য ও অনুকম্পারই উদ্রেক করে, আর কিছু নয় ? ওর মধ্যে কি কোনও ঐতিহ্যের স্মৃতি নেই ?

এই বিচিত্র দেশের প্রাক্তন ইতিহাস স্মরণ করে দেখুন : প্রাচীন হিন্দু যুগ থেকে মুসলমান-আমল পর্যন্ত কত পণ্যবাহী সার্থবাহ ভ্রমণ করে বেড়িয়েছে এক হাট থেকে আর এক হাটে। কত আমদানি আর রপ্তানি চলেছিল মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বড়ো বড়ো গঞ্জ, শহর এবং বন্দরগুলিতে। উজ্জয়িনী, সূর্পারিক, ভৃগুকচ্ছ, তাম্রলিপ্ত, পাটলিপুত্র, মথুরা, বৈশালী, ধারা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিতে কিসের আদানপ্রদান চলেছিল ? রোম্যান স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কাদের বৈশ্যবৃত্তি ভারতীয় শিল্পের বিকাশ সাধন করেছিল। কাদের সঞ্চয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পল্লভ, সাতবাহন, চোল, বিজয়নগরের অতুল ঐশ্বর্য এবং শিল্পকীর্তি ? মধ্যযুগে আরব বণিকরা পৃথিবীর হাটে ঘুরে ঘুরে কোন্ সংস্কৃতির সন্ধান দিয়েছিল ? আর দিল্লী আগ্রা লাহোর প্রভৃতি শহরের বিদেশী বণিকদল কী রোমান্সের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত ? য়ুরোপেও মধ্যযুগে ধর্মযোদ্ধারা যখন বর্ম এঁটে খ্রিস্টান তীর্থত্রাণে স্থলপথে অভিযান শুরু করতেন, পথে রসদ যোগাত কারা ? য়ুরোপের হাটে-মাঠে-মেলায় কোন সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল ? বাণিজ্যকেন্দ্র নগরগুলি কেমন করে বড়ো আর স্বাধীন হয়ে মধ্যযুগের শিল্পসংস্কৃতির বিস্তারে সহায় হয়েছিল ? মধ্য জার্মানি আর উত্তর ইতালির বিভিন্ন হাটে, দক্ষিণ ফ্রান্সের আঙুর-দোলানো ক্ষেতের প্রান্তে গ্রাম্যমেলায় কোন্ কাব্য-নাট্যসঙ্গীতের উৎস খুলে গিয়েছিল ? আমাদেরও গ্রামের হাটে আর মেলায় যে-সব লোক-শিল্প-সঙ্গীতের নমুনা পাওয়া যেত, সেগুলির পুনরুদ্ধারে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আগ্রহ দেখান কিসের জন্য ? ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে একদিন যে বিরাট বাণিজ্যের বসতি ছিল, শ্রীহট্ট নামটি কি তারই স্মৃতি বহন করে আজও কমলা-মধু, আনারস, নানাবিধ আনাজ সামগ্রী আর তুলো, আখ, চুন, সুগন্ধ মসলাপাতি এবং বড় বড় সুপারির ছালা সুরমা নদী দিয়ে রপ্তানির কারবার চালায় ? কৈশোরে একবার সাতক্ষীরা অঞ্চলে বড়দলের হাট দেখেছিলুম। নোনা গাঙের মধ্যে জলে-ভাসা দ্বীপের মতন ঘিঞ্জি জায়গায় সেই বিপুল হাটের দৃশ্য-স্মৃতি আমার মনে আজও যেমন অম্লান, রাজরোপ্পার পথে ছোট্ট একটু ঢালু জমিতে আদিবাসীদের অকিঞ্চিৎকর হাটের চঞ্চল আয়োজনটুকু বড়ো বয়সেও তেমনি আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

হাটের অর্থই হল বাহুল্য—যে-বাহুল্য আসে তার অনিশ্চিত অস্তিত্ব থেকে। কোন-এক অনির্দিষ্ট দিনে অনেক দ্রব্য, অনেক মানুষের সমাবেশ হয় কিছুক্ষণের বা কয়দিনের জন্য। তারপর হঠাৎ যেন ফুরিয়ে যায়। এই নিঃশেষিত অস্তিত্বের কিছুটা রং লাগে গোধূলির আকাশে, পারানি নৌকার জীর্ণ পালে, ঘরে-ফেরা হাটুরের ক্লান্ত পদক্ষেপ, প্রতীক্ষমাণ চোখের ম্লান দৃষ্টিতে। তাই

মনে হয়, হাট বোধ হয় শুধু মরা নদীর একটুখানি চলাচলের স্রোত নয়, নয় কেবল বৈশ্যবৃত্তির বিড়ম্বনা অথবা আদান-প্রদানের ধূলি-মলিন অঙ্গন। ওখানে আছে সূক্ষ্ম দৃষ্টি-চালনার কিঞ্চিৎ অবসর, আছে দার্শনিকতার একটুখানি অবকাশ। তা যদি না হত, তাহলে একাধিক কবি শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছে হট্টশ্রী তার স্থূলতার আবরণ সরিয়ে, একটা কিছু সার বস্তুর সন্ধানে তাঁদের এতটা আকৃষ্ট করত না। আর এই বিশাল জগৎ একটি বিপুল হট্টমন্দিরের মতন প্রতিভাত হয়ে, তার বিচিত্র পসরা আর বেচা-কেনার বহু খণ্ড খণ্ড চিত্রের মারফত একটি বৃহত্তর অখণ্ড সত্যরূপের পরিচয় তাঁদের কাছে তুলেও ধরত না। খোলা হাটকে কোমল হট্টশ্রীতে মণ্ডিত করে যদি না-ও দেখি, তবু তার মধ্যে যে সহজ কৌতুক, রসগ্রহণ, শিল্পবোধ এবং বাস্তবজ্ঞানের ক্ষমতা অর্জন করবার সুযোগ পাওয়া যায়, সে-কথা স্বীকার করতে বাধা নেই।

"মাঝারী"। ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

শোবার ঘর

প্রবোধকুমার সান্যাল

শোবার ঘরে বাইরের মানুষের প্রবেশ নিষেধ। আমি পছন্দ করিনে আমার অনুপস্থিতিতে আর কেউ—যার সঙ্গে আমার আত্মিক যোগ নেই, এমন একজন কেউ আমার ঘরে এসে সময় কাটায়। ঘরে আমার টাকা নেই, সোনা নেই, দামী পোশাক নেই, অথচ এমন কিছু আছে যা একান্ত নিজস্ব। আমার পরিচয়টা আছে সমস্ত ঘরময় ছড়ানো, আর কেউ সেখানে এসে দাঁড়ালে চমকে উঠি, ভয়ে আড়ষ্ট হই, লজ্জায় ঘরখানাকে ঢেকে রাখতে চাই। আমার বহুকালের অসংলগ্ন চিন্তা, উদ্ভট কল্পনা, অসম্ভব স্বপ্ন—সমস্তগুলো শোবার ঘরের সর্বত্র যেন চিত্রিত হয়ে রয়েছে। তাদের সঙ্গতিও নেই, সামঞ্জস্যও নেই। অসতর্ক মুহূর্তে বাইরের মানুষ হঠাৎ ঢুকে যদি তাদের দেখতে পায় ?

টেবলটা অবশ্য বড়, এ-ধার থেকে ও-ধার পর্যন্ত একটা পিঁপড়ে হেঁটে যেতে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় লাগে। কতকগুলো অনাবশ্যক চিঠিপত্র—সেগুলোর মধ্যে কাজের কথা কম আছে, অথচ অনর্থক উত্তর চায় পদে পদে। খানকয়েক মাত্র বই,—শ' দুইয়ের বেশি নয়—সেগুলো ঘরময় এখানে ওখানে ছড়ানো। একখানা ভাল বই পড়তে আমার এক মাস লাগে। আলমারির মাথায় আমার এক শিল্পী বন্ধুর উপহার দেওয়া একখানা স্ত্রীলোকের ছবি। ডুরে-শাড়ি-পরা, বোকা বোকা চোখে চাওয়া একটি মেয়ে ; মাথায় অল্প ঘোমটা, হাতে একগাছা চুড়ি,—মুখের উপরে হৃদয়-বৃত্তির কোনো ছাপ নেই, বরং নাকের গোড়ায় আর চিবুকে যেন একটি অস্পষ্ট অহঙ্কার প্রকাশ পাচ্ছে—কিন্তু বসবার ভঙ্গিতে কেমন যেন একটা শান্তশ্রী। আর একটি জলাভূমির চিত্র। বন্যায় চারিদিক ভেসে গেছে, একটি ছোট কুটির আত্মরক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জল, আকাশ, মাঠ সব একাকার। জনমানব নেই। ভরা বর্ষার এমন একটি স্বপ্ন চিত্রে রূপান্তরিত। পনরো বছর আগে এক বাল্যবন্ধুর কাছে উপহার পাওয়া,—যে-বাল্যবন্ধুটির সঙ্গে আমার কোনোদিন মতের আর পথের মিল হয়নি। মিল হয়নি বটে, কিন্তু মনোমালিন্যও হয়নি। দুজনে দুজনকে দেখলে যেন মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠতাম। গলাগলি এবং গালাগালি কিছুতেই ত্রুটি নেই। গোপনে ধূমপান করা, বিনা টিকিটে স্টিমারে চড়া, ইস্কুল পালিয়ে ডায়মন্ডহারবার যাওয়া, সাইকেলে গড়ের মাঠে খেলা দেখতে ছোটা,—এমন সঙ্গী আর আমার দ্বিতীয় ছিল না। পথে-পথে দুজনে বিবাদ করেছি, প্রহার বিনিময় হয়ে গেছে, কিন্তু দু'দিন দেখা না হলে দুজনেই উদ্বিগ্ন হতুম।

দেয়ালে দু'খানা ক্যালেন্ডার, আমেরিকান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ছবি, একটি আমার ফটো, ব্র্যাকেটে একটি টাইমপিস ঘড়ি। তেলের শিশি, বোরিক তুলো, ব্রাউন ক্যামেরা, কালির দোয়াত, পেপার-ওয়েট, টেবিল-ল্যাম্প। ভাঙা এসরাজটা আজও আমার ঘর ছাড়েনি, তার ছেঁড়া তারে আর সুর ওঠে না। আলমারির মাথায় যত রাজ্যের অকেজো জিনিস। একতাল দড়ি,—গলায় দেবার দড়ির চেয়ে সরু ; খালি ওষুধের কয়েকটা শিশি, একটা ছোট মেরিনার্স কম্পাস, একগাছা রুল, পুরানো একখানা নোট বই, ক্যারমের কয়েকটা ঘুঁটি, মলাট-ছেঁড়া একখানা এডগার ওয়ালেসের বাজে গল্পের বই। তিনটে চামড়ার ব্যাগ আমার শোবার ঘরে। যতই কেননা গৃহস্থের শান্ত জীবন যাপন করি, এই চামড়ার ব্যাগ তিনটে আমাকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়,—তুমি ঘরের নয়, বাহিরের। কেন এসেছ জনতায় ? কেন লোকালয়ে ? তিনটে চামড়ার ব্যাগ ! কিন্তু ইতিহাস অনেক। শিমলা পাহাড়ের সেই লক্ষ্মীনিবাসের ছোট ঘর, রাওয়ালপিণ্ডির পাঞ্জাবি হোটেল, দ্বারকানাথের ধর্মশালা, মাদ্রাজের পরমানন্দ ছত্রম্, দার্জিলিঙের জলাপাহাড়ের মাটি, শিলঙের হিন্দু হোটেল—সব জায়গার দাগ, সব ধর্মশালার ধুলো, সকল ভ্রমণকাহিনীর একটা চর্ম-তালিকা।

চারটে ফাউন্টেন পেন। 'ঝরনা-কলম' আমি এদের বলতে পারব না। নামটার মধ্যে অর্থ পাই, কিন্তু রস পাইনে। কোথায় কোন্ দূর অরণ্যময় পর্বত, গোপনচারিণী ঝরনা, আর কোথায় মণিহারি দোকান থেকে কেনা একটা কলম,—দুটো শব্দের কেমন একটা অসঙ্গত গোঁজামিল আমি পছন্দ করিনে। মুনির তপোবনে একটা যেন সদ্য-আবিষ্কৃত রিভলভার। মনে করেছিলুম কবিঠাকুরের কাছে একখানা প্রতিবাদপত্র পাঠাব, তার নকলও রয়েছে আমার টেবলে, প্যাডের তলায়,—কিন্তু পাঠাতে সাহস করিনি। চারটে ফাউন্টেন পেন আমার। এক-একটা কলমের খোঁচায় কত মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়,—কেউ মরে, কেউ পালায়, কেউ হয় প্রণয়াসক্ত, কেউবা দেয় বক্তৃতা। কলমের কালি যখন ফুরোয় তখন লিখি চোখের জলে, লিখি বুকের রক্তে। আমার ঘরে এসে কেউ আমার কলম ছোঁয়, আমি পছন্দ করিনে,—কলম একান্ত আমার, তাদের ভাষা আছে, সম্ভ্রম আছে, শুচিতা আর আভিজাত্য আছে।

আমার শোবার ঘর বালিগঞ্জী বড়লোকের নকল নয়। চীনেবাজারের রংচঙে পরদা দিয়ে আমি ঘরের দারিদ্র্য গোপন করিনে। বন্ধুদের সাজানো ঘরে উঁকি দিয়ে এসে আমি সুলভ আভিজাত্যের ঢঙে ঘর সাজাইনে ; আমার ঘরের দারিদ্র্যই আমার অহঙ্কার। নকল-পোশাক-পরা যাত্রার রাজা সাজার চেয়ে আসল মানুষটার অনেক দাম। আমার ঘরে জঞ্জাল আছে, কিন্তু নোংরা নেই। ছেঁড়া কাগজ, পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, পুরানো মাসিকপত্র, নিমন্ত্রণের চিঠি, সিগারেটের কুচি, কাটা প্রুফের কাগজ, প্যাকেট খোলা মলাট, দাড়া-ভাঙা চিরুনি, খালি এসেন্সের শিশি, বাসী ফুল—এগুলো অবশ্য নোংরা নয়। একরাশ দড়ি, দু'খানা বড় ছুরি, দুটো নরুন, তিনখানা কাঁচি, চারটে লাঠি—অর্থাৎ এই সব সজ্জা আমার ভালো লাগে ! ঘরে অস্ত্র-শস্ত্র থাকলে আমি খুশী থাকি। অস্ত্রের উপর আমার লোভ। বড় লাঠিটা এনেছিলুম হিমালয় থেকে, চেরির লাঠিটা পেয়েছিলুম দার্জিলিঙে, তেড়া বাঁকা লাঠিটা শিমলা পাহাড়ের,—আর চতুর্থটা পাটনার দাদুর দেওয়া। একখানা বড় তলোয়ার ছিল—পুলিসের ভয়ে সেখানা নষ্ট করেছি। মনে করেছিলুম, বাংলা দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকরা যেদিন কলেজ স্ট্রীট আর কর্নওয়ালিসের রাস্তায় অন্নের অভাবে রক্তাক্ত বিপ্লবে মেতে উঠবে, আমি আমার তরবারি নিয়ে তাদের সেই ধর্মযুদ্ধে যোগদান কবব। কিন্তু সেটা বুঝি আর সম্ভব হল না। তারা কো-এডুকেশনের নেশায় ডুবে রইল। তাদের রক্তে নুনের চেয়ে চিনির ভাগ বেড়ে গেছে। ছাত্র ও যুবকদের জন্য আমি একটা আবেদনের খসড়া করেছিলুম, হয়ত সেটা আজও আছে আমার ঘরের জঞ্জালের মধ্যে,—সেখানা আগুনের অক্ষরে লেখা ; গান্ধীজীর অহিংসাবাদের অপেক্ষাও উত্তেজক।

কুটি কুটি টুকরো লেখা আমার শোবার ঘরে ছড়ানো ; ভয় করে, পাছে সেই টুকরোগুলো কারো চোখে পড়ে। কয়েকটা টুকরো খুঁজে পাওয়া গেল।

'অন্যায় করার অধিকার সকলের নেই, যারা করে তারা পৃথিবীতে বড় হয়ে জন্মায়।'

'বাংলা দেশ অরাজক, তার কারণ, আমাকে আজও ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হয়নি।'

'যে-দেশে সতী নারীর সংখ্যা বেশি, সেই দেশেই কেবল মেয়ে চুরি হয়।'

'পাগল বললে, তুমি পুতুল, সৃষ্টিকর্তা নাচিয়ে বেড়ায় তোমাদের সকলকে।'

'সাহিত্যের নীতি নিয়ে, রামদাস মোদক মাথা ঘামিয়ে মরে গেল, তার বাড়ি ছিল বটতলায়।'

'কেন তুমি এমন করে চলে গেলে ? কেন মরলে না চার বছর আগে—যখন সত্যিই তোমার মৃত্যু কামনা করেছিলুম ? যেদিন তোমাকে বাঁচাতে চাইলুম সেইদিন দিলে ফাঁকি ?'

এমন অনেক কাগজের টুকরো। এর পরে দেখা গেল, উইপোকার বাসা আমার ঘরময়। দুটো টিকটিকি দেখা দেয় রাত্রের ঘরে আলোয়, তারা পোষমানা নয়, কিন্তু পরিচিত। আসে আবশোলার লোভে। আবার দেখি, শরৎকালের নীল শূন্য পথ থেকে ছটকে আসে এক একটা বোলতা—কামড়ায় না, কেবল ছুঁয়ে যায়। জানালা দিয়ে রোদ আসে, সেই আলোয় রঙিন সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল দেখতে পাই, টেবলের কোনা থেকে জানলার গরাদ পর্যন্ত অদৃশ্য মায়াজাল সেতুর মতো রচনা করেছে।

মানুষের জীবন এমনি। কোথা থেকে কোথায় যে কার সঙ্গে মায়াজাল রচনা করেছি, হয়ত নিজেই অনেক সময় বুঝতে পারিনে। জাল অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য। সেই জাল যখন মহাকালের

হাতে ছিন্ন হয়, তখন জানি বেদনার গভীরতা। মরণ যদি আসে সেই দিন বেশি করে বাঁচতে চাই। রণ-দামামায় উত্তেজিত হয়ে সৈন্য ছুটে যায় যুদ্ধে, মারতে আর মরতে,—জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য—কিন্তু আহত হয়ে কাঁদে, বলে, জল দাও, সেবা করো, বাঁচাও।

শোবার ঘরে তিনখানা কড়িকাঠের দিকে চেয়ে অনেক সময়ে ভেবেছি, কেন বাঁচব ? কোন্ অধিকারে ? জীবনকে নতুন করে সৃষ্টি করলুম কই ? সর্বসংস্কার-মুক্ত কি হওয়া যায় না ? ঘরের মধ্যে জঞ্জাল মাড়িয়ে পায়চারি করলাম তেরো বৎসর ধরে। হিসেব করে দেখো, শত-শত মাইল পথ জট পাকিয়ে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমার অতীত। আমার অভিশপ্ত নিরানন্দ অতীত। পা বাড়াবো কোন্ দিকে ? অতীত আমার পথরোধ করে। ওদের মুকুরে দেখি আমার প্রতিফলিত রূপ। দেখে ভয় পাই। আমার হাতে শাসনভার থাকলে নিজেকে গুলি করে মারতুম।

কিন্তু, চমৎকার আমার শোবার ঘর। যেন বিংশ শতাব্দীর চিতাশয্যা। আমার নিশ্বাস লেগে-লেগে দেয়ালে নোনা ধরেছে, আমার নখের আঁচড়ে কড়িকাঠগুলো ক্ষয় হয়েছে, উইপোকার জটিল পথ আমার চিন্তার সাক্ষী।

আশ্চর্য, হঠাৎ সেদিন দিল্লী থেকে ফিরে দেখি, আমার ঘরখানা ছোট হয়ে গেছে। দরজায় মাথা গলে না, জানালাগুলো ক্ষুদ্র। আমার চিরপরিচিত শোবার ঘর এত ছোট ? তবে কি বাইরে গিয়ে বড় হয়ে এলুম ? আর কিছু চিনতে পারিনে, সব যেন নতুন লাগে। বিদেশী যেন হঠাৎ এসে পড়েছি, কিছুই আমার নিজের বলে মনে হয় না। কেন ? কেন এই মনোবিকার ? তবে কি হৃদয়বৃত্তি আমার কিছু নেই। যাকে ফেলে যাই, তাকে ভুলে যাই ?

আবার ঘর বড় হয়, আমি ছোট হই। দেখি বইগুলো ঠিক আছে, মোটা মোটা গ্রন্থাবলী। যে-বইখানা সকলের চেয়ে বড়, সকলের অপেক্ষা বিরাট, সেই বইখানা অগোছালো। আমার এই সুন্দর শোবার ঘরে আমি নিজে সেই অসমাপ্ত বিরাট গ্রন্থ !

"মনে-মনে"। শ্রাবণ, ১৩৪৮।

ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকা

অজিত দত্ত

এইমাত্র ঘুরে এলাম, টোকিয়ো, কিয়োটো, য়োকোহামা শহর। তারপর ভোল্গা নদী পাড়ি দিয়ে, মস্কৌ-লেনিন্‌গ্রাড়-এর উপর দিয়ে ইস্তাম্বুল শহর ঘুরে বোগদাদ-বোখারা-সমরকন্দ দেখে, মোম্বাসাব বন্দর পেরিয়ে একেবারে রাসবিহারী এভিনিউ-এর তিনতলায়। দেখলাম মিশর, মিসিসিপি, মিনেসোটা ; আলপ্‌স্‌ পাহাড় পেরিয়ে গেলাম লিস্‌বন, পেরুলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। এমনি আমার ভ্রমণের নেশা। যাকে বলে মহা-ভবঘুরত্বের পথে। কিন্তু কেউ যদি আজ, কিংবা, যে-কোনদিন সন্ধ্যায়, কিংবা যে-কোনও সময়ে, আমাকে এসে বলে, 'চলো সিনেমা দেখে আসি', তাহলে আমি কেবল পাশ ফিরে শোব।

তার কারণ, ঘুরে বেড়াতেই আমার ভালো লাগে, আর নিশ্চিন্ত আরামে হাত পা ছড়িয়ে না শুলে আমার ঘোরাই হয় না। ভ্রমণকাহিনী লিখতে না হওয়ার এ একটা মস্ত সুবিধা এবং এ-সুবিধার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারই আমি করে থাকি।

ভ্রমণকাহিনী জিনিসটা অবশ্য খুব ভালোই, এবং শুনেছি, যথোপযুক্ত কল্পনাশক্তি খাটাতে পারলে নাকি কাটেও খুব। কিন্তু তার ভূমিকা বড়ই ভয়াবহ। মনে করুন, কোনও এক বিখ্যাত লেখকের কাছে, কোনও এক বিখ্যাত প্রকাশকের কাছ থেকে একখানি ভ্রমণকাহিনী লেখবার ফরমাশ এসেছে। সামনেই বড়দিনের ছুটি। বিখ্যাত লেখক স্থির করলেন, কলকাতার বাইরে যাবেন। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, বন্ধু-বান্ধবদের স্ত্রীদের কাছে, আত্মীয় ও আত্মীয়াদের কাছে এবং অনাত্মীয় ও অর্ধপরিচিতদের কাছে সগর্বে এবং সস্মিত মুখে বলে বলে বেড়ালেন,—'ক'দিনের জন্য বাইরে যাব ভাবছি।' উদ্দেশ্য সকলকে যথাসম্ভব ঈর্ষান্বিত করা। কিন্তু সকালে বন্ধু-বান্ধবরা যখন এসে পৌঁছোয় না এবং রাত্রে বন্ধু-বান্ধবরা যখন চলে যায়, তখন বাড়িতে বিখ্যাত লেখক এবং তাঁর স্ত্রী গালে হাত দিয়ে বসেন ; যাকে বলে 'ভয়াবহ ভবিষ্যৎ'-এর চিন্তায় শঙ্কাকুল। ট্রেনে ছোটো মেয়েটার দুধ গরম করার কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এবং চারটে বাক্স, তিনটে বিছানা, দুটো ধামা, একটা কুঁজো এবং ন'খানা আনুষঙ্গিক খুচরো মোট নিয়ে কী উপায়ে আসানসোলে গাড়ি বদল করা যেতে পারে, এ-সব চিন্তা পরলোকের চিন্তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। তার উপর, বিদেশের বিজাতীয় হালচাল এবং বিখ্যাত লেখকের অসাধারণ হিন্দি জ্ঞানের সমন্বয়ে যে-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে রোমাঞ্চিত না হওয়াই অস্বাভাবিক। আমরা যথারীতি রোমাঞ্চিত হয়ে বলি, 'সত্যি তুমি কী ভাগ্যবান, কত ঘুরচো!' যেন ইঞ্জিনের চাকা হওয়াতেই মানব জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা।

আমার ছেলেবেলা থেকেই একটা বদ্ধমূল ধারণা যে, যারা কেবলি ঘোরে তাদের ঘোরা হয় না, যারা ক্রমাগতই বেড়িয়ে বেড়ায়—বেড়ানোর প্রকৃত মর্ম তারা জানেনি। বড়-বড় ট্রেন ভ্রমণ করা যাদের অভ্যাস, ড্রয়িং রুমের প্রতি আকর্ষণ তাদের অসাধারণ। দু'পাশের জলে-ডোবা ধানের ক্ষেতের একটু দূরে ব্যাঁকা-চোরা ডোবাটায়, পানার আলপনা-আঁকা টলটলে জলের এক পাশটিতে যে-দুধবরণ বকটা এক ঠ্যাং তুলে চোখবুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে, খোঁজ নিয়ে জানবেন, ওটা তাদের চোখেই পড়েনি ; আবার শীতে, শুকনো মাঠে কাটাধানের হল্‌দে আঁটির সারি—আর ভূতের কালো মাথার মতো হাঁড়ি-বাঁধা এবড়ো-খেবড়ো খেজুর গাছ, একটা এখানে একটা সেখানে—মোটেই 'ছবির মতো সাজানো' নয়, বরং ছবি আঁকবার মতো—সেই দেখাটি তাদের মনে হারিয়ে গেছে। আমি অনেক কষ্টে বছরে একখানা করে ছবি দেখে আসি, তাই সে-ছবি আমার মনে সোনার ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে থাকে তাতে মরচে ধরে না। আমার দৌড় এই গ্রীষ্মে গিরিডি, আবার ও-ই শীতে শান্তিনিকেতন ; কচিৎ কোনওবার বা বিক্রমপুরের জোলো-জোলো

দেশ—যা মনের প্রাগৈতিহাসিক মেছো জীবটিকে ডানা ধরে নাড়া দিয়ে যায়। অনেকটা টিকি ধরে টানার মতো। কষ্ট হয়—খুবই কষ্ট হয়, এবং বাড়ি ফিরে কাগজে-কলমে এত চেঁচাই যে, অনেকগুলো লেখা চটপট তৈরি হয়ে যায়। এ-ও এক সাধনা ছাড়া আর কী। জাপানীরা চা খেতে যে-সাধনা করে এ সে-রকম সাধনা নয়, বরং রোদ্দুরে ঘেমে সতরোজন বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে নিজের হাতে স্টোভ ধরিয়ে চা খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করার মতো।

বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে 'কুড়ে' বলে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে। তা করুক। অন্যকে গাল দেওয়া মানেই তুলনায় নিজেকে খানিকটা বড় করা কিনা! যেন কুড়ে হতে সকলেই পারে। বাইরের প্রকৃতি, এমন-কি দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি—চোখ মেলে তাকালে যা কিছু চোখে পড়ে—তার সঙ্গে অন্তরের একটা অবিচ্ছেদ্য অনির্বচনীয় মিল না থাকলে কেউ কোনওদিন সত্যিকারের আলসেমি করতে পেরেছে? সুরের সঙ্গে সুর যেমন করে মিশে যায়, তেমনি ভাবে বাইরের সঙ্গে মনের মিল না হলে কি আর আলস্য-যাপন করা যায়? তাই অফিস থেকে ফিরে আমি হাত পা ছড়িয়ে শুই, তারপর চোখ ছেড়ে দি আকাশে, মেঘে, অথবা দুটো পাখি—নিদেন ঘরের দেয়ালে টিকটিকিগুলোর দিকে! তখন—এবং তখনই আমি হয়ে যাই পৃথিবীর অংশ, লুসির মতো—

Rolled round the Earth's Diarnal course
With rocks and stones and trees.

তাছাড়া, ভ্রমণ যে আমি একেবারেই করি না তা তো নয়। এই যে রোজ ট্রামগাড়ি চড়ে চার মাইল রাস্তা পেরিয়ে আপিসে যাই, আবার চার মাইল অতিক্রম করে বাড়ি ফিরি—এর ভিতরে যদি ভ্রমণের আনন্দ না থাকে, তবে আটশো মাইল ক্রমাগত রেলগাড়ি চড়ে বেড়ানোও নিরর্থক। যে দেখতে জানে সে-ই দ্যাখে; হগ মার্কেটে যে-ফুলওয়ালা লাখো ফুলের মধ্যে বসে ফুলের নাম ধাম এবং দাম মুখস্থ রাখে, সেই কি আমার চেয়ে ফুলের মর্ম বেশি বোঝে? ট্রামগাড়িতে বসে আমি তো একই রাস্তায় দু-হাজার বার গেছি আর এসেছি, এসেছি আর গেছি, তবু আমার দেখা কিন্তু ফুরোয় নি। এই যে বড় পার্কের পাশের স্টপ-এ মোটা-মোটা কেতাব হাতে আটোসাঁটো মেয়েটি জোরে জোরে পা ফেলে ট্রামে উঠেই কোনও দিকে না তাকিয়ে মহিলা-মার্কা সীটটা দখল করে সব চেয়ে মোটা বইটা খুলে বসল—যেন হেড মিস্ট্রেস্ ক্লাস্ রুমে ঢুকলেন—এ-ও যেমন দেখবার মতো, আবার কালীঘাটে নাদুস-নুদুস বাবুটি যে অন্যকে বসতে দেবার জন্য সীট থেকে রোমশ পা-টা নামাতে হল বলে মদনভস্মের পুনরভিনয় করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, সেটাও কম উপভোগ্য নয়। কোনওদিন বা ওই 'লেডিজ' মার্কা সীটটাতেই দেখি, এলো-করে খোঁপা-বাঁধা কলেজী তরুণী, আবার কোনওদিন বা চাকুরি-গর্বিতা দো-আঁশলা মেম-সাহেব। আবার কোনোদিন ঘুমন্ত ছেলে-কোলে নতুন মায়ের অবসন্ন ভঙ্গীটিও বেশ। যা-ই দেখি, দেখতে ভালোই লাগে; তারপর শহর ছেড়ে ট্রাম যখন চৌরঙ্গির মেঠো পথে পাড়ি দেয়, তখন তো আর ছবির শেষ নেই। কোনও চিত্রকর যদি এই মাঠের কোনও এক কোণে কুটির বেঁধে থাকত, ওই মাঠের নানান কোণ থেকে, মাঠ-বিহারী নানান লোককে নিয়ে সে হয়তো পঞ্চাশখানা ছবিই এঁকে ফেলত। তা দেখে-দেখে কেউ বলত না, 'ছোঃ, ওই তো এক মাঠের ছবি, এ আর দেখব কী।' ক্যামেরা নিয়ে ফোটোগ্রাফার ওই মাঠের থেকে হাজারো ছবির টুকরো কুড়িয়ে আনতে পারে, কেননা ওই মাঠের যে-রূপ সে তো ক্ষণে বদলায় মানুষের পদক্ষেপে। আমি হেঁটে গেলে গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে আমাকে সুদ্ধ যে-ছবিটা চোখে পড়বে, একটু পরেই হাসতে-হাসতে তিনটি মেয়ে যখনই ওই পথ ধরেই যাবে, তখন আর একটা গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেই দেখতে পাবেন বিলকুল আলাদা ছবি, যেন আরেক দেশ।

ভাবতে গেলে জীবনে কতটুকুই দেখলাম। এত বড় পৃথিবী, অথচ আমার কেন্দ্র ছেড়ে হাজার মাইল যদি গিয়েছি তো ঢের। কিন্তু আরও ভাবতে গেলে, কী-ই বা দেখিনি! এই গাছ পাতা আর আকাশ; এই আকাশের নীল রঙ যা আস্তে-আস্তে ফিকে হয়ে একদিন ধূসর হয়ে যায়, তারপর হঠাৎ এক আশ্বিনে তাকিয়ে দেখি, রাতারাতি আকাশে কে নীল রঙ মাখিয়ে দিয়ে গেছে, 'কঙ্কাবতী'র ভূতিনী মাসীর মতো; এই পাখি আর অলস-মধ্যাহ্নে পাখির ডাক; এই নদী আর

সমুদ্র ;—কী-ই বা দেখিনি ! পঁচিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে কী আছে অপূর্ব সে-ঐশ্বর্য যা আমাকে নতুন জগতে নিয়ে যাবে—যার মোহে আমি আমার এই সামনের পৃথিবীকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারি ? সেখানে কি নেই এ-চাঁদ, আর সূর্য, আর তারা ? কূপমণ্ডুক আমি, স্বীকার করি। কিন্তু এ-কূপের জল আমার আজও পান করা শেষ হয়নি ; আমার ছোটো পৃথিবীর ঐশ্বর্যই আমার আজও উপভোগ করা শেষ হল না—এর চেয়ে বেশি হলে কি আর থই পাব ?

এই রকম সঙ্কীর্ণ হচ্ছে আমার মনোভাব। সে-ই কবে ছেলেবেলায় কাকে ভালো লেগেছিল, বছর কুড়ি ধরে তাই নিয়েই কবিতা লেখা চলেছে। এখনও পর্যন্ত বন্ধুরা এ-অভিযোগ করেন নি যে, নানা জাতের নানা ধাঁচের নানা মেজাজের দুশো পঞ্চাশটা মেয়ে না দেখে এতগুলো প্রেমের কবিতা লেখা উচিত হয়নি। যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন এবং যাঁদের উপন্যাসে নারী-চরিত্রের কথা সর্বজনবিদিত, দাম্পত্য জীবনে তাঁরা একাগ্র নন এমন কথা কেউ বলে না। তবে আমি যদি আমার রাসবিহারী এভিনিউ-এর তিনতলায় বসেই ভ্রমণকাহিনী লিখি তাতেই বা এমন কী দোষ ! বাংলাদেশের পাঠকেরা আসলে ভ্রমণকাহিনী নামে উপন্যাসই চান।

কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ভ্রমণকাহিনী লিখবার জন্য কোনও প্রকাশকই আজ পর্যন্ত আমাকে ফরমাশ করেন নি। বিখ্যাত লেখক না হওয়ার ওইটেই ক্ষতিপূরণ।

"জনান্তিকে"। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।

আরেক দিন

লীলা মজুমদার

খুব একটা রমণীয় না হলেও, আসলে এটা একটা রম্যরচনা। এর নাম দিয়েছি 'আরেক দিন', কিংবা 'তবুও আমি সাহেব হব।' আমাকে দেখে তা মনে না-ও হতে পারে, কিন্তু আমার ভেতরে-ভেতরে অনেকখানি সাহেবিয়ানা আছে। তার একটা কারণ, ছোটবেলায় আমরা প্রবাসী বাঙালি ছিলাম। শিলং-এ আমরা যে ভাড়া বাড়িতে থাকতাম, তার রান্নাঘরটি ছিল ১০০ গজ দূরে। শীতে ওভারকোট পরে কিংবা আলোয়ান মুড়ি দিয়ে, বর্ষায় ছাতা মাথায় দিয়ে, যাওয়া-আসা করা হত। রান্নাঘরে উনুন ছিল না। বড় বাঁধানো চুল্লি ছিল। তার তলায় খোপ ছিল, তাতে রোস্ট বা পুডিং করা যেত। ওপরে কোকের অভাবে কাঠ-কয়লা জ্বালাতে হত। তার আবার মেলা খরচ। তাই যামিনীদার পক্ষে [সে আমাদের দেশের অর্থাৎ পূর্ববাংলার গাঁয়ের লোক ছিল—] সায়েব হওয়া খুব শক্ত ছিল। শক্ত কেন, অসম্ভবই ছিল। সে চুল্লির পাশে দিব্যি সুন্দর দুটি মাটির উনুন বানিয়ে কাঠের জ্বালে রান্না করত। চুল্লিতে শুধু শৌখিন রান্না হত। সায়েবিয়ানার পথে অনেক বাধাও ছিল। শুনতাম বিলেতের ঝাড়ুদাররা পর্যন্ত সায়েব। তাজ্জব বনে যেতাম। ১৯১২ সালের আগে আমাদের বাড়ির কেউ বিলেত যায়নি।

তবে পিওন, চৌকিদার, বাবার আপিসের চাপরাশিরা মা-কে বলত মেমসাহেব, আমাদের বলত মিসিবাবা, ভাইদের বলত বাবালোগ। যামিনীদা মাকে বলত মাসিমা, আমাদের তাচ্ছিল্যভরে বাঙাল টানে নাম ধরে ডাকত। পাহাড়ী কাঞ্ছাইরা মা-কে বলত 'বাবুনী', আমাদের সবাইকে বলত 'বাবা'। বাবাকে যে সবাই সাহেব বলত সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু বাবাই ছিলেন সায়েবিয়ানার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। দ্বিজেন্দ্রলালের নাম শোনার আগে বাবার মুখেই শুনেছিলাম 'জজের পেজের ভাইজা ভেজের ভাতরাঁধুনের ভাগে হব, তবুও আমি সাহেব হব!' আমি ভাবতাম কথাগুলো বোধ হয় বাবাই বানিয়েছেন। জড়িয়ে মানে ছাড়াও প্রত্যেকটি শব্দের আলাদা মানে বাবা সযত্নে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বলিনি সায়েবিয়ানার পথ সকলের পক্ষে সুগম হয় না। বাবা নিজে আপিস থেকে এসেই ধড়াচূড়ো ছেড়ে ফেলে, লম্বা হাতা গেঞ্জি, সাদা সুতির পাজামা, আর পায়ে গরম মোজার সঙ্গে কালো ঠনঠনের চটি পরে, মোটা একটা আলোয়ান জড়িয়ে, মুখে পান ফেলে ঘুরে বেড়াতেন। মিত্রকাকাবাবু বাবার জুনিয়র হয়েও একটা গরম ড্রেসিং-গাউন পরে বাহার দিতেন। বাবার ও-সব বালাই ছিল না। মিত্রকাকিমা সেকালের মেমদের মতো কর্সেট পরে কোমর সরু করতেন ; ফরসা গালে অল্প একটু রুজ, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে, প্রায় মেম-মেম চেহারাও করে ফেলতেন। লেখাপড়া বেশি না জানলেও, মেম রেখে খটমট ইংরিজি বলা শিখতেন। ওঁদের টেবিলে সাদা টেবিল-ক্লথ, ন্যাপকিন, ঝকঝকে কাঁটাচামচ সাজানো হত। একটা ছোট্ট ঘণ্টা নাড়লেই সাদা পাগড়ি, সাদা পোশাক-পরা বেয়ারা ট্রের ওপর খাবার সাজিয়ে 'জু' বলে হাজির হত। দেখে মুগ্ধ হতাম। এ বিষয়ে কিছু বললে মা এমন মুচকি হাসতেন যে, আমাদের লাল অয়েল ক্লথটার বদলে একটা সাদা টেবিলের চাদর পাতার কথা পর্যন্ত বলতে সাহস হত না। যামিনীদাকে ডাকলে, বিকট চেঁচিয়ে বলত—'আইতাসি! বও, অগ্রে সম্বরাডা দিই!'

তবে ছয় বছর পুরবার আগেই কনভেন্টে ভর্তি করে দেবার ফলে কয়েক বছরের মধ্যে সায়েবী সাজ করতে না শিখলেও, মনের সব চিন্তাগুলো জিবের আগায় উপস্থিত হত ইংরিজি ভাষায়। তাদের বাংলা করে প্রকাশ করতাম। এই প্রসঙ্গ যখন উঠল-ই তখন খোলাখুলি বলব মনের চিন্তাকে জোরালো, স্পষ্ট কিন্তু সহজ বাংলায় প্রকাশ করতে হলে আগে ভালো করে ইংরিজি ভাষা আর সাহিত্য রপ্ত করলে খুব সুবিধা হয়। কারণ ইংরিজির উদারতা, গ্রহণশীলতা, বলিষ্ঠতার জুড়ি

নেই। তাই ইংরিজি আমার ছাত্রজীবনের অনুশীলনের বিষয় আর সহজ কথা বাংলা আমার কর্মজীবনের বাহন হওয়াটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, চিন্তার এদেশ-ওদেশ নেই, যেখানে যা ভালো জিনিস আছে, অকুতোভয়ে তার সারমর্মটি দিয়ে বাংলা চিন্তাকেও সমৃদ্ধ করতে হয়।

সে যাই হোক, আমরা জন্মাবার আগেও ইংরেজিয়ানার মোহ যে আমাদের দেশের ইংরেজনবিশদের পেয়ে বসেছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের অনেকেই যে দেশটাকে ভালবাসতেন, তাতেও সন্দেহ নেই। তবে তাঁরা চাইতেন, জঘন্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিশীয়ানার বদলে আলোকপ্রাপ্ত, যুক্তিসমৃদ্ধ একরকম সাহেবিয়ানা এদেশেও প্রচলিত হোক। শুনেছি, রমেশ দত্তর বন্ধুবান্ধবদের কারও কারও বাড়ির মেয়েদের ভালো কাপড়চোপড় প্যারিস থেকে কেচে আসত। আরেকজন কেউ তাঁর বাড়ির মেয়েদের গাউন পরতে বাধ্য করতেন। নাকি বলতেন—অবশ্যই বিশুদ্ধ ইংরিজিতে—'আমি চাই না যে আমার বাড়ির মেয়েরা আয়াদের মতো সাজ করে ঘুরে বেড়ায়।' আমরা ছোটবেলায় এ-সব গল্প শুনে হাসাহাসি করতাম। কিন্তু ওই সমস্ত জজ্ ব্যারিস্টার কলেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটদের মনের পিছনে যে-ভাবটা ছিল, সেটা ঠিক স্বদেশের প্রতি অবজ্ঞা নয়। সেটা এক রকম আত্মসচেতনতা। মেয়েদের দুরবস্থা আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিচ্ছন্নতার উপর মন্তব্য। তাঁরা কেউ দেশ ছেড়ে চলে যাননি। তাঁরা শুধু চাইতেন, এ-দেশটা হুবহু বিলেতের মতো হোক। অন্য কোনো রকম মার্জিত রুচির কথা তাঁদের মনেই আসত না। একেবারে কারও যে মনে আসত না তা-ও নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো কেউ কেউ ওই নব্য বিলাতীয়ানার হাস্যকর দিকটাও দেখতে পেতেন আর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির লোকরা, কেমন করে এ-দেশীয় একটা মার্জিত রুচির মান তৈরি করা যায়, সেদিকে মন দিয়েছিলেন। যে-দেশের লোকদের জঘন্য জীবনযাত্রা, সে-দেশকে কেউ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না, এ-কথা তাঁরা জানতেন। আবার নকল-নবিশদেরও কেউ শ্রদ্ধা করে না, তা-ও জানতেন। দেশটাকে স্বাধীন করতে হলে তাকে স্বাধীন হবার উপযুক্ত হতে হবে, এটা কিছু গোপনীয় কথা ছিল না।

এই রকম সময় জন্মালাম। সৌভাগ্যবশত ব্রাহ্ম-সমাজের কোলে জন্মালাম, কিন্তু হিন্দু আত্মীয়-বন্ধুদের প্রভাব থেকে বঞ্চিত হলাম না। তার কিছুটা মনে লেগেই রইল। উগ্র নব্যদের এবং গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে অনেক মজাব খোরাক পেতাম। হয়তো সেই মনোভাবের মধ্যে একটু অহমিকাও ছিল। 'আমরা ও-রকম নই।' এই রকম একটা ধারণা। শিলং-এর বাঙালি বাসিন্দাদের কথা মনে করে এখনও আশ্চর্য হই। একটা পাড়ার নাম ছিল সিলেটিপাড়া ; একটা ছিল কলকাতিপাড়া। যেমন নাম, তেমনি বাসিন্দা। আরেকটা কথা শুনতাম, হিন্দুবাড়ি। আমাদের পাড়াটার সায়েবপাড়া বলে খ্যাতি থাকলেও এক ঘর গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে কোনও উৎসব হলে হরির লুট হত। আমরাও যেতাম। তাঁদের জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমা বলতাম। তাঁদের বাড়িতে কত জলখাবারের নেমন্তন্নও খেয়েছি। অজস্র স্নেহও পেয়েছি। জ্যাঠাইমার রান্নাঘরে আমাদের ঢোকা বারণ ছিল। দোরগোড়ায় খানকিটা তাজা গোবর ফেলে রাখা হত। সেইটে মাড়িয়ে যেতে হত। তাতে নাকি মানুষ পবিত্র হয়ে যায়। আমরা না গেলেও, মা-কে জ্যাঠাইমা আদর করে রান্নাঘরের ভেতরে বসাতেন। বলতেন, 'অচলানন্দ স্বামীর নাতনিকে আমার রান্নাঘরে ঢুকতে না দিলে আমার পাপ হবে।' মানামানিটা ছিল নিছক একটা নিয়ম, তার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ ছিল না মনে হয়। ও-বাড়ির বৌদিদি গায়ে একখানি কাচা কাপড়ের ওপর তসরের চাদর জড়িয়ে রান্নার জোগাড় দিতেন। আর আমাদের গায়ে থাকত ইজার-বডি বলে অদ্ভুত একটা জিনিস। তার নিচেটা ইজের, ওপরটা বেনিয়ান। তার ওপর বডি-পেটিকোট। তার ওপর গরম বেনিয়ান। তার ওপর ফ্রক। তার ওপর সোয়েটার। পায়ে হাঁটু অবধি লম্বা গরম মোজা। সর্দি কাশিকে খুব একটা স্কোপ দেওয়া হত না। অবিশ্যি অন্যান্য হিন্দু বন্ধুদের ছেলেমেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদে আমাদের সঙ্গে কোনো তফাত ছিল না। ওইখানেই তো আসল মজা।

হয়তো এর ৩০ বছর পরে আমার ভাসুরকে এ-সব কথা বলাতে তিনি বলেছিলেন, 'তাহলে রামমোহনের আবার আলাদা একটা সমাজ ফাঁদবার কী দরকার ছিল?' অনেকক্ষণ ধরে ডিটেল

সহ ব্রাহ্মসমাজ কী করে হল, রামমোহনের তাতে কতটুকু হাত, তাঁর উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মের ও সমাজের সংস্কার, নতুন ধর্ম বা সমাজ ফাঁদা নয় ইত্যাদির ধারাবিবরণী দিলাম। বললাম, আমাদের সামাজিক জীবনে যা কিছু ভালো, তার-ই মূলে রামমোহন। সব শুনে ভাসুর বললেন, 'অর্থাৎ তিনি যা-যা চেয়েছিলেন, তার প্রায় সবটাই হয়েছে, বল। তাহলে সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করে রাখার কোনও মানে হয় না। ব্রাহ্মসমাজের আর কোনও কাজ নেই, তবু সে উঠে যাচ্ছে না কেন ?' ভাবি, তারপর আরও ৩০ বছর কেটে গেছে, এখনকার দেশটাকে দেখলে না জানি তিনি কী বলতেন ! দেড়শো বছরে দেশের মন তো একচুলও এগোয়নি। তবে আমার গল্প অত আগের থেকে শুরু হয়নি। যা দেখিনি, বা খুব চেনাজানা কেউ দেখেনি, তাই নিয়ে কিছু বলতে চাই না। আমার দৌড় বড় জোর এখন থেকে মাত্র সত্তর বছর আগে পর্যন্ত। শিলং শহরের একটা শীতের সকাল দিয়ে শুরু করছি। তখন আমার বয়স ছয়ের নিচে। সেদিন দু-একবার চোখ খুলে দেখলাম, দু-ঘরের মাঝখানের দরজার পাশে রাখা লণ্ঠনটা নেই। তার মানে ইল্‌বন উঠে গেছে। তবু আরেকটু শুয়ে থাকলাম। শেষটা ঠাণ্ডা পা-দুটোকে আর বাগ মানাতে পারলাম না। কারণ, বিরাট ছাই-রঙের বিদ্‌ঘুটে কিন্তু বড়ই নরম-গরম বেড়ালটা সম্ভবত অন্য ঘরে কারো জেগে ওঠার সাড়া পেয়ে এবং বয়স্ক মহলে নিজের জনপ্রিয়তার অভাব সম্বন্ধে সচেতন থাকাতে, কোনও এক সময়ে আমার পায়ের কাছে লেপেরতলা থেকে নিঃশব্দে কেটে পড়েছিল। চোখ দুটোকে অনেক কষ্টে একটু ফাঁক করতেই দেখলাম, আমাদের পাশে মা-বাবার ঘর ডিঙিয়ে, তার পাশে বসবার-ঘরের দেয়ালে ক্ষীণ একটা আলোর শিখার আভা নড়ছে-চড়ছে। তার মানেই হল তার ওপাশে ভাইদের ঘরের চিমনিতে ইল্‌বন আঁচ দিয়েছে। বাড়িময় একটা কাঁচা কয়লা আর পাকা ধূপকাঠের পোড়া পোড়া পোড়া ঝাঁজ-ঝাঁজ মিষ্টি সুগন্ধ নিকট ভবিষ্যতের উষ্ণ আরামের আশ্বাস দিতে লাগল।

আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা নয়। বিদ্যুৎগতিতেই লেপের তলায় রাতের ইজার-বডির ওপর গরম ফ্রক, তার ওপর গরম জার্সি-পরা হয়ে গেল। মোজা জোড়া আর হাঁটুর ওপর মোজা আটকে রাখার জন্য ঘরে তৈরি গার্টার হাতে নিয়ে, ধাঁ করে মধ্যিখানের গোটা দুই ঘর পেরিয়ে, চিমনির ঠিক সামনের জায়গাটিতে আগুনের মুখোমুখি বসে পড়তে, আমার খুব বেশি সময় লাগল না। ওই জায়গাটা নিয়ে যত ঠেলাঠেলি। বড়রা বলতেন, ওই হল সবচেয়ে খারাপ জায়গা। সায়েবরা নাকি চিমনির দু-পাশের জায়গা দুটিকে সেরা জায়গা বলে। সংসারের সুখ-শান্তির প্রতীক হল চিমনির দু-ধারের দুটি ইঙ্গল্-নুক্ ! মুখে আগুনের তেজ লাগে না ; চোখ ঝলসায় না ; কান তেতে ওঠে না ; অথচ পাদুটি সুন্দর গরম হয়ে ওঠে। এমন অদ্ভুত কথা শুনে অবাক হতাম। পাশ থেকে দেখলে চিমনির ভিতরকার অগ্নিকাণ্ডর কিছুই দেখা যায় না। তবে আর রইল কী ? তা ছাড়া, বড়রা যাকে খুব কষ্টের ব্যাপার মনে করতেন, যেমন ওই চোখে-মুখে আগুনের তাপ লাগা, আমাদের সেটা খুব ভালোই লাগত। একটু পরেই ইল্‌বন্ মস্ত ট্রেতে করে সকলের জন্যে গরম টোস্ট, টি-পটের মুখে বসানো মাখনের বাটি, দুধের জগ্, চা আর চিনির কৌটো, কেট্‌লি করে ফুটন্ত জল ইত্যাদি এনে জায়গা নিয়ে মতভেদ মিটিয়ে দিত।

চিমনি থেকে একটু দূরে মা টেবিলে বসে চা করতেন ; টি-পটের গরম জলের ভাপে বাটির মাখন নরম হত, তখন তাকে রুটিতে মাখানো হত। চা ঢালা হত। আমার মনে হত ঘুম থেকে ওঠে, চিমনির সামনে বিছানো কালো শতরঞ্জিতে বসে গরম চা আর গলন্ত মাখনমাখা পুরু গরম টোস্ট খাওয়ার মতো সুখ আর কোথাও নেই। তবে পরে মা-র কাছেই শুনেছিলাম আসলে ওটা চা ছিল না। চা নাকি ছোটদের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু বিক্ষোভের পথ বন্ধ করবার জন্য, তিন ভাগ দুধের ওপর এক ভাগ চা ঢেলে, পারিবারিক সুখ ও শান্তি বজায় রাখা হত। এতে কোনও দোষ হয় না। মহৎ উদ্দেশ্যে দুধকে চা বলে চালানো কিছু অন্যায় নয় বিশেষত ২৫% চা যখন দেওয়াই হত। অবিশ্যি চা-কে দুধ বলে চালালে কী হয় তা বলতে পারব না। কিন্তু আমার বুদ্ধিমতী মায়ের ওই ব্যবস্থার ফলে প্রতিদিন সকালবেলা আমরা যে পরিপূর্ণ সুখের আস্বাদ পেতাম, আজও তাকে ভুলতে পারিনি। ওই সুখটাকে ঠিক বাঙালী পরিবেশের সুখ বলা না গেলেও, ওটা যে সর্বজন ভোগ্য তার প্রমাণ হয়।

মাঝে মাঝে ছুটির দিনের বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে মিশে যাবার সময়ও ওই রকম পরিপূর্ণ সুখের একটা মুহূর্ত আসত, যার ধারেকাছে তার পরবর্তী এই সত্তর বছরে পাওয়া কোনও সুখ পৌঁছতে পারেনি। ছুটির দিন হয়তো আমরা সারা দিনের মতো, দূরে কোথাও পিকনিক করতে গেলাম। সকালে তৈরি হয়ে, কাঞ্ছাইদের পিঠের 'থাপায়' রান্নাবান্নার সরঞ্জাম তুলে, তিন মাইল হেঁটে, কোনো জল-প্রপাতের ধারে সারা দিনের আস্তানা গাড়া হল। বড়রা বড় বড় পাথর সংগ্রহ করে, উনুন তৈরি করলেন। কাঞ্ছাইরা সাহায্য করল। আমরা শুকনো কাঠকুটো সংগ্রহ করতে লেগে গেলাম। ঝরনার নিচে যেখানে জল পড়ছে, রোদ লাগলে সেখানে ছোট ছোট রামধনু তৈরি হয়। বেশি কাছে গেলে গুঁড়ি-গুঁড়ি জল লেগে চুল চিক্‌চিক্ করে। মাটিতে কান পেতে, শুকনো ঘাসের ওপর শুলে, অদ্ভুত একটা গুম-গুম শব্দ শোনা যায়। দাদা বলত, ওই নাকি পৃথিবীর বুকে যে সব জলাশয় আছে তাতে জল জমার শব্দ। তা খুবই সম্ভব। যে যা বলত, সব বিশ্বাস করতাম। পাহাড়ের গায়ে পাকা বেরির ঝোপ থেকে মিষ্টি ফল তুলে খেতাম। কাঠ কুড়োতে দেরি হত। কী সুগন্ধ সে কাঠের। সরল গাছের তেল-টুপটুপ শুকনো ডাল গাছতলায় ছড়িয়ে থাকত। গাছ থেকে পড়া শুকনো কেঠো ফলও পড়ে থাকত। সেগুলো পট-পট শব্দ করে, দাউ-দাউ করে জ্বলত। তার নাম পাইন্-কোন্। কুড়িয়ে ঝাঁকালে কয়েকটা পাখনাওয়ালা বিচি বেরিয়ে উড়ে যেত। এ-সব কি আর এ-জগতের কথা, যে তার জুড়ি মিলবে।

মনে আছে, মাসে একবার সবাই জিলিপি আর নিমকি খেতাম। তারপর বেলা করে যখন খিচুড়ি নামত, তখন ঘাসের ওপর সারি সারি বসে কলাপাতায় খাওয়া। গড়ানে জমি, এর পাতের খিচুড়ি গড়িয়ে পাশের পাতে চলে যেত। সে বড় মজা। হয়তো ফুলকপি ভাজা আর আলুর দম হত আর টোমাটোর চাটনি। তারপর বল খেলা হত, রোদে গড়ানো হত। সবাইকে সাবধান করে দেওয়া হত সরল গাছের শুকনো পাতা যেখানে পুরু হয়ে আছে সেখানে সাপ থাকতে পারে। মনে আছে কাঁচা পাতাগুলোর ছুঁচের মতো চেহারা। এককে ছড়ায় তিনটি করে পাতা। তাই দিয়ে আমরা বিনুনি করা শিখতাম। হাতে রাত পর্যন্ত একটা ধুনোধুনো গন্ধ লেগে থাকত। স্মৃতি দিয়ে যদি মানুষের ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়, তাহলে এই সব সময়ে আমাদের মধ্যে কিছু অচেনা উপকরণ মিশে গিয়েছিল নিশ্চয়। তাবপর দেখতে দেখতে যাবার সময় হয়ে যেত। তাড়াহুড়ো পড়ে যেত। কাঞ্ছাইরা চটপট থাপাব মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলত। সন্ধ্যার পর ডাকুর ভয়। মা বলতেন, 'সবাই মিলে এমন সুন্দর জায়গাটাকে আবার আগে যেমন ছিল, তেমন করে গুছিয়ে ফেল।' এঁটো পাতা, ঠোঙার কাগজ, তরকারির খোসা সব উনুনের গর্তে পুঁতে ফেলা হত। আমরা রওনা দিতাম। কয়েকটা কালো হয়ে যাওয়া পাথর ছাড়া সারা দিনের আনন্দের কোনও চিহ্ন রেখে যেতাম না। একে কি খুব দিশী ভাব বলা যায়?

তবে চরম সুখের মুহূর্তটি তখনও আসেনি। কাঞ্ছাইরা হাল্কা বোঝা পিঠে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলত। আমরাও ছুটতে ছুটতে দলবলের সঙ্গে যেতাম। বড়রা একটু পেছিয়ে পড়তেন। পাড়ার কাছে পৌঁছলে বন্ধুরা যে যার বাড়ির পথ ধরত। কাঞ্ছাইরা আমাদের আগেই পৌঁছে, জিনিস নামিয়ে, বাড়ির পেছনে লুম্‌পারিং নদী পার হয়ে তাদের গায়ে পৌঁছে যেত।

তখন পাহাড়ের পেছনে সূর্য নেমেছে। চারদিকের আলো কমে এসেছে। মই কাঁধে একটা লোক রাস্তার আলো জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছে। আমরাও বাড়ির সামনে এসে সারি সারি কাঁচের দরজা জানলা দিয়ে দেখি ঘরে ঘরে লম্প জ্বলছে, তার লালচে মিষ্টি আলো বারান্দাব জেরেনিয়ম ফুলের টবে লেগে আছে। বাইরে একটা বড় লণ্ঠন জ্বলছে। ওই মুহূর্তটি আমার জীবনের আরেকটি পরিপূর্ণ সুখের মুহূর্ত। 'আশ্বাসের, অভয়ের, আরামের, আনন্দের আলো। জানতাম, পরমুহূর্তেই যামিনীদার কর্কশ গলার স্বর শোনা যাবে, পোলাপানের মুহে অত কথা ক্যারে? গোছলখানায় গরম জল দিছি, হাত পাও ধুইয়া খাইতে বস।' ওই লম্প, ওই গরম জল, ওই কর্কশ কণ্ঠের ডাক আজ পর্যন্ত আমার মনের কোমল উষ্ণ কোণে সুখের সামগ্রী হয়ে আছে। তার প্রভাব আজও মুছে যায়নি। কিন্তু খুব ভালো করে ইংরিজি শিখেও ওই সায়েবিয়ানাটাকে রপ্ত করতে পারিনি। চা-বাগানের মিসেস গুপ্ত চা খাবার সময় কড়ে-আঙুলটাকে আল্‌গা করে বেঁকিয়ে রাখতেন। পেয়ালা-ভরা গরম চা ধরে রাখার সময় কড়ে আঙুল বাঁকানো খুব সহজ নয়। তা ছাড়া, সায়েবরা

নাকি কক্ষণো চামচ দিয়ে পেয়ালার চা ঘোঁটে না। ওটা ভয়ংকর অসভ্যতা। খেয়ে উঠে আঁচায়-টাঁচায় না। ও-সব নেটিব অভ্যাস। কেন, শোবার আগে যে-কোনও ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা তো বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজে। তার চেয়ে কি ওই কুলকুচিটা বেশি পরিষ্কার। এই সব কথা বলতেন মিসেস গুপ্ত। খাওয়া হয়ে গেলে প্রত্যেককে কাচের বাটিতে গরম জল দিয়ে যেত বেয়ারা, তাতে শুধু আঙুলের ডগা ডুবোতে হয়। কেউ কেউ ভিজে হাতটা একটু ঠোঁটের চারপাশে বুলিয়ে, ন্যাপকিনে মুছে ফেলতেন। ওঁরা ন্যাপকিনকে সার্ভিয়েট্ বলতেন। কুলকুচি করবে না কেউ, অথচ কাঁটা-চামচ দিয়ে খেলে আঙুল কিচ্ছু নোংরা হয় না, তবু তাকে জলে ডুবিয়ে মুছে ফেলতে হবে! এমন অদ্ভুত কথা শুনে বেজায় হাসি পেত, তা সায়েবিয়ানা শেখা হল না। এখন আবার সাহেবিয়ানা কোথায়? সায়েব-ই নেই তো সায়েবিয়ানা। ওই সব সায়েবিয়ানার কথা এখনকার বিলেতের সায়েবরাও নাকি জানে না। তাও তো দৈবাৎ যদি চাটনিতে বা পুডিং-এ কিছুর বিচি থাকে, আর সেটা অসাবধানতার কারণে মুখে চলে গেলে কী করতে হত, তা এখনো বলিনি। থুক্ করে পাতে ফেলা জঘন্য অমার্জিত ব্যবহার। এক-আধবার চামচে করে মুখ থেকে বের করে, প্লেটে নামিয়ে রাখার কথা ভেবেছি, সাহসে কুলোয়নি। মিসেস গুপ্তরা রুমাল বের করে, ঠোঁট চাপা দিয়ে, সকলের অগোচরে মুখ থেকে বিচি বের করে, রুমালটাকে আবার লুকিয়ে ফেলতেন। এই সব বাধার জন্য ওই ইংরিজি ভাষা শেখার বেশি ইংরিজিয়ানাটা রপ্ত করতে পারিনি। আর এখন তো ও-সব উঠেই গেছে। এখন ব্যক্তি-স্বাধীনতার দিন, তাই সব দেশের সব অসৌজন্য আদর পায়। সে ছিল আরেক দিন।

তখন সকাল আর সন্ধ্যার মাঝখানের সময়ের অনেকখানি স্কুলে আর স্কুলের পড়া তৈরি করতে কাটত, বাকিটা কাটত পৃথিবী পর্যালোচনায়। পৃথিবী বলতে আমরা দি ওয়ালর্ড অ্যান্ড হিস ওয়াইফ বুঝতাম না। আমাদের পৃথিবী ছিল আমাদের চারপাশের ছোট জগৎটির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে, লরেটো-কনভেন্টের ওই ৬ বছরে কতটুকু শিখেছিলাম। অনেকগুলো ভালো অভ্যাস রপ্ত হয়েছিল বটে। রমেশ দত্তরা নিশ্চয় খুব খুশি হতেন। এমন কি তাঁদের বাড়ির এক আই-সি-এস জামাইয়ের মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ত পর্যন্ত। মানুষটি বড়ই ভালো, কিন্তু সাহেবি ভাবাপন্ন। রংটাই যা কালো। তবে অন্যান্য ফিরিঙ্গি মেয়েদের থেকে এরা একেবারে আলাদা ছিল। ওই যে বললাম, সেকালের বাঙালি সাহেবরা বিলিতি নিয়মগুলোকে উন্নততর ভাবতেন বলে সেগুলি নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতেন। দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার সঙ্গে বেশ কিছু দিশি সায়েব জড়িত ছিলেন। ফিরিঙ্গিরা কোনও জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিত না। তারা মনে প্রাণে জীবনযাত্রায় সাহেবদের অনুকরণ করার চেষ্টা করত। আমার কলেজ-জীবনে কলকাতায় কুচকুচে কালো এক মেমের সঙ্গে পড়তাম, তার পদবী ছিল দাশ, কিন্তু সে ভুলেও কখনও বাংলা কথা বলতও না। জাতীয়তার কথা ওঠাতে একদিন আমাকে গর্বের সঙ্গে বলেছিল, 'আই হ্যাভ গট্ এ ড্রপ অফ আইরিশ ব্লাড ইন মি।' ওই ড্রপটা কী রকম জোরালো ভাবুন। তবে আমার অনেক সময় মনে হয়েছে হিন্দুয়ানি, বা সা হবিয়ানা, বা ফিরিঙ্গিয়ানা, এ সবের থেকে ঢের বেশি জোরালো হল মানবিকতা। অন্যগুলো একেকটা জীবনযাত্রার অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। ওকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া ভুল। যে নিজেকে বাঙালি কিংবা ভারতীয় মনে করে, সে রং মেখে ভুত সাজলেও দিশি থেকে যায়। উৎকট চেহারায় বা অদ্ভুত সাজপোশাকে তার দেশপ্রেম একটুও কমে না। গান্ধীজী বা শ্রীঅরবিন্দ যখন সাহেব সাজতেন তখনও তাঁরা দেশটাকে ভালবাসতেন। আর বহু ভেতো বাঙালি আর ভারতীয় আছেন যাঁদের মুখ দিয়ে চেষ্টা করলেও ইংরিজি বুলি বেরোবে না, কিন্তু তবু তাঁরা নিজের দেশকে ভালবাসেন না।

সেকালের সায়েবিয়ানার কথা বলতে গিয়ে এতগুলো অবান্তর বিষয় উঠল। ছোটবেলায় আমি মাটিতে কাঠি দিয়ে একটা হাতে ২০ ফুট লম্বা চওড়া চৌকো এঁকে বলেছিলাম, 'জানিস্, মাসিমা বলেছেন সূর্যটা বেজায় বড়, তবে এর মধ্যে ধরবে নিশ্চয়।' আমার চেয়ে দু'বছরের বড় দাদা, চৌকোটাকে পর্যবেক্ষণ করে বলল, 'না রে, এটা বড় ছোট হল। তবে আমদের ফুটবল গ্রাউণ্ডের মতো বড় হলে সহজেই এঁটে যাবে।' দাদার বিদ্যেবুদ্ধির ওপর আমাদের প্রগাঢ় আস্থা

ছিল। ভারি দয়ালুও ছিল। কখনো মিথ্যা কথা বলত না। তবু ওর ওপর চোটপাট করতাম। বড্ড ভালোমানুষ ছিল। কক্ষনো নালিশ করত না। টিফিনের পয়সা জমিয়ে আমার জন্য পেপারমিন্ট কিনে আনত। একবার ওর জন্মদিনে সিলেটিপাড়ার সারদামঞ্জরী দিদিমা এসে ছোটখাটো একটি উপাসনা করার পর, দাদা উঠে বড়দের সকলকে প্রণাম করল। তারপর বাবা হঠাৎ বলে বসলেন, 'এবার তোমরা সকলে দাদার পায়ের ধুলো নাও।' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দাদা আমার চেয়ে বড় এবং বেশ খানিকটা মাথায় উঁচু হলেও আমার সঙ্গে পারত না। আমি কি না প্রণাম করব ওকে! এ কী শুনছি। ঘাড় গুঁজে বসে রইলাম। আর সকলে উঠে টিপটিপ করে প্রণাম করতে লাগল। দাদা বোধ হয় নিজের অযোগ্যতার কথা ভেবে কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তুই করলি না?' কোনও উত্তর দিলাম না। সঙ্গে সঙ্গে এক চড়। মুণ্ডু ঘুরে গেল, তবু নড়লাম না। দাদা তখন কাতর হয়ে আমার কাছে এসে বলল, 'ওরে ওমন করিসনে, বড়দের প্রণাম করতে হয়।' এই বলে নিজের ডান পা, তারপর বাঁ-পা আমার মাথায় তুলে দিল। ব্যস্, পায়ের ধুলো নেওয়া হয়ে গেল। কারও কিছু বলবার রইল না। আড়চোখে চেয়ে দেখি বাবা মুচকি হাসছেন। তখন আমার এবং উপস্থিত সকলের না হেসে উপায় রইল না। এই রকম ছোট ছোট ঘটনাগুলোর সুখের সমাপ্তি হত। এই সব দিয়ে আমাদের মন তৈরি হয়েছিল।

তখন জীবনযাত্রা সহজ ছিল। এত বেশি জিনিস এত ভালো লাগত যে কী বলব। এত ভালো ভালো লোক দেখেছি, তার হিসাব নেই। অবিশ্যি এখনকার মতো তখনও সকলে বলত, দেশের বড় দুর্দিন এসেছে, দুর্নীতিতে ভরতি হয়ে গেছে চারদিক। আমি তার মধ্যেও অনেক ভালো লোক দেখতে পাই। একবার, আমার বয়স যখন তিনের নিচে, বাবাকে তিন মাসের জন্য চেরাপুঞ্জিতে থাকতে হয়েছিল। জায়গাটা শিলং থেকে বোধ হয় ৩২/৩৩ মাইল দূরে। সেখানে নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি পড়ে। আশ্চর্যের বিষয়, বৃষ্টির কথা একটুও মনে পড়ে না। হয়তো শুকনো সময় গিয়েছিলাম আর শিলংঙের বৃষ্টিও চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

কী রকম বাড়িতে ছিলাম, তাও মনে নেই। তবে বাবাদের ১২ নং সার্ভে পার্টির সঙ্গে হাতি ছিল মনে আছে। দাদা-দিদিকে একটা হাতির পিঠে আর আমাকে আর ছোট ভাই কল্যাণকে আরেকটাতে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার বেজায় ভয় করছিল, কিন্তু কল্যাণ একগাল হেসে, হাতির পিঠ চাপড়াচ্ছিল।

সবচেয়ে ভালো লাগত নীলমণিবাবুকে। একমুখ পাকা দাড়ি গোঁফ, মাথায় বাঁদুরে টুপি, গায়ে কালোপানা গলাবন্ধ কোট আর পেন্টেলুন। নিরামিষ খেতেন। তাঁর পোষা কুকুর ভজহরি তাঁর পাশে বসে ডাঁটা চিবুত। তাকেও ভালো লাগত। পরে শুনেছিলাম নীলমণিবাবু ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক। ওখানে একটা ফ্রী স্কুল করেছিলেন। গরীব ছেলেরা ওঁর বাড়িতে থাকত, খেত আর ওই স্কুলে পড়ত। দলে দলে স্থানীয় লোকরা ওখানকার ছোট্ট ব্রাহ্মমন্দিরে খাশিয়া ভাষায় উপাসনা শুনতে আসত।

আমার ৬ বছর বয়সে কনভেন্টে ভরতি হলে বাইবেলের গল্পের একটা বই পড়ানো হত। প্রথম দিন বই খুলেই দেখি নীলমণিবাবুর ছবি। কিন্তু নিচে লেখা গড় নাকি ৬ দিনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি করে ৭ম দিনে বিশ্রাম করছেন। আমার বোঝা উচিত ছিল; কারণ নীলমণিবাবু তো সব সময় চশমা পরতেন, গডের চোখে চশমা নেই। সাদৃশ্য দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম।

যতই সেই আরেক দিনটাকে খুঁজে বেড়াই এখনকার জীবনযাত্রায় তার এতটুকু খুঁজে পাই না। অথচ টুকরো টুকরো মুহূর্তের কণা কণা চিন্তা জমে জমে একেকটা যুগের মানসিকতা তৈরি হয়। ওই নীলমণিবাবুর মতো মানুষ তারপর আর একটিও দেখিনি। তাঁকে দেখার হয়তো ১৫ বছর পরে কথায় কথায় আমার নামকুদা, অর্থাৎ উপেন্দ্রকিশোরের ছোট ছেলে বলেছিল, 'তা বলতে পারিস্, কিন্তু এ-ও মনে রাখিস ওই যে দলে দলে নিরক্ষর গ্রামবাসীরা তাঁর কথায় প্রকৃতি পুজো ছেড়ে নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনায় মন দিয়েছিল, তাদের সকলের ধারণা ছিল যে,

নীলমণিবাবুই সেই নিরাকার পরমব্রহ্ম, যাঁর উপাসনা করতে হয়। শেষ পর্যন্ত ওই কারণেই উনি ওখান থেকে চলে এসেছিলেন।'

ধর্মেটর্মে আমার অতটা আস্থা নেই। ভাবি পরোপকার করবে, সত্যি কথা বলবে, পরিচ্ছন্ন জীবন কাটাবে, তার বেশি ক'জন পারে। যদি সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুখী হত মানুষ, তাহলে কি আর ভগবানের কথা খুব একটা মনে পড়ত ? দুঃখ পায় বলেই ভগবান ভগবান করে সাধারণ মানুষরা। ছোটবেলাতেও এই রকম কথা মনে পড়ত। নীলমণিবাবুকে গ্রামবাসীরা নিরাকার পরব্রহ্ম ছাড়া আর কি ভাবতে পারত ? আর কেউ তো কখনও তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করেনি। তবে আরেকটু না বললে অন্যায় হবে। আর কেউ করেনি বলাটা ঠিক নয়। নয়তো ১৯১১ সালে চেরাপুঞ্জিতে ওর মতো কেউ ছিল না। কিন্তু পরে ওই অঞ্চলের মিশনারি সাহেব-মেমদের কাজ দেখে অবাক হয়ে যেতাম। এখনো যাই! একদল ছিলেন, তাঁরা খালি পায়ে, মোটা জামাকাপড় গায়ে, কুঁড়ে ঘরে থেকে, গরিবদের সেবা করতেন, লেখাপড়া কাজকর্ম শেখাতেন। সারা জীবন ধরে করতেন। অনেকে ওখানেই মারা যেতেন। এঁরাই অনেকে আবার বলতেন, যীশুকে ভগবানের পুত্র না মানলে, মারা গেলে বড় কষ্ট পেতে হয়। কেমন গোলমাল লাগত। এখন সে-কথা মনে পড়লে ভাবি মনের ধর্ম এক আর অনুষ্ঠিত ধর্ম আর। সেদিনও যেমন, এখনো তেমন। মানুষ হওয়া আর ধার্মিক হওয়া যেন দুটো আলদা জিনিস। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত দেখে, অনেক ফ্যাশানেবলরা কেমন বাইরের সাহেবিয়ানা আর ভেতরের হিঁদুয়ানিকে খাপ খাইয়ে নিতেন।

সেই আরেক দিন যে-বিষয়টা দেশবাসীদের সকলের মনে হয় বিদ্বেষের, নয় দেশপ্রেমের ঢেউ তুলত, তার কথা তো বিশেষ বলাই হল না। তার কারণ, ছোটবেলায় তার আওতার বাইরে ছিলাম। আমার কাছে তার কোনও বাস্তব রূপ ছিল না। তবে স্কুলে ফিরিঙ্গি মেয়েদের হাবভাব দেখে সায়েব-মেমদের ওপর ভারি একটা ঘৃণা জমেছিল। সেটা ব্যক্তিগত আক্রোশ ; তার সঙ্গে দেশপ্রেমের সম্পর্ক ছিল না। বাবা আর পাতানো কাকাবাবুরা ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের চাকরে, অন্তত আমাদের সামনে তাঁদের মুখে কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা শোনা যেত না।

একটু একটু মনে পড়ে, পঞ্চম জর্জ যখন রাজা হলেন, শিলং শহর আলোর মালা পরেছিল। সরকারি খরচায় কি না বলতে পারি না। আমাদের বারান্দার কড়িকাঠেও সারি সারি চীনে লণ্ঠন ঝোলানো হয়েছিল। সে বড় সুন্দর ব্যাপার। রঙীন ছবি আঁকা কাগজ দিয়ে বাইরেটা মোড়া, ভেতরে একটা তীরের খোপে মোমবাতি বসানো। বোধ হয় ওই চীনে লণ্ঠনগুলো জাপানে তৈরি ছিল। লাবান পাড়া আলোয় আলো। দল বেঁধে ঘুরে এলাম। ফিরে এসে দেখি মোমবাতি শেষ হয়ে নিবে গেছে। এক জায়গায় কড়িকাঠও ঝলসে গেছে। তখন হয়তো ১৯১০-এর শেষ, কি ১৯১১। দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। অনেক ছেলে প্রাণও দিয়েছে। আলো নেবা দেখে মন খারাপ হয়েছিল।

এর কিছু পরে পুজোর ছুটিতে অনেকে শিলং শহরে বেড়াতে এসেছিলেন। সবাই মিলে একদিন এলিফ্যান্ট ফলসে চড়িভাতি করা হল। আবছা মনে পড়ে, কারা সব বড় বড় দাদারা পাথর আঁকড়ে ঝরনার মুখ বেয়ে দিব্যি সুন্দর উঠে যাচ্ছিল। দেখে আমি ভয়ে কাঠ। পরে ঘোরা পথে আমরাও ঝরনার মাথায় পৌঁছে দেখি ভিজে কাপড়ে ওরা ভিজে ঘাসের পর বসে বসে হাসছে। মা-মাসির দল বকাবকি করতে লাগলেন, 'ওরে তোদের ঠাণ্ডা লাগবে যে!' ওরা বলল, 'আমরা বোলপুরের ছেলে। এসবে আমাদের কিচ্ছু হয় না। আমরা দেশের কাজ করব। শরীর শক্ত করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ডানপিটে হক ছেলেরা।' শুনে অবাক হলাম। কী সে দেশের কাজ ভেবে পাইনি যার জন্য শরীর শক্ত করতে হবে। দেশ বলতে তো জানতাম মৈমনসিংহ জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে মসূয়া বলে একটা ছোট্ট সুন্দর গ্রাম। সেখানে আমাদের ঠাকুমা থাকেন, যামিনীদার বাড়ির লোকেরা থাকে। সেখান থেকে আমাদের জন্য আনারস, আম, কাঁঠাল, ক্ষীরের তক্তি আসে। খুব ভালো জায়গা। দেশকে ভালোবাসতে হয়। ওখানে আগে দিনের বেলাতেও বাঘ দেখা যেত। ওই আমাদের দেশ। তার চেয়ে বড় দেশ কল্পনা করতে পারতাম না। ভাবতাম পৃথিবীর মধ্যে ঐটেই সবচেয়ে ভালো দেশ। কোনো দিনও

চোখে দেখিনি।

তার পরের বছর আমার বড় মাসিমা তাঁর মেয়ে নোটনকে নিয়ে শিলং-এ এলেন। একদিন কলকাতা থেকে কে একজন দেখা করতে এলেন। মা-মাসিমা তাঁকে আদর করে বসবার ঘরে বসালেন। নোটনকে জিজ্ঞাসা করা হল 'কে রে?' নোটন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে অম্লানবদনে বলল, 'ও আমাদের চাকর বেণি,' আমরা তো তাজ্জব বনে গেলাম। কলকাতার চাকররা কোট পেন্টেলুন পরে বসবার ঘরে বসে গল্প করে!

পরে মাসিমা বললেন, দূর বোকা, তাই কখনো হয়? উনি আমাদের বন্ধু আশু ডাক্তার। ওঁর ছোট ভাই কানাই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া কী জিনিস, সে জ্ঞানও ছিল না। মনে আছে, মা আমাদের কাছে পরাধীনতার দুঃখের কথা একটু একটু বলেছিলেন। তবে ১৯১৪ সালে মেমদের স্কুলে ভর্তি হবামাত্র বুঝেছিলাম পরাধীনতার দুঃখ কাকে বলে। পায়ের তলা থেকে সুখের মাটি কে যেন কেটে নিয়েছিল। স্কুলের অসমিয়া বাঙালি মেয়েরাই প্রত্যেক ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড হয়, ভালো সেলাই করে, ছবি আঁকে। তবু মেয়েরা আর ফিরিঙ্গি শিক্ষিকারা তাদের নানাভাবে ছোট ছোট অপমান করে। আমাদের কচি মনেও কাঁটার মতো সেগুলো বিঁধত। নেটিভ, নিগার, ব্ল্যাকি। অথচ তাদের অনেকের রং আমাদের চেয়েও কালো ছিল। কিন্তু খাঁটি মেম নানরা এ-সবের উপরে ছিলেন। কয়েকজন বাঙালি আই সি এসের মেয়েরাও ফিরিঙ্গিদের দলে মিশে আমাদের টিটকিরি দিত। তবে একটা ভালো ফল হল। একটু একটু করে বিলিতি বিদ্বেষী হয়ে উঠতে লাগলাম। কিন্তু বিদেশি-বিদ্বেষ আর দেশপ্রেম কি এক জিনিস? প্রেমের মধ্যে কি বিদ্বেষ থাকতে পারে?

বাবা কখনও সাহেবদের বাড়ি যেতেন না। কিন্তু বলতেন 'ওদের ভালো গুণগুলো রপ্ত করতে না পারলে ওদের সঙ্গে পারবে না। সততা, সময়নিষ্ঠা, মিলেমিশে কাজ করা, পরিচ্ছন্নতা এইসব গুণ রপ্ত করা চাই'। ক্রমে সেটা বুঝলাম। বিপক্ষ দলের গুণ আর শক্তি জানা থাকলে নিজেদের শক্তি বাড়ে। তাদের গুণ অস্বীকার করা নির্বোধের কাজ। এই সব মনে হত বলে পরে যখন সময় এল, আমার আর রাজনীতি করা হল না। তার জন্য যে আত্মাহুতি আর একাগ্রতা দরকার সে আমার ছিল না।

মনে আছে, কলিকাতায় এসে যখন ডায়োসেসান স্কুলে পড়ি, বিলিতি কাপড় পরা ছেড়েছি, মীরা দত্তগুপ্তের প্ররোচনায় তকলি দিয়ে সুতো কাটি। সে সুতো দেখতে ভালো হলেও, মীরার চেনা তাঁতের লোকরা পত্রপাঠ ফেরত দিত। নাকি কম জোরি, তাঁতে চালালেই ছিঁড়ে যাচ্ছে! একটা গামছার পর্যন্ত যোগ্য নয়। সে যাই হক, ভবানীপুরের এক গলিতে একজন দেশপ্রেমিকের একতলা বাড়ির ছাদে আমরা একটি লোকের কাছে লাঠিখেলার প্রশিক্ষণ নিতাম। শির-মোড়া, দাড়িমোড়া ইত্যাদি, এখন ভুলেও গেছি। আমি টিংটিঙে রোগা ছিলাম, মীরা আরেক কাটি বাড়া। কিন্তু আমরা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতাম দেশপ্রেমিক হতে হলে দুর্বল হওয়া চলবে না। সব দিক দিয়ে শক্ত পোক্ত হতে হবে। মীরা আবার নিরামিষ খেত, আমিষের গন্ধে ওর মাথা ঘুরত। শক্ত পোক্ত হওয়া খুব সহজ কাজ ছিল না। তবে বাইরেটা না হক, অন্তরকে তো শক্ত করা যায়। মাঝে মাঝে বন্ধুরা আমাকে বলত, 'তোমার বাবার সরকারি চাকরি ছাড়া উচিত, নইলে খুব খারাপ দেখায়।' বাবাকে সে-কথা বলার সাহস ছিল না। তবু কথাটি কোনও উপায়ে তাঁর কানে পৌঁছতে মনে হল, তিনি ভারি মজা পেয়েছেন। আমাকে ডেকে বললেন, 'ওরে, তাহলে তুই সংসার চালাবার ভারটা নে, মোটে তো ১৭টা লোক। আর আমি দেশপ্রেমে লেগে যাই।' বেজায় রেগে গেছিলাম মনে আছে, মুখে কিছু বলিনি। আমার মণিদা আবার ভারি রসিক ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা সে যে খুব উপভোগ করছিল তাতে সন্দেহ নেই। সে আমাকে পরে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'নারে অতদূর যাবার দরকার নেই। কাকাকে চাকরি ছাড়তে হবে না। বরং অন্য একটা কাজ করতে বলিস—' এই বলে কোনও একজন লেখকের বা সাংবাদিকের কথা বলল, তিনি নাকি যাচ্ছেতাই ভুল ইংরিজিতে মাঠে ময়দানে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন। এবং খবরের কাগজে লম্বা লম্বা বিলিতিনাশক চিঠি ছাড়তেন। তা চিঠিগুলো ছাপা হত না। একদিন শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ তাঁকে বলেছিলেন, "আপনি অমন বিশ্রী ভুল ইংরিজি লেখেন কেন? একটু

ভালো করে লিখুন না।" তিনি বললেন, "ইচ্ছে করে লিখি। ব্যাটাদের তো কিছু করতে পারি না, তাই ভাষাটাকে ধরে তচনচ করে ছাড়ি!" খুব চটেছিলাম মনে আছে।

এখন বুঝি, আমাদের বাড়ির লোকরা বাস্তবিক দেশ-প্রেমিক ছিলেন। দেশের যা কিছু ভালো, শিক্ষা, সাহিত্য, আদর্শ, সবগুলি রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। আমার বড় জ্যাঠামশাই সারদারঞ্জন বলতেন, 'খালি ক্লাস রুমে মানুষ তৈরি হয় না, খেলার মাঠেও নামতে হয়।' দেশটাকে শক্ত-পোক্ত করা এ ছাড়া আবার কী? কাজ সকলে করবে, রাজনীতি করবে জনাকতক। বাবার মতো আদর্শবাদী লোক কোথায়?

ক্রমে চোখ ফুটতে লাগল। সে-সময় কংগ্রেসের নামে লোকে পাগল হয়ে যেত। অথচ ওই সব দেশপ্রেমিকদের মধ্যে বেশ কজন বিলেতফেরৎ সাহেবী ভাবাপন্ন লোকও ছিলেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা অনেকে বিলেতে বা এই দেশেই বিলিতি স্কুলে লেখাপড়া শিখত। ভালো বাংলা বলতে পারত না। অথচ ওই ধরনের কয়েকটা পরিবারের দেশপ্রেমিক বলে নাম। কখনও একটা বাংলা বই খোলে না, বাড়ির হালচাল পুরোদস্তুর সাহেবি। অথচ এঁদের কেউ কেউ দেশনেতা বলেও পরিচিত। দেখে দেখে তাজ্জব বনে যেতাম। হঠাৎ সেকালের রমেশ দত্তদের কথা মনে পড়তেই মনটা হাল্কা হয়ে যেত। স্বদেশকে ভালো না বাসলে এঁরা এদেশে বাস করেন কেন? দেশে বসে সাহেবিয়ানা করলেও, বিদেশে গিয়ে দেশের নিন্দা করেন না তো। হয়তো এ-দেশটাকেও একটা স্বাধীন দিশী বিলেত করে নিতে চাইছেন। সেখানকার ভালো নিয়মগুলো এখানে প্রচলিত করার, সেই পুরনো স্বপ্নই দেখছেন। দেশপ্রেমিক বটে, তবে খুব বাস্তব বুদ্ধি ছিল না।

শুনেছি ইতিহাস ত্রিশ বছরে একবার করে চক্রাকারে ঘুরে আসে। ত্রিশ বছরের পুরনো চিন্তাগুলোই সামান্য একটু সাজ বদলে, নবতম চিন্তা সেজে আবার দেখা দেয়। যত দেখি ততই এ কথার প্রমাণ পাই। তবে ঠিক চক্রাকারে ঘোরে না, spiral-এ ঘোরে। আবর্তনটার মাপও সব সময় ঠিক থাকে না, ত্রিশের বদলে দেড়শো বছরও ফিরে যায়। অনস্বীকার্য প্রমাণ দিয়ে অগ্রসর-উন্নয়নের রূপকথাটাকে নস্যাৎ করে দেয়। জাতিভেদ, যৌতুক, নারী নির্যাতন শিশু বিক্রি।

দেশ স্বাধীন করবার জন্যে দেশসেবকরা যে দুঃখ কষ্ট বরণ করেছিলেন, তার কাহিনী আমার বক্তব্য বিষয় নয়। তাঁরা দেশকে স্বাধীন করবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমরা সাধারণ লোকরা ভাবতাম, ইংরেজরা এ-দেশ ছেড়ে চলে গেলে, ভারতের সঙ্গে স্বর্গের কোনো তফাৎ থাকবে না। যখন সুন্দর সুন্দর দিশি জিনিস তৈরি হতে লাগল, তখন ভাবতাম, আর কখনও বিদেশি জিনিস এ-দেশের কেউ কিনবে না। খালি ওষুধ আর বই ছাড়া। ফরেনের' মোহ কী জিনিস তা-ও জানতাম না। জিনিসের গুণ যে এক, আর তার মোহ যে আলাদা, তাও সন্দেহ করিনি। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প না বলে পারছি না। আমাদের চেনা একজন বিশ্বনাগরিক, কর্মব্যপদেশে তাকে নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, বেইরুট, হংকং, টোকিও করতে হয়। সে একটা অপূর্ব নাইলনের শার্ট গায়ে দিয়ে দেখা দিল, যা রঙে রামধনুকে হার মানায় আর খোল এমনি খাপি, যেন দুধের সর! উপস্থিত নারী-পুরুষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ঘর নিনাদিত এবং আমরা এমন জিনিস চোখে দেখার সুযোগ পাই না বলে হৃদয়বিদারক আর্তনাদ। শার্টের মালিক এই মিশ্র আত্মপ্রকাশে যোগ দিচ্ছেন না দেখে পরে প্রাইভেটলি কারণ জিজ্ঞাসা করা হল। সে কোনও কথা না বলে, বোতাম ঘরের তলাকার পটির কিনারা তুলে দেখাল লেখা রয়েছে 'ম্যানুফ্যাকচার্ড এন্ড মেড ইন ইণ্ডিয়া।'

এমন খাসা জিনিস এই পোড়া দেশে তৈরি বলে আপসোসে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। বলল, 'এমন জানলে কিনতাম না।'

আরেকজন কম বয়সী বন্ধু ৫ বছরের ফেলোশিপ নিয়ে বিদেশ গেল। যাবার আগে তার কী ফুর্তি, উঃফ্ বাঁচা গেল! কাজ সেরে বাড়ি ফিরে লোডশেডিং-এর পাল্লায় পড়তে হবে না!' আরেকজন প্রবীণ পরামর্শদাতা বললেন, 'যা বলেছ! ওইখানেই থেকে যেও। এ-দেশে মানুষ থাকে?'

তাহলে এ-দেশটাকে কারা ভালোবাসবে ? গোড়াতেই বলেছি, এই রম্যরচনাতে রমণীয়তা আছে কিনা জানি না। ইংরিজিতে একটা প্রবাদ আছে, "We like because of/but we love in spite of" সেই সব প্রেমিকরা আজ সরে থাকছে কেন ? আমাদের ছেলেমেয়েরা ইংরিজি বাংলা হিন্দি কোনও ভাষাই নির্ভুল ভাবে ব্যবহার করতে পারে না। মনের কথা প্রকাশ করতে হলে তিনটে ভাষারই আধ খামচা শরণ নেয়। দেশের পোশাক পছন্দ করে না, অনেক সময় সং সাজে। দেশের পুরনো ভদ্রতা জানেই না, আবার তাকে বলে সঙ্কীর্ণতা। মুখে বলে ইংরিজি হটাও। আবার ডিস্কো করে ! এ-সব নির্বুদ্ধিতাকে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিই না, যদিও রুচিতে বাধে। কিন্তু ওই যে নিজের দেশকে ভালো বাসে না, তার কি ওষুধ আছে ? পৃথিবীর ক্ষমতাশালী দেশগুলো মরণযজ্ঞ শুরু করে থাকতে পারে, কিন্তু তারাও বিকৃত বিভ্রান্ত ভাবে নিজেদের দেশকে ভালোবাসে, তাকে সবার বড় করতে চায়। খালি আমরাই নিজেদের দেশ ফেলে পরের দেশের মানুষদের কষ্টলব্ধ ভোগ-সুখে ভাগ বসাতে চাই ! সেই সব লোকরা কোথায় গেল, যাবা রামমোহন, বিবেকানন্দ, সুভাষেব মতো দেশবাসীদের গালি দিয়ে, নিন্দা করে, শিখিয়ে দেবেন কী করে ভালোবাসতে হয় ?

খাকি

বুদ্ধদেব বসু

ড্রাইভারের দিকে পিঠ-দেওয়া লম্বা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসল ওরা পাঁচজন। সঙ্গে-সঙ্গে বেলেল্লা হল্লায় আট নম্বর বাস্ মুখর হয়ে উঠল। সকলেই অমিশ্র বঙ্গীয়, ঘোর তাম্রবর্ণ, যুবা। কারও গোঁফ উঠেছে, কারও ওঠেনি। কিন্তু মুখে তারুণ্যের স্বিগ্ধতা নেই, অত্যন্ত বেয়াড়া-রকমের চোয়াড়ে চেহারা, দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। একদা এরা ছিল কলকাতার স্ট্রীট-বয়, রাজপথের টেড়ি-কাটা বিড়ি-ফোঁকা স্ববাজ্যে এদের আস্তানা ছিল। আজ যুদ্ধের দৌলতে খাকি প্যান্ট পরে পদস্থ হয়েছে। আজ এদের মুখে বিড়ির বদলে সিগারেট, ককনি বুলির বদলে ইংরেজি বুকুনি। আহা, কী ইংরেজি! মাতৃভাষাপ্রেমিক কোনও ইংরেজ যদি শুনতেন তিনি নিশ্চয়ই মনে করতেন যে, বড়ো হাতের E-ওলা 'দি এম্পায়ার'-এর জন্য বড্ড চড়া দাম দিতে হচ্ছে। ইংরেজি ভাষাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সেই মৃতদেহটাকে টুকরো-টুকরো করে কাটছে কারা? তারা মার্ক টোয়েন বর্ণিত ইটালিয়ানরা নয়, তারা কলকাতাব রাস্তাব ছোঁড়ারা, যারা আজ জনরক্ষার ভার পেয়ে খাকি পাতলুন পরেছে।

হী হী করে হাসতে-হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, গাল টিপে দিচ্ছে, একই সিগারেট এক মুখ থেকে পাঁচমুখে ঘোরাঘুরি করছে। অথচ এরা পাগল কিংবা মাতাল নয়। এরা স্বভাববর্বর মাত্র। কোনওদিন লেখাপড়া শেখেনি, ভদ্রসমাজে মেশেনি, কোনো সৌকুমার্যের চর্চা কবেনি। সব দেশের বড়ো শহরেই এ-রকম একটা শ্রেণী থাকে। আমাদের দেশে এরা নতুন, কেন না যন্ত্রযুগের নাগরিক সভ্যতা আমাদের দেশে নতুন। আমাদের দেশের গেঁয়ো অভাজন যারা, তারা আলাদা জাতের। তাদের অজ্ঞ মনে হয়, মূর্খ মনে হয়, বর্বর মনে হয় না। মানুষিক কমনীয়তা থেকে বঞ্চিত নয় তারা। কিন্তু কলকাতার, ঢাকাব, লক্ষ্ণৌর রাস্তাব ছোঁড়াদের কুখ্যাতি কে না শুনেছেন? তাদের দুর্মানুষিকতায় কে না মর্মাহত হয়েছেন? তবু মনে হয় এরা যখন ধুতি কি পাজামা কি লুঙ্গি পরে বেড়ায়, তখন পরিধানের নম্রতাই তাদের চরিত্রকে ঈষৎ যেন মার্জিত কবে। আমরা বহুদিন পরাধীন আছি বলেই হোক, বা স্বভাবতই নম্র বলে হোক, আমাদের পবিচ্ছদে, কথাবার্তায়, ব্যবহাবে যে-ভাবটি সবচেয়ে পরিস্ফুট তাকে বিরূপ সমালোচক বলবেন দাস্যভাব, অনুকম্পায়ী বন্ধু বলবেন, শান্তভাব; আমরা যেখানে একই চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে বসে থাকব, সেখানে একজন ইংরেজ তাঁর উচ্ছল প্রাণশক্তির তাড়নায় কখনও এ-পাশে বেঁকবেন, কখনও ওপাশে হেলবেন, কখনও পা দুটোকে লম্বা করে চালিয়ে দেবেন মেঝেতে, আবার কখনও গুটিয়ে নেবেন হাঁটুর উপর হাঁটু তুলে। কথা বলতে-বলতে সুখ, দুঃখ, বিস্ময়, সংশয় ইত্যাদিব ছায়া ইংরেজের মুখে সিনেমার অভিনেতার মতোই স্পষ্ট হয়ে ফোটে, আমাদের মুখে ব্যঞ্জনা কম, চীনেদের মুখে আরও কম। আমাদের কাছে পাশ্চাত্ত্য অঙ্গভঙ্গি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হয়, পাশ্চাত্ত্য চোখে আমাদের ঠেকে রহস্যময় পাষাণ মূর্তি। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, সে-কথা অবান্তর, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতির মৌল প্রভেদের পরিচয় আছে এখানে। ওদের চঞ্চল স্বভাবে ওরা বিশ্বজয় করেছে, আমাদের শান্ত স্বভাবের জোরে আমরা মরতে-মরতেও মনুষ্যত্ব হাবাইনি। আমাদের ইতর জন যারা, তারাও মানুষ, এতদিন এ-কথা আমরা জোর করেই বলতে পারতুম। বিলেতি ফিল্মে বিলেতি ছোটলোক যখন দেখি, তখন আশ্চর্য হয়ে এটাই উপলব্ধি করি যে, লোকটা চেহারায়, চরিত্রে, হাবে-ভাবে, আমাদের দেশের ইতরজনের চেয়ে ঢের বেশি ছোটলোক। আবার ওদের মধ্যে যাঁরা ভালো, যাঁরা বড়, তাঁরা আমাদের উঁচকপালদের চাইতে সত্যি-সত্যি অনেক উঁচুতে, সেটাও মানতে হয়। ওদের সব চেয়ে ভালোটা আশ্চর্য রকম ভালো, খারাপটাও অতিশয় মারাত্মক। আমাদের ভালোটা হয়তো মাঝারি গোছের কিন্তু মন্দটাও

দুঃসহ নয়। আমাদের রাস্তার ছোঁড়ারাও মেজর বার্বারার পুষ্যিদের মতো একেবারেই 'খাঁটিমাল' নয়, তাদের উদ্ধারের জন্য স্যালভেশন আর্মির প্রয়োজন হয় না ; মনুষ্যত্বের যেটুকু ভেজাল নিয়ে তারা জন্মেছে তার কিছু-না-কিছু ছিটে-ফোঁটা শেষ পর্যন্ত তাদের গায়ে লেগেই থাকে।

এতদিন অন্তত, তা-ই ছিল। এতদিন এরা ধুতি পরেছে, চপ্পল পায়ে ফটফট করে পথ চলেছে, শিষ দিয়েছে, মেয়ে-ইস্কুলের বাস্-এর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেছে ;—তাতে অপৌরুষ ছিল, আস্পর্ধা ছিল না। ধুতি জিনিসটা যেমন দেহের অনেক খুঁত গোপন করে, তেমনি চরিত্রেরও। কিন্তু কাটাছাঁটা খাকি প্যান্ট আজ এদের চেহারার এবং চরিত্রের সমস্ত বর্বরতা নিঃশেষে উদ্ঘাটন করে দিয়েছে ; অশিক্ষার সঙ্গে সামরিক ঔদ্ধত্যের সংযোগে এরা আজ মনুষ্য সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। প্রভুত্বের স্বাভাবিক পৌরুষ এদের কোনওকালেই ছিল না, তার বদলে সেবকের যে-শান্ত ভাবটুকুর গুণে এতদিন এদের মানুষ বলে মনে হত, আজ একটা খাকি পাতলুনের মূল্যে তাও এরা খুইয়ে বসেছে। এতদিনে নিজেদের হীনতা সম্বন্ধে এদের কোথায় একটু লজ্জা ছিল, আজ তাও নেই, আজ এরা সম্পূর্ণ নির্লজ্জ ও নির্জলা, বীরত্বের আর কোনও উপাদান সংগ্রহ না করে শুধু একটা রণবেশের মহিমায় এবং যোদ্ধার হাব-ভাব অঙ্গ-ভঙ্গির কুৎসিত অনুকরণে বিজিত এবং বিজয়ী জাতি উভয়কেই লজ্জা দিচ্ছে। চৈত্রের দুপুর বেলায় এদের চূড়ান্ত অসভ্যতায় আট নম্বর বাস উন্মথিত। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্নদাশঙ্করের চমৎকার কথাটি মনে পড়লো—'খাকি পরলেই খোক্কস হয়।'

জীবনে কোনওদিন আমি খাকির প্রেমে পড়িনি। এই অনির্ণেয় অস্পষ্ট অনুজ্জ্বল রং যে পৃথিবীকে এমন করে ছেয়েছে সেটা আমাদের সভ্যতার রুগণ দশারই একটা লক্ষণ নয় কি ? নয়তো এত ভালো-ভালো রং থাকতে সামরিক ব্যবহারের জন্য খাকি কেন নির্বাচিত হল ? শোনা যায়, বুওর যুদ্ধের সময় খাকির জন্ম। আফ্রিকার তামাটে মাটির সঙ্গে রং মিলিয়ে সৈন্যদের পোশাক তৈরি করা হল, প্রকৃতির অনুকরণে এর আত্মগোপনের একটা কৌশল। জানি না, আজকালকার যুদ্ধে এই কামুফ্লাজ কতটা কার্যকরী। সামগ্রিক হত্যাকাণ্ডে মনুষ্যজাতি দিন-দিন যে-রকম উপার্গনিপুণ হয়ে উঠেছে, তাতে খাকি পরে শত্রুর চোখে ধুলো দিতে পারার আশা কম। খাকি তবু দুর্মর। দেশ ছেয়ে গেল। শুধু রণবেশীরাই নয়, ট্রামের কন্ডাক্টর, ডাকঘরের পিওন, মিলিটারি লরি, সরকারি লেফাফা—যেদিকে তাকাই, চেতন অচেতন সবই যেন খাকি। এই নীরস, নিষ্প্রাণ, বিবর্ণ বর্ণ আর কত দেখতে হবে। তার উপর আবার কয়েক বছর ধরে আপিসের শ্বেতাঙ্গ বেশে খাকি কোর্তার প্রবর্তন হয়েছে, লালদিঘির অর্ধেকটাই আজ খাকি। এদিকে অনেক অগ্রগামী যুবক শখ করে খাকি ইজের পরছেন আর গায়ে চাপাচ্ছেন ঝোপ-কামিজ, ইংরেজিতে যাকে বলে বুশ-শার্ট। যাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হয়, তাদের পক্ষে ঝোপ-কামিজটা হয়তো মানান-সই, কিন্তু তোপের মুখ থেকে যাঁরা অনেক দূরে, তাঁরা যে কোন আহ্লাদে ওই বিচিত্র পোশাকটি অঙ্গে ধারণ করেন তা তো ভেবে পাই না। এর চেয়ে যে বড়ুয়া-পাঞ্জাবি কিংবা 'রাশিয়ান' শার্টও ভালো। হায়রে, এত খাকিও যথেষ্ট নয়, বাঙালী মেয়েরাও নারীবাহিনীতে যোগ দিয়ে খাকি শাড়ি ধরেছেন। হয়তো কয়েক মাসের মধ্যে খাকি শাড়িটাই ফ্যাশান হবে, এবং আমাদের শ্যামশ্রীময়ীরা খাকির খাপে তাঁদের সৌন্দর্যকে কবর দিয়ে সগর্বে ঘুরে বেড়াবেন।

খাকির সমর্থনে একটি কথা শুধু বলা যেতে পারে। ওটা সহজে নোংরা দেখায় না, ওতে খরচ কম। কিন্তু কোনও উজ্জ্বল রঙের পক্ষে ও-কথা তো আরও সত্য। চোখে কী সুন্দর লাগে গাঢ় নাবিক-নীল ! দমকলের টকটকে লাল রং কী মনোহারী ! অমনি টকটকে লাল রং পরিয়ে সৈন্যদের রণক্ষেত্রে পাঠানো হোক না। রক্ত নিয়েই তাদের খেলা, মানাবে ভালো। খাকিটা অমন নিরপেক্ষ, অমন নৈর্ব্যক্তিক বলেই অত খারাপ লাগে, তাতে রাগ বিদ্বেষ ভালোবাসা কিছুই নেই। এর চেয়ে ঢের ভালো কি হয় না, যদি যোদ্ধবেশে রাগের লাল রং আগুনের মতো জ্বলে ওঠে ? কেন না রাগের ধর্ম এই যে, তা কোনও এক সময়ে থামে, এবং একবার থামলে শান্তির প্রেরণা প্রাণের মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু রাগদ্বেষ-বর্জিত, বিশুদ্ধ লুব্ধতাপ্রসূত, একান্ত নৈর্ব্যক্তিক খাকি-রঙা যুদ্ধ—এ কি কোনওদিন থামবে ? কাগজে-কলমে শান্তি হলেও ভিতরে-ভিতরে

ধিকধিকি জ্বলবে আগুন—১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত যুদ্ধ কি থেমে ছিল ? যুদ্ধ করতেই হয়, রেগে গিয়ে যুদ্ধ করা ভালো, সেটা আপন বিবর্তনের বিধানেই ঠিক জায়গায় এসে সুসম্পূর্ণ হবে—এবং শেষ হবে। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, পৌরাণিক কোনও যুদ্ধেই উভয় পক্ষের লুব্ধতা নেই, তাই তার অবসান শুধুই প্রালয়িক নয়, মানবিক ; বিপুল হত্যার পরে মনুষ্যত্ব তার আদিম মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। দুর্যোধন যে বলেছিলেন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দেবেন না, তার কারণ তাঁর ভূমিলিপ্সা নয়, পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ঈর্ষা ও বিদ্বেষ। ঈর্ষা-বিদ্বেষও মানবিক, কিন্তু লোভ দানবিক ; রাবণ লোভী, তাই সে রাক্ষস। যদি এমন হত যে, রামচন্দ্রও লোভী তাহলে রাম-রাবণের যুদ্ধ আজ পর্যন্ত থামত না। কিন্তু রামচন্দ্র মনুষ্যত্বের মহিমা নিয়েই লোভের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন ; তিনি নিজে লোভ করেননি, তাই বলে মনুষ্য ধর্মের ঊর্ধ্বে তিনি ছিলেন না, সীতাবিরহে সাধারণ মানুষের মতোই কাতর হয়েছিলেন। রামচন্দ্র যে সম্পূর্ণ মানুষ, দেবতা নন, অবতার নন, কিংবা হলেও সে-বিষয়ে অচেতন, এটাই রামায়ণের সবচেয়ে বড় শিক্ষা এবং বাল্মীকির সবচেয়ে বড় কীর্তি।

আজ পৃথিবীর লোককে এ-কথা বলবারই সময় এসেছে—তোমরা ক্রোধ থেকে, ঈর্ষা থেকে, হৃদয়ের কোনও গভীর দুঃখ থেকে যুদ্ধ করো তাহলেই যুদ্ধ থামবে। কলের মতো লড়াই কোরো না, মানুষের মতো যুদ্ধ করো। মানুষ-মানুষে মারামারি হোক, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের সংঘর্ষ বাধুক। তাহলে রণক্ষেত্রই একদিন মিলনক্ষেত্রে পরিণত হবে। কিন্তু আজকালকার লড়াই যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের, ট্যাঙ্ক বোমা মেশিনগানের মতো মানুষও যুদ্ধের একটা উপাদান মাত্র। আসল সংঘর্ষ কূটবুদ্ধিপ্রসূত চালের সঙ্গে চালের, সে অতি দুর্গম নেপথ্য থেকে আপন কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক জগতের এটাই বোধ হয় সবচেয়ে অভিনব আবিষ্কার— এই বিনারাগের লড়াই, এই হৃদয়বর্জিত, নৈর্ব্যক্তিক, অ-মানুষিক যুদ্ধ। খাকি তারই প্রতীক।

আধুনিক যুদ্ধের অ-মানুষিক চরিত্র থেকেই খাকির জন্ম, নাকি খাকি রঙের প্রভাবেই আধুনিক যুদ্ধের এই অ-মানুষিকতা, এ-প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নয়—এবং আপাতত না করলেও চলতে পারে। আপাতত যেটা সাদা চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেটা এই যে, খাকি রংটা ঘোরতর অপ্রীতিকর। রং হিসেবে এটা নিকৃষ্ট তাতে সন্দেহ নেই, তার উপর আমাদের চোখে খারাপ লাগবার বিশেষ একটু কারণ আছে। সেটা এই যে, আমাদের দেশে খাকি কখনও ছিল না : ওটা ইংরেজ এনেছে, এবং ইংরেজের সঙ্গে আমাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ বলে খাকিকে আমরা অত্যন্ত সমীহ করি এবং কিছুটা ভয় করি, কিন্তু তার সঙ্গে মেলামেশার পথ খুঁজে পাই না। আমাদের জীবনের অনেক দূরে, অনেক উপরে, সরকারি স্বর্গলোকে খাকি প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা খাকি পরেন তাঁরা আমাদের কর্তা, আমরা দোষ করলে ধমক দেন, যথোচিত সেবা করলে একটু পিঠ চাপড়িয়ে কৃতার্থ করেন। আমাদের মনে খাকি এই প্রভুবৃত্তির সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, আমাদের অবচেতনেও এই মনোভাবের প্রভাব কাটে না। অত্যন্ত নিকট আত্মীয়ও যখন খাকি পরেন, তাঁকে কেমন পর-পর ঠেকে, কোনও খাকি-পরিহিত সুহৃদ-সজ্জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের রাস্তা সহজ মনে হয় না। ও-জিনিসটার বিজাতীয় দূরত্ব আমাদের একটা বহুকালের সংস্কার। তা হলেও এটা মানতে হয় যে, শ্বেতাঙ্গরা যখন খাকি পরেন তাঁদের বেশ ভালোই দেখায়, কিন্তু আমাদের চর্মের তৈলচিক্কণ তাম্র আভা খাকি এমনই নির্মমভাবে প্রকট করে তোলে যে ওর সঙ্গে রাজকীয় মহিমার অনুষঙ্গ না থাকলে আমরা খাকি পরবার আগে সাতবার গলায় দড়ি দিতুম। কথাটা শুনে বন্ধুবান্ধব অনেকেই খুশি হবেন না, কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতেই হয় যে, কোনও বঙ্গবীর যখন খাকি পাতলুন আর ঝোপ-কামিজ পরে বুক টান করে টগবগিয়ে চরে বেড়ান, সে-দৃশ্য দেখে ইংরেজের কী মনে হয় তাঁরাই জানেন, আমরা লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারি না। শিল্পী যামিনী রায়ের মুখে একটা কথা অনেকদিন শুনেছি ; দেশ স্বাধীন হলে সেপাইদের পোশাক কী-রকম হবে, এ-নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবিত। স্বীকার করব, তাঁর এই সমস্যা নিয়ে আমি বিশেষ উৎসুক্য প্রকাশ করিনি ; দেশ যদি স্বাধীনই হতে পারে, তাহলে সেপাইদের পোশাকও একটা উদ্ভাবন করা অসম্ভব হবে না, আমার মনের ভাবটা ছিল এই রকম। কিন্তু সম্প্রতি বুশ-শার্ট পরা বঙ্গবীরদের দেখে যামিনী রায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক

বেড়ে গেল ; তাঁর মনে যে, এ-প্রশ্নটা উঠেছে, তাতে বোঝা গেল, তাঁর জীবনদর্শন কত গভীর। সত্যিই তো, আমাদের সেপাই, সান্ত্রী, পোস্টম্যান, লিফটম্যান, ট্রাম-কন্ডাক্টর, এ আর পি, সকলকেই কি আমরা হৃদয়হীন খাকিতে মুড়ে রাখব ? আর সকলেরই ওই পাতলুন আর কোর্তা ? ধুতি শৌখিনতার অপবাদে লাঞ্ছিত, কিন্তু পাজামা-পাঞ্জাবি কেন আমদের সরকারি পোশাক হতে পারবে না ? আর পৃথিবীর স্নিগ্ধ মধুর রংগুলোকেই বা কোন্ অপরাধে নির্বাসনে পাঠাব ? মনে করুন, চাঁপা-রঙের পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ট্রাম-কন্ডাক্টর, মেটে সিঁদুরের রঙে সুসজ্জিত ডাকওলা চিঠি নিয়ে এল, পায়রার ডিমের মতো ঈষৎ নীল পুলিশম্যান রাস্তার মোড়ে-মোড়ে দাঁড়িয়ে। কল্পনা করতেই জীবনটাকে কত সহজ, স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর মনে হয়। লন্ডন শহরের রাস্তায় ছ'ফুট লম্বা পুলিশ যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন তার জাঁদরেল চেহারা সত্ত্বেও তাকে সর্বজনের বন্ধু বলে মনে হয়, কারণ সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে পোশাকে, হাবে-ভাবে, চলাফেরায় সে সঙ্গতি রক্ষা করেছে। তাকে দেখেই মনে হয় যে, সর্বসাধারণেরই একজন, দূর কেউ নয়, পর কেউ নয়, সর্বসাধারণের ইচ্ছাই তাকে ওখানে দাঁড় করিয়েছে। লন্ডনের লোক তাকে আপনজন বলে না-ভেবেই পারে না। কিন্তু আমাদের দেশের পুলিশ তার পরিবেশের মধ্যে একটি জীবন্ত ছন্দ-পতন, লাল পাগড়ি তাকে সর্বসাধারণের জীবন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাকে লোকে ভয় করে বটে, কিন্তু বড্ড বেশি ভয় করে। পুলিশ যদি শুধুই বিভীষিকা হয়, তাহলে তার পক্ষে যথার্থ কর্তব্য সম্পাদন সম্ভব হয় না। পট্টি-বুট জুতো-কোর্তা-কামিজ জড়ানো এই রাজপ্রতিভূর সর্বসাধারণের জীবনে স্থান নেই। ও-সব পরিহার করে তাকে যদি আজ ধুতি কিংবা পাজামা পরানো হয়, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গেই দেশের লোকের সঙ্গে তার একটি হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয়ে যায়। আজকের এই বোমা-পড়া কৃষ্ণপক্ষে এ-সব কথা বাজে কথা নয়, গভীরভাবে ভেবে দেখবার। এমন যদি হয় যে বাড়িতে বোমা পড়েছে, আর খাকি-পরা এ আর পি এল উদ্ধার করতে, ওই দুঃসময়েও খাকি রংটাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারবো কি ? কল্পনা করা যাক, সেই একই লোক এল শুভ্র খদ্দর পরে ; আমাদের মন মুহূর্তে উন্মুখ হবে তার দিকে, সহজ হবে সহযোগিতা। আর যদি রং চাই তো আছে গেরুয়া—আমাদের দেশের জনসেবার প্রাচীন প্রতীক—আর গেরুয়া পছন্দ না হয় তো উজ্জ্বল বৌদ্ধ হলদে আছে, আমাদের হৃদয় তাকেও সানন্দে গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু খাকি নয়, কিছুতেই খাকি নয়।

"উত্তর তিরিশ"। ১৯৪৫।

ভেগোলজি

পরিমল রায়

সম্প্রতি একটি নতুন বিদ্যা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই বিদ্যার ইংরিজি নাম ভেগোলজি। বাংলা ভাষায় ইহার অভিধা নির্দেশ করা মুস্কিল। তবে, সন্ধ্যাবিদ্যা কথাটি হয়তো মন্দ হয় না। কারণ, বস্তুত, এই বিদ্যা আলো-আঁধারি বিদ্যা। মনের কিংবা জ্ঞানের রাজ্যে দিগদিগন্ত যেখানে তেমন প্রকট নয়, অথচ একটি অনির্বচনীয় বিশালতার স্পষ্ট ইঙ্গিত অনস্বীকার্য, সেখানেই ভেগোলজির প্রভাব মানিয়া লইতে হয়।

ভেগোলজি কথাটি 'ভেগাস' এবং 'লোগোস' এই দুইটি প্রাচীন শব্দের সমন্বয়ে উৎপন্ন। প্রথমটির অর্থ পথ বিলাস। নিছক কতকগুলি জিজ্ঞাসার সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ পরিবেশে যথেচ্ছ বিচরণের যে-আনন্দ, ভেগোলজি তাহারই পরিবেশক। যেখানে গন্তব্য নাই অথচ গমন আছে, ক্ষুধা নাই অথচ ভুঞ্জন আছে, বক্তব্য নাই কিন্তু বাক্য আছে,—অর্থাৎ যেখানে যাবতীয় সন্ধান-বিকৃত মনোবৃত্তির ঊর্ধ্বে লক্ষ্যনিরপেক্ষ নভোচারী চিলের মতো কেবলমাত্র ভাসিয়া বেড়াইবার উৎসাহ আছে, সেখানেই ভেগোলজির প্রকৃষ্টতম প্রকাশ। কোনও-কোনও মনুষ্যের মননশক্তি একটি নির্দিষ্ট জিজ্ঞাসা কিংবা সমস্যা অবলম্বন না করিয়া বিকশিত হইতে পারে না। তাহারা পথে বাহির হইলে কোথাও পৌঁছিতে চায়, বলিতে আরম্ভ করিলে কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করে। এই দুর্বল পরাশ্রয়ী চৈতন্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে ভেগোলজির সাহায্য লইতে হয়। সন্ধ্যাবিদ্যা যাহার আয়ত্ত, তাহার শক্তির স্বাধীনতা অসাধারণ। তাহার বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, দ্বন্দ্ব নাই, দ্বিধা নাই, স্বচ্ছন্দবিহারী যাযাবরের ন্যায় তাহার গতি অকুণ্ঠ, সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া তাহার সংসার।

এদেশে কিছুকাল পূর্বেও ভেগোলজির তেমন প্রচার কিংবা প্রচলন ছিল না। অতি সম্প্রতি ইহার আদর হইয়াছে, এবং, সুখের বিষয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি এই বিদ্যায় ক্রমশ আকৃষ্ট হইতেছেন। ভেগোলজি সম্বন্ধে আমার উৎসাহের ইতিহাসও সাম্প্রতিক।

কিছুদিন পূর্বে একটি বিদ্বৎসভায় জনৈক পণ্ডিতের মুখে 'রবীন্দ্র দর্শন' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। শুনিয়া মনে হইয়াছিল, এমন অপূর্ব ভাষণ পূর্বে আর কোথাও শুনি নাই। সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, ইনি বাংলাদেশের একটি সিদ্ধ পুরুষ ও প্রখ্যাতনামা ভেগোলজিস্ট। তাঁহার বক্তৃতার ভাব ও ভাষা আমার কানে যেন আজও লাগিয়া আছে। তিনি বলিতেছিলেন :

> 'এই যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, এই যে তাঁর সাহিত্য, তাঁর কবিতা এবং সঙ্গীত, এ সকলের মধ্যেই কবি তাঁর জীবনদেবতাকে খুঁজে ফিরেছেন। তিনি সত্যের পূজারী কেবল নয়, সুন্দরের আরাধনাও তাঁর চরম লক্ষ্য নয়, তিনি শিবের সন্ধানী তিনি অ-শিবের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই রূপ-রস-গন্ধময় বিশ্বপ্রকৃতির লীলা নিকেতনে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার, এবং ঠিক এই কারণেই কবি তাঁর সাহিত্যটির ভেতর দিয়ে ভূমার জয়গান গেয়েছেন, অরূপকে রূপ দিয়েছেন, রূপহীন মরণকে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে সজ্জিত করতে পেরেছেন।'

ভেগোলজির প্রতি আমার অকৃত্রিম অনুরাগের উৎপত্তিস্থল এই অভিভাষণ। সামান্য কয়েকটি কথায় এমন অসামান্য আলোকপাত আমি পূর্বে আর কখনও দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আমার নিকট কিছু অপরিচিত নয়, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত মর্ম এমন করিয়া যেন কোনওদিন উপলব্ধি করি নাই। বক্তৃতাটি শুনিয়া হৃদয় এবং মস্তিষ্ক বিভাগে বিশেষ সম্পন্ন বোধ করিয়া সেদিন বাড়ি ফিরিয়াছিলাম। এই পরম বিদ্যার সন্ধান পাইয়া অবধি যেখানেই কোনও ভেগোলজিস্টের সন্ধান পাই, একেবারে ছুটিয়া গিয়া হাজির হই। দু'দণ্ড কাছে বসিয়া কত কথা

শিখিয়া আসি।

একদিন খবব পাইলাম, জনৈক বিখ্যাত শিল্পরসিক মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াছেন। শুনিলাম, প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার আসরে বহু বিদগ্ধজনের সমাগম হইতেছে এবং বহু উচ্চাঙ্গের আলোচনায় তিনি সমবেত সকলকে মুগ্ধ করিতেছেন। শুনিয়া প্রথমটায় তেমন গরজ বোধ করি নাই। কিন্তু একদিন জানিতে পাইলাম, ইনি কেবল বিখ্যাত শিল্পরসিক নন, অতি উচ্চ শ্রেণীর ভেগোলজিস্টও বটেন। এই সংবাদ পাইবার পর আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। এক সন্ধ্যায় গুটি-গুটি আমাকেও গিয়া জুটিতে হইল। ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া দেখি, সভা সরগরম। জ্ঞানপিপাসুর সংখ্যা কম নয়। ফরাসের উপর কুড়ি-পঁচিশটি জিজ্ঞাসু বিনীত উৎসাহে উপবিষ্ট। ক্ষণে-ক্ষণে নানা দিক হইতে নানাবিধ প্রশ্ন আসিতেছে, আর ভদ্রলোকটি অতি শান্ত ও ধীরকণ্ঠে প্রতিটি প্রশ্নের অতি সুচিন্তিত ও সুসংবদ্ধ মীমাংসা জোগাইয়া যাইতেছেন। প্রশ্নটি যত জটিলই হোক না কেন, ভেগোলজির জাদুস্পর্শে উহার যাবতীয় গ্রন্থি মুহূর্তমধ্যে মুক্ত হইয়া যাইতেছে। অতি বিস্ময়কর শক্তিই বলিতে হইবে। ফরাসের একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া বহুক্ষণ দুই কান পাতিয়া বিদগ্ধ রসনাব মধুবর্ষণ সংগ্রহ করিলাম। পরে এক-সময়ে কেন যেন মনে হইল, আমারও কিছু একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত, বোকার মত কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে এ-সভায় মান থাকিবে না। কিন্তু আমার কী সাধ্য, এই আসরের উপযুক্ত প্রশ্ন উদ্ভাবন করি? এতগুলি পরমহংসের মধ্যে আমার মত বকপক্ষীর বক্‌বকানি কে শুনিবে? তাছাড়া, স্বভাবজিজ্ঞাসু না হইলে জিজ্ঞাসাই বা কোথা হইতে আসিবে? নিজের বিপদ যেন নিজেই ডাকিয়া আনিলাম, এবং নিতান্ত মূর্খ বলিয়াই বিষম বেগতিকে পড়িয়া গেলাম। ভাগ্যক্রমে শেবপর্যন্ত একটা সুরাহা হইল। বহু ভাবিয়া চিন্তিয়া, মাথার ঘাম কোলে ফেলিযা একটি প্রশ্ন মনে-মনে খাড়া কবা গেল। ভাবিলাম, জিজ্ঞাসা কবি; গ্রীক ভাস্কর্য ও ভারতীয় ভাস্কর্য এ-দু'য়ের মধ্যে তফাৎ কোথায়? প্রশ্নটি বেশ ভালই মনে হইল। ভাস্কর্যের কোনও একটি প্রচেষ্টা যদি গ্রীসে হইয়া থাকে এবং অপর কোনও একটি প্রচেষ্টা যদি এদেশে হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাদেব মধ্যে অবশ্যই একটি পার্থক্য আছে, অন্তত থাকা উচিত—এবং সে-বিষয়ের উপব একটি জিজ্ঞাসা হয়তো খুব মূঢ়তার পরিচায়ক হইবে না।

সুযোগেব অপেক্ষা করিতে কবিতে এক সময়ে কপাল ঠুকিয়া প্রশ্নটি নিবেদন করিয়া বসিলাম। অপবিসীম ভাগ্য বলিতে হইবে, প্রশ্নটি শুনিযা তদ্রলোকেব পণ্ডিতমন অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠিল। আমার প্রতি প্রশ্রয়পূর্ণ সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন: খাসা প্রশ্ন, অনেককিছু বলবাব আছে। বলিয়া সুস্মিত বদনে মৃদু মৃদু মাথা নাড়িতে লাগিলেন। এতখানি সমাদবেব জন্য অবশ্য প্রস্তুত ছিলাম না। প্রশ্নটির আশাতীত অভ্যর্থনায় খানিকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। তদুপরি সভার দৃষ্টি সশ্রদ্ধ কৌতূহলে আমার প্রতি সহসা নিবদ্ধ হওয়াতে অস্বস্তি আবও বাড়িয়া গেল। ভদ্রলোক বলিলেন:

"গ্রীক ভাস্কর্য এবং ভারতীয় ভাস্কর্য এই দুইটির ভেতর তফাৎ কোথায়? এই আপনার প্রশ্ন?"

বলিলাম: "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইলেন। যতক্ষণ তিনি তুষ্ণীম্ভাবে রহিলেন, ততক্ষণে সমবেত সভ্যমণ্ডলী উৎকণ্ঠিত আগ্রহে তাঁহার বাক্‌স্ফূর্তিব প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনতিকাল মধ্যে মৌনভঙ্গ হইল। ভদ্রলোক বলিলেন:

'আচ্ছা ধরা যাক, এই হল গ্রীক স্কাল্পচার' বলিয়া ফরাসের উপর তর্জনী টানে একটি লম্বা দাগ কাটিলেন। তন্মুহূর্তে সভাসুদ্ধ সকলে বেখাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আমিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উহার উপর নজর রাখিতে লাগিলাম।

'আব, এই ধরা যাক ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার।'

এবারের আরেকটি রেখাপাত হইল, উহার স্থান গ্রীক রেখাব কিঞ্চিৎ নিম্নে। পর-পর দুইটি রেখা সৃষ্টির পর আমাদের দৃষ্টি অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ হইল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উহাদের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মনে করিলাম, হয়তো জ্যামিতিক নিয়মে প্রশ্নটির সমাধান করিবেন।

অতঃপর ভদ্রলোক এক টিপ নস্য লইয়া ফরাসে একটি কিল মারিয়া বলিলেন:

"আচ্ছা। এই যে গ্রীক স্কাল্পচার (গ্রীক রেখায় তর্জনী নির্দেশ), আর এই যে ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার (দ্বিতীয় রেখায় তর্জনী বিহার), এদের মধ্যে তফাৎটা কী? এই আপনার প্রশ্ন?"

সোৎসাহে বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই দু'য়ের মধ্যে তফাৎটা কী?"

প্রশ্নটি যথাযথ ভাবে বুঝিয়া লইয়া ভদ্রলোক একবার চক্ষু বন্ধ করিয়া ঊর্ধ্বমুখী হইলেন। কিছুক্ষণ পর চক্ষুরুন্মীলন ঘটিল, এবং তিনি বলিলেন:

"বেশ। এখন কথা হচ্ছে কী জানেন? গ্রীক স্কাল্পচারে অর্থাৎ এইটেতে (ঊর্ধ্বরেখায় অঙ্গুলিস্পর্শ) এমন একটি বস্তু আছে যা ইন্ডিয়ান স্কাল্পচারে অর্থাৎ এইটেতে (নিম্ন রেখায় তর্জনী নির্দেশ) নেই। বুঝলেন কিনা। আবার, ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার অর্থাৎ এইটাতে (অধোরেখায় অঙ্গুষ্ঠপাত) এমন একটি জিনিস আছে যা গ্রীক স্কাল্পচারে অর্থাৎ এইটেতে (ঊর্ধ্বরেখায় অঙ্গুষ্ঠঘাত) নেই।"

শুনিয়া মুহূর্তমধ্যে আমাদের চোখের সম্মুখ হইতে যেন একটি ঘোরতর অন্ধকার পর্দা সরিয়া গেল। দিব্যদৃষ্টি লাভ করিবামাত্র ভাস্কর্যের নানা দেশীয় কারুকলার বিভিন্ন মূর্তি বিবিধ অর্থ ও মর্ম পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেল। অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

অনেকে বলেন, ভেগোলজি বিদ্যা তেমন উচ্চ শ্রেণীর নয়। তাঁহাদের কুসংস্কারবদ্ধ ধারণা, বিদ্যামাত্রেরই একটা জমকালো সাজ-সরঞ্জাম থাকা চাই। অর্থাৎ গ্রাফ চার্ট টেস্টটিউব টেলিস্কোপ ইত্যাদি লইয়া ভড়ং সহকারে খানিকটা আঁতিপাঁতি না করিলে বিদ্যা হয় না। ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। বিদ্যা কতখানি সবল সহজ ও নিরলঙ্কার হইতে পারে, তাহার উদাহরণ ভেগোলজি। আসলে, ভেগোলজি সঙ্কেতময়ী বিদ্যা। ইহাকে বুঝিতে হইলে আস্তিন গুটাইয়া কুস্তি করিলে চলে না। ইহার সাধনা পালোয়ানির ঊর্ধ্বে।

একদা জনৈক বিখ্যাত ভেগোলজিস্ট আমার গৃহে পদধূলি দিয়াছিলেন। কথায় বার্তায় বোধ হইল, তিনি বাংলাদেশের বর্তমান দুর্যোগের কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আছেন। এবং ইহার প্রতিকারকল্পে কিছু একটা অবিলম্বে আমাদের করণীয় বলিয়া তিনি মনে করেন। ভয়ানক কর্মব্যস্ত লোক, মুহূর্তের অবসর নাই, নানা কাজে সর্বদা আবদ্ধ। আমার সহিত পরিচয় মাত্র এই মহৎ কার্যে সহযোগে প্রার্থনা করিলেন, এবং দ্রুতবেগে অনেকগুলি কাজের নির্দেশ জানাইয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন:

> 'মানে, আপনারা এদিক থেকে এই করতে থাকুন। আর আমরা ওদিক থেকে ওই করতে থাকি। আপনারা যদি এটুকু করেন, তাহলে আপনাদের কাছ থেকে আমাদের এ-তে একটা সত্যিকারের সাহায্য হবে। মানে, বাংলাদেশের যে অবস্থা, বুঝতে পেরেছেন, এখন যদি আমরা এটা না করি তাহলে—মানে, এদের ব্যাপারটি তো বুঝতে পারছেন? এরা দেবে না। কিন্তু দেবে না বললেই তো আর আমরা এ করতে পারি না। আমাদের কেড়ে নিতে হবে। আর, তাহলেই বুঝতে পেরেছেন, ওটা বিশেষ করে দরকার। তাই বলছিলাম, আপনারা এদিক থেকে এই করতে থাকুন, আর আমরা ওদিক থেকে—। মশাই, ছেপে বার করবো। হাজার, দু'হাজার, দশহাজার, দু'লাখ, দশলাখ—যত লাগে।

ইহা ভেগোলজির সঙ্কেতময়ী ভাষা। বুঝিতে হইলে বহুকালের কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন।

ভেগোলজিস্ট সম্প্রদায়ের একটি সর্বসম্মত রীতি আছে। ইহাদের মধ্যে একত্র দল বাঁধিয়া বসবাসের প্রবৃত্তি সাধারণত দেখা যায় না। ইহারা ধর্মপ্রচারকের ন্যায় পৃথক যাত্রায় নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। প্রত্যেকের এলাকা আলাদা। কেহ কাহারো রাজ্যে পদক্ষেপ করেন না। কিন্তু ঘটনাক্রমে কদাচিৎ দুইটি ভেগোলজিস্টের মধ্যে সাক্ষাৎ হইলে অপূর্ব উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যাবিদ্যার সাঙ্কেতিক সমারোহ দেখিয়া তখন মুগ্ধ না হইয়া উপায় থাকে না। এরূপ সৌভাগ্য আমার এযাবৎ দুইবার মাত্র ঘটিয়াছে।

প্রথম বারের কুশীলব দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ী অধ্যাপক। একজন সাহিত্যের, অপরটি অর্থনীতির। কিন্তু সাহিত্য কিংবা অর্থনীতি তাঁহাদের জীবিকার অবলম্বন মাত্র। জ্ঞানের পরিধি অবশ্যই বহুবিস্তৃত। সাহিত্যের অধ্যাপক ক্লাশে বক্তৃতা করিয়া ঘামিয়া ফিরিয়াছেন। বক্তৃতার মধ্যপথে বিজলী-পাখা বন্ধ হইয়া যাওয়াতে বড় বিপত্তি হইয়াছিল। গরমে অস্থির। বিজ্ঞানের

বাহাদুরি কম নয়। কিন্তু উহার বাঁদরামিও অসহ্য। এই অসহ্য দিকটার মূল অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে 'সাহিত্য' জিজ্ঞাসার সুরে উক্তি করিলেন :

"পাখাগুলো রোজই দেখছি মাঝে-মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপারটা কী ?"

প্রশ্নটি বিশেষ কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া নয়। কিন্তু অর্থনীতির কানে উহা ঢেউ তুলিল। তিনি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিলেন :

'হঠাৎ প্রেশারটা বেশি হয়ে পড়লেই সার্কিটটা বন্ধ হয়ে যায়।'

সাহিত্য অত সহজে ভজিবার পাত্র নন। তিনি তৎক্ষণাৎ পাল্টা প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে অর্থনীতি আবার জবাব হাঁকিলেন। প্রশ্নোত্তরের নমুনায় বোঝা গেল ভেগোলজির সঙ্কেতসিদ্ধি উভয়েরই অসামান্য। ফলে, অতি অপূর্ব কথামালা গলায় ঝুলাইয়া বাড়ি ফিরিলাম। কথোপকথনটি আপনারাও শুনুন।

সা তা, প্রেশারটা রেগুলেট করলেই হয়।

অ সে কী করে হবে ? একটা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স আছে তো ?

সা সেটা কে অস্বীকার করছে ? আমি বলছিলাম রেজিস্টেন্সটা যদি--

অ বাড়ানো যায় ? তাহলে আবার লাইন জখম হয়ে যাবে।

সা কিন্তু লাইনে তো দুটো। পজিটিভটা গেলে নিগেটিভটা থাকবে।

অ সে হয় না। শর্টসার্কিট হয়ে যাবে।

সা শর্টসার্কিট হয়ে গেলেও লং সার্কিটটা থাকবে।

অ কিন্তু এ যে এ.সি. কারেন্ট।

সা এ.সি. কারেন্ট ? ডি.সি. নয় ? ওটাও থাকা উচিত ছিল।

অ তা কি সম্ভব ?

সা কেন, একটা ডি.সি. কয়েল ফিট করিয়ে নিলেই—

অ তাতে হয় বটে। কিন্তু খরচটা আপনি দেবেন ? (হাসি)

সা (হাসি)

আমরা উপস্থিত মূর্খের দল এই সঙ্কেতের ভাষা কিছুই বুঝিলাম না। কিন্তু এটুকু বুঝিলাম, উভয়েই দুর্ধর্ষ ভেগোলজিস্ট।

দ্বিতীয় ভেগোলজিক্যাল সংঘর্ষটির মল্লবীর দুইটি তরুণ উচ্চশিক্ষিত যুবক। ইহারা অতি অল্প বয়সেই ভেগোলজি চর্চায় নিযুক্ত হইয়াছে। আশা করা যায়, পরিণত কালে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। একদা এই যুবকদ্বয়ের মধ্যে একাদিক্রমে দুইটি প্রসঙ্গের আলোচনা শুনিয়াছিলাম। প্রথম বিষয়টি আগামী রুশ-মার্কিন যুদ্ধ, দ্বিতীয়টি, উত্তর ভারতীয় পরিচ্ছদ চুড়িদার-পাজামা ও আচকানের উৎপত্তি। দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নাই। আড্ডায় বসিয়া এলোমেলো কত কথাই তো হয়।

ধরা যাক, যুবক দুইটির নাম অরুণবাবু ও তরুণবাবু। অরুণবাবু বলিতেছিলেন, আগামী রুশ-মার্কিন যুদ্ধে রুশের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই উক্তির পিছনে অরুণবাবুর কোনও রাজনৈতিক পক্ষপাত ছিল না। তিনি বলিতেছিলেন, যুদ্ধের আধুনিক কলাকৌশলের মর্ম যাহার আয়ত্ত, তিনিই জানেন এ-যুদ্ধে মার্কিনের জয় সুনিশ্চিত। তরুণবাবুর সে-সকল কলাকৌশলের মর্ম সম্যক আয়ত্ত। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও দেখা গেল, এই উক্তি মানিয়া লইতে তাঁহার বিশেষ আপত্তি। অতএব অচিরে অরুণে ও তরুণে মহা তর্ক বাধিয়া গেল। সেই ঘোরতর বাক্য সংঘর্ষে বহু বোমা বারুদ ফাটিল, অতীতের বহু রক্তাক্ত ইতিবৃত্ত আলোচিত হইল, নানাবিধ সৈন্য সমাবেশ, ব্যূহ রচনা, ব্যূহ ভেদ, নৌযুদ্ধের কৌশল, আকাশ যুদ্ধের নৈপুণ্য, পাতাল যুদ্ধের কীর্তি, উড়োজাহাজ, ডুবো জাহাজ, অ্যান্টি-এয়ার, অ্যান্টি-অ্যাটম, ট্যাঙ্ক, টমিগান, বনযুদ্ধ, মরুযুদ্ধ, যাবতীয় সামরিক তত্ত্ব দুই রসনা হইতে বেপরোয়া উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অর্থাৎ, এককথায়, দুইজনের মধ্যে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়া গেল। অরুণের বাণ তরুণ কাটিয়া ফেলে, তরুণের বাণ অরুণ মুঠায় ধরিয়া দুমড়াইয়া শেষ করে। কেহ কাহাকেও আঁটিয়া উঠিতে পারে না। আমরা বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উহাদের আলোচনা শুনি, এবং আশ্চর্য হই, এত বিদ্যা ইহারা কবে সংগ্রহ

করিল ?

বহুক্ষণ ধরিয়া যখন এই শুম্ভ-নিশুম্ভ কাণ্ড চলিতেছে তখন এক সময়ে তর্কের এক তুমুল মুহূর্তে তরুণ একটি মহা ভুল করিয়া বসিল। মার্কিন সাফল্যের বিপক্ষে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাইবার পর, তরুণবাবু রুশের আয়তন-সম্পর্কিত মামুলি যুক্তিটা উত্থাপন করিয়া বসিলেন। যদি নেপোলিয়ন ব্যর্থ হইয়া থাকে, যদি হিটলারকে ফিরিয়া আসিতে হইয়া থাকে, তবে মার্কিনকেও একই ফাঁদে পড়িতে হইবে। এই কথা শুনিবামাত্র অরুণ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হইল। উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল :

"আপনি তাহলে এতক্ষণ এই কথাটাই ভাবছিলেন ? কিন্তু আপনি কি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে আগামী যুদ্ধে আমেরিকাকে রুশ দেশে একটি পা-ও ফেলতে হবে না ?" শুনিয়া তরুণ হাসিয়া অস্থির। ব্যঙ্গ সুরে বলিলেন :

"যুদ্ধটা তাহলে ওরা নিউইয়র্কে বসেই জিতবে ?" এইবার অরুণচন্দ্রের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ :

"আরে মশাই, ওরা ভি-টু ছাড়বে। জাপান থেকে ওরা অনবরত ভি-টু ছাড়তে থাকবে। কী করবে রাশিয়া ?"

অরুণের ব্রহ্মাস্ত্র তরুণের ব্রহ্মতালু ভেদ করিল। তরুণ দারুণ লজ্জায় অধোবদন। একথাটি তাহার মনে হয় নাই। ভি-টু ছাড়িলে আর উপায় কী ? তর্কযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া তরুণ বলিল :

"ভি-টু ছাড়বে ! তা বটে। হ্যাঁ, তাহলে আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েট পারবে না।"

একটা মীমাংসা হইয়া যাওয়াতে আমরাও নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

দ্বিতীয় আলোচনাটি উত্তর ভারতীয় পরিচ্ছদ চুড়িদার-পায়জামা ও আচকানের উৎপত্তি লইয়া। এই পোশাকটি মূলে হিন্দুদের, না মুসলমানদের ? তরুণের মতে ইহা হিন্দু পরিচ্ছদ। অরুণের বিশ্বাস, ইহা মুসলমানী পোশাক। মহা তর্ক। ইতিহাস উপড়াইয়া ফেলিবার জোগাড়। ভারতের যত কৃষ্টি, যত সংস্কৃতি, যত ঐতিহ্য, এবং উহাদের যত পার্থক্য এবং সমন্বয়, অন্তর্ভুক্তি ও সমাবেশ, মিশ্রণ ও বিবর্তন, যুগ্ম রসনার আস্ফালনে টগবগ করিয়া উঠিল। একেবারে কুরুক্ষেত্র না হইলেও অন্তত বস্ত্রহরণ। স্বযুক্তির নজির স্বরূপ একপক্ষ যে-বস্ত্রটিই তুলিয়া ধরে, প্রতিপক্ষ তাহা নিমেষে হরণ করিয়া অপর একটি বস্ত্র আনিয়া হাজির করে। ভেগোলজিক্যাল কার্পাস উভয়েরই অফুরন্ত, টানিয়া আর শেষ হয় না। কাহারও যুক্তি কোথাও একটা চরম মীমাংসায় আসিয়া পৌঁছাইতেছে না। অভীষ্ট পর্বতের চূড়া যেন ক্রমশই তুঙ্গপথে ঊর্ধ্বগামী, কোনও পক্ষেরই আরোহণের শেষ নাই। আমরা পুনরায় রুদ্ধ নিঃশ্বাস, কখন কী হয় বলা যায় না।

কিন্তু এক সময়ে সব কিছুরই অবসান ঘটে। এই অরুণ-তরুণ-সংঘর্ষও শেষকালে এক সময়ে ফুরাইয়া গেল। কিন্তু ফুরাইল বড় অদ্ভুতভাবে। দমকা হাওয়ায় আলো নিবিবার মতো তরুণের কী এক ফুৎকারে অরুণ যেন অকস্মাৎ বেমালুম উবিয়া গেল। হঠাৎ আচমকা পরশ পাথরের সন্ধান পাইবার মতো আবিষ্কারের বিজয়-উল্লাসে তরুণ একবার হাঁকিয়া উঠিল :

'অরুণবাবু, কণিষ্ক ?' বলিবামাত্র কী যেন ঘটিল, অরুণের মুখ হঠাৎ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, যত তর্ক, যত গলাবাজি ও আস্ফালন মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গিয়া নিঃশেষিত তুবড়ির মতো অরুণ যেন কালো মুখে কাত হইয়া পড়িল। আমরা বুঝিলাম, এবারে তরুণ প্রতিশোধ নিয়াছে, কিস্তিমাৎ হইয়া কুরুসভার পাশা খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। অরুণ বীরের ন্যায় পরাজয় শিরোধার্য করিয়া স্বীকার করিল :

'কণিষ্ক ! হ্যাঁ, তাহলে ওটা হিন্দুদেরই পোশাক।'

ভেগোলজির কী অপূর্ব মহিমা ! সামান্য একটি শব্দ 'ভি-টু', সামান্য একটি আওয়াজ 'কণিষ্ক', কিংবা ফরাসের উপর সামান্য দুইটি রেখার আবছায়া ! সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ঝটিকাবর্ত একেবারে শান্ত, দুর্দান্ত সিংহ ল্যাজ গুটাইয়া যেন পায়ের তলায় নিস্তব্ধ ! এই মহাবিদ্যাকে অবহেলা করিয়া লাভ নাই। আমি ইহার সংস্পর্শে যত আসিতেছি, তত মুগ্ধ হইতেছি। পূর্বে এক কলম লিখিতে লিখিবার বস্তু খুঁজিয়া পাইতাম না, কোনও বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতাম, সভায় মুখ খুলিতে ভয় হইত। ইদানীং এই জড়তা অনেকটা কাটিয়াছে। ধীরে-ধীরে আত্মপ্রত্যয়

জন্মিতেছে, এবং আশা করিতেছি, শীঘ্রই দেশের পরম শ্রদ্ধেয়দের মধ্যে আসন গ্রহণ করিতে পারিব।

আরেকটি কথা আমার মনে ক্রমশই বদ্ধমূল হইতেছে। শিশুদের বর্ণ পরিচয়ের পর কথামালা-ই যথেষ্ট। বোধোদয়ের প্রয়োজন নাই।

মধুমালার দেশ

সুবোধ ঘোষ

"স্বপ্নে দেখেছি আমি মধুমালার দেশ।"

এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ছন্দোবদ্ধ গীতগ্রন্থ সম্মুখে রয়েছে সারি-সারি। পাতা উল্টিয়ে পড়ি, আবৃত্তি করি। বিচিত্র কল্পনা, ভাব, ভাষা ও ছন্দের বৈভবে মন আত্মহারা হয়। বাস্তবতার শাসন দীর্ণ করে মন যেন অরূপলোকে উত্তীর্ণ হয়। কল্প-কল্পান্তরের আবেগ শরীরী হয়ে সম্মুখে আসে! যা অনির্বচনীয়, যা অধ্যেয়, তাই যেন প্রত্যক্ষের আনাচে-কানাচে মুখর হয়ে ওঠে, বর্ণভূষা সৃষ্টি করে। যে-কবিতাই পড়া যাক না কেন, যদি সেটা সত্যি-সত্যিই কবিতা হয়, তবে তার মধ্যে এমন কোনও গুণ থাকবে যার আবেদন শুধু যুক্তি ও বুদ্ধির উপর পড়ে না। সঙ্গে-সঙ্গে কল্পনার সাযুজ্য তাকে লাভ করতেই হবে, যার প্রসাদে একটা রূপের আশ্রয় পাওয়া যায়। বস্তু ও ভাব পরিবেশন করেই শুধু কাব্য ও শিল্পের কর্তব্য শেষ হয় না। সমস্ত ছাড়িয়ে পৌঁছতে হবে রূপে। ভাব ভাষা ছন্দ ও বিষয়, সব কিছুই লুব্ধ চঞ্চল ভ্রমরের মত এই বাঞ্ছিত রূপের মুদ্রিত পদ্মটির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিল্প, কাব্য-সাহিত্য, কথা-সাহিত্য—সবার লক্ষ্য এই রূপ। রসিক পাঠককে যে-শিল্প ও সাহিত্য এই রূপলোকে হাত ধরে নিয়ে যেতে সক্ষম নয়, সে-সাহিত্য সাহিত্যই নয়, সে-কাব্য কাব্য নয়, সে-কথা কথা নয়।

তাই নতুন যুগের কাব্যসাহিত্য পড়তে-পড়তে মাঝে-মাঝে ক্লান্ত মস্তিষ্কে স্বপ্নে দেখি মধুমালার দেশ। জ্যোৎস্নারাতের বনান্ত দেশের মতো সেই আমাদের রূপকথার জগৎ, যে-জগতের রূপ ছেলেবেলা থেকে প্রত্যেক শিশু শ্রুতিধরের মতো শুনে-শুনে নিজের কল্পনার সিন্দুক পূর্ণ করেছে, বড় হয়ে সঁপে দিয়েছে শিশু উত্তরপুরুষের কাছে। বিনা অক্ষরে, বিনা পুঁজিতে এই রূপকথা কত পুরুষ ধরে আমাদের মানসলোকে প্রবাহিত হয়ে আসছে জানি না। রূপকথার এই প্রাণশক্তির, এর অফুরান ঐশ্বর্যের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। মানুষ সভ্য হচ্ছে, জ্ঞানী হচ্ছে, অনুশীলন ও বিশ্লেষণে নিপুণ হচ্ছে, ঐতিহ্য ও সংস্কারকে ঝাড়া দিয়ে পুরাতন নির্মোকের মতো ফেলে দিচ্ছে। আজকের সাহিত্য কাল অচল হয়ে যায়। কত পুরাণ, মহাকাব্য ও গীতিকা সাগরলহরী সমান জনমি পুন মিলিয়ে যাচ্ছে। কত শাস্ত্র, নীতিকথা, দোঁহা, স্তোত্র ও মন্ত্র সাধক ও কবির মুখে রচিত হল, দেশ বা জাতির সমাজ ও সম্প্রদায়-বিশেষে তার স্থান হল। কিন্তু কত দিন? কটা যুগ শেষ না হতেই তা মিলিয়ে গেল জলের তিলকের মতো। কত ছান্দসিক ও বৈয়াকরণিক কত কাব্যকে অলঙ্কৃত করেছে, সুসংস্কৃত করেছে, কিন্তু মহাকালের পরীক্ষায় তা লোকময় হয়ে টিকে থাকতে পারেনি। যদি কেউ বলেন, কবি কালিদাস অমর, সে-কথা সত্য বলে স্বীকার করতে পাব না। কালিদাসকে ক'বছরের মধ্যেই মেরে ফেলা যায়, যদি অক্ষর ও লিপি অর্থাৎ লিখনকলাকে নিঃশেষ করে ফেলা হয়। কালিদাসের অমরতার মন্দিব দাঁড়িয়ে আছে কাগজে-কলমে লেখা কাব্যগ্রন্থের ভূমির ওপর। সে-ভিত্তি যদি ভাঙে, তবে কালিদাসেব কাব্যের অমরতাও ভাঙবে। অন্যপক্ষে দেখি, আমাদের রূপকথা সাহিত্যের এই অস্থূল প্রাণাশ্রয়ী ও লোকোত্তর শক্তি। সে-কথার রূপ প্রখর জ্যোতিষ্কের মতো কালের আকাশে বিনা নির্ভরে ভেসে আসছে যুগ-যুগ ধরে।

প্রথম নিঃশ্বাসের মতো প্রত্যেক শিশু এই রূপকথার প্রসাদ গ্রহণ করে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে। সমস্ত জীবনে তাকে সে আর ঠেলতে পারে না। তাই মধুমালার দেশ স্বপ্নে আজও দেখা দেবে, তাতে আশ্চর্যের কী আছে?

কারা ছিল সেই কথাকার? কথাকে এত রূপ দিয়েছিল কোন্ কবি? কে তাদের নাম জানে? কোথায় তারা কুড়িয়ে পেয়েছিল এই স্বপ্নচ্ছবি? এই অপূর্ব অদ্ভুত পুরাতন মেঘদূতের মহিমা

আজও অম্লান।

সাত ভাই চম্পা জাগো রে! পারুল দিদির ডাকে সাড়া দাও। রাজার মালী ফুল তুলতে এসেছে। দিও না দিও না ফুল। রাজা এসেছে, চলে যাক। সুয়োরানী এসেছে। চলে যাক। এবার এলো দুয়োরানী দুঃখিনী ; সাত ভাই আর বোনের মা। সাতটি চাঁপা ও পারুল ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের বুকে।

রূপকথার এ-আলেখ্য যে রচেছিল, সেই অজ্ঞাত শিল্পীর প্রতিভাকে আজ প্রণতি জানাই। জানি অতি দূর বিস্মৃত দিবসের এই কবিগুরু আজ কোনও স্মৃতিপটে নেই, কোন নির্মাল্যময় অর্ঘ্য সেখানে পড়ে না। তবে জানি, কবিতা কল্পনা ও কথার সাহিত্যে এত বড়ো সৃষ্টির তুলনা খুবই বিরল।

মধুমালার দেশে যে-কল্পনার ফসল একদিন ফলেছিল তারই প্রসাদ আজও আমরা অকাতরে গ্রহণ করে কথাকে রূপদান করি। 'সোনার কাঠি' ও 'রুপোর কাঠি'র রূপ যাদের কবিত্বের ইন্দ্রজালে সত্য হয়ে উঠেছিল, তাঁরা কি 'গেঁয়ো' কবি ছিলেন? সে-সোনার কাঠি শত যুগের শত রুচি-বিপ্লব উত্তীর্ণ হয়ে আজও ক্লাসিক গরিমায় প্রতিষ্ঠ রয়েছে।

পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা পক্ষিরাজ আর সাপের মণি—এ রূপকথাব জগৎ কাদের সৃষ্টি? মনে হয়, কোনও প্রলয়ে সে-জগৎ বুঝি নষ্ট হবে না কোনও দিন। উপনিষদের জীবাত্মা আর পরমাত্মারূপী দুই পাখির কথা পণ্ডিতেরাই বোঝে, সহস্র বৎসর পরে পণ্ডিতেরা হয় তো তাও ভুলে যাবে, কিন্তু রূপকথার দেশে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী গাছের ডালে বসে যে-আলাপ করে গেল, তার গুঞ্জরণ অনাহত ছন্দে এখনও বেজে চলেছে—রূপগ্রাহী মানুষের স্মরণের মধ্যে।

তাই মনে হয়, শিল্প ও সাহিত্যে আমরা একান্তমনে খুঁজছি শুধু এই একটি জিনিস—রূপ। সাহিত্যকে বিপোর্ট না হয়ে রূপকথা হতে হবে। আমরা দেখতে চাই আমাদের যুগের বেদনা, আনন্দ ও সংগ্রাম শুধু ভাষা ও ছন্দের জোরে মুখর হবে না, শুধু ভাবের ভারে ঋজু হবে না। তাকে রূপময় হতে হবে।

"কালপুরুষের সাতপাঁচ"। খ্রিস্টাব্দ ১৯৪১।

পত্রসাহিত্য

যাযাবর

পারস্যদেশীয় উপকথায় একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে। গল্পের নায়ক—বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন ও বিত্তহীন এক রাখাল বালক সমুদ্রের বেলাভূমিতে ক্রীড়াচ্ছলে শুক্তি আহরণ করত প্রতিদিন। জানত না, তার মধ্যে ছিল লক্ষ হীরা-মানিক। সে-মানিক যার ঘরে আসে তাকে রাজা করে ; যার ঘর ছাড়ে, সে হয় ফকির। অপুত্রক অধিপতির মৃত্যুর পরে রাজ্যের বৃদ্ধ উজির বের হলেন ভাবী সুলতানের সন্ধানে। বহুদিন-ব্যাপী ব্যর্থ অন্বেষণের পর হতাশ হয়ে একদিন শপথ করলেন, পরদিন জুম্মার নামাজের শেষে যার সঙ্গে প্রথম দেখা হবে, তাকেই রাজপদে মনোনীত করবেন। নামাজের পরে মসজিদের বাইরে এসে উজির দেখতে পেলেন দ্বারের পাশে মিনারের ছায়ায় এক রাখাল বালক নিদ্রামগ্ন। ক্ষুধায় ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। ঘোড়ায় চড়িয়ে উজির নিয়ে এলেন তাকে রাজধানীতে। রাখাল বালককে বসিয়ে দিলেন বাদশাহের তক্তে। শাহজাদীর সঙ্গে ঘটল তার পরিণয়।

নিজের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ সামান্যতা লাভের এমন বিস্ময়কর ঘটনা শুধুমাত্র রূপকথার ভাণ্ডারেই নিবদ্ধ নয়, সত্যিকার মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ইতিহাসেও এমন একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। প্রীতিপ্রদ বলেই সে-অভিজ্ঞতা দীর্ঘকাল আমাদের স্মরণে থাকে না। সে আমাদের আপন সৌভাগ্যের অনুকূল, তাই তাকে আমরা আপন যোগ্যতার অবধারিত পুরস্কাররূপেই গণ্য করি ; প্রসন্ন ভাগ্যদেবতার অকারণ পক্ষপাত বলে স্বীকার করিনে।

আমি লেখক নই। গ্রন্থ রচনার কোনও উচ্চাভিলাষ কোনওকালে আমার কল্পনায় ছিল না, অথচ সম্প্রতি গ্রন্থকাররূপে আমার পরিচিত ঘটেছে। এটা একান্তই আকস্মিক। পাঠকজনের যে-প্রসন্ন প্রশ্রয় লেখকজীবনের চরম পুরস্কাররূপে চিরকাল স্বীকৃত, সেই অভাবনীয় অনুগ্রহের দ্বারা যদি ধন্য হয়ে থাকি, তবে তাও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

কর্মের প্রয়োজনে আমি দিল্লী এসেছিলাম। সে অনেকদিন আগেকার কথা। বয়স তখন অল্প, কৌতূহল প্রচুর এবং মনের স্বাভাবিক রসগ্রাহিতা পরিণত বুদ্ধি ও পরিপক্ব অভিজ্ঞতার অন্তরালে তখনও পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ার অবকাশ পায়নি। জীবনের যে-অধ্যায়ে হৃদয় সহজে উদ্বেগ, কল্পনা উদ্দীপ্ত ও রসনা মুখর হয়, যৌবনের সেই প্রারম্ভকালে আর্যাবর্তের এই মহানগরীতে আমার প্রথম পদার্পণ। আমার পক্ষে সেটা অবশ্যই অবিস্মরণীয় ঘটনা।

সর্বদেশেই কাব্য-উপকথার মধ্য দিয়ে কয়েকটি স্থান অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে ·লির খ্যাতি তাদের আপন মাহাত্ম্যে নয়, সাহিত্যিকের রচনানৈপুণ্যে। হারুন্-অল্ রসিদের রাজধানী বোগদাদের সঙ্গে সত্যিকার ভূগোলের সম্পর্ক সামান্য। তার যথার্থ পরিচয় আছে একমাত্র শেহরজাদী-কথিত একাধিক সহস্র রজনীর কাহিনীতে। যে-উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-অলিন্দে একদা মৃগলোচনা জনপদবধূরা প্রবাসী প্রিয়জনের প্রতীক্ষারতা ছিলেন, তার আসল ঠিকানা সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ম্যাপে মিলে না। শুধু স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

কাব্যলোকের মহিমামণ্ডিত এই নগরমালার মধ্যে দিল্লীর স্থান নেই। রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত অভিশপ্ত যক্ষের বিরহ-বেদনা বহন করে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে যে-পূর্বমেঘ যক্ষপ্রিয়ার কাছে উপনীত হয়েছিল, তার-পরিক্রমণ-পথে দিল্লীর আকাশ ছিল কি না, সে-কথা কালিদাস বলেননি। ইঙ্গ-বঙ্গ-অধ্যুষিত অতি-আধুনিক দার্জিলিংকেও রবীন্দ্রনাথ কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলোক থেকে গল্পের স্বপ্নলোকে উন্নীত করেছেন। কিন্তু দিল্লী-পথের ধূলি ছাড়া মহানগরীর আর কিছুই তাঁর রচনায় স্থান পায়নি, যদিও বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীকে জনশূন্য ক্যালকাটা রোড অপেক্ষা আজমিরী গেটের পাশে খুব বেমানান দেখাত বলে মনে হয় না।

তবুও দিল্লীর গৌরব তার নিজস্ব। সে তো একটি মাত্র নগরী নয়, বহু নগরীর ধ্বংস ও বিকাশ। একটি রাজার রাজধানী নয়, বহু রাজত্বের শ্মশান ও সূতিকা। বিচিত্র সভ্যতা, বিভিন্ন ধর্ম, বহুবিধ জাতির সংঘাত, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এইখানে। যুগ-যুগান্ত ধরে যে-তিনটি স্থান ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ধারণ, খ্যাতি বহন ও পরিচিতি প্রসারণ করেছে তার মধ্যে বারাণসীর পরিচিতি প্রজ্ঞায়, বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধি ভক্তিতে, দিল্লীর গুরুত্ব ইতিহাসে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও দিল্লীর ইতিবৃত্ত অনেকাংশে সমার্থক।

ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের প্রভেদ অনেক। কাব্যের আবেদন মানুষের মনে। তার নায়ক-নায়িকার বিচরণস্থল আমরা কল্পনায় অনুভব করি। চোখ বুজে তাকে ভাবা যায়। ইতিহাসের সাক্ষ্য থাকে মাটিতে। তার ঘটনাস্থল প্রত্যক্ষ। চোখ মেলে তাকে দেখা যায়। দিল্লীর প্রাচীর ও প্রান্তরে, দুর্গপ্রাকার ও প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে, সমাধিক্ষেত্র ও সৌধমালায় অসংখ্য দর্শনীয় আছে।

কিন্তু দর্শনের যে-রস, সে শুধু নয়ননিবদ্ধ নয়, মননসাপেক্ষ। চক্ষুদ্বারা দেখি—এ-কথা বাল্যকালে বিদ্যারম্ভের প্রথম পর্বে পাঠ্যপুস্তকে আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু চোখ চাইলেই যে দেখা যায় না, এ-তথ্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমরা ক্রমশ জেনেছি। যে-দৃষ্টির সঙ্গে মনের যোগ নেই, সে তো দেখা নয়,—তাকানো।

দেখার সঙ্গে আনন্দের যোগসাধন করতে সঙ্গীর প্রয়োজন। ভোগের বেলায় সংখ্যাধিক্যের ফলে বস্তুর হ্রাস ঘটে। একের পাতে যা পরিপূর্ণ এক, দুইয়ের পাতে তা বিভক্ত অর্ধেক। উপভোগের বেলায় বহু দ্বারা রসের ঘটে বৃদ্ধি। এইজন্যেই স্টেথোস্কোপ হাতে রোগী দেখতে যাই একা, উড়নী গায়ে বিয়ের কনে দেখতে যাই সবান্ধবে।

দিল্লীতে আমি দেখেছি অনেক, শুনেছি প্রচুর এবং জেনেছিও নেহাত কম নয়। কিন্তু সমস্তই একক। যাঁর সঙ্গে দেখলে দেখার বস্তু দর্শনীয় হয়ে উঠে, তিনি ছিলেন অন্যত্র। তাঁকে নিয়ে দিল্লী পরিভ্রমণ সেদিন সম্ভব ছিল না। তবুও আমার চোখ দিয়েই তাঁকে দেখাব, আমার মনে এই অভিলাষ ছিল। সে-কাজটা সহজ নয়।

পুরাকালে হংসদূতের দ্বারা দূর-দূরান্তরে বার্তা প্রেরণের রীতি ছিল। কিন্তু এ-যুগের নলরাজেরা জানেন, বার্তাবাহী রাজহংস দময়ন্তীর উদ্যানে পৌঁছতে পারবে না, মধ্যপথেই কোনো সুনিপুণ পাচকের হস্তে সুপক্ক ব্যঞ্জনে ভোজনরসিকগণের রসনাতৃপ্তির সহায়ক হবে। বর্তমানের মরালগামিণীরা মরালকে বাতিল করেছেন। তাঁরা এখন উর্দিপরা সরকারি ডাকহরকরার উপর নির্ভর করেন। সুতরাং আমার দেখাকে আমি রূপান্তরিত করলেম পত্রে। তার সংখ্যা অনেক এবং স্ফীতি ভীতিজনক।

চিঠি জিনিসটা স্বভাবতই দ্বিচনের ব্যাপার। তাকে বহুবচনের ব্যবহারে আনলে ব্যাকরণদুষ্টি ঘটে। চিঠি চাঁদনী রাতে দুটি মাত্র প্রাণীর গঙ্গাবিহরণের ছোট্ট পানসিটি। কুসুমগঞ্জের হাটের পথে বহুজনের নদী পারাপারের জন্যে পাঁচ মাল্লার খেয়া নৌকা নয়।

দিল্লীর রৌদ্রদগ্ধ আকাশের নীচে আমার বিস্তীর্ণ অবকাশক্ষেত্রে যে-প্রচুর পত্রশস্য জন্মলাভ করেছিল, সেগুলি একটি মাত্র গৃহিণীর ভাণ্ডারে মরাই ভরে রইবে, এই ছিল কামনা। কোনওদিন কোনও কারণে সরকারি সিভিল সাপ্লাইয়ের গুদামে সেগুলি সর্বসাধারণের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করবে, এমন আশঙ্কা ছিল না। পত্রগুলি যাঁকে লেখা, তাঁর কোমল করযুগলের মধ্যে কৈবল্য লাভ করলেই তাদের মোক্ষ। তারা যে ভবিষ্যতে কম্পোজিটারের স্থূল হস্তাবলেপনের দ্বারা সর্বাঙ্গে ছাপাখানার মসীলিপ্ত হয়ে সাহিত্যের বিচারশালায় লেখকের দুষ্কৃতির অকাট্য সাক্ষ্যরূপে দেখা দেবে, তা কল্পনাও করিনি।

মুদ্রণের দ্বারা পত্রের জাতিভ্রংশ ঘটে। যেমন সিনেমাকরণের দ্বারা উপন্যাসের। পত্রের রস লজ্জানম্র নববধূর অনুচ্চকণ্ঠে গীত ও সঙ্গীতের মতো, নির্জন শয়নকক্ষে একমাত্র দয়িতের কাছেই তার প্রকাশ। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে জনাকীর্ণ জলসার আসরে তাকে টেনে আনলে তারও দুর্গতি, অন্যের দুর্ভোগ। কারণ, বঁধুর কানে যা কলস্বর, বহুর কানে তা কলরব।

অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত পত্রের অভাব নেই, যদিও সিনেমায় বেশীর ভাগ

যুদ্ধ-চিত্রই যেমন প্রচ্ছন্ন প্রোপাগাণ্ডা, সাহিত্যের অধিকাংশ পত্রসংকলনও তেমনি ছদ্মবেশী প্রবন্ধ-সংগ্রহ। পত্র-সাহিত্য নামেও সাহিত্যের একটা বিভাগ আছে। সাধারণত দুটি কারণে তার উদ্ভব। প্রথমটা তথ্যমূলক, দ্বিতীয়টা সাহিত্যিক।

কবি বা সাহিত্যিকদের লেখা পত্রে লেখকের দুটি বিভিন্নরূপ প্রকাশ পায়। কাব্যজীবনের বহির্দেশে প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর নিছক মানুষরূপে যে একটা সত্তা বর্তমান, একশ্রেণীর পত্রে তারই পরিচয় থাকে। সেখানে পত্রলেখক পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী বা বন্ধু প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা পরিচিত, সাহিত্য প্রতিভা দ্বারা নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রগুলি পত্র-রচয়িতার আত্মপ্রকাশের অন্যতম উপকরণ। পত্ররচনা সেখানে একটা নীতি, ইংরেজীতে যাকে বলে ফর্ম। সেখানে যাকে লেখা হয় সে গৌণ, যা লেখা হয় সেটাই মুখ্য। এই ফর্ম অবলম্বন করে সার্থক কথাসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—রোমানফের গল্প। তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে, যথা—লেটারস টু দি শেরিফ অব ব্রিস্টল। নবশিক্ষার্থিনীর জন্যে সংক্ষেপে পৃথিবীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে ; প্রমাণ—লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু এ ডটার। উপভোগ্য কবিতা রচিত হয়েছে, উদাহরণ—শিলং-এর চিঠি।

প্রথম শ্রেণীর পত্র প্রকাশকালে প্রকাশকের একটি চোখ থাকে জীবনীকারের দিকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পশ্চাতে থাকে সৃষ্টির প্রেরণা। 'ভাই ছুটি' বলে যার আরম্ভ আর ছিন্নপত্র—এ-দুয়ের রস যে আলাদা জাতের এবং গুরুত্ব যে পৃথক কারণে, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

মুদ্রিত পত্রের আরও একটি শ্রেণী আছে। সেখানে লেখকের উদ্দেশ্যটা এতই সুস্পষ্ট যে, তাকে কেউ পত্র বলেই জ্ঞান করে না। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় 'খোলাচিঠি'র গোলাবর্ষণকে পাঠকেরা কূটনৈতিক কুস্তির প্যাঁচরূপেই গণ্য করে, চিঠি বলে ভুল করে না।

"জনান্তিক"। বঙ্গাব্দ ১৩৫৯।

ইন্‌সম্‌নিয়া

জ্যোতির্ময় রায়

সভ্য-মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁকই হল প্রকৃতির 'বিরুদ্ধ-চালে' চলা। প্রাকৃতিক নিয়মে যা শুদ্ধ, দিনের পর দিন মানুষের নিয়মে সেটাই গণ্য হচ্ছে ভুল বলে। তাই যে-মানুষ যত বেশি স্বাভাবিক নিয়মে চালিত, সভ্য-মানুষের সঙ্গে তার তত বেশি গরমিল। শিশুরা বড় বড় জুতোতে পা ঢুকিয়ে থপ থপ করে হেঁটে বেড়াতে ভালোবাসে, একটু লক্ষ করলেই দেখবেন অবধারিত উল্টো চড়িয়ে বসে আছে, আমাদের ভুলের মতো দু'-একবার হয়তো-বা শুদ্ধ হয়ে যায়। নিরক্ষর লোক মাত্রই বই ধরবে উল্টো করে, আমাদের মতো পণ্ডিতদের চোখে পড়লেই দেব সেটা ঘুরিয়ে। প্রাকৃতিক নিয়মকে যতটা পারা যায় ঘুরিয়ে দেওয়াই হল আমাদের কাজ। আমাদের চলা, বসা আহার, নিদ্রা কোনওটাই এ-চেষ্টায় হাত এড়িয়ে যেতে পারেনি। আমরা খাই বা ঘুমাই ক্ষিদে বা ঘুম পায় বলে নয়, খাবার বা ঘুমোবার সময় হয়েছে বলে। প্রাকৃতিক নিয়মে খাওয়া-শোয়া পশুর জন্যে, মানুষ তার নিজের নিয়ম নিজে তৈরি করেছে। এ-ভাবে নিজের সুখ-সুবিধা ও নিজের নিয়ম তৈরির ভার নিজের হাতে গ্রহণ করায় মানুষের ব্যস্ততা কেবলই চলেছে বেড়ে এবং এ-ব্যস্ততাকে নিয়মিত করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করেছে সময়-পরিমাপক যন্ত্র—এ-যন্ত্রের অঙ্গুলি-হেলনেই আজ তাকে চলতে হয়। শুধু চলতে হয় না, ক্রমে জগৎটাকে সে বানিয়ে তুলেছে একটা ঘড়ির ডায়াল, কাঁটার কদমে তাঁর ওপর ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার সময়ের মূল্য জানতে হলে যাবেন শেয়ার মার্কেটের সামনে, দেখতে পাবেন, গাড়ির গা থেকে দরজা খুলে নাবিয়ে রাখা হয়েছে, কারণ দরজা খুলতে সময় নষ্ট হয়—গাড়ির গতি যে-সময় দিয়েছে তাতেও আজ কুলোচ্ছে না। কাজের যেখানে হুড়োহুড়ি সময়ের সেখানে কাড়াকাড়ি—অবশ্য এমন লোকও আছে যারা কাজের চাপ ছাড়াই সময়ের চাপে অস্থির। তাদের ব্যাপারটা তত্ত্বসভায় মূর্খের উৎকট একাগ্রতার মতো। মানুষের এই হাস্যকর যান্ত্রিকতায় য়ুরোপীয়দের মতো পাঙ্‌চুয়াল-জাতের ভিতর থেকেও কৌতুক করে বলা হয়েছে : 'পাঙ্‌চুয়ালিটি' হল ঘড়িবিক্রেতাদের প্রোপাগাণ্ডা, তা ছাড়া এর গভীর কোনও সার্থকতা নেই।

যার যখন খাবার সময় তার ঘণ্টা-দু'ঘণ্টা আগে কোনও সুখাদ্য সামনে দিয়ে দেখবেন, বলবে, 'না, এখন খাব না, খেলে দুপুরের (বা রাত্রির) খাওয়াটা নষ্ট হয়ে যাবে। এ-কথার কোনও অর্থ আমি খুঁজে পাইনে। কেন, যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা খাওয়া কি খাওয়া নয়! যদি মনে করো ওতে পুরো পেট ভরবে না, বেশ তো, আদ্ধেকটা এই সুখাদ্য দিয়ে ভরিয়ে নাও, বাকি আদ্ধেকটা থাক নিয়মিত আহার্যের জন্যে। আসল কথা, তৃপ্তির চেয়ে নিয়মগত অভ্যাসটাই এঁদের কাছে বড়ো, না হয় ক্বচিৎ নিয়মভঙ্গে দেহ-ভঙ্গ হবে না সেটা ওঁরা জানেন। ঘুমের বেলায়ও ঠিক তেমনি। ঘুম না-আসাটা অসুস্থতার লক্ষণ বলেই অস্থির হয়ে ওঠে না, অস্থির হয় দশটা কি এগারোটায় ঘুম আসবার কথা, আসছে না কেন! ঘুমের সময়ে ঘুম আসছে না, হয়তো আসবে তখন যখন জেগে থাকবার কথা—মিছেমিছি হবে সময় নষ্ট, দুর্ভাবনা গাঢ়তর হয়। সময়ের তাঁবেদারি করে মনের স্বভাবও হয়েছে কলের মতো, নিয়মের একটা স্ক্রু ঢিলে হলে সমগ্র কাঠামোটাই যেতে চায় বিগড়ে। অনভ্যস্ত অবসরকে আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে তোলার বদলে কলটাকে চালু করার চেষ্টায় সেই ঢিলে স্ক্রু নিয়েই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘুমের স্বভাবও আবার তেমনি অতি-বেশি লাজুক, যত তার জন্য ডাকহাঁক আর আয়োজন করা যায়, তত যায় সঙ্কুচিত হয়ে—আর ঘুম-বিরহীর স্থৈর্যের বাঁধও ক্রমশই আসতে থাকে ভেঙে। এগারোটা— বারোটা— একটা... দুটো... আর সহ্য হয় না, অবশেষে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মাথায় জল, ওষুধ-বিষুধ-ছটফটানির অন্ত থাকে না। বাড়ির লোকের উপর হুকুম চালাতে পারেন এমন

একজনকে দেখেছি বাড়িশুদ্ধ লোককে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বসিয়ে রেখেছেন,—তাঁর ঘুম যখন আসছে না, আর সবাই কেন আরাম করে ঘুমোবে !

আমার কিন্তু মনে হয়, ইন্‌সম্‌নিয়া হচ্ছে সানন্দে গ্রহণ করবার মতো একটা অবস্থা (অবশ্য শরীরে যতটা সয়)। অসুস্থতা মাত্রই ভালো নয়, এ-কথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু এমন ধরনের অসুখও আছে, যার ক্রুদ্ধ-আক্রমণ ছাড়া সাধারণ-আক্রমণকে বিলাস হিসেবে গ্রহণ করা যায়। মনে করুন, সুন্দরী একটি মেয়ের সর্দি হয়েছে (সর্দি একক, মাথাধরার হাত ধরা নয়), দর্শক এবং রোগিণী উভয়ের পক্ষেই বেশ একটা বিলাস নয় কি ? স্ফীত রক্তাভ মুখখানি ঘিরে উস্কো-খুস্কো এলো চুল ; নাকের ডগাটি হয়েছে টুকটুকে লাল, গলার স্বর ভারী ও মিঠে। তা ছাড়া সর্দি হলেই চেহারায় আসে একটা আহ্লাদে ভাব, সুমুখে সেটি হয় আরও মনোরম। কিংবা শুধু হালকা একটু জ্বরে, যাতে গরম লুচি আলুর-দম সহযোগে পথ্য করে পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা যায়। এ-ধরনের অসুখ যদি এমন একটি লোকের আওতায় হয় যার সঙ্গে মনের সম্পর্কটা মোটে গড়ে উঠেছে এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার কাজটা তারই হাতে ছেড়ে দিতে কোনও বাধা নেই—তবে এ-অসুস্থতাকে ভাগ্য বলে মেনে নেবে না, এমন নীরব ব্যক্তির অস্তিত্বের কথা না-ই বা ভাবলাম। ইন্‌সম্‌নিয়া কিন্তু এ-জাতীয় বিলাসের চেয়েও গভীর ও ব্যাপ্তভাবে উপভোগ্য বস্তু। জীবিত মানুষের কাছে জেগে থাকার মতো আনন্দ ও কাম্য আর কী থাকতে পারে !

কাজ, খেলা, সঙ্গী বা আমোদ ছাড়া হলেই ঘুম ছাড়া যাদের গত্যন্তর থাকে না, অতন্দ্র অবস্থা তাদের কাছেই অসহনীয়। ক্লান্তি থেকে ঘুম আসে—এই হল সাধারণের ধারণা, কিন্তু আমাদের ঘুমের কারণ ক্লান্তি নয়—সে ছিল প্রাকৃতিক নিয়ম। সভ্যজগতের নিয়মে ক্লান্ত হতে হয় যার যত কম, ঘুমোতে হয় তার তত বেশি। দেখা যায়, শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্যে দরকার হয় সাধ্য-সাধনার, আর বড়রা সাধ্য-সাধনা করেন ঘুমের। এর কারণ দৈহিক নয়, মানসিক। দৈনন্দিন জীবনের ঘড়ি-ধরা বা নিষ্কর্ম একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে নিদ্রা হল সবচেয়ে সহজ উপায়। আমাদের মনটা হয়েছে আফিম-খাওয়া সার্কাসের বাঘের মতো, বাইরে থেকে ক্রমাগত লোহার-শিকের খোঁচা দিয়ে তাকে খাড়া রাখতে হয়, ডাক ছাড়াতে হয়—খোঁচা বন্ধ হল কি পড়ল ঝিমিয়ে। নিজের আনন্দে খাড়া থাকবার ক্ষমতা তার নেই। তাই স্থূল রকমের লিপ্ততা বা ঘুমের বাইরে পড়লেই মাথার কলকব্জা যায় বিগড়ে। প্রথমত, ঘুমের সময় পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঘুম আসছে না ; দ্বিতীয়ত, ঘুম না এলে কী করে এই দীর্ঘ সময় কাটবে ! যখন পারিপার্শ্বিক সব-কিছু নিশ্চল, তখন এক-একটা লোক নিজেকে চালু রাখবে কী করে ! এ-দুর্ভাবনায় বিনিদ্র ব্যক্তি চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং ক্রমবর্ধমান চেষ্টা ও ব্যর্থতায় সে-চঞ্চলতা পরিণত হয় ক্ষিপ্ততায়। সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ব্যর্থতার আতিশয্যের কাছে তার বিষয়বস্তু যায় হারিয়ে। যে-কথাটা সোলার মতো মনের চেতনায় ভেসে বেড়াচ্ছে—হাত বাড়ানো মাত্র না পেয়েই, যখন আমরা ডুবসাঁতার দিতে শুরু করি মনের গভীর স্তরের আনাচে-কানাচে তখন ব্যর্থতা হয় সুনিশ্চিত ! এ-কথা সে-কথার টানে বা ভাসতে-ভাসতে অনাহুত এক সময় আপন থেকেই এসে হাতের কাছে ধরা দেয়। এমনিধারা জলকে শক্ত-মুঠোয় ধরতে যাওয়ার মতো ঘুমকে জাপটে ধরার অতি-প্রয়াসে ঘুম যায় পালিয়ে। একদিন হয়তো শারীরিক বা মানসিক কারণে ঘুম এল না, বস্—মাথায় দুর্ভাবনা জুটল, ঘুমের সময় ঘুম তার আসছে না। পরের সারাটা দিন কাটবে সে-চিন্তায়, রাত দশটা না বাজতেই শুরু হবে উৎকট প্রয়াসের পালা। নিদ্রাদেবী আশেপাশেই হয়তো ছিলেন, সেই চেষ্টায় ধাক্কায় কিছুকাল তিনি আর কাছ ঘেঁষতেই পারেন না।

চেষ্টা আর উত্তেজনায় মস্তিষ্ককে উত্তপ্ত না করলে এবং মনের জড়তাটা একটু ছুটিয়ে নিতে পারলেই জানা যায়, ইন্‌সম্‌নিয়া কত বড় উপভোগ্য অবস্থা। মানুষের ঘুমের সময়টাই কাটে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতায়। কারণ চেতনাটাই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমরা যে শুধু 'আছি' এবং দেহ দিয়ে সে-থাকাকে ভোগ করছি তা নয়, আমরা প্রতি মুহূর্তকে জানছি, বুঝছি। রূপকথার রাজকন্যার মতো শিথেনে সোনার-কাঠি রেখে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে জীবনের মূল্য দাঁড়ায় শুধু বেঁচে থাকা। ঘুমের টুকরো-টাকরা আমরা ব্যবহার করব নেহাত শারীরিক প্রয়োজনে। তা ছাড়া শুধু জাগব আর জানব—সজ্ঞানে অনুভব করব সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ।

নেহাত শারীরিক ক্লেশ ভুলবার চেষ্টা ভিন্ন ঘুম মানুষের কাম্য হওয়া উচিত নয়। যতক্ষণ আছি, জনতায় ততক্ষণ মেতে থাকব মন নিয়ে আর জনতা নিয়ে। যখন আমি একা, তখন আছি আমি আর আমার মন। মনের জগৎটা বিশ্বের চেয়ে ছোট হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। সেখানে বসে সে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, জটিলতার জট, সমস্যার সমাধান—কতো কী-ই না গড়তে আর ভাঙতে পারে। সবচেয়ে আনন্দের হচ্ছে নিশ্চুপ হয়ে সে কী করছে তা-ও সে জানছে।

অনেকে বলেন, পৃথিবীর এই দুঃখজ্বালার চেয়ে স্বপ্নে কিছুটা ভালো সময় কাটিয়ে আসা ঢের ভালো—অতএব ঘুম ভালো। স্বপ্নটা যে ভালোই হবে তার কি নিশ্চয়তা আছে? সুখস্বপ্নের গ্যারান্টি পেলে কথাটা আংশিক আমলে আনা যায়। কিন্তু দুঃখস্বপ্নের মিছে দুঃখ পাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। 'ঢাকের বাদ্যি থামলে মিষ্টি'-র মতো জেগে তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে হয়! সুখস্বপ্নের সুখটুকু আবার জাগলে হয়ে যায় মিথ্যে। মিথ্যের এই টানা-হেঁচড়ার চেয়ে সত্যের ঝকমারিও ভালো।

"দৃষ্টিকোণ"। ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

পোষা পাখি নয়—পোষা পাথর

সুভো ঠাকুর

ও বলে : এটা হচ্ছে ওর পোষা পাখি নয়—এটা হচ্ছে একটা পোষা পাথব !

ওর বন্ধুদের তো চক্ষু ছানাবড়া। লোকটার মাথাটা নেহাতই বিগড়ে গেলো নাকি—বলে কি ?

পোষা পাথর—পাথর আবার পোষা হয় না কি ?

সে কি জ্যান্ত, যে পোষ' হবে !

মানুষের জীবজন্তু পোষার শখ বোধহয় সেই মনুষ্য সভ্যতার শুরু থেকেই। তা সে ময়না থেকে ময়ূর, কাঠবিড়াল থেকে বনবিড়াল, হরিণ থেকে হায়না—যাই পুষুক না কেন।

খয়রাতের খাতায় মোটা অঙ্ক না হলেও, অবশ্যই তাদের তদ্বির তদারকে আর খোরপোষ বাবদ বেশ খানিকটা খরচ হতে বাধ্য।

বড়লোকের বাড়ি হলে তো আর কথাই নেই। কতরকম তাদের খাঁচা তৈরির খেসারত, কতরকম তাদের ম্যাকাও-মনির ম্যাও সামলানোর সমস্যা।

উপরন্তু পাখির দেখাশুনোর জন্যে মাইনে-করা আলাদা আদমিরও আবার আমদানি হয় অবিলম্বে। গরমের সময় দার্জিলিং কিংবা কালিম্পঙে পাক-পক্ষী-সারমেয় সমভিব্যাহারে ঠাণ্ডা হাওয়া খাওয়াতে, যাওয়া-আসার কথাও শোনা যায় কানাঘুষো।

এর পরে বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো যদি আবার থাকে একটা কাকাতুয়া—তা হলে তো কথাই নেই—দেখতে পাওয়া যায় তাদের নিদারুণ সে-সব দাঁড়ের কী দারুণ দার্ঢ্য। পায়ে লাগানোর শিকলি, লোহার হলে হবে কী ? কত না তাতে সব কারিগুরির বাহাদুরি। তারপর হীরে না হলেও হীরেমন তোতা তো বটে—তাকে ব্রজবুলিতে তালিম দেওয়াব সেও আবার কী দারুণ দম্ভ !

এ সবই অবশ্য শুধু অনুধাবনযোগ্যই নয়, সমাজ কৌলিন্যের বিশেস লক্ষণ হিসেবেও বিলক্ষণ গ্রাহ্য।

গ্রেটডেন কিংবা অ্যালসেসিয়ান পুষলে, তার খাদ্যের বরাদ্দ—কিন্তু বিফ নয়, মটনের মাংস। বলাবাহুল্য সে-মাংসের মূল্য একটি মধ্যবিত্ত সংসারের দিনমানের সমূহ খরচের সমতুল্য তো বটেই, হয়তো-বা বেশিও হয়ে যেতে পারে।

এই প্রকার সব সারমেয়-সংবাদ বাদ দিলেও এমন কি দরিদ্রতম বস্তিবাসিনীর বাৎসল্যের বারমাস্যার মহান এ-হেন নমুনা—এই যে মেকুর—তারও ওই মালিকানি, নিজে দরকার হলে নুন-ভাত খেয়েও দেখা যাবে মাছ-ভাতটি ঠিক রেখে দিয়েছে, পোয়াতি মেনি বেড়ালটির রসনা-রঞ্জনের জন্যে।

ওর তো, বলতে গেলে, একমাত্র মেজদি ছাড়া অমন মেকুরি-আস্কারা দেওয়ার মত মাথায় তোলা স্নেহ, আর কারো কাছ থেকে ও যে পেয়েছে বলে তো মনে হয় না।

এমন সময় এই পরিপ্রেক্ষিতেই তো মনে পড়ে যায় ওর সেই প্রিয়-বান্ধবীর কথা—ওর উপর সে কি মমতাহীন ওর দুর্ব্যবহার ! ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে কিনা জিভের আগায় চকলেট রেখে জিব বের করে কাকাতুয়াকে চকলেট খাওয়া শেখানোর সে কি রোয়াব !

ওর কাকাতুয়ার মতন ওইরকম চিত্ত-চনমনকারী চঞ্চু না থাকলেও ওর ওই অতিসাধারণ ওষ্ঠ দিয়েই অতি সহজেই ও'-ও ওইরকম জিভের থেকে চকলেট উঠিয়ে নেবার সামর্থ্য রাখে ; অবশ্য যদি ওর প্রিয় বান্ধবীর জিভের ডগা থেকেই হয়—তবেই।

কিন্তু বান্ধবী যে শেয়ালের মতই শেয়ানা।

সর্বসমক্ষে দিন-দুপুরে ওর ওইরকম আকুতির আনুকূল্যে অনুমতি দিতে আজকের এই জিন্‌স্‌-পরার যুগেও ও কিনা নিতান্তই নারাজ—নাজুক তো বটেই, উপরন্তু একটা লাজুক লাজুক ভাব ও ভান কর্তেও আবার ও যে বেজায় ভালোবাসে কি না।

এরপর এর চেয়ে শোকসংবাদ তোমাদের কী আর শোনাতে পারা যায় বলো ?

আদতে এরপর থেকে না ওর পাথর-পোষার সূত্রপাত।

পাথরেরা অন্ততপক্ষে মানুষের মত ঠকায় না। ওর প্রিয় বান্ধবীর মত নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ ওমনিতর প্রত্যাখ্যানও করে না। এমন কি পাখিদের মত হারামিগিরি করে শিকলি কেটে উড়ে যেতেও অক্ষম। ওর মত এলোমেলো আচাভুয়া লোকের পক্ষে সময়মত দেখাশুনোর দাবী মেটাবার হাঙ্গামাও নেই। তার উপর পাথরেরা আবার অসুখ-বিসুখের বালাই থেকেও বিলকুল বিবর্জিত কি না। এমন কি পোষা জীবজন্তু বা পাখ-পক্ষী মরে গেলে যে মনঃকষ্ট, তারও সম্ভাবনা এই পাথর পোষায় নাস্তি।

ওই যে লোহার খাঁচায় চন্নাটিকে দেখা যায়—বারান্দার খিলেন থেকে দুলন্ত খাঁচায় বসে দোদুল্যমান...চন্নাজন্তর চেখে দেখার ঢং-এ কেষ্ট নামের মালা টপকানো টপকে গিয়ে এখন মাত্র নামমাহাত্ম্যে মজে আছে যে অনবরত। সেই পরম বৈষ্ণবী পক্ষীটিরও পাকা কলাটা আমটার সঙ্গে পাকা পেঁপে, ভিজনো ছোলার সঙ্গে কয়েক টুকরো পিয়ারা—এসবের খরচ কুলঙ্কষার মতই কূল ছাপিয়ে ওঠে যে গো ফেঁপে।

না-না—ওই সব খরচের খেসারতের মাত্রা কোনোমতেই কম্‌তি তো নয়ই, উপরন্তু সব সময়ই বাড়তির দিকেই দাঁড়িপাল্লা হেলে আছে জেনো। তবে সেখানে ওর বলতে গেলে ওই পাথর পোষায় একটি পয়সারও বাড়তি ব্যয় নেই। এর উপর আবার পোষা পাথর, ওর আর্থিক অবস্থার অবশ্যই আন্দাজ রাখে। ও কথায় সোচ্চার না হলেও, ও ওর অর্থ কষ্টের প্রতি সত্যিই সহানুভূতিশীল।—ও বুঝতে পারে।

ওর পয়সার প্রাচুর্য হলে, ও আবার আন্দাজে আন্দাজ করতেও পারে মনে হয়। যখন ভেজানো রিঠের জলে ওর গা ধুইয়ে দেয়, নরম ধুন্দুলের ছাল দিয়ে গরম জলে ওর গা ঘষে দেবার ছুতোয় ওর সর্বাঙ্গ সর্বতোভাবে অনুভব করে হাত দিয়ে—পাথর তখন বুঝতে পারে : প্রিয়তমের পয়সার কিছু আমদানি হয়তো বা হয়েছে এবার।

প্রেমের কথা বলাবলির বালাই ওদের মধ্যে না-থাকলেও 'না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর' ছাঁদনাতলায় বসে কত কথাই না হয়ে থাকে ওদের দুজনের মধ্যে।

মনে পড়ে, সেই প্রায় চল্লিশ বছর আগে, প্রথম দর্শনেই এই পাথরের সঙ্গে ওর প্রথম প্রণয়ের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার, চুপ-কথার কাহিনী।

অজন্তা যাবার পথে, পথের ধার ঘেঁষে হোঁচট-খেয়ে-পড়ে-থাকা একটি পাথর দেখে ওর মনটা কেমন কেমন যেন করে উঠল...ও সেটাকে সেই অনাদরে পড়ে থাকা মাটির কোল থেকে তুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে ধুলো ঝেড়ে, আদর করতে লেগে গেছিল। কী সুন্দর গতরখানা। কী সুন্দর কচি কচি ভাব। ও মনে মনে কথা বলতে শুরু করে দেয় যেন ওর সঙ্গে—সে যেন একটি সা-বালিকা। যেমন অপরূপ, তেমনি নিষ্কলুষ, তেমনি সুন্দর মনে হয়েছিল তখন ওর কাছে। ওর মনে হয়েছিল—পথের ধারে পড়ে থাকা অনাদৃত সেই পাথরটির সঙ্গে নতুন করে প্রেমে পড়ল বুঝি বা ও। ওই পাথরটির প্রতি ও অনুভব করেছিল এক অসীম আসক্তি।

ও হায়দ্রাবাদ ফেরার পথে সযত্নে ও-টিকে কোলে করে নিয়ে এসেছিল তখন। ও হোটেলটায় ফিরে এসে ফিসফিস করে ওর সঙ্গে যেন কথা বলাবলি শুরু করে দিয়েছিল ততক্ষণে।

সেই তখন ক'দিন দেখা গেছিল—দুপুরবেলায়, এমনকি দরজা জানলায় খিল দিয়ে সেই আবছা আলো-অন্ধকারের আবছাওয়ায়— দুজনে দুজনার পানে চুপচাপ চেয়ে থাকত, নির্বাক। নিষ্পন্দ।

কী রূপ আবিষ্কার করেছিল ওই রূপমতীটির মধ্যে তখন একমাত্র ওই যেন বুঝতে পারে। এমন কি অন্যকে বোঝাতেও অক্ষম, আর তারই অহমিকায় কিনা অহরহ থাকতো আন্দোলিত।

রবি ঠাকুরের কবিতা কাপড় খুলে এবার ধরা দিয়েছে যেন ওর কাছে : সেই পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম/ কস্তুরী মৃগ সম ! কবিতার লাইনটা বারবার লালায় ভিজিয়ে ও যে ভিজে বেড়ালের মত করে তোলে ওকে।

কী জানি কী যেন একটা অকেশানে ওর আর্ট কালেকশান দেখতে এসেছে সেদিন অনেকে। অনেক গুণী জ্ঞানী বিদেশী সব বিদগ্ধ ব্যক্তিরা। দেখছে—দোয়াতের সংগ্রহ। গ্রাম-বাংলার নিজস্ব নক্‌শি কাঁথা। ছেঁড়া শাড়ির সুতো দিয়ে তৈরি, কিন্তু কাশ্মীরের জামেওয়ার শালের চেয়েও মন-মাতানো কত রকমের আর শত রকমের রকমফেরে তৈরি, নম্র নরম নক্‌শাগুলো সততই হৃদয় স্পর্শকারী যে।

বেড়িয়ে বেড়ানোর তথা সেই নানা ভঙ্গির ওয়াকিং স্টিক তথা ছড়িগুলোর ছড়াছড়ির মধ্যে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল তখন ওরা। তার মধ্যে হঠাৎ একজন রসিকতা সহকারে শুধোয়, পড়ে পাই চৌদ্দ আনা, এই পাথরটাও কি তোমার বিশিষ্ট সংগ্রহের সাংঘাতিক একটি নমুনা ? উত্তরে বলেছিল ও : নির্ঘাত শুধু নয়, নিশ্চয়ই। তার চেয়েও হতে পারে অনেক বেশি এটা। এতক্ষণ যা তোমরা দেখে তারিফ করছিলে, ওগুলো যেন সব বাজে আর বাজারে লোক-দেখানো—গুল আর পট্টি। সেখানে ওই পাথরটিই যেন ওর অতি আদরের দিল-এর আদত দুর্লভ বস্তু। এটা রাস্তার ধার থেকে কুড়িয়ে আনা হলে হবে কী ! ওটা যে ওর জান্, কলিজা, অন্যান্য জিনিসের মত, সব গুলপট্টির গুল এটা নয়। বুকের জমিনে তৈরি এটা খাঁটি বসরাই গুল—মানে গোলাপ, গোলাপ আর কী !

এর মূল্য ?

না বললেই নয় : এর মূল্য নির্ণয় ইতিহাস হাঁটকে হয় না। প্রত্নতাত্ত্বিক কিংবা পুরাতাত্ত্বিক বিদ্যে দিয়ে এর বিচার তো নয়ই। হৃদয় দিয়ে ও যে একে ধরেছিল কি না। এ যে ওর হৃদয়ের বস্তু। বুকের পাঁজরের পাঁজায় পোড়ানো এ যে ওর পোষা পাথর। পাখি তো নয়, যে উড়ে যাবে। এ যে ঠকাতে জানে না মানুষের মত। মানুষের চেয়ে অনেক ভালো, পাখিদের চেয়েও অনেক প্রীতিপদ। আর সারমেয় ? এর তো সারমেয়র মত দাঁত নেই, যে কামড়াবার জন্যে দাবড়াবে ! তুলনায় এ যে সবার তুঙ্গে। আমার এই সংগ্রহের সেরা বস্তু।

পুষতে গেলে, ওর মতে, পাথরই পোষ মানে সব চেয়ে বেশি। সবচেয়ে বেশি ভালবাসে : যে ওকে পালন করে।

কোনও বায়নাক্কা নেই। বায়না বেয়াদপি, সব কিছুর বাইরে—

ও ওর এই পোষা পাথরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

ও যে নাক উঁচিয়ে সকলকার কর্ণভেদ করে বলে বেড়াত—গত চল্লিশ বছর পোষা-পাথর, সে তো একমাত্র ওরই আবিষ্কার। একমাত্র ও জানে, পাথরকে কী করে পোষ মানাতে হয়, বশে আনতে হয়।

সত্যিই তো তাই।

আর তো কেউ জানেও না, শোনেওনি পোষা পাথরের কথা। আর মুষ্টিমেয় ওর এই পাথর পোষার কথা যারা জানে, তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে, ওটা নেহাতই ওরই আবিষ্কার। সকলের মতে : রাস্তার নুড়িকে কুড়িয়ে এনে ওই নাকি ইজ্জত দিয়ে ঘরে নিয়ে এসেছে। ইয়ার্কি নয়, যেন বাড়ির বউটি আর কি !

তারপর একদিন ক্যানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া থেকে কলকাতা এলো ওর মেয়ে—চিত্রলেখা।

ওর ওই নানা সেপ্-এর এবড়ো-খেবড়ো পাথরের সংগ্রহগুলো দেখে ও আচমকা বলে ওঠে : বাবা, তুমিও কি শেষে 'পেট রক-এর' পাল্লায় পড়লে ?

ও বলে ওঠে : 'পেট রক', সে আবার কী ? 'পেট রক' তো কখনও শোনা যায়নি। কলকাতার ক্যালকেশিয়ানদের অভিধানে 'রকবাজি' বলে একটা শব্দ আছে, কিন্তু 'পেট রক' বলে তো কখনও কোনও কথা শোনা যায়নি। এমন কি ওটা তো চলন্তিকাতেও নেই।

চিত্রলেখা তখন বলে : 'পেট রক' আজকাল ক্যানাডা, আর নর্থ অ্যামেরিকার সর্বত্র ছেয়ে গেছে। এখন এই 'পেট রক'-এর পাল্লায় সবাই নেহাতই নাজেহাল। আর যে বের করেছে এই

'পেট রক', সে জানো বাবা, আমাদেরই ব্রিটিশ কলম্বিয়ার বাসিন্দে। এখন মিলিওনিয়ার। তার নামটা মনে এলেও মুখে আসছে না। ক্যানাডায় ফিরে গিয়ে তার নামটা আমি পাঠিয়ে দেব তোমাকে। গ্রেট ম্যান থিঙ্কস এ্যালাইক, না ?

ও মেয়েকে মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে বলে ওঠে : দ্যুৎ তেরি কা—গ্রেট ম্যানের নিকুচি। আদতে ও তখন হায় হায় করতে লেগেছে। এত দিন ওর যে ধারণা ছিল সারা বিশ্বে ও-ই একমাত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্, যে এই কুড়িয়ে পাওয়া নুড়িকে পুষেছে। প্রতিষ্ঠিত করেছে, ভালোবেসেছে এবং ওর ও ভালোবাসার হয়েছে ভাগীদারহীন একমাত্র অধিকারী।

কত সময় খরচ করেছে শুধু নয়, দেহ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, এদের সংগ্রহ করতে কত না কষ্ট ! তা, সে অর্থ-কষ্ট থেকে মন-কষ্ট কত কিছুই না সহ্য করতে হয়েছে। সে কি ওই ক্যানাডার কোনও এক নচ্ছার ম্লেচ্ছকে মিলিওনিয়ার বানাবার জন্যে ? ওর এই পাথর-পোষা পর্বে ওর গৃহিণীর সঙ্গে মন কষাকষি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ইস্তক হয়ে গেল যে। ওর গিন্নি থাকত দিল্লিতে, আর ও থাকত কি না কলকাতায়।

ওকে টুক্‌লিফাই করে মিলিওনিয়ার হল ক্যানাডার একটা হৃদয়হীন ম্লেচ্ছ ! পয়সার পরিবর্তে আমার পোষা পাথরকে ঘরে ঘরে বিলি করে বেড়াচ্ছে। যেন ঘরের বৌকে এনে বারদুয়ারির দরজায় এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

চৌবাচ্চা

সুশীল রায়

মায়া হয়। ইচ্ছে হয় না এই টলটল নিটোল আর নিস্তব্ধ জলে ঢেউ জাগিয়ে দিই। পরিচ্ছন্ন জলে টইটুম্বর হয়ে আছে চৌবাচ্চা। গলা কাচের মতো জল। এক মনে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে শুধু। কেবলই মনে হচ্ছে, একটু ছোঁয়া পেলেই বুঝি চমকে উঠবে, ওর মসৃণ শরীরটায় অগণিত টোল পড়ে যাবে।

আস্ত জিনিস এই প্রথম দেখছিনে। এর আগে কত জায়গায় কত রকমের অখণ্ড ও অনাবিল পদার্থ দেখা গেছে; কিন্তু ওদের কারও উপরেই এমন মায়া পড়ে যায়নি। প্রয়োজনে, এমন-কি বিনা প্রয়োজনেও, তাদের খান খান করে ভেঙে দিতে দ্বিধা হয়নি এতটুকু, বিন্দু-বিসর্গ সঙ্কোচও বোধ করিনি; কিন্তু আজ চৌবাচ্চার কিনারে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। হাতের বালতি হাতেই ঝুলতে লাগল।

যে-জলের সীমা নেই, পার নেই, শুরু নেই, শেষ নেই, পৃথিবী-জোড়া সেই জলের তুলনায় এর জল তো সামান্য একটি বিন্দুমাত্র। শুনেছি, অনেকে সেই মহাসিন্ধুর কিনারে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়। সে-বিস্ময়ের কারণ হয়তো আছে; কিন্তু এখানে এভাবে আমার স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার হেতুটা কী—সেই কথাই ভাবছিলাম।

চারদিকে চারটে প্রাচীর খাড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে এই জলকে। এর বন্দিত্বের জন্যেই মনে কোনও করুণার উদয় হল কি না খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু না, করুণার কণাও পাওয়া গেল না—তন্ন তন্ন করে খুঁজেও। খুঁজে যা পাওয়া গেল, তার আগাগোড়া সবটুকুই অকৃত্রিম মায়া।

ছোট একটা চৌবাচ্চার সামান্য এই জল আমাকে এভাবে কাবু করে দিতে পারে, এ-কথা তো আগে স্বপ্নেও ভাবিনি। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা অবশ্য বলেন যে, বড় পাহাড় যাকে বশ করতে না পারে এমন কঠিন পাষাণও দৈবাৎ নাকি একটা ছোট পাথরের নুড়ির টানে পড়ে যায়। কেন যায়, তার ব্যাখ্যা তাঁরা যদি করে যেতেন, তাহলে নিজের অবস্থাটা তার সঙ্গে পরখ করে দেখে নেওয়া যেত। স্থানবিশেষে সামান্য ছোটরও কদর নাকি বেড়ে যায় অনেক, উদাহরণস্বরূপ নাকি বলা যেতে পারে—ছোট্ট চোখের তারার উপরে যদি খুব ছোট একটা ছানি পড়ে তাহলে সে-ছানিকে ছোট বলে উপেক্ষা করা যায় না।

এই চৌবাচ্চার জল তাহলে আমার মনশ্চক্ষের তারার উপর ছানি হয়েই দেখা দিল কিনা, সেটা ভেবে দেখা দরকার। মায়া জিনিসটা যদি অন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে স্বীকার করতে হবে, সত্যি, আমি ওর ওই নিস্তরঙ্গ নিটোল আর নিস্তব্ধ জল দেখে অন্ধই হয়ে গেছি। তাই তো অপলক চোখে তাকিয়ে এইভাবে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে একটানা।

ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র-সিঞ্চন নাকি অসম্ভব। কী-কারণে অসম্ভব, সে-কথা তুলে দরকার নেই। কিন্তু বালতি দিয়ে চৌবাচ্চা সিঞ্চন করা যে সম্ভব নয়, সেটা বুঝতে পারছি; অথচ তার কারণটা খুঁজে পাচ্ছিনে কিছুতে। যে-কথা আগে বলেছি, এ কি শুধু তাই—কেবলই মায়া! আর যদি মায়াই হয়ে থাকে, তাহলে ওই জলকে তফাতে না রেখে সর্বাঙ্গে মেখে ফেলাই তো সমীচীন। যার উপর টান এতটা, তাকে কেউ স্বেচ্ছায় এমন দূরে রেখে দেয় না বলেই তো শুনেছি।

নিজের অকারণ এই সঙ্কোচ মনে-মনে সমর্থন না করলেও ওর ওই নিশ্চলতাটা ভেঙে দিতে পারছিনে। তাই দুপায়ে সমান জোর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি অনেক্ষণ থেকে। এক-একবার মনে হচ্ছে, অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই; আজ না হয় ভেঙেই দিই ওকে, কাল আবার নতুন করে গড়ে নেওয়া যাবে। তা হয়তো যাবে, কিন্তু আজ যে-মনটাকে নিয়ে এর পাশে এসে দাঁড়ানো গেছে, ঠিক সেই মনটাকে যদি কাল আর হাতের কাছে পাওয়া না যায়। ভরা চৌবাচ্চা

আজই তো জীবনে এই প্রথম এল না, কিন্তু এর আগে যখন এমন থমকে দাঁড়াইনি কখনো, তখন আজ না হয় একটু দাঁড়িয়ে রইলাম। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাতে যখন কোনও কষ্ট হচ্ছে না, তখন দাঁড়িয়ে থাকাতেই বা ক্ষতি কী !

কোনও তাড়া বা কোনও তাগাদা যদি না থাকত, সময় নষ্ট হচ্ছে, এই রকমের বোধের হাত থেকে যদি রেহাই পাওয়া যেত পুরোপুরি, তাহলে আমি হয়তো সারাটা জীবন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম এইভাবে একটানা। সামনে ওই জল—নিটোল আর নিস্তব্ধ, কানায়-কানায় ভরা। জলকে জল বলে মানতেই ইচ্ছে করে না আদপে। মনে হচ্ছে, গলিত কাচ দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে আমার এই চৌবাচ্চা। এর চারটে প্রাচীর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তার ভিতর এবং তার বাহির ; তার তল এবং তার উপর। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত আর উদার হয়ে অবারিত আগ্রহ নিয়ে সে যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এমন আন্তরিকভাবে কোনওদিন কেউ হয়তো দেখেনি তাকে, তাই তার চোখে এই বিস্ময়।

তারই বিস্ময় কি না, তাও ভালভাবে বুঝতে পারছিনে অবশ্য ; আমার বিস্মিত চোখের ছায়া গিয়েই তার উপর পড়ে থাকবে। তার মারফত আমি হয়তো-বা আমার বিস্ময়টাই দেখছি তাহলে। আমার চোখের বিস্ময়টা তো তাহলে অমনি স্তব্ধ আর অমনি নিটোল। আমার চোখ দুটোই অমনি কাচ-স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে কি না, কে বলবে !

এতটুকু উচ্চকিত না করে ওকে একটু ছুঁতে ইচ্ছে হল। ডান হাত থেকে বালতিটা বাঁ হাতে পার করে ডান হাতটাকে মুক্ত করে দাঁড়ালাম। সন্তর্পণে আঙুলটা এগিয়েও নিয়ে গেলাম ; কিন্তু পারলাম না কিছুতে। কিছুতে ছুঁতে পারলাম না ওকে। ঠিক মনে হল, ও সজল চোখে তাকিয়ে নীরবে আমাকে যেন নিষেধ করল।

চৌকো চোখ দেখিনি কখনও, তাই হয়তো ওই চোখের ইশারায় চমকে গিয়ে থাকব। কিন্তু এর আকার যেমনই হোক, এর আচরণ অনেকটা সজল চোখেরই মতো। ওই চৌবাচ্চার জলের রূপ নিয়ে তাহলে হয়তো আস্ত একটি চোখ এসে দাঁড়িয়েছে আমার চোখের সামনে। আর আমি তাইতেই অভিভূত হয়ে আছি।

চোখের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক নাকি ঘনিষ্ঠ। কবিরা নাকি চোখের দ্বারা অভিভূত হয়েছেন এবং চোখের অনেক গুণকীর্তন করেছেন। একটি সামান্য চোখ নিয়ে নাকি বৃহৎ মহাকাব্য রচনার সম্ভাবনা ও সুযোগ আছে। কিন্তু সে-সম্ভাবনা নিয়ে তো আমার কাজ নয়, কারবারও নয়। আমি কবি নই, কাব্যও বুঝিনে ; ঠিক এই মুহূর্তে এখন আমি সামান্য একজন স্নানার্থী। তাই এই সলিল-তীর্থে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু মুখের কথার সলিল-তীর্থ সত্যিকারের তীর্থের গরিমা নিয়ে দাঁড়াবে, এতটা ভাবা যায়নি। সত্যিই, আমার মনে হতে লাগল, আমি প্রাত্যহিক নিয়মিত একজন স্নানার্থী নই। আমি এসেছি যেন এক তীর্থের কিনারে, এখানে পুণ্য অর্জন করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

চৌবাচ্চা থেকে চোখে, সেখান থেকে সরাসরি এক তীর্থে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু এতটা অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও এক পা আমি এগোতে পারলাম না, আঙুলটা একটু এগিয়ে নিয়ে ছুঁতে সাহস পেলাম না।

কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে আছি জানিনে। এখানে আসার সঙ্গে-সঙ্গে সময়ও থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে বলেই আমার ধারণা। ছোট এই স্নানের ঘরে সময়কেও তাহলে বন্দী করে ফেলা গিয়েছে। ওই জলকে যেমন চারটি প্রাচীর দিয়ে বাঁধা হয়েছে, ওই বাঁধা-জল আমাকে যেমন বেঁধে ফেলেছে, ঠিক সেইভাবেই আমরা বাইরের সময়কে এখানে এনে বেঁধে ফেলে থাকব ; আমি স্বয়ংই হয়তো সেই বহমান নদীর নিশ্চল প্রতিমূর্তি। যতক্ষণ বাইরে থাকি, ততক্ষণ সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই ছুটোছুটি করতে হয় ! কে কাকে হারাতে পারে—এই পাল্লা চলে হরদম। কিন্তু তার সম্মুখের ঝাঁকড়া চুল মুঠিতে এঁটে ধরেও তাকে কাবু করা যায় না। অথচ এখানে আলগোছে সরে এসে সমস্ত শরীরকে আলগা দিয়ে সময়ের সঙ্গে পাল্লা না দিয়েও সেই সময়কে কাবু করা গেল।

আর যে-লোকসানই হয়ে থাক-না কেন, সময়কে এইভাবে যে বাঁধতে পারা গেছে—এইটুকুই

লাভ। জীবনের মহাসাগরের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ উচ্ছলতার মাঝে-মাঝে এমনি এক-আধটা চৌবাচ্চা থাকা যে বিশেষ দরকার—এতে আর সন্দেহ কী। এদের পাশে এসে তবু একটু নিশ্চিন্ত নীরবে দাঁড়ানো যায়, বাইরের ঝড় আর সময়ের হাত থেকে একটু নিষ্কৃতি তাহলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ছোট হোক, বড় হোক, মাঝারি হোক—টল টল জলে তা যেন থাকে ভরপুর।

যে-সমুদ্রের কথা বললাম, তার জল বড় গাঢ় নীল, আর বড় লোনা, তার তল দেখা যায় না। সেই অতল অগাধ মহাসিন্ধুতে সাঁতার কেটে যখন হাত-পা অবশ হয়ে আসে, বিস্বাদ জলের আস্ফালনে সর্বাঙ্গ যখন তিক্ত হয়ে যায়, তখন যদি চোখের সামনে মেলে ধরে কেউ অমনি একটা স্বচ্ছ চৌবাচ্চা, তাহলে মন পুলকে রোমাঞ্চিত না হয়ে পারে না। অতলতার রহস্য দিয়ে বিভীষিকার সৃষ্টি কোনও দিন কোনও চৌবাচ্চা করেছে বলে শুনিনি ; তার জলের স্বাদ লোনাও তো হয় না।

এ-হেন চৌবাচ্চাকে ফেলে মানুষে কেন সমুদ্রের লালসা পোষণ করে, এ-রহস্যটা আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় না কিছুতে। আমি আজ যে-আবিষ্কার করে ধন্য হয়েছি, সকলে তার অংশ-ভাগী হোক—এই আমার ইচ্ছে। তারা সকলে মিলিত হোক চৌবাচ্চাদের চারধারে, স্বচ্ছ চোখে একবার তাকিয়ে দেখুক এর প্রশান্ত আর অতল সৌন্দর্য আছে কিনা।

যা বিরাট আর যা বিশাল, তারাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে, এই জন্যই ছোটখাট চৌবাচ্চারা ছোট-ছোট ঘরে বন্দী হয়ে অখ্যাত জীবন যাপন করে চলেছে। তাই বলে এদের বাইরে টেনে আনতে অবশ্য বলিনে ; এরা নেপথ্যবাসী, নিভৃতেই এদের সঙ্গে দেখা হওয়া সমীচীন।

একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে ধৈর্য হয়তো ফুরিয়ে এল। সন্তর্পণে একটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলাম ওই জল। প্রতিবাদ করে উঠল যেন অমনি ; আপত্তির ঢেউ উঠল তার বুকে ; হাত দিয়ে ছুঁয়েই ফেললাম তাকে। জল ছলকে পড়ল তার কিনারা উপছে। অপরাধী বলে মনে হল নিজেকে। সরে এলাম এক পা। দেখলাম, সে-নিটোল সৌন্দর্য আর নেই ; নিষ্ঠুর করাঘাতে তার নিস্তব্ধতা চুরমার করে ভেঙে দিয়েছি।

বাইরে থেকে এক ঝাঁক সময় ঢুকে পড়ল যেন স্নানের ঘরে হুটপাট করে। আর দেরি করা চলে না। তারা এসে তাড়া দিতে লাগল। বাঁ হাতের বালতি ডান হাতে চালান করে এবার সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। বালতি-বালতি জল ঢালতে লাগলাম মাথায়। যা মনে হয়েছিল গলিত কাচ, আসলে তা সামান্য জল হয়ে গেল। একেবারে ঘরোয়া, একেবারেই সাধারণ।

কঠিন আঘাতে এমনি অনেক স্বচ্ছ চোখেরও সর্বনাশ হয়তো হয়। জীবনের সঙ্গে এইভাবে মেনে নিতে গেলেও হয়তো স্বপ্নিল সে চোখের জাদু আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

তা না যাক। তার জন্যে কোনও আক্ষেপ নেই। কিন্তু প্রত্যহ অন্তত একবার যেন এমনি সহজ স্বচ্ছ নিটোল আর নিশ্চল চৌবাচ্চার সঙ্গে দেখা হয়, এটা মনে-প্রাণে রোজ চাইব। হয়তো রোজ পাওয়া যাবে না, কিন্তু বলেছি তো, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ এই মহাসাগরের মাঝে দম নেবার উপযুক্ত ছোটখাট এক-আধটা ঘাঁটি যে চাই-ই। নিজের নির্বুদ্ধিতার তাগিদে হয়তো তা ভেঙে খানখান করব রোজই, কিন্তু চাহিদাটা সেইজন্যই বর্জন করব কেন।

"দেশ"। ২৪ চৈত্র ১৩৫৭।

যদি

কালপেঁচা

বাংলা ভাষায় এমন একটি "শব্দ" আছে যাকে সাহিত্যিকরা উপেক্ষা করেন, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা অবহেলা করেন, অথচ যার আকর্ষণশক্তি দুর্বার, মাধুর্য অনির্বচনীয় এবং ব্যঞ্জনার কোনও আদিঅন্ত নেই। বাংলা ভাষার মহারণ্যে মাত্র দুই অক্ষরের সেই শব্দটি ঠিক নিবাভবণ বনদুহিতার মতন। কোনও ঝংকার নেই তার, কোনও রূপলাবণ্য নেই। আলংকারিকের দৃষ্টিতে কোনও অলংকারের চিহ্ন তার গঠন-বিন্যাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। তবুও তারই জন্যে "সাহিত্য" সচল এবং "জীবন" দুর্বিষহ বোঝার ভারে আজও অচল হয়নি। কাব্যের উপেক্ষিতা সে আমাদের "আ মরি বাংলাভাষার" নগণ্য "যদি"।

আমরা কোনওদিন ভেবে দেখিনি, আমাদেব অলংকারবহুল জীবনে এই নিরলংকার নির্বিকার "যদি" কী প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার কবে রয়েছে। "চলন্তিকা" অভিধানে "যদি" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু লিখেছেন : "অবধারণে বা বিকল্পে, If (যদি বৃষ্টি হয় তবে ঠাণ্ডা পড়বে, যদি আসতে তো ভালই হতো) ; সংশয়ে বা আশঙ্কায়, lest (যদি রাত হয় তাই লণ্ঠন এনেছি, ভয় হয় যদি সে রাগ করে) ; সংশয়াধিক্যে (যদি মরি তাতে ক্ষতি কী ইত্যাদি)।" এই হলো "যদির" আভিধানিক অর্থ। অবধারণে বা বিকল্পে, ইংরেজি "ইফের" মতন, সংশয়ে বা আশঙ্কায়, ইংরেজি "লেস্টের" মতন, অথবা সংশয়াধিক্যে, ইংরেজি "ইভ্‌ন ইফ্‌"-এর মতন, আমাদের বাংলাভাষার "যদি"। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, আভিধানিক অর্থের এই নির্দিষ্ট সীমানা ছাড়িয়ে বাংলার "যদি" তাব গভীর দ্যোতনার ইন্দ্রজাল মানসিক ভাবানুভাবেব নিঃসীম দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তার করে রয়েছে। ইংরেজির "ইফ্‌" আছে, "লেস্ট" আছে, "ইভন-ইফ" আছে, "দ্যো" আছে, "অল্‌দ্যো" আছে, কিন্তু বাংলায় আছে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, হিমাদ্রির মতন অচল অটল অদ্বিতীয় "যদি"।

আমাদের জীবনের একমাত্র পাটাতন "যদি" যেমন ওদের লাইফেব "ইফ্‌"। সারাজীবনেব সমস্ত সঞ্চিত পাথেয় থেকে যে-কোনও সময় একটি একটি করে সবগুলি "যদি" একবার যদি খসিয়ে নেন, তাহলে দেখতে পাবেন, বিয়োগফল যা পড়ে রইল সেটা শুধু একটা শূন্য খোলসমাত্র, একটা স্কেলিটন বা কঙ্কাল ; রক্ত-মাংস, রূপলাবণ্য কিছুই তার নেই। তার কারণ জীবনের রক্ত-মাংস, জীবনের রঙবেরঙের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য, জীবনের মনোহর লাবণ্য, সবই ওই "যদি"। জীবন যাদের বিশাল হাজারদুয়ারী রাজপ্রাসাদের মতন জমকালো, তাদেরও হাজার স্তম্ভের প্রতিটি স্তম্ভ ওই "যদি।" জীবন যাদের পর্ণকুটীরের মতন জীর্ণ, তাদেরও প্রত্যেকটি ঘুণধরা খুঁটি ওই "যদি।" তা না হলে আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ, এরা ওরা সকলেই তো মানুষ, তবু কেন এক নবকৃষ্ণ শোভাবাজারের মহারাজা হলেন এবং আর এক নবকৃষ্ণ দেনার দায়ে তার শুধু দুই বিঘে জমি বেচে দিয়ে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেল। এক জনের জীবনে স্বপ্নলোক থেকে "যদি" নেমে এলো মাটির পৃথিবীতে, আর এক জনের জীবনে "যদি" চিরদিন স্বপ্নাকাশে তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে রইল। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান কেবল যদির ব্যবধান, জীবনের সঙ্গে জীবনের দূরত্ব কেবল "যদির" দূরত্ব। জীবনের কোনও এক সময়ে আপনার নিজের পায়ে-হাঁটা পথের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যদি স্থির দৃষ্টিতে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে-যাওয়া কোনও জীবনের মূর্তির দিকে চেয়ে থাকেন, তাহলে দেখবেন গভীর অন্তঃস্থল থেকে একটি চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল এবং পিছনে পড়ে-থাকা আপনি ও এগিয়ে-যাওয়া সে, এই দুই জীবনের মধ্যে যে-পথের দূরত্ব, তার মধ্যে অসংখ্য মাইলপোস্ট দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল, প্রত্যেক পোস্টের পাথুরে গায়ে বড় বড় হরফে খোদাই করা "যদি"। এই "যদি"-ই আপনার দীর্ঘ নিঃশ্বাসের উৎস

এবং জীবনধারণের একমাত্র জীবিকা। যে যাচ্ছে সে কেবল চলার আনন্দে মশগুল হয়ে চলছে না, "যদি"র টানে চলছে, "যদি" আরও একটু চলা যায়, "যদি" আরও কয়েকটা পর্বতচূড়া পার হওয়া যায়, "যদি" জীবনের নন্দাগিরি, ধবলগিরি অতিক্রম করে এভারেস্ট পর্যন্ত পৌঁছোনো যায়, যদি তার পরেও কোনও তুষারশৃঙ্গ থাকে—। জীবনের আঁকাবাঁকা পথ দিগন্তবিস্তৃত, সেই পথের বাঁকে-বাঁকে "যদির" মাইলপোস্ট। আপনার চলার ইতিবৃত্ত কয়েকটা "যদি" পার হওয়ার করুণ বা রোমাঞ্চকর কাহিনী, আপনার ব্যর্থতার ইতিহাস সামনে অসংখ্য দূরতিক্রম্য "যদির" মর্মান্তিক ইতিহাস এবং আপনার সার্থকতার ইতিহাস কেবল কতকগুলি অতিক্রান্ত "যদির" রোমাঞ্চকর ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

জীবনে যে ব্যর্থ হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, দেখবেন যখন জীবন-কাহিনী সে বলা শুরু করবে তখন অনর্গল ধারায় মুখ থেকে উৎসারিত হবে "যদি, যদি, যদি।" প্রত্যেক "যদি"র পর এক-একটা দীর্ঘশ্বাসের ছেদচিহ্ন, একটা সকরুণ ভাব, একটা গ্লানিবোধ, একটা প্রতিহিংসার লেলিহান প্রবৃত্তিশিখা। যদি ওটা পেতাম তাহলে এই করতাম, এই হত, যদি পারতাম, যদি ঘটত, যদি ওই ভুলটা না করতাম, যদি একবার বাগে পেতাম, তাহলে তাহলে বলে বক্তা উত্তেজিত হয়ে উঠবেন। যদির কাহিনী শুনতে-শুনতে অবসন্ন হয়ে পড়বেন। যত মহাজন যত আত্মজীবনী লিখেছেন আজ পর্যন্ত তার সবটাই প্রায় "যদি।" জীবনে যার প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে, প্রতিহিংসার আগুনে সে নিয়ত জ্বলছে আর ভাবছে "যদি একবার পাই—।" প্রেমিক যে সে ভাবছে "যদি সে আসে—।" শিশুর স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা তাজ্জব দুনিয়ায় "যদি" ছাড়া আর কিছু নেই। যদি সে ছাড়া পায় তাহলে গাছে ওঠে, পাহাড় ডিঙোয়, নদী পার হয়। যদি তার ছোট্ট খেলনা-এরোপ্লেনটা উড়তে পারত তাহলে তাতে চড়ে সমস্ত আকাশটা সে একবার বোঁ করে ঘুরে আসত, দেখে আসত মেঘগুলোকে। যদি মা না মানা করত, তাহলে ঠিকই সে কাগজের নৌকায় চড়ে ভেসে পড়ত নদীর বুকে, কত দূর দেশ-বিদেশ চলে যেত। শৈশব থেকে কিশোর-জীবনের "যদি" আরও একটু পাল্লার মধ্যে এলো। "যদি উকিল হই তবে রাসবিহারী ঘোষ হব, যদি ডাক্তার হই তাহলে গরীব-দুঃখীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করব, যদি পড়াশুনা করতে পারি, তাহলে বিদ্যাসাগর হব, যদি ব্যবসা করি তবে বিড়লার চেয়েও বড়ো হব, যদি শ্যামসুন্দরের মতো বীর হতে পারি তাহলে বাঘের গলায় বগ্‌লস দিয়ে শিকল বেঁধে কুকুরের মতন টেনে নিয়ে বেড়াব, আর দেশের সমস্ত বন্দিনী, অভাগিনী, কুমারী কন্যাদের দস্যুদের কবল থেকে ছিনিয়ে আনব। অর্থাৎ "যদি" একবার ড্যাশ হই, তাহলে দেখে নেব, দেখিয়ে দেব কী করতে পারি, যা কেউ করেনি কখনও, ইতিহাসে যে-কাহিনী লেখাজোখা নেই।" এই হল কৈশোরের "যদি।" এ-"যদি" এমনই জীবন্ত যে যদি একবার কিশোর রাজপুত্র তার ও-বাড়ির বা ও-পাড়ার কিশোরী রাজকন্যাকে পায়, তাহলে তার হাত ধরে সে এই কমলালেবুর মতন পৃথিবীটাকে স্বচ্ছন্দে জয় করে তার মাথার উপর বিজয়দর্পে দাঁড়িয়ে বিষাণ বাজিয়ে ঘোষণা করতে পারে যে সে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। দিল্লী থেকে মক্কা, মক্কা থেকে কামচকাট্‌কা, টাঙ্গানিকা থেকে সাইবেরিয়া সে এক এক লাফে চলে যেতে পারে, গিয়ে সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে সেখানে, ঠিক এস্কিমোদের মতন, নিগ্রোদের মতন, বেদুইনদের মতন, অবশ্য যদি সে তাকে পায়, যদি তাকে তেমনি করে পাওয়া যায়, যদি তাকে রুদ্ধ ঘরের জানালার গরাদ ভেঙে একবার ছিনিয়ে আনা যায়, যদি—যদি—। এই হলো দুরন্ত কৈশোরের দুর্ধর্ষ "যদি।" শৈশবের "যদি" রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়া, কৈশোরের "যদি" দুর্বারগতি গ্যালপিং ঘোড়া। শৈশবের "যদি" কাগজের নৌকা, কৈশোরের "যদি" হাজার দাঁড়ি ময়ূরপঙ্খী নাও। যৌবনের "যদি" উত্তাল তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে ভাসমান স্টীমলাইণ্ড জাহাজের মতন, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে তার বিরামহীন যাত্রা। অনুসন্ধানী মন চির-অতৃপ্ত, "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না", তাই যদির টানে কেবল খোঁজা আর চলা, যদি পাই, যদি সার্থক হই, যদি জয়ী হই, যদি—যদি—। প্রৌঢ়ত্বের বালুচরে যৌবনের তরঙ্গায়িত জাহাজটা হঠাৎ যখন ধাক্কা লেগে আটকে যায়, তখন বিস্তীর্ণ বালুচরের দিকে চেয়ে চেয়ে হিসেবী মনটা সজাগ হয়ে ওঠে, চোখের সামনে অস্তগামী সূর্যের আলোয় জীবনের বালু-স্তূপে ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে অসংখ্য ফেলে-আসা পাশ-কাটানো

"যদি", মনে হয়, হায়, হায় ! যদি না ওটা করতাম, যদি আর একটু বুদ্ধিমান অথবা যদি অতটা লোভ, অতটা বাড়াবাড়ি না করতাম, যদি—যদি— । বালুতটের অস্বস্তি ও হা-হুতাশের মধ্যে বার্ধক্যের সন্ধ্যা নামে, জীবনের সূর্য যায় অস্তাচলে। শেষ দিনের শেষ মুহূর্তটিতে অসংখ্য "যদি" এসে ভিড় করে ক্ষীয়মাণ দৃষ্টিপথে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলে যখন চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন মনে হয় যেন প্রত্যেকে এক একটি মূর্তিমান "যদি"। বৃদ্ধা মা'র দিকে চেয়ে মনে হয় জীবনে তাঁর প্রতি কত অন্যায়, কত অবিচার করেছি ক্ষমা চাওয়া হয়নি—অমনি কোথা থেকে "যদি" উদ্বেল হয়ে ওঠে, মনে হয় যদি একবার প্রাণ খুলে ক্ষমা চাইতে পারতাম, যদি "মা" বলে ডাকতে পারতাম। কিন্তু সে-সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ডাকবার শক্তি নেই, তাই "যদি যদি" করে নিভ-নিভ চোখে জল জমে শুধু। স্ত্রী-পুত্র, স্বজন-বন্ধুদের দিকে চেয়েও ওই কথা মনে হয়, কেবলই মনে হয় যদি একবার সকলকে মনের আসল কথাটা বলতে পারতাম তাহলে কত ভুলের বোঝা হালকা হয়ে যেত। কিন্তু সে-সময় নেই। কেবল যদি, আর অন্ধকার। অন্ধকার গাঢ়তর হয়, বৃহত্তর হতে হতে মাথার উপরে সিলিং স্পর্শ করে—যদি আর-একটা দিন, মাত্র একদিন, যদি—যদি— ।

জীবনের "দি এণ্ড" বা "ওই শেষ।" হাজার হাজার অসংখ্য "যদি"র ভগ্নস্তূপ এই জীবন। কিন্তু ওইখানেই শেষ নয়। যার শেষ হয়ে গেল সে তো জানল না যে যারা বেঁচে রইল তাদেরও জীবন কতদিন কতবার ওই "যদি" জর্জরিত করবে। তারা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ওই "যদি" তাদের হন্ট্ করবে, যে চলে গেল তার কথা ভেবে মনে হবে মধ্যে-মধ্যে, ভীষণভাবে মনে হবে—যদি তাকে পেতাম, যদি একদিনের জন্যেও পেতাম, যদি একবারটি জীবন্ত পেতাম তাকে—যদি—তাহলে— । চলার পথে জীবনের বাঁকে-বাঁকে মাইল পোস্ট যেমন "যদি", জীবনের এপার থেকে ওপারের সেতুও তেমনি "যদি।" "যদিশূন্য" জীবন মাত্রেই মৃত্যু আর "যদিদীপ্ত" জীবন মানেই এগিয়ে চলা।

"কালপেঁচার দু'কলম" । মহালয়া ১৩৫৯ ॥

"আমি"

রঞ্জন

যাদবপুর জঙ্গীপুর ও অন্যান্য দুয়েকটা জায়গা থেকে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে যোগদান করবার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলুম। যে-সহৃদয় অনুরাগীরা আমার প্রতি এই অনার্জিত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তবু যে তাঁদের সেই সস্নেহ আমন্ত্রণ সবিনয়ে কিন্তু সজোরে প্রত্যাখ্যান করেছি তার কারণগুলি যতটা ব্যক্তিগত ঠিক ততটাই নীতিগত। তাই সেগুলি প্রকাশ্যে আলোচ্য বলে মনে করি।

একদল দার্শনিক আছেন যাঁরা বলেন, "I am a Soul, I have a body." আমার অস্তিত্ব তার চেয়েও অসম্পূর্ণ ও অনির্দেশ্য। আমি বেনামী লেখক। তাই আমার শুধু একটা নাম আছে, তার বাইরে আর কোনো সত্তা নেই যার জোরে সাহিত্যের রাজ্যে আমি প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারি। সাহিত্যসভায় সশরীরে আতিথ্য গ্রহণ করতে আমার সঙ্কোচ এই জন্য যে, 'রঞ্জন' হিসাবে আমার শারীরিক কোন অস্তিত্ব নেই। আমি নিরাকার। পাঠকের কাছে আমি 'নিত্য গাওয়া গান, মূর্তিহীন।' তার বেশি নই।

কিন্তু সত্যি তো তা নয়। আমি আসলে জীবন্ত একটা মানুষ। অফিস করি, বাজারে যাই,—কখনও কখনও লিখি। প্রথম দুটো কর্মের আর তৃতীয়টির মধ্যে যে ড্যাশ চিহ্ন দিয়েছি তার কারণ দুটোকে আমি আলাদা করে দেখাতে ও দেখতে চাই। অফিস করি ও বাজারে যাই স্বনামে, বেনামীতে এগুলি চেষ্টা করলে জেলে যেতে হত। লিখি বেনামীতে, কেননা—কিন্তু সে-কাহিনী দীর্ঘ, কারণ তার নানাবিধ।

এর ফলে দুটো সত্তার সৃষ্টি হল। একজনের নাম অমুক চন্দ্র অমুক, অমুক অফিসে অমুক কাজ করে সে। দ্বিতীয় জনের নাম 'রঞ্জন' সে প্রবন্ধ লেখে, গল্প লেখে, উপন্যাস লেখে, আরো কত কী।

আজ সাহস সঞ্চয় করে এ-কথা কবুল করতেই হবে যে 'রঞ্জন' নামের অন্তরালে এই যে আত্মগোপনের আশ্রয় নিয়েছি তার প্রধান কারণ ভীরুতা। অনামী পাঠক আর বেনামী লেখকের সম্বন্ধ কখনই সম্মুখ সমরে পরিণত হতে পারে না, দুয়ের অনচ্ছ পেপার কার্টেন। এই যবনিকার পশ্চাতে অবস্থান করবার সুবিধা এই যে, আমাকে যদি কেউ এসে বলে যে 'রঞ্জন' লিখতে জানে না, আমি তৎক্ষণাৎ সহাস্যে সম্মতি জানাতে পারি; তা নইলে জিজ্ঞাসা করতে পারি, 'রঞ্জন? সে আবার কে? নেভার হার্ড অব্ হিম!'

এমন সম্ভাবনা যখন অনুপস্থিত, যখন স্পষ্টতই জানি যে নিমন্ত্রিত হয়ে কোনো সভায় সভাপতিত্ব করতে গেলে সেখানে আমার প্রশংসা বই নিন্দা হবে না, তখন ছদ্মনামটা ঘুচিয়ে দিয়ে গলা বাড়িয়ে মালা পরতে আমার বাধে। একবার যখন পাঠকের রক্তচক্ষুর ভয়ে ছদ্মনামের বর্ম পরিধান করেছি, তখন নিরাপদ সভাস্থলে লোকচক্ষুর সামনে সেই আবরণ উন্মোচন করতে যাওয়া যেন গাছেরও খাওয়া তলারও কুড়নো। ওটা অসাধুতা।

যে-লেখক ছদ্মনামে লেখে, সে আসলে জেনে বা না জেনে বেচারি ফ্রাংকেনস্টিনের বিপজ্জনক ক্রীড়ায় মত্ত হয়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে এক দানবের আবির্ভাব হয়, সে এসে বলে, 'তুমি অমুকচন্দ্র নও, তুমি রঞ্জন।' এ-দানব কখনও আমি নিজে, তখন আমি সাধারণ জীবন যাপন না করে দায়িত্বহীন উচ্ছৃঙ্খলতায় আর্টিস্টের মতো হতে চাই। কখনো এ-দানব সাহিত্যসভার আয়োজন করে, তখন তাঁরা দাবি করেন আমার সশরীর উপস্থিতি:

রাজী হইনে, কেননা, সভায় গিয়ে বলব কী? যদি পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি করি, তাতে পরিশ্রম কম। কিন্তু কোন্ শ্রোতা তাতে তৃপ্ত হবেন? আর যদি নতুন কথা বলতে যাই, তবে

তার জন্যে প্রস্তুতি চাই। অর্থাৎ পরিশ্রম চাই। অথচ এ-কাজে আজও আমাদের দেশে পারিশ্রমিকের রীতি প্রচলিত হয়নি। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে পরিববহনের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া শুধু মালার লোভে কতদিন লেখকরা সভায় গিয়ে বক্তৃতা করবেন, অর্থাৎ এমন বক্তৃতা যা একাধারে বক্তব্য এবং শ্রাব্য ?

প্রথমত, লেখকের মনে যদি কোনও নতুন কথার উদয় হয় (ঈশ্বর জানেন, এমন ঘটনা কী মর্মান্তিক রকম বিরল) তবে তার প্রথম ইচ্ছা হবে, সে-কথা লিখতে, সভায় গিয়ে বলতে নয়। দ্বিতীয়ত, লেখা এবং বক্তৃতা করা দুটো আলাদা আর্ট, দুটোর জন্যেই সাধনা চাই এবং আলাদা রকমের সাধনা।

এই প্রভেদের পর্যাপ্ত স্বীকৃতি নেই বলেই অক্ষম বক্তা হলেও সফল লেখককে বক্তৃতা করতে ডাকা হয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সফল বক্তাকে লিখতে। ফলে পাঠক এবং শ্রোতা উভয়কেই বঞ্চিত হতে হয়। তাই সুবক্তা না হলে লেখকদের উচিত বক্তৃতা করতে অস্বীকার করা।

আমি যে অস্বীকার করেছি তার অন্য একটা কারণ আছে। বক্তৃতার, অর্থাৎ পাঠকের সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ এলেই আমার অনেকদিন আগে-পড়া রোমানফের একটা গল্প মনে পড়ে। সেই যেটাতে কুৎসিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কুরূপা এক রমণীর প্রেম হয়েছিল।

কেউ কাউকে দেখেনি, শুধু প্রেমপত্রের বিনিময় হয়েছে মাসের পর মাস। কিন্তু 'চিঠিতে কি মানে মন বিনা দরশনে ?' একজন, আরেকজনকে দেখতে চাইল। প্রেমিক লিখল, 'ক্ষমা করো, তুমি জানো না আমি দেখতে কী ভয়ানকরকম কুৎসিত। দেখামাত্র তুমি তোমার মুখ ফিরিয়ে নেবে। না, দেখা আমি দেব না, কিন্তু তোমায় দেখতে চাই।' প্রেমিকা লিখল, 'আমি তোমার রূপের তো প্রেমে পড়িনি, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি ; আর রূপের কথাই যদি বলো, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না আমি কী ভয়ানক রকম কুরূপা। তুমি দেখে শিউরে উঠবে। আমি তোমায় দেখা দেব না, কিন্তু তোমাকে দেখতে চাই।'

প্রেমে পড়লে কে কবে কার বারণ মানে ? তাই নির্ধারিত স্থান ও কালে দুজনে দেখতে গিয়েছিল দুজনকে। দূর থেকে দুজনেই দুজনকে দেখে দেখা আর করেনি। বাড়ি ফিরে এসে আবার প্রেমপত্র রচনা করেছে। চিঠিই ভালো।

আমিও বলি, লেখাই ভালো। কাজ কী দেখায় ? দেখা হলে হয়তো, আমি পাঠককে নিরাশ করব। হয়তো পাঠকও আমাকে।

"বিকল্প"। অগ্রহায়ণ ১৩৬০।

বাসা-বদল

সন্তোষকুমার ঘোষ

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্যাতি...
আবার বাসা-বদল করেছি।

'আবার'। কথাটার তাৎপর্য এই—এ-কাজে আমার এই সবে হাতেখড়ি নয়। 'শতমারী', তবে বদ্যি। বাড়ি-বদলের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অতখানি মারাত্মক না হলেও চলে, দু-চারবার হলেই ঢের। আমার অন্তত ডজন তো পুরল।

...পটলডাঙা, দর্জিপাড়া, হাটখোলা...নতুন বাসায় বিছানায় সটান হয়ে হিসেব মেলাতে চেষ্টা করছিলুম। ...টালিগঞ্জেই তিনটে। তারপর 'হপ' করতে-করতে সাইকেলে সওয়ার হতে শেখার মত, বাসা বদলাতে-বদলাতে একদিন এই শহর থেকেই উধাও হয়ে গেলুম। উত্তর ভারতের প্রায় পশ্চিমতম প্রান্তে সাত বছর। প্রডিগাল ফিরে এল, এবার পাইকপাড়া। অবশেষে এই ভবানীপুরে।

এত বাসা বদলাই কেন ? আমাকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা জানেন, এই শহরটাকে আমি চিনি। গলির গলি তস্য গলি, একরকম নখদর্পণে। বাসা বদলাই—পাড়ার পর পাড়া যোগ দিয়ে যে-কলকাতা, সেই কলকাতাকে আরও চিনতে।

সদর-সড়কে নতুন বাসা, অহর্নিশি ঢঙ্ ঢঙ্, ধস ধস। এ-রাস্তায় এক জাহাজ চলতে দেখিনি, উড়োজাহাজও না। বাকি সব চলে। আমরা ভেঁপুর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি, ভেঁপুর ডাকে জাগি।

পুরনো পাড়ায় এ-বালাই ছিল না। সেখানে তকতকে মেঝে থেকে সিঁদুরের মত সব টুকটাক শব্দ কান তুলে নিত। গাড়ি এলে পাড়ায় সাড়া পড়ত।

নতুন-বাসা। শুয়ে-শুয়ে চেয়ে দেখছি। পুরনো আসবাব, পুরনো পরিজন, তবু নতুন। সব কুড়িয়ে-কাচিয়ে এখানে এনে তুলেছি। সব কি ? সেই পাতা-ছেঁড়া ক্যালেণ্ডারটা অনুমান করি এখনও ময়লা দেয়ালে ঝুলছে। ওটা এই যেন-ধোবা-বাড়ি-ফেরত ধবধবে দেয়ালে মানাত না। মনে করে ওটাকে কেউ তাই খুলে আনেনি। পাখা আর বাল্‌ব টেনে হিঁচড়ে-ছিঁড়ে নামালাম। কড়ি-কাঠ আপত্তি করেনি। কিন্তু 'সকেট'-গুলো কানা হয়ে রইল। চোখ উপড়ে নিয়ে চলে এলাম।

কিন্তু তবু রয়ে গেল দেয়ালের কয়েকটি দাগ—বসুধারার বিগলিত চিহ্ন। কোণে কোণে ঝুল। আর ? হয়ত নিভৃত এবং একান্ত কিছু-কিছু স্মৃতি। সন্ধ্যায় ও-বাড়িতে হঠাৎ বেজে-ওঠা ঘণ্টাধ্বনি ; সকালে প্রতিবেশী অধ্যবসায়ী কিশোরীটির অনর্গল সর্গম। এসব রয়েই গেল। সেখানে তারা অপেক্ষা করে থাকবে, কোনও দিন যদি ফিরি, তখন গ্রাস করবে। আর চক দিয়ে আমার ছোট মেয়েটি আঁকা-বাঁকা হরফে দরজার কপাটে একদিন যে তার নাম লিখে রেখেছিল ? মুছে আসা সম্ভব হয়নি।

স্মৃতি আর চিহ্ন নতুন বাসা ঘিরেও গড়ে উঠবে। এখনও তার দেরি আছে। অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এর চেহারা আলাদা। ঘরের ব্যবস্থা আলাদা, বলতে কি, ব্যক্তিত্বই আলাদা। যতবার বাসা বদলেছি, ততবার আবিষ্কার করেছি, প্রত্যেক বাড়িরই একটা নিজস্ব "ব্যক্তিত্ব" আছে। এর উপস্থিতিতে কেমন একটু আড়ষ্ট, অস্বচ্ছন্দ বোধ করছি ? আলাদা বাসায় আমিও একটু আলাদা হয়ে পড়ছি না তো ? সার কথা হয়ত এই—আমরাই খালি বাড়ি বদলাই না, বাড়িও আমাদের বদলায়।

এই লোভেই এত ঘন-ঘন বাড়ি বদলের তাগিদ পাই কি না ঠিক বলতে পারব না। একঘেয়ে জীবনে মাঝে-মাঝে নতুন হবার এই শর্টকার্ট রাস্তা। নিজের বাড়ি যিনি একবার করে ফেলেছেন

তাঁর আর এ-পথ খোলা নেই। বিয়ে করে ফেললে যেমন—

থাক সেই গর্হিত অসামাজিক সাধটার কথা উচ্চারণ করে কাজ নেই। মোদ্দা কথা স্থির করেছি, বাড়ি কদাচ করব না, বদলাব। বদলানোর উপায় যখন থাকবে না, তখন মাঝে মাঝে ঘরের আসবাব এ-দিক ও-দিক করে নতুনত্বের স্বাদ নেব।

আর মৃত্যুরও। এক-একটা বাসা থেকে মুছে যেতে যেতেই তো আমরা একেবারে মুছে যাওয়া কাকে বলে তার আন্দাজ পাই, তার জন্যে অজান্তেই তৈরি হয়ে যাই।

আঁচল

বিমল কর

এ-কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বয়সে যখন আমি বালক, আদিরসাত্মক জ্ঞানমার্গে কোনও অধিকার জন্মায়নি, তখন থেকেই মেয়েদের শাড়ির আঁচলের ওপর (শুধু 'আঁচল' শব্দটাই অবশ্য যথেষ্ট হত) আমার ভীষণ টান। কেমন করে এটা সম্ভব হল, স্পষ্টভাবে আজও তা বুঝতে পারি না। তবু মনে হয়েছে, আমার মা এবং ছোট মাসীর আঁচলে সর্বক্ষণ চোখ রেখে রেখেই দৃষ্টিটা সেই ছেলেবেলা থেকেই আঁচলমুখো হয়ে থাকল। মার কথা মনে পড়ে ; তাঁকে দেখতুম, পিঠের ওপর চওড়াপাড় শাড়ির আঁচলটা ছড়িয়ে আছে, এক কোণে তার চাবির রিঙ্ বাঁধা ! বালক মনকে আকর্ষণ করার মতন যতগুলি ভাণ্ডার ছিল বাড়িতে, প্রায় সেই নীলদাড়িঅলা বুড়োর গল্পের মতনই মা সেগুলিকে চাবিবন্ধ করে রেখেছিলেন। এখনও বেশ মনে পড়ে, মেহগনি কাঠের ছোট্ট একটি হাতবাক্স ছিল মার। বালিকা-বয়সে যখন নববধূর বেশে স্বামীগৃহে আসেন, তখনই সঙ্গে করে এনেছিলেন, শ্বেতপাথরের আর বিলিতি কাঁচের পুতুল ভর্তি করে। পুতুলের সেই হাতবাক্সটির ওপর আমার লোভ ছিল খুব। কিন্তু মার আঁচলের চাবি আমার উদগ্র লোভকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যর্থ করেছে। এ-ছাড়াও মনে পড়ছে, জালি-দেওয়া সেই আলমারিটার কথা, যার মধ্যে আচার মোরব্বা ইত্যাদি জিভে-জল-টানা টুকটাক খাবার থাকত তালাবন্ধ হয়ে। আর এ-কথা না বললেও চলে, সেই তালার চাবিও থাকত মার আঁচলে বাঁধা চাবির গোছার মধ্যে। সেই থেকে মার আঁচলের ওপর আমার দৃষ্টিটা হয়ে উঠেছিল সতীন-সুলভ। ভাবতুম, সব সর্বনাশের মূল ওই আঁচল। ঈশ্বর যদি মার ওই আঁচল নামক জিনিসটুকু না রাখতেন, চাবির গোছা সব সময় পিঠে পিঠে বয়ে বেড়ানো মার পক্ষে কি সম্ভব হতো ? কখনওই না। ওটা থাকত কোথাও ইতি-উতি আর তা হস্তগত করা অসাধ্য হত না আমার। আজও অবাক হয়ে ভাবি, কত দুপুরে ভীষণ লক্ষ্মীছেলে সেজে মার পাশে গলা জড়িয়ে শুয়েছি, তারপর সুযোগ বুঝে কত সন্তর্পণেই না চেষ্টা করেছি আঁচলের গিঁটটা খুলে চাবির গোছাটা হস্তগত করার ! দুর্ভাগ্য আমার, পুত্রের সকল চেষ্টাই জননী অনায়াসে ব্যর্থ করেছেন। বেশ বুঝতে পারি, বাল্যকালে যে-ঐশ্বর্যের প্রতি আমার সতত আসক্তি ছিল মার আঁচলই সেই ঐশ্বর্যের অধিকারে বাদ সেধেছে। অথচ, আশ্চর্য, যখন দেখতুম, গলায় আঁচল জড়িয়ে তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিচ্ছেন মা, প্রণাম করছেন—তখন, কী জানি কেন, হয়তো সেই বিশেষ মুহূর্তের রূপটুকুই আঁচল সম্পর্কে আমার সতীন দৃষ্টিকেও কোমল করে তুলত।...এই তো গেল মার কথা, তারপর আসে ছোট মাসীর আঁচল। মাসীর আঁচলকে ছেলেবেলাতেই মনে হয়েছে, দেবতার বর রাখা ঝুড়ি, খুশির পুঁটলি। তখনও মাসীর বিয়ে হয়নি ; মার মতন ভব্য-সভ্য হয়ে আঁচল ঝোলায় না, চাবি বাঁধে না কোণে। তার আঁচল এই হাওয়ায় উড়ছে, এই লুটোচ্ছে ধুলোয়, কখনও কোমরে জড়ানো, কখনও-বা পুঁটলি হয়ে ঝুলছে পিঠে। কোন ভোরে মল্লিকদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মাসী বেল ফুল তুলছে, হয়তো-বা গাছতলা থেকে মুঠো-মুঠো শিউলি কুড়িয়েছে—সব দেখো, আঁচলে বাঁধা। বাড়ি এসে মাসী আঁচল খুলে সব ফুল উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে আমার হাতে। শুধু কি ফুল ? অল্প অল্প শীতের আমেজ, মাথায় গায় রদ্দুর মেখে, দুপুরে লুকিয়ে-লুকিয়ে মাসীর আঁচলে বাঁধা কাঁচা কুল আমরা কী মজা করেই না খেতাম। চেয়ে চিন্তেও মার কাছ থেকে যা জুটত না, না চাইতেই মাসীর আঁচল থেকে চুপি চুপি তা টুপ্ করে ঝরে পড়ত আমার হাতে। গালমন্দ, কানমলা, থাবড়া খেয়েছি মার কাছে, মাসী এসে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়েছে। খেলতে গিয়ে হাত পা ছড়ে-কেটে যদি বাড়ি ফিরেছি মুখ চুন করে মাসী, ছুটে এসে কাটা-ছড়া জায়গা জড়িয়ে ধরেছে রক্ত বন্ধ করতে। আর এ তো আমার অভ্যেসই ছিল, ঘুমোবার আগে যত

রাজ্যের গল্প শোনার সময়, মাসীর আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে, পা ঢাকা দিয়ে বসতাম। আমার ভাগ্য ভালো, মাসীর আঁচল ছিল সর্বদাই সদয়, মার নির্দয় আঁচল দেখে দেখে হয়তো আমার বীতরাগ জন্মে যেত আঁচলের ওপর। ছেলেবয়সের এই আঁচলমোহ, আঁচলমুখো চোখ আর অন্য কোথাও থেকে আবেগ উৎসাহ ধার করেনি, কেবল আর একটি জায়গা ছাড়া। আমাদের স্কুলে যে-বাঙলা বই পড়ানো হত তাতে ছিল এক কবিতা, নাম 'শরৎ', রবীন্দ্রনাথের লেখা। কবিতাটা তো অসম্ভব সুন্দর ঠিকই, ছেলেবেলায় আরও সুন্দর মনে হত, বিশেষ করে পুজোর আগে আগে সময়ে। যেন চোখের সামনেই শরৎকালের বাঙলা মাকে দেখতে পেতুম। কবিতাটা মুখস্থ করার ধুম পড়ে যেত আমাদের। আর ক্লাসেও মাস্টারমশাই, প্রায় নিত্য তার অংশ তুলে তুলে অর্থ লেখাতেন। এই কবিতায় দুটি অংশ আছে, যা ছেলেবেলায় আমায় যত আনন্দ দিয়েছে, তত বিস্ময় আর কল্পনা। 'ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার নবীন জীবন উড়ায়ে—' এই লাইনটি পড়তাম আর ইলিবিলি মন নিয়ে ভাববার চেষ্টা করতাম, বাতাসের আঁচল—আহা, না জানি কী সুন্দর জিনিস! আঁচলের রঙ কি সাদা, তার কি পাড় আছে লতাপাতায় বোনা কিংবা শাঁখ আঁকা-আঁকা ?.... এই কবিতার আর এক জায়গায় আছে—'মাতার কণ্ঠে শেফালি মাল্য, গন্ধে ভরেছে অবনী। জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত শুভ্র যেন সে নবনী।' কানের কাছে যে-শরৎ গুনগুন করত, এই কটি লাইন পড়তে পড়তে সেই গুনগুনোনি হঠাৎ থেমে যেত। শেফালির মালা যেন চোখের সামনেই দেখতে পেতাম, কিন্তু 'জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত'—এ আর কিছুতেই কল্পনায় আসত না। ভেবে-ভেবে যখন আকুল, আকাশ দেখে দেখে অধীর, তখন ছুটে যেতাম মাসীর কাছে। 'ও মাসি, আমায় জলহারা মেঘ আঁচল দেখাও!'...মাসী হাসত। বলত, 'আয়, দেখাই।'

আর পাঁচজনের মতন আমারও বাল্যকালের বেলা বয়ে গেল, কেটে গেল কৈশোর, এসে পৌঁছলাম যৌবনের দরজায়। ধুতরো-ফুলের মধু-খাওয়া নেশাকরা পাখিরা আগল খুলে দিল। বিচিত্র ইন্দ্রপুরী ; স্থলে-জলে শুধু রঙ, শুধু সুর, আকাশ-মাটিতে খুশির হোলি খেলা, মনে-মনে আবির ছোঁড়াছুঁড়ি। এই তো যৌবন, জীবনভোরের একটি বসন্ত ঋতু। দুঃখ থাক, দায়িত্ব থাক, রোগ, শোক, তাপ—থাক না সবই, তবু যৌবন ফুটে উঠবেই, হিম পাঁক আবর্জনা সব তুচ্ছ করে পদ্মফুলের মতন নিরালা কোনও পুকুরে। আর একবার সে-সূর্যের দিকে মুখ তুলে চাইবেই। এই চাওয়াটুকু ঘিরে যত কাঁপন, যত ব্রীড়া, যত আশা, আশাতীত কামনা, কল্পনা, বাসনা—তাকে নিয়েই কাব্য : যৌবনের, জীবনের। রসের সিঞ্চনে এ-কাল, এর কাব্য সিক্ত। যখন এই রসের সমুদ্রের স্বাদ পেলাম, দেখলাম, এখানেও অনেক আঁচল আছে, অনেক আশ্চর্য সুন্দর আঁচল যাতে কাঁটা বিঁধে যায়, যে-আঁচল খুলে পড়ে, হাতছানি দেয়, আপন বিভবে ময়ূরের পাখার মত ছড়িয়ে থাকে ঝিকিমিকি রঙ মেখে। আমি তো ভাবতেই পারি না, যুবক বয়সে কোনও না কোনও আঁচল দেখে মুগ্ধ না হল, মতিভ্রম না ঘটল, মাতাল না হল, এমন কেউ আছে এ-ভূভারতে। যে-লোক হয়নি, এমন যদি কেউ থাকে, তবে বলব চোখ থেকেও সে অন্ধ ; তার চিত্ত আছে, রসানুভূতি নেই। আর যিনি রসিক তাঁর চোখে আঁচল যে আকাশের মতন, স্বপ্নকল্পনার দিগন্ত। এই সামান্যই তাঁর চোখে অসামান্য হয়ে ধরা দেয়। তাই কি নয় ? 'শকুন্তলা' নাটকের সেই দৃশ্যটির কথা ধরা যাক—যেখানে পরস্পরকে প্রথম দেখে দুষ্মন্ত আর শকুন্তলা পরস্পরের প্রতি অনুরাগাসক্ত হয়ে উঠেছে। সাক্ষাৎ এবং সামান্য কিছু আলাপ-আলাপনের পর শকুন্তলা রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে সখিপরিবৃতা হয়ে, অথচ পা এগিয়ে চ লেও মন যেতে চায় না ; মন বলছে, আর একটু দাঁড়াও দুষ্মন্তের কাছে। ভীরু তাপসকন্যার অনুরাগ সঞ্চারের, মন-চাঞ্চল্যের এই মুহূর্তটুকু ফুটিয়ে তুলতে কালিদাস যে-চিত্র এঁকেছেন তাতে দেখি, যেতে-যেতে শকুন্তলা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। অনসূয়াকে বলছে, সখি, একটু দাঁড়া ; কুশাঙ্কুরে আমার পা কেটেছে, কুরুবকের ডালে আমার বাকলের আঁচল জড়িয়ে গেছে, ছাড়িয়ে নিই। এই কথা বলে শকুন্তলা ঘাড় বেঁকিয়ে বাকলের আঁচল ছাড়াবার ছলে দুষ্মন্তকে দেখে নিচ্ছে আবার। বলা বাহুল্য, কালিদাস যদিও 'আঁচল' শব্দটি ব্যবহার করেননি, তবু বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়, পিছন থেকে কুরুবকের ডালে আর কী আটকানো সম্ভব একমাত্র বাকলের আঁচল ছাড়া।... এই চিত্র ছাড়াও আর একটি চিত্রের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। শকুন্তলা যখন কণ্বমুনির আশ্রম ত্যাগ করে

চলে যাচ্ছে—সেই অপূর্ব বিদায় দৃশ্যটির কথাই বলছি। কোনও শিল্পীর আঁকা এক ছবি দেখেছিলুম, এই দৃশ্যটি যার উপজীব্য। তাতে ছিল : রোরুদ্যমানা শকুন্তলা পথ চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, পিছন থেকে এক হরিণশিশু এসে শকুন্তলার বসনের আঁচল ধরে টানছে। এই সেই হরিণশিশু—শকুন্তলা নাটকে যার বর্ণনা আছে, সুতীক্ষ্ণ কুশাগ্রে এই মৃগশিশুর মুখ ক্ষতবিক্ষত হলে, শকুন্তলা, স্বহস্তে ইঙ্গুদী ফুলের তেল দিয়ে, মুঠো মুঠো শ্যামাধানের শিষ খাইয়ে যাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল, যাকে সে পুত্রের মতো দেখত। আজ শকুন্তলার যাবার বেলায় সেই হরিণশিশুও এসে বাধা দিচ্ছে।... বলতে কি, আমি তো ভেবেই পাই না, সামান্য আঁচল থেকে যে-অনন্যসাধারণ দুটি মুহূর্ত, দুটি চিত্র সৃষ্টি হল, তা আর কীভাবে হতে পারত, আর কোন্ অতিসাধারণ জিনিসের সাহায্য নিয়ে!

এমন কোনও ভারতীয় কবি কে আছেন জানি না, আঁচল সম্পর্কে যিনি উদাসীন থাকলেন। জয়দেবকে দেখেছি, শ্রীরাধার বসনাঞ্চলকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন; চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসেরও যথেষ্ট দুর্বলতা দেখেছি রাধার আঁচলের ওপর। এঁদের রাধা আঁচলের আড়ালে প্রদীপ ঢেকে বিক্ষুব্ধ অন্ধকার রাত্রে অভিসারে যান, চঞ্চল কানুকে বেঁধে রাখতে চান আঁচলে। রাধার আঁচল বাতাসে উড়ে গেলে কবিদের মনে হয়, আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গেল। আর কৃষ্ণর কথা নাই-বা বললুম, রাধার আঁচল ধরে টানতে তাঁর সংকোচ নেই। .. হয়তো মনে হতে পারে, আঁচল নিয়ে কাব্য করার সময় নেই, তখনই শেষ হয়েছে। এমন মনে হলে বলব এ-ধারণা ভুল। রবীন্দ্রনাথের চোখেও আঁচল কিছু কম সুন্দর মনে হয়নি, কোথাও এমন নিদর্শন নেই, যাতে মনে করা যেতে পারে, আঁচল-বিহীন বসনের সৌন্দর্যকে তিনি অধিকতর মনোহর মনে করেছেন। বরং তাঁর চোখে আঁচল যে কত নব নব রূপে এসে দেখা দিয়েছে, তার দু'একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। কবির 'ভ্রষ্ট লগ্নে'র নায়িকা ময়ূরকণ্ঠী কাঁচল পরে 'দুর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে' টেনে দেয়, তাঁর কাব্যলোকের তরুণ-তরুণীরা অনঙ্গ দেবতাকে সংবর্ধনা জানাতে পথে 'আঁচল হতে অশোক চাঁপা করবী' ছড়ায়, তাঁর আত্মসমর্পণ-আকুলা নায়িকা প্রিয়ের চরণে সমস্ত সমর্পণ করে কাঙাল হয়ে বলে, 'আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া তোমারে পরানু বাস...'। শুধু এতেই শেষ নয়, দূর-কালের গার্হস্থ্য কোনও চিত্র যখন মনে আসে, কবি এমন সেবিকাকেও চোখে দেখতে পান, যে তাঁকে 'আঙিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়, সে আঁচল দিয়ে ধুলো দেয় মুছিয়ে।'

কাব্যসাহিত্যের প্রাঙ্গণ থেকে নেমে এসে যখন দাঁড়াই আমাদের এই প্রাত্যহিক জীবনে, তখনই কি আঁচলের সব সুধা নিঃশেষ হয়ে যায়? না, তাও নয়। তা যে হয় না, সে কথা তো আগেই বলেছি। মার আঁচল, মাসীর আঁচল, স্ত্রী, প্রিয়া, এমন-কি কন্যার আঁচলেও আমাদের মনের এক একটি বিশেষ-বিশেষ সুখ, আশা, স্বপ্ন, শোক, সান্ত্বনা জড়িয়ে আছে। আসলে, আঁচল যেন কিসের একটা প্রতীক, বিশেষ করে আমাদের এই বাঙালীদের জীবনে। সমাজে এর স্থান আছে, ধর্মে কর্মে, সর্বত্রই। বিয়ের গাঁটছড়া, সে তো বাঁধে নববধূর আঁচলে আর বরের উত্তরীয়ের সাথে। বিবাহের পর কন্যা যখন পিতৃগৃহ ত্যাগ করে চলে যায়, তখন পিতৃগৃহের ঋণ যে-তণ্ডুলকণা দিয়ে সে পরিশোধ করে যায়, মা আঁচল পেতে তা গ্রহণ করেন। এমনি আরও আছে, অনেক কিছু। তাই, মাঝে-মাঝে ভাবি, আমাদের সমাজের মেয়েদের মাপাজোক, আঁটসাঁট জীবনে, সংসারে দিয়ে থেকেও যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে, তাদের বসনের মতই, যার মধ্যে তাদের রাগ, অনুরাগ, স্নেহ, বিরহ, সতর্কতা, শোক আর সঞ্চয়—একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই সঞ্চিত হচ্ছে—তারই কি প্রতীক নয় আঁচল?

"দেশ"। ১৬ মাঘ, ১৩৬০।

ছদ্মনাম

পত্রনবীশ

এতকাল সাহিত্যিকরা ভেবে এসেছেন, 'কী লিখব' অথবা 'কেমন করে লিখব'। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যের সিংহচর্মে আবৃত হয়ে আরেকদল আসরে নেমেছেন, যাঁদের হাতেখড়ির প্রথম প্রশ্নই হল : কেন লিখব ? প্রশ্নটা সাহিত্যিকের, কিন্তু উত্তরটা নয়। কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি উত্তরটা তাঁদের : লিখব শুধু আত্মপ্রচারের জন্যে। আমিও এ-দলের। সাহিত্য বা সাহিত্যের বাজারকে টিকিয়ে রাখার ভার নিজের ঘাড়ে টেনে এনে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করার ইচ্ছে আমারও। কিন্তু জীবনে অসংখ্য প্রেমের চিঠি, বাজারের হিসেব, লেজারের খাতা লিখে নিব ভোঁতা করা কলমটা হাতে নিয়ে বাংলা ভাষায় জীবনের প্রথম অপ্রয়োজনীয় লেখা লিখতে শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গে যে-প্রশ্নটা সেলাম জানিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল তার মূল বক্তব্য শুনলাম, কী নামে লিখছো ?

ভাবলাম, কথাটা ভাববার মতই। কী নামে লিখব ? 'কী লিখব' এ-জিজ্ঞাসা স্বভাবতই ইলেকশন-জয়ী সদস্যের প্রতিশ্রুতির মত উবে গেল। লক্ষ্য বিষয়বস্তু থেকে ব্যক্তিতে গিয়ে পৌঁছল। ভাবলাম, অসকার ওয়াইল্ডের 'অল আর্ট ইজ ইউসলেস' মন্তব্যটাকে যখন অনেকেই উল্টে নিয়ে ইউসলেস সব কিছুকেই আর্ট বলে জাহির করছেন—শুধুমাত্র আত্মপ্রচারের বলে, তখন আমি এক অখ্যাত অজ্ঞাত হবু সাহিত্যিকই বা মহাজন খুরাঙ্ক অনুসরণ করে কেননা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠার চেষ্টা করি !

এই বিখ্যাত হয়ে ওঠার সবচেয়ে শর্টকাট রাস্তা হল ছদ্মনাম গ্রহণ করা। নামী হওয়ার চেয়ে বেনামী হওয়ায় একটা বিশেষ লাভ আছে, বেনামী সম্পত্তির মালিকের মতো ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারা। সাহিত্যের ট্যাক্‌সো নিষ্ঠা আর পরিশ্রম, কিন্তু শ্রাদ্ধে মূল্য ধরে দেওয়ার মতো ফাঁকির পিছন-দরজা হল ছদ্মনাম।

নিজেকে অপ্রকাশ্য রাখার ভান করে এত বেশী করে প্রকাশ করার জন্যে আস্তিনে লুকিয়ে রাখা একমাত্র টেক্কা—এই ছদ্মনাম।

কে কবে প্রথম নিজেকে বেনামী করেছিল, তা জানিনে। সম্ভবত, ছদ্মনামের জন্ম হয়েছিল মুখোশ থেকে। 'ওয়ান্স আপন এ টাইম' দিয়ে শুরু করা এবং ঈশপের নামে চালিয়ে আসা গল্পের গর্দভ আগে সিংহচর্ম পরেছিল, না দাঁড়কাক আগে ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়েছিল তা বলতে পারিনে, কিন্তু মানুষ যে ডাকাতি বা রাহাজানির জন্যে প্রথম মুখোশ আবিষ্কার করে এবং চুরি জোচ্চুরির দায় থেকে রেহাই পাবার জন্যে নাম ভাঁড়াবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, সে-সম্বন্ধে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।

সুতরাং, বুঝতেই পারছেন, ছদ্মনামের সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটা বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। অবশ্য, ব্যতিক্রম যে নেই এমন নয় ! হারুন-অল-রসিদের মহত্ত্ব লুকিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে চলাফেরার জন্যেও ছদ্মনাম অনেকে নিয়েছে। শেষোক্ত যুক্তিটা খুঁজে বের করতে হল নিজেকে এবং তার সঙ্গে শ্রদ্ধাভাজন কয়েকজনকে বাঁচাবার জন্যে। যাঁরা মহৎ, তাঁদের কাছে ছদ্মনাম ত্যাগের সামিল, অন্তত একদিনের জন্যও বাদশাহী তক্ত ছাড়তে হয় তাঁদের। কিন্তু যাঁরা সাধারণ, তাঁরা মোটা অঙ্কের ডিভিডেণ্ড ভোগ করেন এরই কল্যাণে। বিশেষ করে সাহিত্য-যশঃপ্রার্থীরা। অজানাকে জানবার যে দুরন্ত মোহ, তাকে এত নিপুণভাবে এক্‌সপ্লয়েট করা অমুকচন্দ্র অমুকের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, কিন্তু দুটি উল্টোনো যতিচিহ্নের মাঝখানে 'অমুক'-এর পক্ষে স্বভাবজ। ছদ্মনাম সম্পর্কে পাঠককুলের স্বাভাবিক ঔৎসুক্য আছে, আর উৎসুক্য জাগাতে পারাই লেখকের পক্ষে থ্রি-কোয়ার্টার সাফল্য।

এইসব বিভিন্ন যুক্তির বলেই সাধারণত অসাহিত্যিকরা ছদ্মনাম নিয়ে থাকেন, কিন্তু আমি ছদ্মনামের অনুরাগী এই কারণে যে, সত্যিকার সাহিত্যিক ও কবিদেরও ছদ্মনামের আশ্রয় নিতে দেখেছি।

উদাহরণ : রবীন্দ্রনাথ।

সব বিষয়েই যেমন রবীন্দ্রনাথ অন্যদের চেয়ে এক হাত উঁচুতে ছিলেন, ছদ্মনামের ব্যাপারেও তেমনি। কত বিভিন্ন নামে যে তিনি লিখেছেন, কখনো খেয়াল-খুশির জন্যে, কখনো বা উদ্দেশ্য ছিল বলে, তার ইয়ত্তা নেই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'মুদ্রিতবরণা' 'বীণা অভিলাস' এবং ভারতীতে 'দুদিন' লিখেছিলেন তিনি দিকশূন্য ভট্টাচার্য নামে। এ-ছাড়া অকপটচন্দ্র ভাস্কর, আন্নাকালী পাকড়াসী নাম দুটিও তিনি ব্যবহার করেছেন। আর বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তিনি। সেদিন পুরনো পত্রিকা 'ভাণ্ডারে'র জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সংখ্যায় 'শ্রীমতী কনিষ্ঠা'র 'জলকষ্ট' এবং পরের সংখ্যাতেই জবাবে 'শ্রীমতী মধ্যমা'র 'অহেতুক জলকষ্ট' পড়ে মনে হল এ-দুটিও রবীন্দ্রনাথেরই ছদ্মনাম। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে চমকপ্রদ নাম : ভানুসিংহ।

ভ্যালেটের কাছে যে হিরো হওয়া যায় না, তা সাহিত্যিক মাত্রেই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং আপিসের সহযোগী সকলের কাছেই পরিচিত সাহিত্যিক টাকা খরচ করে লেখা ছাপান, কিংবা সম্পাদকের সঙ্গে বন্ধুত্বের বা আত্মীয়তার সূত্রে। আর অপরিচিত সাহিত্যিক মাত্রেই শুধুমাত্র বই বিক্রি করে বালিতে বা বালিগঞ্জে বাড়ি তোলেন। কমবয়েসী রবীন্দ্রনাথ এই অভিমানেই পদাবলী ধরনের কয়েকটি গান লিখে ভানুসিংহ নামের কোনও কাল্পনিক কবির প্রাচীন রচনা বলে আত্মীয়ের কাছে চালিয়েছিলেন, প্রশংসা পাবার আশায়। এই ভানুসিংহকে প্রাচীন মৈথিলী কবি মনে করে যে-বাঙালী ভদ্রলোকটি জার্মানীর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস লিখে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছিলেন, তাঁর নাম নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, এই ঘটনার কথা জানতে পারার পর থেকে জার্মানীর ডক্টরেট উপাধির ওপর আমি শ্রদ্ধা হারিয়েছি। শুনেছি ফ্রান্সেও নাকি এক ধরনের 'ডক্টরেট' দেওয়া হয়, যাকে ক্রসওয়ার্ডের ভাষায় বলে কনসোলেশন প্রাইজ। এঁরা ফ্রান্সে নামের আগে ডক্টর লিখতে পান না, কিন্তু অন্য দেশে উপাধির যথেচ্ছ ব্যবহার চালাতে পারেন। ঘরে বসে ডাকযোগে টাকা পাঠিয়ে মার্কিন ডিগ্রী পাওয়ার চেয়েও অবশ্য এটা একটু উঁচুদরের। কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত শুনেছি এই ধরনের 'ডক্টর'।

কিন্তু বৈদেশিক ছাপ (ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় যাকে বানরের ল্যাজের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন) যার নামের আগে বা পরে নেই, তাঁর পক্ষে ছদ্মনাম গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এ যেন সামনে ফুটলাইট দিয়ে পিছনের অন্ধকারে পর্দা টাঙানো। নিজে লিলিপুট হলেও ছায়াটা ব্রবডিগনাগের মতো দেখাবে।

এবংবিধ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে আমি কলম-নামের পক্ষপাতী হয়েছি। কিন্তু ভালো ছদ্মনাম নির্বাচন করা যে কত দুরূহ কাজ তা ভুক্তভোগীদের মতো আমাকেও জানতে হয়েছে।

ছদ্মনাম সংগ্রহের একটি সহজতম উপায় সকলের উপকারার্থে জানিয়ে দেওয়াই বিধেয়। অতএব আমার নিজের অভিজ্ঞতাটাই জানিয়ে দিই। আমি প্রথমেই একটি মোটাসোটা অভিধান নিয়ে বসেছিলাম। তারপর তুরীয় ভাবগ্রস্ত সন্ন্যাসীর মতো দু'চোখ বুজে হঠাৎ মাঝখানে একটি পাতা খুললাম এবং সঙ্গে-সঙ্গে চোখের পাতাও। তারপর বাম ও দক্ষিণের পৃষ্ঠায় প্রত্যেকটি শব্দ দেখে গেলাম। থাম, থুৎনি, থুৎকার, দংশ, দক্ষ, দক্ষজা, দক্ষসাবর্ণি, দগ্ধশলাকা ইত্যাদি শব্দগুলি পেলাম। মনে হল, এর মধ্যে যে-কোনও শব্দই দগ্ধশলাকা হয়ে দেখা দিতে পারে। অতএব পুনরায় অভিধান বন্ধ করা, পুনরায় তুরীয় ভাব, পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার প্রথম শব্দ পেলাম 'রাজনামা'। ইউরেকা বলার আগেই অর্থটুকুও চোখে পড়ল— পটোল। এর পরই যে-শব্দটি পাওয়া গেল, তা হল 'রাজযক্ষ্মা'। অতএব পুনরায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এইভাবে ট্রাই ট্রাই এগু ট্রাই করে গেলে ফললাভ অবশ্যই হবে। যদিচ বিখ্যাত ছদ্মনামীরা এ-পথ অবলম্বন করেন নি।

উদাহরণ : পরশুরাম।

শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু এই ছদ্মনামটি কিন্তু তাঁর 'চলন্তিকা' থেকে সংগ্রহ করেননি। শুনেছি জীবনের প্রথম ব্যঙ্গ-গল্পটি লিখে তিনিও আমার মতই ছদ্মনামের চিন্তায় বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন এবং এ-বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে-করতে নির্বাচিত প্রায় সব নামই খারিজ করে ফেলেছিলেন। এমন সময় তাঁর সামনে দিয়ে বাড়িতে ঢুকল তাঁদের পরিবারের স্যাকরা—পরশুরাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে ওই নামটাই বসিয়ে দিলেন তিনি গল্পের শেষে। অথচ তিনি যখন বিখ্যাত হলেন, তখন সমালোচক ও গবেষকরা কত কী অর্থ বের করলেন এই ছদ্মনামের। তাঁর ব্যঙ্গরচনাকে কুঠারের সঙ্গে তুলনা করা হল। এই ঘটনার পরও কি সমালোচক ও গবেষকদের উপর শ্রদ্ধা রাখতে বলেন? সে যাক, এই সূত্রে একটা খবর কিন্তু জানিয়ে রাখা দরকার যে, শরৎচন্দ্রও একদা 'পরশুরাম' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। 'বেণু' কাগজে 'নূতন প্রোগ্রাম' প্রবন্ধটি এই ছদ্মনামে লিখেছিলেন তিনি।

বাস্তব ঘটনা ছাড়াও অনেক সময় ছদ্মনাম নির্বাচনে স্বপ্নেরও সাহায্য পাওয়া যায়।

উদাহরণ : মার্ক টোয়াএন।

স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন নাবিক। সমুদ্র আর জাহাজই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তারপর নানা বিচিত্র ঘটনার ভেতর দিয়ে জীবন কাটিয়ে এসে এমন এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মুখোমুখি হতে হল তাঁকে যে, বিষয়টি নিয়ে রাত জেগে একটি কৌতুককর গল্প লিখে ফেললেন তিনি—'দি জাম্পিং ফ্রগ'। কিন্তু কী নামে পাঠাবেন গল্পটা— ভাবতে-ভাবতে এক সময় টেবিলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর স্বপ্নে দেখলেন, বিগত নাবিক-জীবনের একটি দৃশ্য। দেখলেন, তিনি নাবিক বন্ধুদের সঙ্গে জাহাজ থেকে দড়ি ফেলে জলের গভীরতা মাপছেন, আর গাইছেন একটি বহু-প্রচলিত গান—'বাই দি মার্ক ওয়ান; বাই দি মার্ক টোয়াএন : মার্ক টোয়াএন—অর্থ দ্বিতীয় চিহ্ন। ছদ্মনাম হিসেবে এর কোন অর্থ আছে কি নেই ভেবে দেখলেন না ক্লিমেন্স, ঘুম থেকে উঠেই ব্যঙ্গ-রচনাটির নীচে এই নামটাই বসিয়ে দিলেন। আর এই নামেই তিনি আজও বিখ্যাত।

বাস্তব জীবন হল প্রথম পৃথিবী, স্বপ্নকে বলা চলে দ্বিতীয় পৃথিবী। আর তৃতীয় পৃথিবী—জেলখানা। অনেকেই এই তৃতীয় পৃথিবীতে গিয়ে সাহিত্যের সম্পদ বাড়িয়েছেন। কিন্তু জেলখানায় যাঁরা চাকরি করেন, তাঁরা সাহিত্যের কোনও উপকার কোনদিন করেছেন বলে শুনিনি। অবশ্য সাহিত্যিককে ছদ্মনাম জোগানোও যদি সাহিত্যকর্ম হয়, তাহলে একজন পাহারাদারকে অন্তত সাহিত্যসেবক উপাধি দেওয়া চলে।

উদাহরণ . ও হেনরি

সিডনি পোর্টার কাজ করতেন একটি ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কের হিসেব মেলাতে গিয়ে অ্যাকাউন্টেন্টের নজরে পড়ল, বেশ কিছু টাকা তছনছ হয়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে পুলিসে খবর দিলেন তিনি, আর খবর শুনে সিডনি পোর্টার পালালেন টেকসাস ছেড়ে। পরে অবশ্য তিনি ধরা দিলেন এবং যথাকালে কারাদণ্ড ভোগ করতে হল তাঁকে। অনেকের ধারণা, পোর্টারের নিজের কোন অপরাধ ছিল না, শুধুই ভয় পেয়ে পালিয়েছিলেন তিনি এবং সেজন্যে বিচারকরা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। সে যাই হোক, জেলে থাকতে থাকতে গল্প লেখার সাধ জাগল তাঁর। কিন্তু নিজের কলঙ্কিত নামে গল্প ছাপলে কেউ পড়বে না ভেবে ছদ্মনাম খুঁজলেন তিনি। জেলখানায় তাঁর প্রহরী ছিল ও হেনরি। তারই নাম ব্যবহার করে গল্প লেখক হিসেবে বিখ্যাত হলেন।

এ-ঘটনার অবশ্য মতান্তরও আছে। অনেকে বলেন, টেকসাস থেকে পুলিসের ভয়ে নিউ অর্লিনসে পালিয়ে আসেন পোর্টার এবং সেখানেই তাঁর গল্প লেখার সূত্রপাত। কিন্তু স্বনামে পাঠালে পুলিসের কাছে ধরা পড়ে যেতে পারেন এই ভয়ে একদিন একটি মদের দোকানে বসে জনৈক সঙ্গীর সঙ্গে ছদ্মনাম সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, আর মাঝে মাঝে 'বয়' হেনরিকে ডাক দিচ্ছিলেন, ও হেনরি, আর এক বোতল! সঙ্গী বললেন, এই তো চমৎকার ছদ্মনাম—ও হেনরি।

ছদ্মনাম যে সব সময়ে লেখক নিজেই নির্বাচন করেন তা নয়। অনেক সময় এটি অপরের দ্বারা আরোপিত হয়, কখনও প্রশংসার ছলে, কখনও বিদ্রূপের ছলে।

উদাহরণ : জর্জ ইলিয়ট

মেরী এ্যান ইভানস্ নামের মেয়েটি নাকি যৌবনেও কোনও পুরুষের চোখে সুন্দর হয়ে দেখা দিতে পারেনি। ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, কোথায় যেন পড়েছি যে, মেরী নিজে সুন্দর না হলেও কোনও একজনকে তার সুন্দর মনে হয়েছিল এবং তার হাবেভাবে কথাবার্তায় সকলেই বুঝতে পারত যে, এই মেয়েটি ওই বিশেষ যুবকটিকে মন দিয়ে ফেলেছে। এতৎসত্ত্বেও কেন সে মেরীকে বিয়ে করতে চায় না, প্রশ্ন করায় যুবকটি তার বন্ধুকে বলে, 'ভালবাসা পাওয়াই তো সব নয়, চেহারা ভালো না হলে কি কোনও মেয়েকে ভালবাসা যায়? মেবী যে দেখতে একেবারে জর্জের মতো, মিঃ ইলিয়টের ছেলে জর্জের মতো কুৎসিত।'

তারপর কী করে যেন মেরী ইভানসের কানে গেল কথাটা ; এবং এ-আঘাত সে সারা জীবনেও ভুলতে পারল না। তাই সারা জীবন এই জর্জ ইলিয়ট নামে লিখে গেল অসংখ্য উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ। যে-যুবকটি ইভান্‌সকে আঘাত দিয়েছিল, অনেকে সন্দেহ করেন, তিনি হার্বার্ট স্পেন্সার। ঠিক এই ধরনের মন্তব্য লিখেও রেখে গেছেন তিনি। জর্জ ইলিয়ট নাম নাকি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। পরবর্তী জীবনে অবশ্য সমালোচক জর্জ হেনবী লিউইস বিয়ে করেছিলেন মেরী ইভানসকে এবং লিউইসের মৃত্যুর দু' বছব পরেই—মেবীর বয়স তখন ষাট,—জনৈক মিস্টাব ক্রসকে বিয়ে করেন মেরী ইভান্‌স।

অপরের দ্বারা আরোপিত আরও একটি ছদ্মনাম আছে।

উদাহরণ : Q

ইস্কুলে পড়বার সময় থেকেই ছেলেটি একটু প্রিকশাস হয়ে উঠেছিল। শিক্ষকদের বিব্রত করতে তার মতো ওস্তাদ আর একজনও ছিল না। দু' মিনিট অন্তর তিড়িং করে বেঞ্চি থেকে দাঁড়িয়ে উঠবে, আর এমন এক একটা প্রশ্ন করে বসবে যে, শিক্ষকমশাই ঘেমে অস্থির সঠিক উত্তর দিতে। ছেলেটা বুদ্ধিমান, পড়ুয়া হিসাবে ভালো, কিন্তু প্রশ্নগুলো বড় বেয়াড়া ধরনের। তাই ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তার নাম দিলেন 'Q' অর্থাৎ কোয়েশ্চেন-এর সংক্ষিপ্ত চিহ্ন। পরে ছেলেটি যখন সমালোচনা লিখতে শুরু করল, তখন সে 'Q' নামটি ত্যাগ কবল না। বহুকাল পরে তবে পাঠকরা জানতে পেরেছিল যে, তাঁর আদি নাম স্যার আর্থার কুইলার কাউচ।

এর আগে যে-ক'টি ছদ্মনামের গোপন তথ্য পরিবেশন করেছি, তা হয়তো আমার মতই পাঠকরাও অন্য কোথাও-না-কোথাও পড়েছেন। সুতরাং প্যারীচাঁদ মিত্র কী করে 'টেকচাঁদ ঠাকুর' হয়েছিলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচা', বঙ্গবাসীর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চানন্দ', প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল', শরৎচন্দ্র কেনই বা 'অনিলা দেবী', 'পরশুরাম' এবং 'অনুপমা' হয়েছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'নবকুমার কবিরত্ন' এবং রবীন্দ্রনাথ মৈত্র 'দিবাকর শর্মা', সে-গবেষণা না করলেও চলবে। যাঁরা আগের কাহিনীগুলো জানতেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এগুলির ইতিহাসও জানেন।

ছদ্মনামী হলেই যে লেখক পাঠকের ঔৎসুক্য অর্জন করেন, তা নিঃসন্দেহ, কিন্তু বিখ্যাত হন তাঁরাই, যাঁদের ছদ্মনামের পিছনে কোনও ঘটনা আছে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, আমার ক্ষেত্রে ঠিক এই মুহূর্ত পর্যন্ত অভিধান যেমন সাহায্য করতে রাজী হল না, তেমনি কোনও অভাবনীয় ঘটনাও রুপোর রেকাবিতে পানের খিলিব বদলে একটি ছদ্মনাম তুলে ধবল না। সোয়াবিয়াব জাদুকর ফাউস্টও শয়তানেব চর মেফিস্টোফিলসের সঙ্গে করমর্দন কবেছিল, কিন্তু ভাগ্য আমাব সঙ্গে দেখছি রাজী নয়।

না, এবংবিধ অবস্থায় একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। রচনাটি প্রায় শেষ করে এনে যখন ভাবছি, কী নামে সম্পাদকের দরবারে পাঠানো যায়, সেই মুহূর্তে সত্যিই একটি ঘটনা ঘটে গেল। কলকাতা শহরের শ্রেষ্ঠ ইংরেজী দৈনিকের লালরঙা নাম-প্লেট ঝোলানো সাইকেলের পিয়ন এসে কলিং বেল টিপল। ওড়িয়া চাকরটা ছুটে গেল, নিয়ে এল একখানা চিঠি। এ-যাবৎ একটিও বাঙলা রচনা না লিখে যে বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিকটিতে শুধুই বেনিয়া ব্রিটিশের মাতৃভাষায় চটকদার প্রবন্ধ লিখে এসেছি, সেই পত্রিকার সম্পাদক কশ্চিৎ পাঠিকার লেখা একটি চিঠি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাঠক, বিশেষ করে পাঠিকাদের প্রশংসাপত্রে আমাব অরুচি ধরে

গিয়েছে, প্রথম-প্রথম খুশি হয়ে উত্তর দিতাম, তারপর শুধুই খুশি হতাম—উত্তর দিতাম না, বর্তমানে খুশি হই, কিন্তু পড়ে দেখি না। তা সত্ত্বেও এ-চিঠিখানি আমি পড়তে বাধ্য হলাম, কারণ চিঠিটা ছোট, ঠিক হ্যাণ্ড গ্রানাডের মতো। বিস্ফোরণ তাই বেশি। পাঠিকা লিখেছেন, 'আপনার ইংরেজী প্রবন্ধটি পড়ে খুশি হয়েছি এই ভেবে যে, আপনি বাঙলায় লেখেন না। এরপর আপনি যদি ইংরেজিতেও না লিখে বোর্নিও বা আইসল্যাণ্ডের ভাষায় লেখেন, তাহলে আরও খুশি হব। ও-দুটি ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকায় আপনার লেখার সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে না। খুশি হবার কথা নয় কি?'

নীচে নাম সই। পদবী পত্রনবীশ।

চট্ করে পদবীটি কুড়িয়ে নিলাম। 'পত্রনবীশ'—চমৎকার ছদ্মনাম। 'পত্রনবীশের চিঠিপত্র' নাম দিয়ে বেশ একখানা রম্যরচনার বই লেখা যাবে, আর ভূমিকাটা একটু সত্যিমিথ্যে জড়িয়ে লিখলেই বেলে লেটার্স বা জুর্নাল বলে চালাতে এতটুকু অসুবিধে হবে না। ফরাসী নামে পাঠকরা আজকাল একটু মজে বেশি। ভাবলাম, কে জানে, আজকের এই ছদ্মনামধারী 'পত্রনবীশ' অদূর ভবিষ্যতে বাংলার সাহিত্যারণ্যে হয়তো কোনও বনস্পতি বিশেষ হয়ে উঠবে। বনস্পতি শব্দ মারফৎ আমি অবশ্য ঘৃতের ছদ্মবেশে স্বনামপ্রসিদ্ধ সামগ্রীটুকুই বোঝাতে চেয়েছি। বর্তমান দিনের সব রম্যরচনাই সেই বস্তু কিনা!

"শুভদৃষ্টি"। ১৩৬২।

কামরাডেয়ারি

রূপদর্শী

কুমুদ !

মনে পড়েছে। ওর নাম ছিল কুমুদ। একই অফিসে কাজ করতাম আমরা। আমরা লেখার কাজ করতাম। কুমুদ ছিল, যাকে বলে আমাদের জোগালে। কুমুদ আমাদের এতই মান্য করত যে মাঝেমধ্যে আফিসের কাছে দেশি মদের দোকানে যদি দৈবাৎ দেখা হয়ে যেত তো, সে বেজায় অস্বস্তিতে পড়ত। আমাদের দলে শান্তিদা ছিলেন মনেপ্রাণে কমিউনিস্ট। ব্যাপারটা, মানে কুমুদের এই অস্বস্তি, শান্তিদার প্রাণে বড় বাজত। দেশির দোকানটা এতই ছোট, কোনও আড়াল ছিল না, তাই কুমুদ আমাদের দেখলেই জড়সড় হয়ে মুখটা তেরচা করে গেলাসে চুমুক দিত। ওর সঙ্গে কোনও দিনই আমাদের চোখাচোখি হয়নি। আমার আর ভূপালদার এতে কিছু যেত আসত না। কিন্তু শান্তিদার কষ্ট বেড়েই যেত। আমি যদি কোনও দিন বলতাম, এখানে যদি একটা কেবিন থাকত চাংওয়ার মতো, তাহলে সমস্যাটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত। শান্তিদা খেপে যেতেন। আবার কেবিন ! জাঙ্গিয়ার বুক পকেট !

শেষ পর্যন্ত আমাদেরই পাড়াটা ছাড়তে হল। কারণ কুমুদের পক্ষে ওই দোকানটাই ছিল সব চাইতে সুবিধেজনক। কুমুদ যে আফিসের বাইরেও আমাদের পাতি বুর্জোয়ার অবতংস ধরে নেবে, কিছুতেই যে তার সঙ্গে আমাদের কামরাডেয়ারি হল না, হতে দিল না কুমুদ, এমন কি দেশি মদের দোকানেও, শান্তিদার এই যন্ত্রণার লাঘব হয়নি।

যেমন সব আফিসেই থাকে, আমাদের আফিসেও সেই রকম ইউনিয়ন ছিল। এবং সেটা ছিল কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণে। শান্তিদা এক সময়কার নাম লেখানো কমিউনিস্ট সদস্য ছিলেন। কিন্তু ইউনিয়নের সদস্য তিনি ছিলেন না। হতে পারে, শান্তিদা যে-সময়ের কমিউনিস্ট তখন পার্টি ভাগ হয়নি, তাই। অথবা আমাদের আফিসের ইউনিয়ন যে-কমিউনিস্টদের দখলে, শান্তিদাকে তাঁরা যথেষ্ট কমিউনিস্ট বলে মনে করত না। কিংবা সেটা ছিল মূলত ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, এবং আমরা ওয়ার্কার্স নই, তাই শান্তিদা ইউনিয়নের সদস্য হতে পারেননি। অথবা এমনও হতে পারে যে, শান্তিদা অনেক পোড় খাওয়ার পর, নিজেই আর ও-পথে যেতে রাজি হননি। সে যাই হোক, মোদ্দা কথা এই যে, শান্তিদা ইউনিয়নের নাম লেখানো সদস্য ছিলেন না। কিন্তু ইউনিয়নের দাবিদাওয়ার প্রতি ওঁর যথেষ্ট সমর্থন ছিল। যে-সময়ের কথা বলছি, সে-সময়ে আমিও ইউনিয়নের অনেক দাবিরই সমর্থক ছিলাম।

ইউনিয়ন অনেকগুলো দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনে নেমে গেল। প্রথমদিকে আমরা দু-একটা মিটিং-এ গিয়েওছি। আমি বা শান্তিদার কথা বলছিনে। আমাদের অন্যান্য সহকর্মীদের কথাই বলছি। প্রথমদিকে অনেকেই ইউনিয়নের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। টেবিলে বসে তাঁরা যতটা সময় ইউনিয়নের দাবিদাওয়া নিয়ে যেভাবে সোচ্চারে আলোচনা করতেন এবং আমাদের যেসব সহকর্মীরা ইউনিয়নকে পছন্দ করতেন না, তাঁদের প্রতি যে-রকম চোখা-চোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতেন, তাই থেকেই এ-ধারণাটা আমার মনে জন্মেছিল। হঠাৎ শোনা গেল ইউনিয়ন গেট-মিটিং করবে। সারা আফিসময় সে কী নিদারুণ উত্তেজনা। মনে হল, ইউনিয়ন গেট-মিটিং করা মানেই বোধ হয় অক্টোবর বিপ্লব ঘটে যাবে। আমাদের আফিসে এ-রকম কাণ্ড বোধ হয় এই প্রথম হতে যাচ্ছে।

আমি আমাদের আফিসের উপরওয়ালাদের কিছুটা স্নেহভাজন ছিলাম, এমন একটা ধারণা আমার ছিল। আবার এও দেখতাম যে, ইউনিয়নের সেই আমলের অনেক নেতারও আমার প্রতি একটা সস্নেহ ভাব রয়েছে। অন্তত আমার ধারণা ছিল তাই।

কাজেই মাঝখানে যখন কথা উঠল, ইউনিয়নের দাবি দিবসের সমর্থনে আফিসের সব কর্মীদের নিয়ে একটা সলিডারিটি দেখানো হবে, তখন এই প্রস্তাবটা আমার খুব পছন্দ হল। এবং আমার সহকর্মীদের মধ্যে আরও অনেকেরই দেখলাম, এই বিষয়ে দারুণ উৎসাহ। কেন না, ইউনিয়নের এই সাহস দেখে, আফিসের নন্‌-ওয়ার্কারদের মধ্যেও দাবিটাবি পেশ করা সম্পর্কে কথাবার্তা ততদিনে চালু হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ গোর্কির মাদার বইটা পড়ে নিচ্ছেন বা নিয়েছেন, এমন গুজবও আমার কানে আসতে লাগল। ভাবলাম, এ ভালই হল। মধ্যবিত্ত মনে সাহস একটা নতুন জিনিস। সলিডারিটির মধ্য দিয়ে সেটা যদি কায়েম হয়ে যায় তো একটা কাজের কাজ হয়।

কী করে সলিডারিটি দেখানো যায়, টেবিলে টেবিলে এ নিয়ে অনেক রকম আলোচনা চলতে লাগল। ইউনিয়ন একটা প্রস্তাব দিল, একটা দিন সকলেই দাবি ব্যাজ পরে আফিস করুন। আমার কাছে প্রস্তাবটা অত্যন্ত নিরীহ বলে মনে হল। ধর্মঘট নয়, পথসভা নয়, দাবি ব্যাজ পরে আফিস করা, এতে আপত্তিকর কী আছে?

হঠাৎ শোনা গেল, অর্থাৎ ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতিশীল নন্‌-ওয়ার্কার নেতাদের মুখ থেকেই শোনা গেল, এ-ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আপত্তি আছে। এই সংবাদটি জানিয়ে দিয়ে তাঁরা এমনও সমালোচনা করলেন যে এটা আর কিছুই নয়, আসলে কর্তৃপক্ষ ওয়ার্কার আর নন্‌-ওয়ার্কারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চান। সলিডারিটির আগের দিন আমি বাড়ি যাবার আগে কুমুদকে বলে গেলাম, আমার জন্য একটা ব্যাজ এনে রেখো। কুমুদ স্বভাব নিরীহ লোক। সে আমার দিকে চেয়ে বলল, আপনি ব্যাজ পরবেন? হ্যাঁ, বলে বেরিয়ে বাড়ি চলে গেলাম। এবং পরদিন যথারীতি আফিসে আসতেই কুমুদ আমার বুকে ব্যাজটি লাগিয়ে দিল। আমি তাই পরেই আফিস করলাম। আমার সতীর্থরা বারে বারে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। যেন আমি একটি আজব জীব। ইউনিয়নের সদস্যরা আমার কাজে খুবই প্রীত হলেন। এবং আমার শ্রদ্ধেয় কর্তৃপক্ষের একজন আমার দিকে একবার কটমট করে তাকিয়েই নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। এবং সলিডারিটি হল না।

এর পরেও যখন কুমুদ তার স্বভাব মতোই আমাদের দেখে মুখ ফিরিয়ে গেলাসে চুমুক দিতে শুরু করল, সেই দিনই স্থির করা হল, আমাদের ঠাঁই নাড়া হতে হবে। কুমুদকে বিব্রত করে লাভ নেই।

ইউনিয়নের আন্দোলন আরও একটু জঙ্গী রূপ ধারণ করল। এক দিনের প্রতীক ধর্মঘটের ডাক দিল। এবার নন্‌-ওয়ার্কারদের মধ্যে আবার নানা রকম বাতচিত চলতে লাগল। কিছু লোক প্রায় মনস্থির করেই ফেললেন যে, কর্তৃপক্ষের উপর আমাদেরও একটা চাপ দিতে হবে। তাতে যদি প্রতীক ধর্মঘট করতে হয় তো আর কী করা যাবে। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন যে ধর্মঘট করলে একদিনের বেতন কাটা যাবে। ইউনিয়ন বলল যে তারা আফিসে কাউকে সেদিন ঢুকতে দেবে না। নন্‌-ওয়ার্কারদের কাছে কর্তৃপক্ষ এবং ইউনিয়ন, এই উভয়েই সমালোচনার বস্তু হয়ে উঠল। তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে বললেন, এ কী অন্যায়, আমরা তো ধর্মঘট করিনি, তবে আমাদের বেতন কাটার কথা উঠছে কেন? কর্তৃপক্ষ বললেন, আফিসে যে না-আসবে, তারই বেতন কাটা যাবে। তাঁরা তখন ইউনিয়নের নেতাদের কাছে গিয়ে বললেন, দেখুন, আপনারা যখন ধর্মঘট করছেন তখন মাল তো বের হবে না। আমরা ঢুকি আর না ঢুকি, তাতে আপনাদের কাজ তো আর বানচাল হচ্ছে না। তাহলে আমাদের ঢুকতে দেবেন না কেন? ইউনিয়ন বলল, আফিসের ত্রিসীমানার মধ্যে যাদের দেখব, তাদেরই অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। নন্‌-ওয়ার্কাররা বললেন, এ তো বড় অন্যায় কথা! খামাখা আমাদের মাইনে কাটা যাবে! বাঃ!

প্রতীক ধর্মঘটের আগের দিন শান্তিদা আমাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি প্রতীক ধর্মঘটে যোগ দিচ্ছ, শুনলাম! কখন আসছ? বললাম, সকাল সাতটায়। শান্তিদা বললেন, আমার তো নাইট ডিউটি। তাহলে আমিও বাড়ি যাব না। ওদের সঙ্গেই বসে থাকব। শান্তিদা সলিডারিটি ব্যাজ পরেননি। ধর্মঘট সম্পর্কে কারও সঙ্গে কোনও আলোচনাও করেননি।

সাতটার সময় এসে দেখি, ধর্মঘটীরা এসে গিয়েছেন। শান্তিদাও একেবারে ফিটফাট, যাকে

বলে ধোপদুরস্ত, ওদের মধ্যে বসে আছেন। আমিও ওদের মধ্যে ফিট হয়ে গেলাম। ধর্মঘটী মহল থেকে চা দিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করা হল। সলিডারিটির প্রতীক হিসাবে আমরা দুজন দিব্যি জমে গেলাম।

রোদ যখন চনমন করে উঠল তখন শান্তিদা বললেন, চল একটু কিছু পেটে দিয়ে আসি। ওখান থেকে সটান যাওয়া হল হোটেল ব্রডওয়েতে। শান্তিদা শুধু বললেন, রোদে রামই প্রশস্ত। অতএব বসে বসে রাম টানা হল। এবং দুজনে ফিরে এসে নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়া হল। আমি ধর্মঘটী বন্ধুদের মুখে আমাদের দুজনার সাহস, ন্যায়নীতি বোধ, চরিত্রবল ইত্যাদি ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশংসাসূচক বাক্য শুনতে পেলাম। বেশ ভালই লাগতে শুরু করেছিল। তাই ঘণ্টাখানেক বাদে আবার দুজনে উঠলাম। এবং ব্রডওয়ে বারে গিয়ে ঢুকলাম। এবং আবার কিছুটা রাম উদরস্থ করলাম। মনে উচ্চ ভাবগুলি বেশ দানা দানা হয়ে ফুট কাটতে লাগল। আবার ফিরে এসে ধর্মঘটে বসলাম। দুপুরটা ক্রমেই তরল হয়ে আসতে লাগল।

বার কয়েক ফেরি মারার পর দেখি আমার ধর্মঘটী বন্ধুরা কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। থাকতে না পেরে একজন এক সময় বলেই ফেললেন, বারবার কোথায় যাচ্ছেন বলুন তো? বললাম, এই সামনেই, ব্রডওয়েতে। যাবেন না কি? তিনি একটু বিব্রত হয়ে বললেন, না। আমরা ও-সব জায়গায় যাইনে। বললাম, সামনেই আরেকটা সস্তাব জায়গাও আছে। তবে চলুন, সেখান থেকেই না হয় একটু ঘুরে আসি। তিনি এবার একটু রাগত হয়ে বললেন, না। আজকের দিনে এসব কি না করলেই নয়? আপনাদের ইন্টেনশন নিয়ে কথা উঠছে মশায়। একজন বলেই ফেললেন, যত ইয়ের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি। অতএব ব্যাপারটা বোঝার জন্য আবার আমরা ব্রডওয়েতে গেলাম। এবং যখন ফিরে এলাম তখন দেখি আমাদের বিষয় নিয়ে প্রায় গ্রুপ মিটিং বসে গিয়েছে। এবং যেসব বন্ধু আমাদের চরিত্রের নানাবিধ গুণাবলী নিয়ে সকালের ঝোঁকে নানা ভাল ভাল কথা বলে ফেলেছিলেন, তাঁরা তাঁদের অন্যান্য বন্ধুর কাছ থেকে কিছু কটূক্তি শুনতে লাগলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের ইউনিয়নের সদস্য নই, স্বেচ্ছায় তাঁদের কাছে এসেছি আমাদের সমর্থন জানাতে, কোনও রকম বেচালও কিছু করছিনে, এমন অবস্থায় আমাদের নিয়ে যে কী করা উচিত, সেটা তাঁরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, ওঁদের মনের উষ্ণতাকে ভদ্রতার বাঁধ দিয়ে ওঁরা বোধ হয় খুব বেশিক্ষণ আটকে রাখতেও পারবেন না।

আসলে আমাদেরই হয়ত উচিত ছিল, ওখান থেকে সরে পড়ে ওঁদের এই অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। শান্তিদার মনে কী হচ্ছিল, তা আমি বলতে পারিনে। কিন্তু আমার কথা আমি বলতে পারি, আমার মন তখন কামরাডেয়ারি ভাবে এত পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, ওখান থেকে সরে পড়ার কথা মনেই আসেনি। চব্বিশ ঘণ্টার প্রতীক ধর্মঘট। তার মধ্যে বারো ঘণ্টাও কাটেনি। এরই মধ্যে উঠে চ'লে যাব, এমন কাপুরুষতার কথা মনে উঠবেই বা কী করে? অথচ ওদিকে ব্যাপারটা গুরুতর আকার নিতে শুরু করেছে। প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক ধরে আমাদের উদ্দেশ্য নির্ণয় করার চেষ্টা অবশেষে একটা ফল ফলাতে পারল। এবং সেটা এই যে, আমরা দুজনে মালিকের পোষা পায়রা, মালিকের নির্দেশেই ওঁদের মধ্যে গিয়ে বসে পড়েছি। এছাড়া আমাদের ব্যবহারের আর কী মানে থাকতে পারে? প্রতীক ধর্মঘট ওঁদের কাছে একটা মহাপবিত্র জিনিস। সেই পবিত্রতাকেই মালিক ভেঙে দিতে চাইছেন। এবং আমাদের দুজনকে সেই উদ্দেশ্যেই এখানে পাঠানো হয়েছে। একদল ধর্মঘটী এই রকম একটা অঙ্ক কষেই ফেলে দিলেন।

এমন সময় ঘটনাস্থলে ভূপালদার আবির্ভাব ভূপালদাকে আমাদের বিব্রত বন্ধুরা কিছু বলেছিলেন, কি না, আমি জানিনে। আমি নিজের মধ্যেই এমন মশগুল হয়ে ছিলাম যে, এমন ধারণা কারও মনে হতে পারে কি না, সে সম্পর্কেও কোনও হুঁশ ছিল না। ভূপালদাকে দেখে আমি আর শান্তিদা বেশ উৎসাহ বোধ করলাম। সেটা এই কারণে যে, আমাদের মধ্যে অন্তত আর একজন সাহস করে ধর্মঘটীদের এত কাছে এসে গিয়েছেন। আমার হিসাবে দুইয়ে একে তিন হলাম এতক্ষণে। কাজেই আমরা ভূপালদাকে সাদরে বরণ করে নিলাম। এবং ভূপালদা

যখন বললেন, চল একটু ঘুরে আসি, তখন আমি তো একপায়ে খাড়া। শান্তিদাও উঠে পড়লেন। এবং আমরা তিনজন, দুইয়ে একে তিন, এবার এলফিনস্টোন বারে গিয়ে বসলাম। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তিনজনেই উচ্চভাবের মধ্যে একেবারে ডুবে গেলাম। কতক্ষণ সেখানে ছিলাম জানিনে। আমার একবার মনে হল যেন এলফিনস্টোনের ভিড়টা বেশ পাতলা হয়ে এসেছে। সেখান থেকে উঠবার সময় এক লহমায় মনে হয়েছিল, আমার পা দুটো যেন দু'খানা ডানা হয়ে গিয়েছে। এবার আমরা তিনজনেই মিছিল করে ধর্মঘটী বন্ধুদের মধ্যে গিয়ে বসলাম। কিন্তু বন্ধুরা, এটাও আমার ধারণা, যেন আমাদের এড়িয়ে গিয়ে অন্যদিকে ভিড়টা বাড়িয়ে দিলেন।

আমি ওঁদের কাছে যাওয়ার জন্য উঠলাম। কিন্তু আফিসের শ্বেত পাথরের লম্বা সিঁড়ির হাতছানি পেয়ে সেদিকেই চলে গেলাম। এবং সেই শীতল আশ্রয়ে বসে পড়লাম। অর্থাৎ আমার বসে পড়ারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমি শুয়েই পড়লাম। এবং তারপরই বমি করে সিঁড়িটা পরিষ্কার করে দিতে লাগলাম। সেই শীতল শ্বেত পাথরের আলিঙ্গনে শরীরটা জুড়িয়ে যেতে লাগল। শরীরের অস্বস্তি যত কেটে আসতে লাগল, ততই ঘুম ঘুম পেতে লাগল। হঠাৎ আমার মনে হল, সেই আবছায়া হুঁশের মধ্যেই মনে হল, কে যেন পরম যত্নে আমার মাথাটা কোলে তুলে নিল। প্রথমে মনে হল, ঈশ্বর। পরক্ষণেই ভুলটা ভাঙল। কেননা, ঈশ্বরকে কখনও কারও কোনও কাজে আসতে দেখিনি। তবে ? মা ? তাই বা কী করে ? মায়ের পক্ষে এত রাত্রে আমার আফিসে আসা কখনওই সম্ভব নয়। তবে কে ? তবে কি কুমুদ ? হ্যাঁ, কুমুদই। এবার সে আর তার মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। সোজা সটান আমার মাথাটা তার কোলে চাপিয়ে বসে আছে। তার ময়লা চাদর দিয়ে আমার মুখের ক্লেদ গ্লানি মাঝে মাঝে মুছিয়ে দিচ্ছে যত্ন করে। অস্ফুট স্বরে আমাকে একটানা বলে চলেছে, আমার কোনও ভয় নেই। কুমুদ থাকতে আমার কোন ভয়ই নেই। সে আমাকে সারারাত আগলাবে। আমি যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুম দিই। আমার চোখে ধীরে ধীরে ঘুম নেমে আসতে লাগল। শীতে শরীরটা শিরশির করতে লাগল। কুমুদ সঙ্গে-সঙ্গে তার চাদর, বা যেখান থেকেই হোক একটা ময়লা চাদর এনে, আমার গায়ে ঢাকা দিয়ে দিল।

হঠাৎ একটা শোরগোলে ঘুম ভেঙে গেল। দেখা গেল, আমার দেহটাকে নিয়ে দু'দলের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। আমি চোখ মেলতেই কুমুদ বলে উঠল, কোনও চিন্তা নেই আপনার। কুমুদের দেহে যতক্ষণ জান আছে, আপনার বডিকে কেউই আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকুন। এ-বডি আমাদের। এ-বডি আমরা মালিককে ছিনিয়ে নিতে দেব না। আমার দেহের চারপাশে একে-একে ইউনিয়নের ক'জন বন্ধুও এসে দাঁড়ালেন। তাঁদেরও একবাক্যে রায়, এ-বডি আমাদের বডি। মালিকের লোককে এ-বডিতে হাত দিতে দেওয়া হবে না। এদিকে বন্ধ কোলাপসিবল্ গেটের ওধার থেকে কয়েকজন বলে চলেছেন, পার্সনেল অফিসার ওঁকে উপরে নিয়ে যেতে বলেছেন। তিনি খবর পেয়েছেন, উনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কেন, ওনাকে উপরে নিয়ে যেতে দেবেন না আপনারা ?

কভ্ভি নেহি। মালিকের হাতে এ-বডি ছাড়া হবে না। এ আমাদের লোক। ইউনিয়নের কয়েকজন বন্ধু সমস্বরে দাবি তুললেন। ওঁদের কেউ কেউ বিকালের ঝোঁকে আমরা যে মালিকের দালাল, সেটা প্রায় সাব্যস্ত করে ফেলেছিলেন, এখন তাঁরাই আমার 'বডি'টাকে মালিকের কারও হাতে ছাড়তে দিতে বাধা দিতে এসেছেন। ওঁদের বক্তব্য, ওঁরা সেই সকাল থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন। একসঙ্গে ফুটপাথে বসে অবস্থান ধর্মঘট করেছেন। ওঁরা আমাদের লোক। মরুন বাঁচুন, আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আমরাই ওঁর দেখাশুনা করব। মালিক কে ?

দারোয়ানেরাও ছাড়বে না। তাঁদের উপর পার্সোনেল অফিসারের নির্দেশ, অসুস্থ লোকটাকে উপরে নিয়ে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন ভূপালদা। উনি ভিতরের লোকদের বলে দিলেন, পার্সোনেল অফিসারকে জানাতে যে আমার জন্য উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। আমার শরীরও কিছু খারাপ হয়নি। একটু রোদ লেগে থাকতে পারে। তাছাড়া এখানে সবাই মিলে ওঁকে দেখাশোনাও ভাল করছেন। এ-কথায় ইউনিয়নের আপত্তির কোনও কারণ দেখা গেল

না। অফিসের ভিতরের লোকরা গিয়ে পার্সোনেল অফিসারকে ভূপালদার কথা বলতেই তিনিও নিশ্চিন্ত হলেন।

কুমুদ আমার মুখের কাছে মুখ এনে বললে, ভয় নেই। ঝামেলা মিটে গিয়েছে। আপনার বডি এখানেই থেকে গেল। আমাদের মধ্যে। এটা বড় ভাল হল। আমি বললাম, হ্যাঁ, সলিডারিটি।

এ-কাহিনীর শেষ এইখানেই। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, ঘটনা কি এই রকমই ঘটেছিল? এ-প্রশ্নের জবাব আগের দিনে যে কীভাবে দিতাম, এখন আর তা মনে পড়ছে না। এই বাষট্টি বছরের প্রলম্বিত যৌবনে (মাফ করবেন, 'এক্সটেন্ডেড ইয়ুথ', কথাটা আমার নয়। এরিকসনের।) এসে, আজ, এই প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, ঘটনাটা এ-রকমই ঘটেও থাকতে পারে। না ঘটলেও ঘটা যে উচিত ছিল, সে সম্পর্কে আমার কোনও দ্বিধা নেই।

অবসর

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কালও সেই স্বপ্ন দেখেছি। তিরতির' করে বয়ে যাওয়া খুব শীর্ণ একটি জলধারা। তার পাশে, কচ্ছপের পিঠের মতো একটা টিলার উপরে, দাঁড়িয়ে আছে একটা বাংলো-বাড়ি। পরপর তিনখানা ঘর। ঘরের দরজায় মোটা-কাপড়ের হলুদ-রঙের পর্দা ঝুলছে। মাঝে-মাঝে হাওয়া দিচ্ছে বটে, কিন্তু দরজার পর্দা তাতে খুব একটা নড়ছে না। ঘরের ভিতরে কী আছে, তা তাই দেখা যাচ্ছে না। ঘরের সামনে টানা বারান্দা। বারান্দা থেকে চওড়া ক'ধাপ সিঁড়ি নেমে এসেছে। সিঁড়ির একপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটা চিনা-গুলঞ্চের গাছ। তার কালচে-সবুজ, পুরু পাতার ভিড়ের মধ্যে কয়েক থোপা সাদা গুলঞ্চ ফুটে আছে। ফুলের বোঁটার কাছটাতে অল্প-একটু হলুদের ছোপ লাগানো। বাড়ির কম্পাউণ্ড যেখানে শেষ, তার পরে খানিকটা কাঁকুরে ঢালু জমি। তারপরে শালের জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রেল-লাইন চলে গেছে।

স্বপ্নের মধ্যে পক্ককেশ এক বৃদ্ধকেও আমি দেখতে পেয়েছিলুম। বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে তিনি বসে আছেন। হাতে সিগারেট। সিগারেট থেকে অল্প-অল্প ধোঁয়া উঠছে। দাড়ি কামাবার সময়ে রোজই যেহেতু আয়নায় তাঁকে দেখতে পাই, তাই চিনতে কোনও অসুবিধে হয়নি। আমি। স্বপ্নের মধ্যে একইসঙ্গে দু'দুটি মানুষের চোখের কাজ চলতে থাকে। আমি তাঁকে দেখি, এবং বারান্দা থেকে অপলক যিনি সামনের শাল-জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছেন, সেই বুড়ো মানুষটি দেখতে থাকেন যে, ডানদিক থেকে ঝিকঝিক করে একটা রেলগাড়ি এসে ক্রমশ বাঁ-দিকে চলে যাচ্ছে।

এই রকমের মাল্টি-কালার স্বপ্ন কেউ কখনও দেখেন কিনা, তা আমার জানা নেই। কিন্তু আমি দেখি। বছর কয়েক আগে এই স্বপ্নের শুরু। তখন অবশ্য রোজ নয়, মাঝে-মধ্যে দেখতে পেতুম। ইদানীং রোজই দেখছি। দেখবার জন্যে আমার ঘুমুবার দরকার হয় না, জেগে-জেগেই দেখতে পাই। অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে, মুখ-হাত-পা ধুয়ে, জামা-কাপড় পাল্‌টে, এক-কাপ চা খেয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি। ক্লাবে যাই। ক্লাবে কিছুক্ষণ তাস পিটি। তারপর বাড়িতে ফিরে, রাত্তিরের খাওয়ার পাট চুকিয়ে, মুখে এককুচি সুপুরি ফেলে, লেখার টেবিলে বসবার আগে একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় দাঁড়াই। ঠিক তখনই আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে সেই ছবি। সেই তিরতিরে জলধারা, সেই টিলা, সেই বাড়ি, সেই বারান্দা, সেই চিনা-গুলঞ্চের গাছ, সেই শালের জঙ্গল, সেই রেল-লাইন, সেই পক্ককেশ বৃদ্ধ। আমি স্বপ্ন দেখি, এবং সেই স্বপ্নকে আরও স্বপ্নিল করে দিয়ে, হাওয়ার মধ্যে ঘুরপাক খেতে-খেতে মাঝে-মাঝেই ঝরে পড়তে থাকে শুকনো শালপাতা। ঝরতে থাকে তো ঝরতেই থাকে।

আপনারা যাঁরা এই লেখাটি পড়ছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো কখনও-না-কখনও ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে গিয়ে দু'চার দিনের ছুটি কাটিয়ে এসে থাকবেন। তাঁদের নিশ্চয় মনে হচ্ছে যে, এ আর কিছুই নয়, সেখানকার রেল-স্টেশনের খুব কাছেই যে একটা গেস্ট-হাউস আছে, তারই ছবি এঁকে আমি আমার স্বপ্ন বলে সেটাকে চালাতে চাইছি। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। গত জানুয়ারি মাসে আমি ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে গিয়েছিলুম ঠিকই, এবং ছিলুমও বটে ওই অতিথিশালাতেই, কিন্তু জীবনে এই প্রথম আমার সেখানে যাওয়া। অথচ, তার অনেক আগে থেকেই আমি এই স্বপ্ন দেখছি। সত্যি বলতে কী, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে গিয়ে আমার স্বপ্নের সঙ্গে সেই বাড়ি, বাড়ির সামনের সেই তিরতিরে জলধারা, সেই শাল-জঙ্গল, এবং শাল-জঙ্গলের ভিতরকার সেই রেল-লাইনের হুবহু মিল দেখে আমি নিজেই ভীষণ অবাক হয়ে যাই।

কিন্তু সে-কথা থাক। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, চাকরিজীবী মানুষের বয়স যখন পঞ্চান্ন পেরোয়, এবং চাকরি থেকে তাঁর অবসর নেবার দিনটি যখন ক্রমেই এগিয়ে আসতে থাকে, তখনই তাঁর এই ধরনের স্বপ্ন দেখার পালা শুরু হয়ে যায়। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা, ইতিমধ্যে তিনি তাঁর কর্মজীবনের চোদ্দ-আনা পথ পাড়ি দিয়েছেন। সেই পথের সবটাই যে খুব মসৃণ ছিল, তা তো নয়। এখনকার কলকাতার রাস্তার মতোই তাতে খানাখন্দ ছিল অনেক, ইতস্তত জমানো ছিল জঞ্জালের ডাঁই, বিস্তর ম্যানহোলের ঢাকনা ছিল খোলা, প্রবল প্রতিপক্ষের দ্বারা যে-কোনও মুহূর্তে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা ছিল, এবং সেই পথের নানা অংশে খণ্ডযুদ্ধে-ব্যবহৃত সোডার বোতলের কাচের টুকরোও ছড়ানো ছিল অজস্র। ফলত, তিনি বারকয়েক প্রায় মরতে-মরতে বেঁচে গেছেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা দাঁড়িয়েছে 'এ কুল মিলিয়ান'-এর সেই নায়কের মতো। তাঁর নাক গেছে থেঁতলে, তাঁর হাতে ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, এবং তাঁর পা দু-খানিও রক্তাক্ত। এদিকে, এই বয়সে যা হয় আর কী, তাঁর রাত্তিরের ঘুম এখন বারে-বারে ভেঙে যায়, আর দিনের বেলায় যখন টেবিলে বসে কাজ করবার কথা, ঘুমে তখন তাঁর চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে থাকে। অথচ, কড়া এক-কাপ চা খেয়ে যে তিনি ঘুম তাড়াবেন, তারও উপায় নেই। কেননা, বাড়তি এক-কাপ চা খেলেই তাঁর গলা বেয়ে উঠে আসে চোঁয়া-ঢেকুর। একদিকে তাঁর রক্তের চাপ বেড়েছে, এবং অন্যদিকে তাঁর রক্তের মধ্যে জমেছে শর্করা। দু'পা হাঁটলেই এখন তাঁর বুক ধড়ফড় করে, এবং বুকের মধ্যে অনেক কষ্টে যাঁকে আটকে রাখা হয়েছে, সেই প্রাণপাখিটির ডানা-ঝটপটানির শব্দ শোনা যায়। অথচ, এক্ষুনি যে বসে পড়বেন, এমন কথাও তিনি ভাবতে পারেন না ; বরং তিনি ভাবেন যে, আর তো মাত্র দু'আনা পথ বাকি, লেংচে-লেংচেই এটুকু তিনি পেরিয়ে যাবেন। ব্যস্, তারপরেই তাঁর বিশ্রাম নেবার দিন আসছে। এই যে ভাবনা, একেই কেন্দ্র করে তিনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তাঁর নির্ঝঞ্ঝাট অবসর-জীবনের স্বপ্ন।

সবাই কি আর দেখেন ? নাকি দেখতে পারেন ? রামবাবুর কথাই ধরুন। তাঁর বয়স এখন ছাপ্পান্ন। সওদাগরি যে প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকরি করেন, দু' বছর বাদেই তাঁর কর্মজীবন সেখানে কাবার হয়ে যাবে। অথচ, এখনও তিনি অমন কোনো স্বপ্ন দেখতে শুরু করেননি। কীভাবে দেখবেন ? তাঁর বড় ছেলেটি (বয়স ৩১) এখনও চাকরির দরখাস্ত করে যাচ্ছে, এবং ছোট ছেলেটি (বয়স ২৩) এখনও বি-কমের বেড়া টপকাতে পারেনি। তাঁর বড় মেয়েটি (বয়স ২৭) আজ থেকে ছ'বছর আগে বি.এ. পাশ করেছে, কিন্তু এখনও যেহেতু তার পাত্র জোটানো যায়নি, অগত্যা তাই তাকে সন্ধেবেলায় হারমনিয়ম টেনে নাহক ঘণ্টা দেড়েক আ-আআ-আআআ করতে হয়। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক সমস্যা এই যে, আজ থেকে এগারো বছর আগের এক পৌষমাসের মাঝরাত্তিরে রামবাবুর ঘুম ভেঙে যায়, এবং এইসব সময়ে যা হয় আর কী, তাঁর মাথায় কিঞ্চিৎ দুর্বুদ্ধির উদয় হয়! বলা বাহুল্য, তাঁর হিতাহিতজ্ঞান ঘুলিয়ে গিয়েছিল, এবং তার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা ফুলটুসির বয়স এখন মাত্রই দশ বছর। নাতনির বয়সী এই কন্যাটির দিকে যখন তাকান, রামবাবুর গলা তখন শুকিয়ে যায়, এবং বুকের মধ্যে খাঁখাঁ করতে থাকে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটির টাকা হাতে এলে বড়মেয়ের জন্যে যা-হোক একটি পাত্র জোটানো যাবে ঠিকই, ততদিন ও পরিত্রাহি হারমনিয়ম বাজিয়ে যাক, কিন্তু ফুলটুসির কী হবে ? ওর তো তিনি বর জোটাতে পারবেন না। ওর দাদারাই যে পারবে, এমন ভরসাও নেই। তাহলে ? পাড়ার মস্তানরা তখন ফুলটুসিকে ছিঁড়ে খাবে না তো ? ওরে বাবা ! ভাবতেই রামবাবুর রক্ত একেবারে হিম হয়ে যায়। এই অবস্থায় কেউ অবসর-জীবনের স্বপ্ন দেখে না। রামবাবুও দেখেন না। বরং দিবারাত্রি তিনি এখন এক্সটেনশানের কথা ভাবেন। মেয়াদ তো ফুরিয়ে এল, এক্সটেনশান পাওয়া যাবে তো ?

এক্সটেনশান পাবার প্রাথমিক শর্ত, শারীরিকভাবে 'ফিট' থাকা চাই। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি যে 'ফিট' আছেন, বড়সাহেবকে রামবাবু সেটা বোঝাবেন কী করে। একটা উপায় হল অফিসের বাৎসরিক স্পোর্টসের দিন দৌড়-প্রতিযোগিতায় নাম লেখানো। কিন্তু সেইভাবে নিজের ফিটনেসের প্রমাণ দিতে গিয়ে এক সওদাগরি অফিসের জনৈক প্রবীণ কর্মচারী কীভাবে ট্র্যাকের উপরে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন, মতি নন্দীর গল্প পড়ে সে-কথা জানবার পরে আর

অফিস-স্পোর্টসে নাম লেখাতে রামবাবুর বিশেষ ভরসা হয় না। সক্ষমতা প্রমাণের অন্যতর সুযোগ অবশ্য ইতিমধ্যে একদিন এসে গিয়েছিল। অফিসে ঢুকে রামবাবু সেদিন দেখতে পান যে, বড়সাহেবও লিফ্‌টের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু লিফ্‌ট সেই যে উপরে উঠেছে, আর নামছে না। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষার পরে রামবাবু বললেন, "আমি সার লিফ্‌ট ছাড়াই পাঁচতলায় উঠে যেতে পারি।" ভেবেছিলেন, বড়সাহেব নিশ্চয় তাঁর কথায় খুব খুশি হবেন। কিন্তু বড়সাহেব মোটেই খুশি হন না। গম্ভীর মুখে বলেন, "ডোন্ট্‌ বি স্টুপিড!" অগত্যা রামবাবু এখন নিয়ম করে সকালে ও বিকেলে ভাত খাবার পরে একটা বলবর্ধক টনিক খাচ্ছেন। তার ফলে এক-একবার তাঁর মনে হয় যে, হাতে-পায়ে যেন আগের চেয়ে বেশি বল পাওয়া যাচ্ছে, আবার একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় তাঁর হাত ও পায়ের গাঁটগুলি যখন বাতের ব্যথায় সেই আগের মতোই টন্‌টন্‌ করতে থাকে, রামবাবু তখন মাঝে-মাঝেই স্বগতোক্তি করেন ; ধুস্‌ শালা!

বলা বাহুল্য, চাকরিজীবী সমাজে রামবাবুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে দু-চারজন শ্যামবাবুও আছেন বই কী। আমার পরিচিত একজন শ্যামবাবুর কথা বলি। তাঁর মেয়ে দুটির বিয়ে হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু তিন-তিনটি উপযুক্ত ছেলের একটিও এখনও চাকরিতে ঢোকেনি। সুতরাং সাংসারিক দায়দায়িত্ব তাঁরও কিছু কম নয়। কিন্তু তা নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না। বলেন, "যদ্দিন পারব, সংসারটাকে টেনে যাব, যখন পারব না, টানব না। ব্যাস! রিটায়ার করবার পরে হতচ্ছাড়াদের কার কী হবে, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন? প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকা হাতে পেলেই আমি চ্যাটার্জি ট্রাভ্‌লার্সের টিকিট কেটে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ব।"

জিজ্ঞেস করেছিলুম, "ছেলেপুলেদের মা কী বলেন?"

শ্যামবাবু তাতে একগাল হেসে বললেন, "তিনি বলেন, একটা নয়, দুটো টিকিট কেটো।"

রিটায়ার করলে ছেলেপুলেরা অসুবিধেয় পড়বে কি না, এবং ছেলেপুলেদের মা এ-বিষয়ে কিছু বলেন কি না, জিজ্ঞেস করায় শ্যামবাবু বলেছিলেন, "আরে মশাই, এ-সব কথা উঠলে তিনিও তাঁর গুণধর ছেলেদের স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়েন না। বলেন, 'কী ভেবেছিস তোরা, অ্যাঁ? সারা জীবন কি ওই লোকটা তোদের জন্যে মুখে রক্ত তুলে খেটে মরবে নাকি? আর আমিও কি চিতেয় ওঠবার দিন পর্যন্ত তোদের জন্যে হাঁড়ি ঠেলে যাব?' বিয়ের পরে দু'পাতা ইংরিজি পড়িয়েছিলুম তো, তা সেটা এখন দিব্যি কাজে লাগছে। কথায়-কথায় ছেলেদের তিনি বলেন, 'তোদের কী হবে, সে তোরাই ভাল বুঝবি, আই ডোন্ট্‌ কেয়ার!'"

শ্যামবাবু দেশভ্রমণের স্বপ্ন দেখেন, আমি দেখি না। আমি শুধু কোনও একটা জায়গায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে চাই। চুপচাপ দেখে যেতে চাই সেই শালের জঙ্গলটিকে, যার ভিতর দিয়ে একটি রেলগাড়ি খুব ধীরে-ধীরে আমার চোখের আড়ালে চলে যাবে।

ফলত, আজও আমি স্বপ্ন দেখি। ক্লাব থেকে ফিরে, রাত্তিরের খাওয়া চুকিয়ে, মুখে এক-কুচি সুপুরি ফেলে, লেখার টেবিলে বসবার আগে একটা সিগারেট ধরিয়ে যখন আজও আমি আমার শোবার ঘরের সংলগ্ন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াব, তখন আমার চোখের সামনে আজও ফুটে উঠবে সেই ছবি। সেই তিরতিরে জলধারা, সেই টিলা, সেই বাড়ি, সেই বারান্দা এবং সেই পক্ককেশ বৃদ্ধটিকে আজও আমি দেখতে পাব।

আমি তাঁকে দেখি, কিন্তু তিনি আমাকে দেখতে পান না। তিনি শুধু তাঁর সামনের সেই শাল-জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু আমি জানি যে, আর দেরি নেই, খুব শিগগিরই এবারে একদিন তিনি শাল-জঙ্গলের দিক থেকে তাঁর চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাবেন। তাকিয়ে, অল্প-একটু হেসে বলবেন, "আর কেন, চলে আয়।"

"দেশ সাহিত্য সংখ্যা"। ১৩৯১।

ইহুদীরঙ্গ

ইন্দ্রমিত্র

এই গল্পটির অকুস্থল রাশিয়া। তখন রাশিয়ায় সম্রাটের রাজত্ব।

নিজের বাড়িতে বসে একজন ইহুদী ভদ্রলোক সন্ধ্যাবেলা স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগুজব করছেন। হঠাৎ দুজন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

গল্পগুজব বন্ধ হয়ে গেল।

পকেট থেকে খড়ি বের করে দুজন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত ঘরের মেঝেতে নিপুণ বৃত্ত এঁকে ফেলল। স্বামীকে ঘাড় ধরে বৃত্তের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড় করিয়ে রেখে বলল— খবরদার, এই খড়ির গণ্ডির বাইরে এক পা যদি বাড়াও তো তোমার ধড় আর মুণ্ডু আলাদা করে দেব।

তারপর স্ত্রীকে ধরে টানতে-টানতে দুজন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল, ভিতর থেকে খিল লাগিয়ে দিল। ভিতরের ব্যাপারের রগরগে বর্ণনা দেওয়ার কোনও দরকার নেই।

অনেকক্ষণ বাদে দুজন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত বেরিয়ে এল। ইহুদী স্বামী তখনও খড়ির গণ্ডির ঠিক মধ্যিখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে দুজন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত চলে গেল।

খানিকক্ষণ বাদে পাশের ঘর থেকে স্ত্রী এলেন। পোশাক আলুথালু, শরীর লণ্ডভণ্ড। স্বামীকে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করে বললেন— তুমি কি মানুষ? তুমি কাপুরুষ, তুমি কাপুরুষ, তুমি কাপুরুষ।

স্বামী মোলায়েমভাবে বললেন— তুমি কাকে কী বলছ? আমি কাপুরুষ?

—তোমাকে বলছি। তুমি কাপুরুষ, তুমি কাপুরুষ, তুমি কাপুরুষ।

—না জেনে কেন বাজে কথা বলছ? তোমাকে নিয়ে ওরা পাশের ঘরে খিল বন্ধ করার পর আমি—খড়ির গণ্ডির ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ইহুদী ভদ্রলোক ডানহাতের পাঁচটি আঙুল মেলে ধরলেন—পাঁ-চ-বা-র এই খড়ির গণ্ডির বাইরে পা বাড়িয়েছি।

বিচক্ষণ পাঠকের জন্য বলে রাখা দরকার যে এই গল্পের সঙ্গে রাশিয়ার সম্রাটের পদচ্যুতির কোনও সম্পর্ক নেই। রাশিয়ার সম্রাট পদচ্যুত হয়েছেন ১৯১৭ সালের মার্চে। লেনিনের পরিচালনায়, ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর, বলশেভিক দল ক্ষমতা দখল করেছে। এই সূত্রে অনিবার্যভাবে ট্রটস্কির নাম এসে পড়ে। ট্রটস্কি ইহুদী-সন্তান। লেনিনের সঙ্গে একত্রে তিনি অক্টোবর বিপ্লব পরিচালনা করেছেন। ট্রটস্কি সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী; তারপর ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমরমন্ত্রী।

লেনিন মারা গেছেন ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি। তারপর ট্রটস্কির সঙ্গে স্টালিনের নেতৃত্বের লড়াই আরম্ভ হয়েছে। ট্রটস্কি চেয়েছেন বিশ্ববিপ্লবের পথে দ্রুত পদক্ষেপ। কিন্তু স্টালিন চেয়েছেন সমাজতন্ত্রের পথে রাশিয়ার দ্রুত উন্নয়ন। নেতৃত্বের লড়াইতে স্টালিন জিতেছেন।

আর ট্রটস্কি? ১৯২৭ সালে ট্রটস্কি বলশেভিক দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। ১৯২৮ সালের জানুয়ারিতে, দেখা যাচ্ছে, তিনি মধ্য এশিয়ার আলমা-আটায় নির্বাসিত। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত, সোভিয়েত নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ১৯৩২ সালে। আলমা-আটার পর তিনি নির্বাসিত জীবনযাপন করেছেন তুরস্কে, ফ্রান্সে, নরওয়েতে, মেক্সিকোয়। নির্বাসিত জীবনে ট্রটস্কি অনবরত স্টালিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। 'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা'র মতে মেক্সিকোয় নিজের বাড়িতে ট্রটস্কি, ১৯৪০ সালের ২০ আগস্ট, অতর্কিতে একজন স্টালিনপন্থী আততায়ীর হাতে মারাত্মকভাবে আহত

হয়েছেন এবং পরদিন মারা গেছেন।

ট্রটস্কি নিহত হওয়ার কিছুকাল আগের একটি গল্প—খাঁটি ইহুদী গল্প।

মস্কোর রেড স্কোয়ারে জনসভা। ট্রটস্কির কাছ থেকে স্টালিন একখানা টেলিগ্রাম পেয়েছেন। স্বয়ং স্টালিন সভায় সেখানা পড়ে শোনাবেন।

টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে স্টালিন উঠলেন। সাদামাঠা গলায় পড়লেন— প্রিয় কমরেড স্টালিন, আমি ভুল করেছি কিন্তু আপনি ঠিক করেছেন। আপনি লেনিনের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হব। ভবদীয় ট্রটস্কি।

ফিঙ্কেলস্টাইন নামে একজন ইহুদী ছাড়া সভার অসংখ্য মানুষ আনন্দে উচ্ছ্বসিত। ফিঙ্কেলস্টাইন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন— কমরেড স্টালিন, এমন একখানা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক টেলিগ্রাম আপনি সাদামাঠা গলায় পড়লেন কেন? ঠিকমতো দরদ দিয়ে পড়া উচিত ছিল। তাহলে এই টেলিগ্রামের সারমর্ম সভার সকলের মনে চিরকাল গাঁথা হয়ে থাকত।

খাঁটি কথা। স্টালিন সভামঞ্চে ডেকে নিয়ে গেলেন ফিঙ্কেলস্টাইনকে। বললেন— কমরেড ফিঙ্কেলস্টাইন, আপনি খাঁটি কথা বলেছেন। কিন্তু আমার গলায় ঠিকমতো দরদ আসে না। আপনি দয়া করে টেলিগ্রামখানা ঠিকমতো দরদ দিয়ে সভাকে পড়ে শোনান।

টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে ফিঙ্কেলস্টাইন ঠিকমতো দরদ দিয়ে সভাকে পড়ে শোনালেন— প্রিয় কমরেড স্টালিন, আমি ভুল করেছি কিন্তু আপনি ঠিক করেছেন?! আপনি লেনিনের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ?? !! আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হব ??? !!! ভবদীয় ট্রটস্কি।

গল্পের গোড়ায় দু-একটা সত্যকথা না থাকলে অনেক গল্প নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, সংক্ষেপে দু-একটা সত্যকথা বলতে হচ্ছে। শুনেছি, ইহুদী ধর্ম সর্বপ্রাচীন একেশ্বরবাদী ধর্ম। স্বয়ং যীশু, সকলেই জানেন, ইহুদী। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী আগে কৃষকরূপে মিশরের বসতি স্থাপনের সময় থেকেই ইহুদীদের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে। ইহুদীদের ইতিহাস কুসুমাস্তীর্ণ নয়। ইতিহাসে বিস্তর ইহুদী বিদ্বেষীর নাম আছে এবং ইহুদীরা, যতদূর জানি, ইহুদী বিদ্বেষীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। গল্প আছে।

একজন জর্মন, একজন ইংরেজ, একজন মার্কিন, একজন ফরাসী ও একজন ইহুদী পাঁচজনে হস্তী সম্পর্কে পাঁচখানা বই লিখেছেন।

পাদটীকা-কণ্টকিত মস্ত তিন খণ্ডে সমাপ্ত জর্মনের বইখানার নাম—হস্তী সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ।

এক খণ্ডে সমাপ্ত ইংরেজের বইখানার নাম—আফ্রিকায় হস্তীশিকার।

এক খণ্ডে সমাপ্ত মার্কিনের বইখানার নাম— হস্তীর ব্যবসায় বিপুল মুনাফা।

ফরাসীর ফিটফাট ছিমছাম বইখানার নাম—হাতির প্রেম!

আর ইহুদী? এক খণ্ডে সমাপ্ত ইহুদীর বইখানার নাম—হস্তীর ইহুদীবিদ্বেষ।

হস্তীরা সত্যি-সত্যি ইহুদী-বিদ্বেষী কিনা জানি না। কিন্তু ইহুদীদের সঙ্গে পদ্মবনের উপমা দিলে হিটলারকে অনায়াসে মত্ত হস্তী বলা চলে— না, মত্ত হস্তীও হার মেনে যাবে। হিটলারের ইহুদী-বিদ্বেষ অতুলনীয়। হিটলার জর্মানির সর্বেসর্বা হয়েছেন ১৯৩৩ সালে।

ইহুদী-বিদ্বেষের দাপটে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে পর্যন্ত জর্মনি থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। তাঁর জন্ম জর্মনিতে। তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করেছেন, কাইজার হিলহেলম ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯২১ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ইহুদী ; এই কারণে তাঁকে জর্মনি থেকে চলে যেতে হয়েছে ১৯৩৩ সালে। তারপর আমৃত্যু তিনি আমেরিকায় সসম্মানে বসবাস করেছেন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি অসামান্য কীর্তি।

আইনস্টাইন একদা বলেছেন— আমার আপেক্ষিকবাদ নির্ভুল প্রমাণিত হলে জর্মনি দাবি করবে যে আমি একজন জর্মন, কিন্তু ফ্রান্স ঘোষণা করবে যে আমি একজন বিশ্বনাগরিক। আর আমার আপেক্ষিকবাদ ভুল প্রমাণিত হলে ফ্রান্সের মতে আমি হয়ে যাব একজন জর্মন, কিন্তু জর্মনি ঘোষণা করবে যে আমি একজন ইহুদী।

এই উচ্চারণের মধ্যে আক্ষেপ ও রঙ্গব্যঙ্গ ওতপ্রোত হয়ে আছে।

আবার বলি, হিটলারের ইহুদী-বিদ্বেষ অতুলনীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে পৃথিবীতে প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ ইহুদী ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে একা হিটলার প্রায় ষাট লক্ষ ইহুদীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

হিটলারকে নিয়ে বিস্তর ইহুদীরঙ্গ শুনেছি এবং ভুলে গেছি। কিন্তু একটা গল্প বোধ হয় আমার মন থেকে কখনও মুছে যাবে না।

রাইন নদীর ধারে একদিন হিটলার ছদ্মবেশে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাথায় হাজার-হাজার চিন্তাভাবনা। কাছাকাছি লোকজন বিশেষ নেই।

হঠাৎ একটা অঘটন ঘটল। ছদ্মবেশী হিটলার নদীতে পড়ে গেলেন। জলের মধ্যে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন, চিৎকার করলেও গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না, জলে ডুবে প্রাণ বুঝি যায়।

কিন্তু, ভাগ্যের কী জোর, একজন সৎ-সাহসী যুবকের চোখে পড়ল ব্যাপারটা, চোখের পলকে তিনি ঝাঁপ দিলেন, প্রায় ডুবন্ত ছদ্মবেশী হিটলারকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন।

ছদ্মবেশী হিটলার জিজ্ঞেস করলেন— তুমি জানো আমি কে ?

যুবকটি উত্তর দিলেন— না।

—ছদ্মবেশে আছি বলে তুমি আমাকে চিনতে পারছ না। আমি স্বয়ং হিটলার। তোমার নাম কি ?

যুবকটি ভয়ে-ভয়ে বললেন— আমার নাম কুর্ট আয়েসনার।

হিটলার ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন— দেখেশুনে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তুমি একজন ইহুদী। আমি ইহুদীদের সুনজরে দেখি না। কিন্তু তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। অতএব আমি তোমাকে একটি— মনে রেখো মাত্র একটি— অনুগ্রহ করব। বলো, কী অনুগ্রহ তুমি চাও ?

আয়েসনার বিগলিত হয়ে বললেন— আপনার একটি অনুগ্রহই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছি, অনুগ্রহ করে আমার বাবাকে এই কথাটা জানাবেন না।

দায়ে পড়ে আবার যৎকিঞ্চিৎ নীরস তথ্য পরিবেশন করতে হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে জাতিসঙ্ঘ প্যালেস্টাইনকে দুভাগ করেছে— একভাগ আরব রাজ্য, আরেক ভাগ ইহুদী রাজ্য ; মধ্যিখানে রইল জেরুসালেম সহ একটি আন্তর্জাতিক এলাকা। ইহুদী রাজ্যের নাম ইসরাইল। আরবদের বিরোধিতা সত্ত্বেও, ১৯৪৮ সালের ১৪ মে, তেলআভীবে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম ঘোষিত হয়েছে। ইসরাইলের প্রধান ভাষা হিব্রু। হিব্রু অক্ষরে য়িদিশ ভাষা লেখা হয়, য়িদিশ ভাষায় বহু হিব্রু শব্দ আছে, য়িদিশ ভাষার কলম হিব্রুর মতো ডানদিক থেকে বাঁদিকে আসে—তবু হিব্রু আর য়িদিশ সম্পূর্ণ আলাদা ভাষা। য়িদিশ ভাষার কথা কেন ? কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল আগেও পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ইহুদী য়িদিশ-ভাষী ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর য়িদিশ-ভাষীর সংখ্যা বিস্তর কমেছে বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে বহু য়িদিশ শব্দ ইংরেজী ভাষার ভাণ্ডারে জমা পড়েছে। কেউ-কেউ ঠাট্টা করে সেসব শব্দকে 'য়িংরেজী' বলেন।

যে যা খুশি বলুন, নীরস তথ্য মুলতুবি রেখে কয়েকটা গল্প দিচ্ছি।

নতুন ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। তেলআভীবে একটা রেস্তোরাঁয় বসে দুজন ইহুদী বন্ধু—আব্রাহাম ইয়াকভ আর আইসাক গোল্ডবের্গ— চা খেতে-খেতে গল্পগুজব করছেন। গল্পগুজব করতে-করতে স্বদেশের উন্নয়নের কথা উঠল। দুঃখকষ্ট ও অভাব-অভিযোগ থেকে নিস্তারের কি কোনও আশা আছে ? ইহুদীদের কপাল তো ভালো নয়।

আব্রাহাম ইয়াকভ বললেন— আমার মতে একটিমাত্র পন্থা আছে।

আইসাক গোল্ডবের্গ বললেন— কী ? খুলে বলো।

—আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ করলে আমাদের কপাল খুলে যাবে।

আইসাক গোল্ডবের্গ অবাক হয়ে বললেন— তুমি কি পাগল হয়েছ ? কোথায় আমেরিকা আর কোথায় ইসরাইল, আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলে ইসরাইল তো চোখের পলকে হেরে যাবে। আহা, ইসরাইলের উন্নয়নের জন্য কী পন্থাই ভেবেছ !

আব্রাহাম ইয়াকভ চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন— ভেবেচিন্তেই আমি প্ল্যানটা বের করেছি।

আগে আমার কথা শোনো, তারপর মতামত দিও। শোনো। আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে আমরা চোখের পলকে হেরে যাব। খাঁটি কথা। কিন্তু তারপর কী হবে?

—কী হবে?

আমেরিকা আমাদের এই দেশে একটা পুতুল-সরকার গড়ে দেবে। রাশি-রাশি ডলার আসবে আমেরিকা থেকে। ডলারের দৌলতে কলকারখানা খেতখামার ব্যবসাবাণিজ্য ফেঁপেফুলে উঠবে, আমাদের আর কোনও দুঃখকষ্ট বা অভাব-অভিযোগ থাকবে না।

প্ল্যান শুনে আইসাক গোল্ডবের্গ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি এভাবে তলিয়ে ভাবেননি। বললেন— খুব ভালো প্ল্যান বের করেছ। চমৎকার। কিন্তু...

—আবার কিন্তু কিসের?

আইসাক গোল্ডবের্গ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন— কিন্তু তোমার প্ল্যান বোধ হয় খাটবে না। ইহুদীদের যা কপাল, আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে হয়তো শেষ পর্যন্ত আমরা জিতেই যাব।

কপাল তো কেবল যুদ্ধে নয়, বিবাহেও। একজন সুন্দরী তরুণী ইহুদী একজন খ্রিস্টান যুবকের প্রেমে পড়েছে। ওই খ্রিস্টান যুবকটি ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। আত্মীয়স্বজন অনেক বোঝালো-শোনালো, কিন্তু কে কার কথা শোনে, মেয়েটির একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ।

—তুমি খ্রিস্টান যুবককে বিয়ে করবে কেন? চমৎকার ইহুদী যুবকের তো অভাব নেই।

মেয়েটির আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব মিলে একদিন ঘরোয়া সভা করল। এই অনাচারের প্রতিকার চাই। সমাজের মুখে চুনকালি মাখিয়ে একজন ইহুদী মেয়ে একজন খ্রিস্টানকে বিয়ে করবে?

সভায় জেকব হেনরি নামে একজন তরুণ ইহুদী বললেন— আমি চাই যে খ্রিস্টান যুবকের সঙ্গে আমাদের এই মেয়েটির বিয়ে হোক। শুধু এই মেয়েটি কেন, আমি চাই যে আমাদের মেয়েরা পাইকারি হারে খ্রিস্টান যুবকদের বিয়ে করুক।

সভাস্থ সকলে অবাক হয়ে তাকালো জেকব হেনরির দিকে। টেবিলে ঘুষি মেরে জেকব হেনরি বললেন— শুধু ইহুদী যুবকদের কপালেই বিবাহিত জীবন চিরকাল দুর্বিষহ হবে কেন? খ্রিস্টানেরাও একটু ভুগুক।

খ্রিস্টান যুবকদের কল্পিত দুর্ভোগের কথা ছেড়ে একজন বুড়ো ইহুদীর কথায় আসি। বিরাশি বছরের একজন চিরকুমার বুড়ো ইহুদী নিজের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। না, অসবর্ণ বিয়ে নয়, জাতিধর্ম ঠিক আছে।

শুনে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বললেন— তুমি কি ক্ষেপেছ? এই বয়সে বিয়ে করবে?

—ক্ষেপিনি। করব।

—পাত্রীটি কেমন?

আহ্লাদের চোটে বিরাশি বছরের বুড়ো ইহুদীর দু'চোখ চকচক করে উঠল। বললেন— পাত্রীটি চমৎকার। দারুণ রূপসী। চব্বিশ বছর বয়স।

অন্তরঙ্গ বন্ধু চমকে উঠল বললেন— বিরাশি বছর বয়সে তুমি একটি চব্বিশ বছরের রূপসী তরুণীকে বিয়ে করবে? অ্যাঁ?

আমোদে হা-হা করতে করতে বিরাশি বছরের বুড়ো ইহুদী বললেন—আর অ্যাঁ-ট্যাঁ নয়। হ্যাঁ। চব্বিশ বছরের রূপসী তরুণীকে বিয়ে করব।

অন্তরঙ্গ বন্ধু গম্ভীর হয়ে বললেন— দ্যাখো, এই বয়সে রূপসী তরুণী সামলাতে পারবে না। তোমাকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য। আমোদ-আহ্লাদের টানে তুমি এই বয়সে এমন সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করবে যে ফল মারাত্মক হতে বাধ্য। মৃত্যু প্রায় অনিবার্য।

প্রায় অনিবার্য মৃত্যুর কথা শুনলে কার না ভাবনাচিন্তা হয়। আশি বছরের বুড়ো ইহুদী খানিকক্ষণ ভেবেচিন্তে—যা বলেছ ভাই। কিন্তু তেমন দুর্ঘটনা যদি নিতান্তই ঘটে তাহলে, আর উপায় কী, আমি আবার আরেকজন রূপসী তরুণীকে বিয়ে করব।

বিরাশি বছরের বুড়ো ইহুদীর ভুল হিসেবের গল্পের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে একজন ইহুদী

ভদ্রমহিলার নির্ভুল হিসেবের গল্প।

ভদ্রমহিলার নাম মিসেস ওপেনহাইম।

সকাল থেকে একজন নাছোড়বান্দা পাওনাদার বাইরের ঘরে বসে আছে। মিসেস ওপেনহাইমের সঙ্গে দেখা না করে সে কিছুতেই যাবে না। কিছুতেই না।

অগত্যা মিসেস ওপেনহাইম বাইরের ঘরে এলেন। রুক্ষ গলায় বললেন— সামান্য পাঁচশ ডলারের জন্য বারবার তাগাদা দিতে আমার বাড়িতে আসতে তোমার লজ্জা করে না? আবার বলছি, এখন তোমার পাওনা শোধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

নাছোড়বান্দা পাওনাদার হাতজোড় করে বলল— ম্যাডাম, মরে যাব। পাঁচশ ডলার আপনার কাছে সামান্য, কিন্তু আমার কাছে অসামান্য। দয়া করুন। দিয়ে দিন।

—দিয়ে দিতে পারলে কি আর চুপ করে বসে থাকি? সময় হলেই দিয়ে দেব। বিরক্ত করো না। মরে যাবে? নাছোড়বান্দা পাওনাদার অত সহজে মরে না। যাও!

নাছোড়বান্দা পাওনাদার কাচুমাচু গলায় বলল— আমার পাওনা পাঁচশ ডলার না পেলে আজ আমার কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। কোথায় যাব?

মিসেস ওপেনহাইম রাগ করে বললেন— তুমি আধাজহান্নামে যাও।

এমন কুকথার পর আর বসে থাকা চলে না। নাছোড়বান্দা পাওনাদার কোনও কথা না বলে উঠে পড়ল। দরজা পর্যন্ত গিয়ে পাঁচশ ডলার ছাপিয়ে মনে একটা প্রশ্ন উঠল— মিসেস ওপেনহাইম আধাজহান্নামে যেতে বললেন কেন?

ফিরে এসে নাছোড়বান্দা পাওনাদার আস্তে আস্তে বলল— মিসেস ওপেনহাইম, লোক তো জহান্নমে যেতে বলে, আপনি আমাকে আধাজহান্নমে যেতে বললেন কেন?

মিসেস ওপেনহাইম রাগ না করে বললেন— কারণ তোমার মতো আমার আরেকজন নাছোড়বান্দা পাওনাদার আছে এবং সে-ও আমার কাছে তোমার মতো পাঁচশ ডলার পাবে।

দেনাপাওনার আসল কথা গোপন থাকলেই ভালো, জানাজানি হয়ে গেলেও খুব ক্ষতি নেই। কিন্তু গুপ্তচরের আসল কথা গোপন না থাকলে সমূহ সর্বনাশ। গুপ্তচরের কাজ বৈষ্ণব কবিতার পিরীতির মতো— গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি সাধিবি মনের কাজ। ইসরাইলের গুপ্তচর বিভাগ গোপনে কাজ সারতে, শোনা যায়, খুব পটু। কেমন পটু? গল্প আছে।

ইসরাইলের গুপ্তচর বিভাগের বড়কর্তা একদিন গোপনে ডেকে পাঠালেন অস্কার লেভাস্ট নামে একজন অধীনস্থ গুপ্তচরকে। গোপনে বললেন— লেভাস্ট, আজই তোমাকে নিউ ইয়র্ক যেতে হবে। এই নাও প্লেনের টিকেট।

বড়কর্তা গোপনে টিকেটখানা লেভাস্টের হাতে দিলেন। বললেন— সেখানে গিয়ে কোন্ হোটেলে উঠবে তা এই গোপন খামের মধ্যে লেখা আছে। নাও।

টিকেট ও খাম লেভাস্ট গোপন পকেটে রেখে দিলেন। বড়কর্তা বললেন— ওই হোটেলে আমাদের একজন গুপ্তচর আছে। তার নাম এডগার ম্যাগনিন। সে যে আমাদের গুপ্তচর একথা সে জানে, আমি জানি আর তুমি এই মুহূর্তে জানলে। খুব গোপন। তুমি গিয়ে এডগার ম্যাগনিনের ডান কানের কাছে মুখ নিয়ে গোপনে ফিসফিস করে বলবে, 'আকাশ নীল আর ঘাস সবুজ'। তারপর এডগার ম্যাগনিন গোপনে তোমাকে একটা কাজের কথা বলবে, তুমি গোপনে সেই কাজ হাসিল করে গোপনে চলে আসবে। ব্যস।

বড়কর্তার নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চললেন লেভাস্ট। কিন্তু নিউ ইয়র্ক হোটেলে এসে গোপন বিপদে পড়লেন। রিসেপসনিস্ট খাতাপত্র খুলে বললেন— আমাদের হোটেলে এখন দুজন এডগার ম্যাগনিন আছেন। একজন থাকেন তেতলায় বিয়াল্লিশ নম্বর ঘরে আর একজন থাকেন বাষট্টি তলায়...

আর শুনে দরকার নেই। আগে গোপনে তেতলায় বিয়াল্লিশ নম্বর ঘরে গিয়ে দেখা যাক।

তেতলায় বিয়াল্লিশ নম্বর ঘরে ঢুকতে কোনও অসুবিধা হল না। ঘরের মধ্যে এডগার ম্যাগনিন আছেন, তিনি সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন লেভাস্টকে। ম্যাগনিনের ডান কানের কাছে মুখ নিয়ে গোপনে ফিসফিস করে অস্কার লেভাস্ট বললেন— আকাশ নীল আর ঘাস সবুজ।

শুনে এডগার ম্যাগনিন হা-হা করে হাসলেন। বললেন— আপনি ইসরাইলের গুপ্তচর এডগার ম্যাগনিনকে চাইছেন তো ? তিনি বাষট্টি তলায় ছাপান্ন নম্বর ঘরে থাকেন।

গুপ্তচরের গোপন গল্প থেকে অনায়াসে খোলাখুলি যুদ্ধের খবরে চলে আসা যায়।

ইহুদীদের সঙ্গে আরব-লীগভুক্ত দেশসমূহের যুদ্ধ বেঁধেছে ; জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতায়, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে, যুদ্ধ থেমেছে বটে, কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে ইসরাইল রাষ্ট্রের আয়তন প্রায় দেড়গুণ হয়েছে। ১৯৫৮ সালে মিশর ও সিরিয়া একত্র হয়ে আরব প্রজাতন্ত্র গড়েছে ; এই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইলী যুদ্ধে আরব পরাস্ত হয়েছে। ইহুদীরা, খুব স্বাভাবিক, নাসেরকে সুনজরে দেখে না।

কতদূর কুনজরে দেখে ? এ-বিষয়ে একটি মোক্ষম গল্প আছে— এক গল্পেই কিস্তিমাৎ।

একজন মার্কিন ভদ্রলোক ইসরাইলে বেড়াতে এসেছে। একজন ইহুদী ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রমহিলার একটি সুন্দর বাচ্চা ছেলে আছে।

—আপনার ছেলের নাম কী ?

—নাসের।

শুনে মার্কিন ভদ্রলোক চমকে উঠলেন— নাসের ? আপনারা তো নাসেরকে দারুণ ঘেন্না করেন। মিসেস স্যামুয়েল, নিজের ছেলের নাম আপনি কেমন করে নাসের রাখতে পারলেন ?

ভদ্রমহিলা কুলকুল করে হাসলেন। বললেন— স্যর, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি আদৌ বিয়ে করিনি।

হারিয়ে যাওয়া ঘোড়ার গাড়ি

হিমানীশ গোস্বামী

ঘোড়ার গাড়ি যখন দেখিনি, ফরিদপুর জেলার একটি গ্রাম থেকে তার সংবাদ আমরা পেতাম কলকাতা-ফেরতদের কাছে। সংবাদ মানে, ঘোড়া গাড়ি চাপা পড়ার ভয়াবহ সব বৃত্তান্ত। ঘোড়া খেপে গিয়ে মানুষকে খুন জখম করেছে, এমন-সব লোমহর্ষক কথা ও কাহিনী। সেসব কাহিনীর বিশদ বিবরণ এখন মনে নেই। কিন্তু এটা মনে আছে, সেসব শুনে আমাদের কলকাতা শহর সম্পর্কেই একটা ভয়াবহ ধারণা হয়ে গিয়েছিল, এবং কলকাতা গিয়ে পৌঁছনো মাত্র ঘোড়ারা গাড়ি সমেত হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটাবে—এটা সম্পর্কে একরকম নিশ্চিত ছিলাম। তাই, এখন বলতে বাধা নেই, যেদিন সন্ধেবেলায়—আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে—শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেছিলাম সেদিন ভয়ে বুক প্রচণ্ডভাবেই দুরু দুরু করে উঠেছিল। এবং ঠিক যখন নানাবকমভাবে খুঁটিয়ে দেখে মনে হয়েছিল, ঘোড়ার গাড়ি তেমন বিপজ্জনক নয়, এবং গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসেছিলাম, ঠিক সেই সময় চোখে পড়ে গেল দৃশ্যটি—দুজন লোকেব উপব দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি চলে গেল—লোক দুটি বিকট আর্তনাদ করে রাস্তার দুদিকে ছিটকে পড়ে কাতরাতে লাগল। ভিড় আজকের মত এমন জমাটি না হলেও মনে হল শ'তিনেক লোক যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল জায়গাটিকে ঘিরে।

সেই থেকে ঘোড়ার গাড়ি একটা যেন বিভীষিকাই হয়ে গেল আমার! কৈলাস বসু স্ট্রীট দিয়ে তখন দিনে, আজ আন্দাজ করলে যেন মনে হয়, শ' খানেক ঘোড়াব গাড়ি চলত। খট খট খট খট্ করে আওয়াজ করতে করতে কত রকম ঘোড়ার গাড়ি যে দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। এক-নম্বর, দু-নম্বর, তিন-নম্বর গাড়ি, ফীটন গাড়ি, পেছনে একজন পাহারাদার কিংবা দু-জন তকমা আঁটা পাহারাদার নিয়ে গাড়ি ছুটত—আর আমি ভয়ে ভয়ে সেদিকে তাকাতাম। সে সব গাড়ির কী চেহারা! নোংরা রাস্তার উপর দিয়ে চললেও সে-সব গাড়ি ছিল তকতকে ঝকঝকে! কোথাও কোনো একটি আঁচড় পর্যন্ত যেন পড়েনি! সেই সব গাড়িতে দেখতাম নানা উচ্চ স্তরের মানুষ। দেখে কী রকম আশ্চর্য লাগত, অসম্ভব মনে হত। সবে তখন রূপকথার গল্পগুলি পড়তে শুরু করেছি—তার আগে কেবলই শুনেছি। সেখানে অবশ্য ঘোড়ার দেখা অনেক পেয়েছি— রাজা, মন্ত্রী, রাজপুত্র, রাজকন্যার গল্প, ঐশ্বর্যের নানা বিবরণ। সেই ঐশ্বর্যের পুরো ধারণা বুনো কল্পনাতেও আনা যায় না, কিন্তু ঐ সব ঘোড়া—বড় বড় সুঠাম চেহাবার কালো গা-চকচিকে ঘোড়াদের দেখেই মনে হত, এরাই সেই রূপকথার ঘোড়া. আব যে-সব লোক ওর মধ্যে বসেন তাঁরা সেই রূপকথারই রাজা, রানী, রাজকন্যে! কোনও-কোনও গাড়ির সঙ্গে থাকত দুটো ঘোড়াও, আবার চার ঘোড়ার গাড়িও দেখেছি বলে যেন মনে পড়ছে, ৪৫ বছব পুরু সময়ের পরদা ভেদ করেও। এ-ছাড়া হাড় জির-জিরে ছোট ছোট ঘোড়া টানত থার্ড ক্লাস গাড়ি—সেই একই পথে। তাদের সংখ্যাই ছিল বেশি। কখনো সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িও দেখেছি।

কিন্তু হঠাৎ যেন সেগুলি কোথায় সব মিলিয়ে গেল! সেদিন শেয়ালদা স্টেশনের ফ্লাই ওভার দিয়ে নেমে আসছি ট্রামে, হঠাৎ ডান দিকে চোখ পড়ল একটি ঘোড়ার গাড়ি! কতদিন দেখিনি ঘোড়ার গাড়ি? হঠাৎ মনে আনতে পারলাম না। এক বছর? দু-বছর? হতে পাবে। তিনও হতে পারে। রুগ্ণ ঘোড়া, রুগ্ণ গাড়োয়ান। অতি ধীরে-ধীরে চলেছে শেয়ালদা স্টেশনের দিকে। আর ঠিক তখনই দেখলাম, একটি দশ এগারো বছরের ছেলে ওই ঘোড়াব গাড়ির পেছনে উঠে নিবিড় আনন্দে বিনি-পয়সার গাড়ি চড়ে নিচ্ছে! তখনই সমস্ত ভুলে 'পিছুমে ছিপ্‌টি!' বলে চিৎকার করে উঠেছিলাম আর কি। হঠাৎ যেন আমি চলে গিয়েছিলাম পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার

কলকাতায়। হঠাৎ! হয়ত এক সেকেণ্ডের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ সময়! কিন্তু তারপর? বর্তমান জগতে ফিরে এসে কোনক্রমে পিছুমে ছিপ্‌টি কথাটাকে আটকে দিই! নইলে এক কেলেঙ্কারির ব্যাপার হত। ট্রামসুদ্ধ লোক আমাকে খ্যাপা মনে করে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন। পাশের লোকটি যদি যুবক হতেন, তাহলে ভাবতেন, আমি অতঃপর তাঁকে কামড়েও দিতে পারি, এবং একটু সন্দেহের চোখে তাকাতেন এবং সাবধান হওয়ার চেষ্টা করতেন। কিছু বৃদ্ধ নিশ্চয়ই ভিড়ে দাঁড়িয়ে মনে করতেন আমি এমন একটা দৃশ্য দেখেছি যা আধুনিক যুগে আর দেখা যায়নি। তাঁরাও জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে চেষ্টা করতেন। একটি ঘোড়ার গাড়ির পেছনে লম্ফনরত কোনো বালকের গায়ে গাড়োয়ানের চাবুক এসে পড়ছে কি না!

না, এ-দৃশ্য এখন আর দেখা যায় না। সে-দিন ছিল ঘোড়ার গাড়ির যুগের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। ঘোড়ার গাড়ি চলতে থাকলেই বালকদের অদম্য স্পৃহা জাগত, সেই ঘোড়ার গাড়ির পেছনে উঠে কিছুটা বিনি-পয়সার মজা লুঠে নেওয়া! কিন্তু কতক্ষণই বা। ঈর্ষান্বিত অন্য বালকের কথা ছেড়েই দিলাম, কিছু কিছু বয়স্কও বলে উঠতেন, পিছুমে ছিপ্‌টি! সঙ্গে সঙ্গে গাড়োয়ানের লম্বা লিকলিকে চাবুক অপূর্ব কৌশলে বিদ্যুতের মতো এঁকে বেঁকে চলে যেত পেছনের দিকে! আর সে কী মধুর অনুভূতি! সে-অনুভূতির কথা এখনও মনে আনতে পারি, খুব একটা চেষ্টা না করেও!

'পিছুমে ছিপ্‌টি!' কথাটার মধ্যে গাড়োয়ানদের অবাঙালিত্বের সন্ধান পান অনেকেই। কিন্তু কথাটা অবাঙালিদের তৈরি হলেও ব্যবহারের সময় কিন্তু বাঙালি, অবাঙালি, ধনী, দরিদ্র কেউ বাদ যেতেন না। প্রথম দিকে, যখন ঘোড়ার গাড়ির চলন হয়েছিল কলকাতায়, সম্ভবত অবাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় তা চালু করেছিলেন। আমার যত দূর মনে পড়ে, আমি বহু বাঙালি গাড়োয়ান দেখেছি, কিন্তু সম্ভবত তাদের কেউ হিন্দু নয়। হিন্দুদের সঙ্গে ঘোড়ার যোগাযোগ ঐতিহাসিক উপন্যাসে, গল্পে, উপকথায় থাকলেও বাস্তবে কমই দেখা যায়—বিশেষ করে এই বাঙলায়।

শেয়ালদা স্টেশনের কাছে 'পিছুমে ছিপ্‌টি!' বলতে বলতেও থেমে গিয়েছি! তারপর বাড়ির বইয়ের মধ্যে যে বই-ই পড়ি দেখতে পাই কিছু-কিছু ঘোড়া। ঘোড়া যেন আমাকে পেয়ে বসে। ঘোড়ারা যে বাঙালি নয়, তার প্রমাণ পাই অবনীন্দ্রনাথের লেখায়—

আগরোম্ বাগরোম্ সবরোন্ ঘোড়া
নর্মন ঘোড়া, জর্মন ঘোড়া,
আগাডুম বাগাডুম পাৎলুন ঘোড়া পান্টুন ঘোড়া
টাক্‌টুম্ টাকাটুম্ বর্মন টাট্টু
টপাটপ্ টপাটপ স্টড ব্রেড ঘোড়া।

টুকে রাখি খাতায়। ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি পেলেই হল, লিখতে শুরু করি একটা পুরনো ডায়েরির পাতায়। তারপরই দেখতে পাই নাইনটি হর্স পাওয়ার কান্ট্রি ঘোড়া, কিন্তু এর মানে বুঝে উঠতে পারি না। কান্ট্রি ঘোড়া—কোন্ কান্ট্রি ঘোড়া? সব ঘোড়াই তো কোনও-না-কোনও 'কান্ট্রি'র। তবে, মনে হয় দিশী ঘোড়া—অর্থাৎ দিশী বলতেই যা মনে আসে তাহল ক্ষীণকায়, ক্ষীণজীবী অতি দুঃখে কাতর কোনও একটি চতুষ্পদ জীব। যে-জীব শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পে, খাবার সময় জীবনে সে যা কখনও খায়নি, কেবল লোভ করেই এসেছে, সেই ভেজানো ছোলা দিতে দেখে হাসতে-হাসতেই মারা পড়েছিল!

কিন্তু বাঙালি ঘোড়ার নামগন্ধও নেই, যদিও ভারতীয় ঘোড়ার কথাও আছে :

চক্কর ঘোড়া লক্কর ঘোড়া— হার্সটিন হাজির।
বাজি রাওন তাজি ঘোড়া, হিন্দ রাওন সিন্ধি ঘোড়া

ঘোড়ার খোঁজে বই হাতড়েছি। বইয়ের জন্য বাড়ির বাইরে যাইনি, যা ছিল, তারই কিছু অংশ খুঁজেছি, 'পট-লাক্' ইংরেজী কথাটায় আমার গভীর বিশ্বাস। যা আছে, দেখি কেমন, চেখে। যা নেই, তা নেই। তার জন্য টুঁড়তে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। অত পরিশ্রম করলে অন্বেষণ

হয়, গবেষণা হয়, কিন্তু আড্ডা হয় না, বোধ হয় গল্পও নয়। তাই হাতের কাছে যা পাওয়া গেল, তাই দিয়েই আমার এই রম্যরচনার প্রয়াস, যা কিনা আড্ডার লিখিত সংস্করণ। এই হিসেবটা কেউ মানবেন কিনা জানি না। পণ্ডিতরা কী বলবেন তাই বা কে জানে। যা বলতে চাই, তা হল ঘোড়ার গাড়ি হারিয়ে গেছে। এই রচনার নামও তাই দেওয়া আছে— হারিয়ে যাওয়া ঘোড়ার গাড়ি। ঘোড়ার গাড়ি হারিয়ে গেছে, তাই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে, শোকে নয় শূন্যতায়। যে-শূন্যতা আমার মনেই হয়নি এতদিন। যে-শূন্যতা একটা প্রেরণার বশে অতি আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করেছি। অবশ্য একেবারে শূন্য হয়নি। দু-একটা ঘোড়ার গাড়ি এখানে-ওখানে ছিলই। কয়েকদিন আগেও যেমন দেখেছি, তেমনি নিশ্চয় আগেও চোখে পড়েছে। চোখে পড়েছে, কিন্তু মনে এসে বিশেষ কোনও ঝড় তোলেনি।

তবে, ঘোড়া, ঘোড়াগাড়ি দেখেছি ঠিকই, অনেকই দেখেছি—কিন্তু দেখার মত করে কি দেখেছি ? আছে, চোখে পড়ছে ; দরকার হচ্ছে, ব্যবহার করছি ; এই রকম ভাবে। আমার কাছাকাছি ঘোড়া যেমন দেখেছি, দেখেছি অজস্র গাড়োয়ান। কিন্তু যারা কোচম্যান, কিংবা আমাদের চলতি ভাষায় যারা কোচয়ান, কোচুয়ান, কোচম্যান— এদের জাতই ছিল আলাদা। তাও একখানা বই খুলে পড়লাম বলেই জানতে পারলাম। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইতে যে কথা, তা থেকে কিছুটা :

"...বাবামশায়ের সময়ের কোচোয়ান, আস্তাবলবাড়ির দোতলার নহবত খানায় থাকে। তিনটে বাজলেই সে বেরিয়ে এসে বসে আস্তাবলের কাছে খাটিয়া পেতে, ফরসি হাতে ; ঠিক একটি ফুলদানির মতো ফরসি ছিল তার। আক্কেল সহিস তামাক সেজে ফরসি এনে হাতে দেয়, তবে সে তামাক খায়। সহিসরা ছিল তার চাকর ; সব কাজ করে দিত, নিজের হাতে সে কিছু করত না। দূর থেকে দেখছি, সমশের আয়েস করে ফরসি হাতে খাটিয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে, আক্কেল সহিস তার বাবরি চুল বাগাচ্ছে, ঘণ্টাখানেক ফাঁপিয়ে ফাঁপিয়ে চুল আঁচড়াবার পর একটা আয়না এনে সামনে ধরলে। সামসের বাদশাহী কায়দায় বাঁ হাতে আয়নাটি ধরে মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে গোঁফ মুচড়ে আয়না ফেরত দিয়ে উঠল। ঘরে গিয়ে চুড়িদার জরিদার বুককাটা কাবা প'রে পা বের করে দিতে আর এক জন সহিস শুঁড়তোলা দিল্লীর লপেটা তার পায়ে গুঁজে দিল। আর এক সহিস মাথার শামলাটা দু-হাতে এনে সামনে ধরল, সমসের পাগড়িটা মাথার উপর থাবড়ে বসিয়ে হাতি মার্কা তকমার দিকটা হেলিয়ে উঁচু করে দিলে। অন্য সহিস ততক্ষণে লম্বা চাবুকটা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সমশের চাবুক হাতে নিয়ে এবারে দোতলা থেকে নামল মাটির সিঁড়ি দিয়ে। নিচে ঘোড়া ঠিক করে রেখেছে সহিসরা দুধের মতো সাদা জুড়ি। সেই জুড়ি ঘোড়া গাড়িতে জোতবার আগে খানিক ছুটিয়ে ঠিক করে নিতে হত। যেখানে রবিকার লালবাড়ি সে জায়গা জোড়া ছিল গোল চক্কর প্রাচীর ঘেরা। এক পাশে ছোট্ট একটি ফটক। সহিসরা ঘোড়া দুটো চক্করে ঢুকিয়ে ফটক বন্ধ করে দিল। সমসের লম্বা চাবুক হাতে প্রাচীরের উপর উঠে দাঁড়িয়ে বাতাসকে চাবুক বসালে— সাট্ ! সেই শব্দ পেয়ে ঘোড়া দুটো কান খাড়া করে গোল চক্করে চক্কর দিতে শুরু করলে। একবার করে ঘোড়া ঘুরে আসে আর চাবুকের শব্দ হয় শট্ শট্। যেন সার্কাস হচ্ছে। এই রকম আধ ঘণ্টা ঘুরিয়ে সমশের কোচোয়ান চাবুক আক্কেল সহিসের হাতে ছেড়ে দিয়ে নামল। আক্কেল গাড়ি বের করলে—ঝক ঝক তক তক করছে গাড়ির ঘোড়ার রুপোর পিতলের শিকলি-সাজ। গাড়িতে জুড়ি জোতা হলে পর সমশের কোচবাক্সে উঠে হাতা গুটিয়ে দাঁড়াতেই সহিস রাশ তুলে দিলে তার হাতে।

'রাশ ধরবার কায়দা কি ছিল সমশের কোচোয়ানের' দশ আঙুলের ভেতরে কেমন কায়দা করে ধরত ! সেই রাশে একবার টান দিতেই বড় বড় দুটো ঘোড়া তড়বড় করে এসে গাড়ি বারান্দায় ঢুকল। গাড়ি বারান্দায় ঢুকতেই যে পুরু কাঠের পাটা পাতা থাকত সেটা শব্দ দিলে একবার হুড়দুম্ যেন জানান দিলে গাড়ি হাজির। বাবামশায় হাওয়া খাবার জন্য তৈরি হয়ে গাড়িতে চাপলেন। গাড়ি চলল গাড়ি বারান্দা ছেড়ে। সমশের তখনও দাঁড়িয়ে রাশ হাতে কোচবাক্সে। কাঠখানা চারখানা চাকার চাপে আর দু বার শব্দ দিলে হুড়দুম্ হুড়দুম্। ধপাস করে এতক্ষণে সমশের কোচোয়ান কোচবাক্সে জাঁকিয়ে বসল যেন সিংহাসনে বসলেন আর এক লক্ষ্ণৌয়ের

নবাব।"

ছবি। একেবারে পাক্কা শিল্পীর হাতে আঁকা। কেবল ছবি নয়, চলচ্চিত্র! স্মৃতির আর্কাইভে সযত্নে রাখা। তবে যাঁরা ঘোড়া এবং ঘোড়ার গাড়ির যুগ দেখেননি তাঁদের পক্ষে এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করা সহজ নয়। তবু ধরে রাখা আছে হারিয়ে যায়নি। এই চিত্র যেমন একটু ভয়, সম্ভ্রম জাগায় তেমনি বেশ জানিয়ে দেয় সমশের লক্ষ্ণৌয়ের নবাব নয়— কিন্তু হাবভাব যেন ঠিক তাই! এ-রকম কেবল সমশের করেনি, করেছে সেই প্রাচীন যুগের আধা, সিকি কিংবা এক পাই জমিদাররাও। যেন প্রত্যেকেই লক্ষ্ণৌয়ের নবাব! ঘোড়ার জুড়ি গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সেই জমিদারদের শেষ বাতিটিও নিবে গেছে, সঙ্গত কারণেই!

অবনীন্দ্রনাথের দেখা ঘোড়ার গাড়ি, কোচোয়ান এসব আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না। দুটি যুগ বহু দূরের—সেটি একটি কারণ, অন্য কারণটি সামাজিক এবং আর্থিক। আজও কি আমরা জানতে পারি, বড় মহলে ঐশ্বর্য-বিলাস কিভাবে পরিচালিত হয়? কথাটায় কিছু ভুল হল। কথাটা হবে, আজ আমরা ক'জন জানতে পারি, ধনী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সম্পত্তির এবং ভোগ-বিলাসের পরিমাণ?

তবু ছবি ছবিই। এ ছবি মুছে যাবে না। কিন্তু ছবি কি একটা? হারিয়ে-যাওয়া ঘোড়ার গাড়ির অনেক ছবি আছে। আমি যতদূর দেখেছি, এমন ছবি আর পাইনি। এবং আরও একটা কথা, ছবি ছবিই— এ-ছবি যেমন মুছে যাবে না, তেমনি এর মধ্যে কতখানি বাহুল্য রঙ দেওয়া রয়েছে, তাও জানা যাবে না। জানা যাবে না, কোন্ রঙটা বড়ই হালকাভাবে দেওয়া হয়েছে কিংবা কোন্ রঙটা একেবারেই দেওয়া হয়নি?

ঘোড়ার গাড়ি যখন জলজ্যান্ত ছিল, তখন সাহিত্যেও এর হুড়দুম্ দুড়দুম্ প্রবেশ ঘটবে, সেটা এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ মাস্টারমশায় গল্পটিতে অসাধারণ ভূতুড়ে আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন। একটুখানি স্মরণ করিয়ে দিই:

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—কোনো লোক নাই তবু তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভরতি হইয়া উঠিতেছে; যেন তাহার আসনের শূন্য অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠাসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাবিল—এ কী ব্যাপার। গাড়িটা আমার সঙ্গে এ কী রকম ব্যবহার শুরু করিল। "এই গাড়োয়ান, গাড়োয়ান!" গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সহিসটার হাত চাপিয়া ধরিল; কহিল "তুম ভিতর আকে বৈঠো!" সহিস ভীতকণ্ঠে কহিল, "নেহি সা'ব, ভিতর নেহি যায়েগা।" শুনিয়া মজুমদারের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল; সে জোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, "জলদি ভিতর আও।"

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল।

গল্পটি ভূতুড়ে। কিন্তু ভূতুড়ে গল্পের সবটাই ভূত নয়। এর মধ্যে 'ভূত' ছাড়া আর সবই বাস্তব। কেবল তাই নয়— সম্ভবত ভূতও বাস্তব। গল্পের মধ্যে ঘোড়ার গাড়ির আমদানি সে যুগে ছিল সহজ, স্বাভাবিক। কেননা ঘোড়ার গাড়িই ছিল স্বাভাবিক।

গল্পের মজুমদার যে-ঘোড়ার গাড়িটিতে উঠেছিল সে-গাড়িটি কিন্তু স্বাভাবিক ছিল না। কেননা, "গাড়িটা কেবলই ময়দানের রাস্তার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া দুটো ক্রমেই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল—তাহাদের বেগ কেবলই বাড়িয়া চলিল—গাড়ির খড়খড়েগুলো থর থর করিয়া কাঁপিয়া ঝরঝর শব্দ করিতে লাগিল।"

এটি একটি ব্যতিক্রম। কোনও ঘোড়ার গাড়িই এরকম আচরণ করে না বলেই গল্পটা জমাটি। কিন্তু আধুনিক যুগে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে গল্পই আর হয় না। তখন কেউ ঘোড়ার গাড়ির উল্লেখ করলেই মনে হবে কাহিনীটি ভূতুড়ে!

★

পিছুমে ছিপটি!

রবীন্দ্রনাথের নায়ক মজুমদার ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে হিন্দি ভাষায় কথা বলে।

সেই কোন্ যুগে লেখা গল্পে এটাও ছিল বাস্তবতা। মজুমদার সহিসকেও হিন্দিতেই কথা বলেছে। পিছুমে ছিপ্‌টি! কথাটাও ছিল হিন্দি। এ-সমস্ত থেকে এটাই প্রমাণিত যে বাঙালিরা ঘোড়ার ব্যবসায়ে আসেনি। তার আর একটা বড় প্রমাণ—সতেরো জন অশ্বারোহীর আগমনেই আমাদেরই সমগোত্রীয় এক রাজা রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, অন্তত এটাই ঐতিহাসিক জনশ্রুতি। গাড়োয়ান বা সহিসরা যে হিন্দি ছাড়া কথা বলত না, বা বুঝত না, তার আর একটা প্রমাণ পেয়ে গেলাম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় : Boy এসে খবর দিলে যে, "কোচম্যান লোগ আবি গাড়ী যোৎনে নেহি মাঙ্গতা। ও লোগ সমজ্‌তা দো দশ মিনিট্‌মে জোর পানি আয়েগা, সায়েৎ হাওয়া ভি জোর করে গা। ঘোড়া লোগ আস্তাবল্‌মে খাড়া খাড়া এইসাঁই ডরতা হ্যায়।"

সেদিন ঘোড়ারা ঝড়বৃষ্টির ভয় না পেলে চার ইয়ারের গল্পই জমত না। আজকাল ঐ একই পরিবেশে ড্রাইভার এসে কেবল হয়ত বলত, তাড়াতাড়ি চলে আসুন—বিষ্টি পড়লে রাস্তাঘাটে বিতিকিচ্ছিরি কারবার হবে স্যার! মনে হচ্ছে বিষ্টি এলো বলে!

এই ড্রাইভার, বলা বাহুল্য, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান নয়, কোচম্যানও নয়! অবশ্য এই ড্রাইভার হিন্দিতে কথা বললেও বেমানান হত না। এই ড্রাইভার হাওয়া গাড়ির—যাকে এককালে ঐ সহজ নামেই ডাকা হত। এখন হাওয়া গাড়ি কেউ বলে না বলে মোটর গাড়ি।

কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি কবে এল? কোত্থেকে এল? গবেষণা করিনি, করার মত সাক্ষীসাবুদ পাওয়া যায় না হাতের কাছে। তবু, বহুদিন আগে এক খাতায় টুকে-রাখা কিছুটা শোনাতে পারি। উইলিয়াম হিকির বিবরণে পাই—যা কিনা প্রায় দুশো বছরের মামলা—তা হল গড়ের মাঠে ঘোড়া গাড়ি চড়ার বিবরণ— (অনুবাদ বিনয় ঘোষ) : "চোখে তখন ক্ল্যারেটের রঙ ধরেছে, ফুরফুরে হাওয়া লাগছে গায়ে, আর মনে হচ্ছে যেন দেবদূতের মতন পুষ্পরথে করে স্বর্গের দিকে উড়ে চলেছি। জানিও না কখন ঘোড়া দুটি ফোর্টের দিকে বাঁক নিয়েছে। ক্যাপটেনের ইচ্ছে ছিল ফোর্টের ভিতর দিয়ে যাবার। আমি নিজেই তাই শুনে ঘোড়ার মুখ কেল্লার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি খেয়াল নেই। স্বর্গের বদলে যে আমরা ফোর্টের দিকে চলেছি এবং দুরন্ত বেগে তাও হুঁস নেই।" অতএব ধরে নিতে পারি কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি এসেছে অন্তত দু শো বছর আগেই।

১৯ শতকের প্রায় সবটাই কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি দাপটে পরিবহন ক্ষেত্রে ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছে— তার নানা প্রমাণ, নানা সাক্ষী! ঈশ্বর গুপ্তর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়—

> বিধাতা যদ্যপি করে গাড়ির সহিস।
> আগে ভাগে ছুটে যাই পহিস্ পহিস ॥
> সাজিয়া কউচম্যান উপরে উঠিয়া।
> ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই, জুড়ি হাঁকাইয়া ॥২

'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সাক্ষ্যও হাজির। সেই সাক্ষী বলছেন, বাবুরাম অধোমুখে শীঘ্র এক-খানা লকাটে রকম কেরাঞ্চিতে ঠক চাচা প্রভৃতিকে লইয়া উঠিলেন এবং খন্ খন্ ঝন্ ঝন্ শব্দে বাহির সিমলের বাঞ্ছারামবাবুর বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হুতোমের সাক্ষ্যও চমৎকার; কলকাতার কেরাঞ্চি গাড়ি বেতোরোগীর পক্ষে বড় উপকার (গ্যালবানিক শকের) কাজ করে।

সাক্ষ্য আরও আছে : "চার আনা!" "চার আনা!" "লাল দিকি :" "তের জুরী!" "এসো গো বাবু ছোট আদালত!" বলে গাড়োয়ানেরা সৌখীন সুরে চিৎকার কচ্চে,—নবদ্ধাগমনের বৌয়ের মত দুই এক কুটিওয়ালা গাড়ির ভেতর বসে আচেন— সঙ্গী জুটচেনা। দুই একজন গবর্মেন্ট আপিসের ক্যারাণী গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কসাকসি কচ্চেন। অনেকে চটে হেঁটেই চলেচেন— গাড়োয়ান হাসি টিটকিরির সঙ্গে "তবে ঝাঁকা মুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম্ম নয়!" কমপ্লিমেন্ট দিচ্চে!

এবং আরও : দত্তবাবুর গাড়ি রুনু রুনু ছুনু ছুনু করে নুড়িঘাটা লেনের এক কায়স্থ বড় মানুবের দরজায় লাগল।

১৯ শতক ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া বর্ণনা করা প্রায় অসাধ্য! নববাবু বিলাসেও দেখি, বাগবাজারের ঘাটে পান্‌সি রেখে বাবুরা "...অপূর্ব অপূর্ব ছকড়া সকলে আরোহণ পূর্বক সদর দেয়ানী কোর্ট

আপিল প্রভৃতি আদালতে গমন" করতেন। কেবল তাই নয়, হুতোমকে ডেকে জিজ্ঞেস করা যাক, দফতর ছাড়া অন্য কাজে কি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবহার হত না ? হুতোম এই প্রশ্ন শুনে সাগ্রহে জবাব দিলেন : বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাবে টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজলো। সূর্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আসতে লাগলো। শহরের বাবুরা ফেটিং, সেলফ্ ড্রাইভিং, বগি ও ব্রাউহ্যামে করে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্রলোক, বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগানে চল্লেন— দুই চার জন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরই পেছনে মালভরা মোদাগাড়ি চল্লো, পাছে লোকে জানতে পারে এই ভয়ে সে গাড়ির সইস কৌচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন— কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরির কাজ মনে করেন।

আরও আছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে তিনি ছক্কড় গাড়ির বর্ণনা দিয়েছেন। ছক্কড় গাড়ি থেকেই ছ্যাকড়া গাড়ি। শিবনাথ শাস্ত্রীর কথায় : দোলদার ছক্কড় গাড়ি। পূর্বেই বলিয়াছি চাঙড়িপোতা গ্রাম কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রতিষ্ঠিত। সেকালে এক প্রকার দোলদার ছক্কড় গাড়ি ছিল, তাহা চাঙড়িপোতার সন্নিহিত রাজপুর গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিত। কুঠীওয়ালা বাবুরা ও অপেক্ষাকৃত পদস্থ ব্যক্তিরা প্রতি সোমবার সেই দোলদার ছক্কড়-গাড়ি চড়িয়া কলিকাতায় আসিতেন ও শনিবার কলিকাতার ধর্মতলা হইতে ঐ গাড়ি চড়িয়া বাড়ি যাইতেন।

আজ থেকে আটাত্তর বছর আগে ছাপা প্রমোদা নামের একটা গোয়েন্দা কাহিনীর পাতা ওলটাতে ওলটাতে সহজেই চোখে পড়ল ; এই সময়ে একখানি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ি রসা রোডের কোন একটি দ্বিতল বাটীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। ...বালক অন্ধকারে আত্ম লুকাইয়া দণ্ডায়মান হইল—তিন-জন গাড়িতে উঠামাত্র, গাড়ির দ্বার রুদ্ধ হইল—গাড়ি কলিকাতা অভিমুখে চলিতে লাগিল। বালক আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া শকট চালকের অলক্ষিতে সাবধানে গাড়ির পশ্চাতে আরোহণ করিল।

পিছুমে ছিপ্‌টি !

বালক গাড়ির "পশ্চাতে আরোহণ" করেছে— এখন তার একমাত্র ওষুধ, "পিছুমে ছিপ্‌টি' ! বলে গাড়োয়ানকে সাবধান করে দেওয়া। কিন্তু আজ আমি যত জোরেই চিৎকার করি সে আওয়াজ আটাত্তর বছর ভেদ করে গাড়োয়ানকে সাবধান করে দেবে না। কিন্তু তবু ছোটবেলাকার সেই প্রবৃত্তিটা এখনও যেন মনের কোণে কোথাও রয়ে গেছে। ঠিক যেমন ট্রাম থেকে ছোট ছেলেকে ঘোড়ার গাড়ির পেছনে চড়তে দেখে চিৎকার করতে করতে থেমে গিয়েছিলাম, ঠিক তেমনি এই লেখাটা পড়েও আচমকা নিজেকে সংযত করলাম।

ঘোড়া গাড়ির দিন আর নেই। যখন ছিল তখন ছিল কত গৌরব ! কিন্তু প্রথম দিকে কেউ কেউ পাল্‌কিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন—ঘোড়ার গাড়ি চড়াতে দোষ আছে মনে করতেন। তবে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের বায়নাক্কাও ছিল, শশিশেখর বসু আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে তাঁর ছেলেবেলার কথা লিখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে গত শতাব্দীর শেষ দিকেই। তিনি লিখেছেন : ...অসময়ে ডাক্তার আনতে হলে ভাড়াগাড়ি ডাকা হত। গাড়োয়ান যদি শুনত ডাক্তার আসবেন ও ফেরত যাবেন তা হলে বলত, বাবু, ও ডাক্তারবাবু অনেক বেশি তামাক খান, বেশী ভাড়া দিতে হবে।

এ বায়নাক্কা অবশ্যই অন্যায্য নয়। মানুষ যখনই নিজেকে ভাড়া দিয়েছে তখন সুযোগ পেলেই সময় দীর্ঘ হলে ভাড়ার পরিমাণ বেশি দাবি করেছে।

ঘোড়ার গাড়ি যখন জোর ছুটত, তখন বুদ্ধিমান লোকেরা ভয়ে, বিস্ময়ে এবং কখনও প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ঘোড়ার গাড়ি থেকে শতহস্তেন না হলেও যতটা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করত। দূরে না গেলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটত। রবীন্দ্রনাথের গোরা থেকে তারই সামান্য একটু বর্ণনা : একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক ঝাঁকা ফল সবজি আণ্ডা রুটি মাখন প্রভৃতি আহার্য সামগ্রী লইয়া কোনো ইংরেজ প্রভুর পাকশালার অভিমুখে চলিতেছিল। চেন-পরা বাবুটি তাহাকে গাড়ির সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য হাঁকিয়াছিল, বৃদ্ধ শুনিতে না পাওয়াতে গাড়ি প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে।

ঘোড়ার গাড়ির বিভীষিকার কাহিনী নানা মানুষের মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল—আমরাও সেই সুদূর গ্রামে থেকেও প্রথম যা শুনতাম, তা হল, ঘোড়ার গাড়ির হৃদয়হীন আচরণ। গাড়োয়ানরা নাকি মানুষদের চাপা দিতে বেশি পটু। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে কৌতুককর দৃশ্যও দেখা যেত। একশো বছরেরও বেশি আগে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন : ৫ই অগ্রহায়ণ শনিবার বেলা ২টা ৩৫ মিনিটের সময় তৃতীয় শ্রেণীর একখানা ভাড়াটে গাড়ি হাটখোলার একটি দোতলা বাড়ির সম্মুখে আসিয়া রণবাদ্য বন্ধ করিল। ঘোড়া দুইটার মধ্যে একটার খাড়াই আধ হাত কম, কিন্তু তাহার লাগামের নীচে দিয়া যে-পরিমাণ জিহ্বা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে খর্বতার মায় সুদ ক্ষতিপূরণ হইল।

কলকাতার মন্থরগতিতে দ্রুততর করে তুলেছিল ঘোড়ার গাড়ি। রিকশো আসেনি তখনও, প্রধান ভরসা পাল্‌কি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘোড়ার গাড়িতে যেতে চাইতেন না। তবে প্রয়োজনে তিনিও ঘোড়ার গাড়ি চড়েছেন। এখানে বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র দত্ত—কে চড়েননি ? এ সম্পর্কে প্রমাণ পাচ্ছি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের। তিনি বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন : বিদ্যাসাগর পাল্কী চড়িতেন, ঘোড়ার গাড়ি চড়িতে সহজে রাজি হইতেন না ; বলিতেন যে, পাল্কী চড়ায় কোনো দোষ আছে মনে করি না। ঘোড়ার গাড়ি চড়ায় কিন্তু আমার বিশেষ আপত্তি। ঘোড়াগুলোকে তাহাদের অনিচ্ছায় আমাকে বহন করিতে বাধ্য করান হয়—কিন্তু পাল্কী বেয়ারারা স্বেচ্ছায় অর্থের প্রত্যাশায় আমাকে বহন করে। সেই জন্য ঘোড়ার গাড়ি চড়া কতকটা ইম্মরাল মনে করি।

কিন্তু তবু ঘোড়া বাধ্য হয়ে গাড়ি টেনেছে, এবং মানুষে সে-গাড়িতে চড়েছে। পাল্কী লুপ্ত হয়ে গেছে—সেই বিখ্যাত সার্ভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট-এর অমোঘ নিয়ম অনুসারে। ঘোড়া কেবল গাড়ি টেনেই ক্ষান্ত থেকেছে তা নয়—টেনেছে অনেক বেশি ভারি ট্রাম। তবে বেশিদিন নয়। বিদ্যুৎ এসে ঘোড়াকে ট্রাম টানা থেকে মুক্তি দিয়েছে। রবার এবং পেট্রোল তাকে মুক্তি দিয়েছে গাড়ি টানার হাত থেকেও। কিন্তু মানুষকে এখনও মুক্তি দেয়নি—সে রিকশো টেনে চলেছে।

কিন্তু, কবে থেকে ঘোড়াটানা গাড়ির 'পতন' হতে শুরু করল সেটা, কোথাও স্পষ্ট করে লেখা না থাকলেও, অনুমান করে নেওয়া যায়। গল্প-উপন্যাস কবিতা ছড়া থেকে ঘোড়ার গাড়ি উধাও হয়ে গেছে। এখন কেউ লিখবে না, "একখানি সৌখীন লাণ্ডোগাড়ি হইতে একটি সুসজ্জিত—কিন্তু কুরূপা ও স্থূলকায়া—মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক একটি সমবয়সী পুরুষকে লইয়া নামিল।" তবে এটি যে খুব পুরনো আমলের লেখা তাও নয়। গত মহাযুদ্ধের ঠিক আগে প্রকাশিত অনিরুদ্ধ রায়ের আফিমের ফুল-এ এই বর্ণনা আছে! লাণ্ডোগাড়ি কি আজ কেউ বলতে পারবে বলে মনে হয় না। লাণ্ডো ছিল ঘোড়ার গাড়ি— একটু বেশি আরামপ্রদ—এবং উপরটা প্রয়োজন মত খুলে নিয়ে খোলা রোদ্দুরে এবং হাওয়ায় ঘোরা যেত। নামটা এসেছে জার্মানির বাভারিয়ার লাণ্ডাউ থেকে।

এখন কেউ লিখবে না : নন্দবাবু কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব অবস্থায় রহিলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া বেগে ঘর হইতে পলায়ন করিলেন। মুন্সী পিছনে ছুটিতে ছুটিতে বলিল— 'হামার দস্তুরি ?' নন্দ একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া তিন লাফে নিচে নামিয়া গাড়িতে উঠিয়া কোচম্যানকে বলিলেন— 'হাঁকাও !' আজকের যুগে নন্দবাবু বড় জোর 'বেগে ঘর হইতে পলায়ন' করে রাস্তায় নেমে ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বলতে পারেন, জোর চলুন! নন্দবাবুর পলায়ন সম্পর্কে কে লিখেছিলেন ? পরশুরাম।

এখন কেউ লিখতে পারবে না পরশুরামের মত। লিখলেও সেটা বাস্তবসঙ্গত হবে না। ঘোড়া রাখা সোজা নয়। ঘোড়ার খাদ্য জোটানো যায় না। তাদের থাকবার জায়গাই বা কোথায় এই জন-জমাট, যান-জমাট, জ্যাম-জমাট কলকাতা নামক আজব শহরে ? কেবল যে এখনই ঘোড়া রাখা সোজা নয় তা নয়। সেই কবেকার কথা। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন,

বড় মানুষ দূরে থাকুক
ভাল করে পেট চলে না

এখন কেমন করে চড়বে গাড়ী
জোটেনাক' ঘোড়ার দানা।

ভারত নামক দেশে কোনো কিছুই লুপ্ত হয় না। পাঁচ হাজার বছর আগেকার গোরুর গাড়ি চলে, সেই সঙ্গে চলে অতি আধুনিক জেট প্লেনও। কেরোসিনের আলো, বিদ্যুতের আবির্ভাবের পর থেকে নিভে যাওয়ার কথা—কিন্তু এখনও আমরা কেরোসিনের জন্য লাইন দিচ্ছি—দিতে বাধ্য হচ্ছি। কেননা, 'বিজলী থাকি থাকি চমকায়'। তাই সব রকম বন্দোবস্তই হাতের কাছে রাখতে হয়। যখন আজকালকার যুগেও ট্যাক্সির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় কখনো তখন মনে হয়, হায় রে! যদি থাকত সেইকালের ঘোড়ার গাড়িগুলো। কী চমৎকারই না হত তা হলে। কিন্তু হায় রে কবে কেটে গেছে ঘোড়ার গাড়ির কাল! ছুটতে ছুটতে হয়রান হচ্ছি—ট্যাক্সির পেছনে। আমরা, সেই ইংরেজীও শেখা হল না, বাংলাটাও ভুলে মেরে দিলামের মত, ট্যাক্সিও ধরতে পারলাম না, আর ঘোড়ার গাড়িটাও উঠে গেল! হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গেল, কত সহজে! যখন দীর্ঘ বিকেলে সূর্য ঢলতে শুরু করে, তখন মনে হয় না, কখনও সূর্য অস্ত যাবে। কিন্তু যখন যায়, তখন মনেই পড়ে না, ঠিক কখন অস্ত গেল। রাতেরও রূপ আছে— নিশ্চয়ই। বহু কবি ঔপন্যাসিক কি মিথ্যে কথা লিখে গেছেন গাদা-গাদা ? সেই রূপের জন্যই বিকেলের জন্য শোক হয়নি। কিন্তু অন্ধকারে তো রাস্তার গর্ত চোখে পড়ে না। আমরা ট্যাক্সির পেছনে ছুটে চলেছি—পাচ্ছি না, আর ঘোড়ার গাড়িগুলিও সব হারিয়ে গেছে, ঝামেলার এক শেষ!

এখন তাই, শুধুই স্মৃতি। কেবলই সেই, গুড ওল্ড ডেজ! কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, ওল্ড ডেজ-এর কালো দিকটা আমাদের চোখে পড়ে না। মন সেখানে ধোয়া মোছা তুলসীর পাতা, একেবারে নিষ্কলুষ।

পিছুমে ছিপ্‌টি!

আবার একখানা বই ওলটাতে ওলটাতে চোখ পড়ল, এবারে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কলমে : ...দেখিলেন একটা থার্ড ক্লাস খালি ছ্যাকড়া গাড়ি। দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং দোকানের বিপরীত দিকে জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন— 'ওরে ভবানীপুর জগুবাবুর বাজারে—'।

খালি ছ্যাকড়া গাড়ি! খালি !! সত্যি, গুড ওল্ড ডেজ। তখনকার দিনে ফিরে যেতে পারি এক্ষুনি। এমন কিছু পুরনো কথা নয়। সমস্যাও ছিল, ছিল না? এই তো সেদিনকার কথা—গত মহাযুদ্ধের সময়কার কলকাতার কথা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি লেখেননি অনুবর্তনে—একখানা, ঘোড়ার গাড়ি পাওয়ার ঝামেলার কথা? শুনুন তাহলে : সকাল হইতে না হইতে যদুবাবু ঘোড়ার গাড়ির আড্ডায় গাড়ি ভাড়া করিতে গেলেন। হাওড়া স্টেশনে যাইতে কেহ হাঁকিল তিন টাকা, কেহ হাঁকিল সাড়ে তিন টাকা। একজন বলিল, হাওড়া পুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাবু, কোন গাড়ি যেতে দিচ্ছে না।

কিন্তু সে তো যুদ্ধের সময়ে। ইভ্যাকুয়েশন! কলকাতায় জাপান বোমা ফেলবে। মানুষ ভয়ে পালাচ্ছে তখন দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। ওই সময় ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া শক্ত ছিল ঠিকই। কিন্তু সামান্য কষ্টের কথা বলে গুড ওল্ড ডেজ-এর স্মৃতিচারণের মজা মাটি করার কোনো অর্থ হয়?

না। হয় না। তাই পাঠকদের বলব, সেই কালটাই ছিল অন্যরকম। একেবারে অন্যরকম। সুনীতি চাটার্জির কথায় : আমাদের ছেলেবেলায় গয়ংগচ্ছ যান অর্থাৎ, মোটরকার, ইলেকট্রিক ট্রাম, বাস, এসব হয়নি। একটু সংগতিপন্ন ব্যক্তির বাড়িতেই গাড়ি আর ঘোড়া থাকত। এই গাড়ি আর ঘোড়া আমাদের শিশু জীবনের অভিজ্ঞতার আর কল্পনার অনেকখানি জুড়ে থাকত। আমার মামার বাড়িতে ঘোড়ার গাড়ি ছিল। পাড়ার ধনী পরিবার লাহাদের বাড়িতে বড়ো-বড়ো ঘোড়া আর গাড়িও ছিল। আজকালকার ছেলেরা এই ঘোড়ার প্রতি আমাদের শিশুমনের আকর্ষণ বুঝতে পারবে না। ...আমার মনে হয়, আজকাল যন্ত্রচালিত গাড়ি এসে ঘোড়ার অন্ন যেমন মেরে দিয়েছে, তেমনি আমাদের জীবনে প্রাচীনকাল থেকে যে রোমান্সের ধারা চলে এসেছে তাকেও

বাতিল করে দিয়েছে। Other times, Other manners—যা অবশ্যম্ভাবী, বা ভবিতব্য তা হবেই, কিছুই চিরস্থায়ী থাকে না।

স্মৃতি সততই সুখের ! তাই, কেউ যখন বুড়ো বয়সে গল্প বলতে বসেন, তখন পুরনো কালের ভাল ভাল কথাগুলিই এসে দেখা দেয়। তুচ্ছ কথা—দৈনন্দিন হিসেব নিকেশের কথা আর তেমন মনে পড়লেও নতুনদের কাছে বলতে বাধ বাধ ঠেকে। বুড়ো বয়সে অবনীন্দ্রনাথ যখন বলেন, সেকালে শখ বলে একটা জিনিস ছিল। সবার ভিতরে শখ ছিল, সবাই ছিল শৌখিন। একালে শৌখিন হতে কেউ জানে না, জানবে কোত্থেকে ? ভিতরে শখ নেই যে।

অবনীন্দ্রনাথের প্রতি অজস্র শ্রদ্ধা থাকলেও এটা বলতে বাধ্য হই যে, অতটা নয়, অতটা নয়। এককালে সবার ভিতরে শখ ছিল, এখন কারুরই নেই—সেটা কি সম্ভব ? তাই, এককালের ঘোড়ার গাড়ি ছিল দরকারে ছিল, দরকার ফুরিয়েছে, চলে গেছে—আজকের দরকার পুরনোকে চিরকালই সরিয়ে দিয়ে এসেছে, এরকম অনেক নিষ্ঠুরতার কথা রয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। 'আদার টাইমস আদার ম্যানার্স' সুনীতিবাবু ঠিকই বলেছেন। উপায় কি ? পুরনো যুগকেও যেমন আনা যায় না, আনা যায় না পুরনো কালের সব জিনিসপত্রও। অনেক কিছুই ফুরিয়ে যায়—আর আসে না।

তবু আক্ষেপ একটা যে থাকেই। থেকেই যায় ! এর হাত থেকে রেহাই নেই। 'আক্ষেপ করি না' বলার সঙ্গে সঙ্গেই যে সেটা আরও প্রকট হয় ! ঘোড়ার গাড়ি সব হারিয়ে গেছে। যাবেই—কেউ ঠেকাতে পারত না। শেয়ালদার কাছে— একটা-কি-দুটোই হবে— ঘোড়ার গাড়ি এখনও চলমান। আবার হয়ত কোনও প্রাচীন বাড়ির আস্তাবলে কেউ কেউ এখনও ঘোড়ার দেখা পান। কখনও একটা গাড়ি বেরতেও পারে, এই সেদিন যেমন বেরিয়েছিল কলকাতার এক প্রাচীন বাড়িতে 'বাবুয়ানা'র যুগ-এর নকল দেখাতে। তাতে ছিলেন কিছু 'বাবু', কিছু 'বিবি' কিন্তু সে সবই নকল। এমন কি আসল ঘোড়া এবং গাড়িটাকেও নকল বলেই মনে হচ্ছিল।

সত্যি, ঘোড়ার গাড়িরা সব হারিয়ে গেছে। তারা আমাদের কাছাকাছিও আর আসবে না। তাদের স্মৃতিও থাকবে না আর—যা থাকবে তা আমাদের (যাদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জন্মাবার সুযোগ ঘটেছিল), মনে, খাতায়, পুরনো চিঠিপত্রে, বইয়ের পাতায়। আর কি। সমস্তই তাই। তবে, একটি কথা এখানে বলতে চাই—তা হল আমি একাদিক্রমে কলকাতায় থেকেছি প্রায় চল্লিশ বছর—কিন্তু ঘোড়ার গাড়িতে চাপা পড়তে দেখেছিলাম কলকাতায় যেদিন প্রথম আসি সেদিনই, তারপর থেকে কত হাজার দিন, কত হাজার রাত্রি, কত হাজার ঘোড়ার গাড়ি দেখেছি কিন্তু আর কোনও মানুষকেই চাপা পড়তে দেখিনি !

গোপন সম্মোহন

সুনীল বসু

যে-কোনও বইয়ের নামকরণ, মলাট, ছাপা ইত্যাদি আমার কাছে খুব একটা বড় জিনিস। স্বভাবদোষে আমি জনৈক অতৃপ্ত গ্রন্থ-অনুসন্ধানী। স্বভাবদোষে বললুম এইজন্যে যে, নিজের পছন্দমত বই খুঁজে বেড়াবার মত একদিকে এর চেয়ে বেশি আনন্দ আমার কাছে যেমন কিছু নেই, তেমনি এই বই খোঁজার নেশাড়ে তাগিদে আমার কাছে অনেক জরুরী কর্তব্যও তুচ্ছ হয়ে যায়। একখানা জুৎসই বই পেলে আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যাই, আমার অন্য আর কোনও কিছুতেই হুঁশ থাকে না। স্বপক্ষে কিছু যুক্তি আছে বই কি। বই যারা লেখে আর ক্রমাগত বই যারা চোখ দিয়ে গেলে, এই দুই জাতের মানুষকেই আমি শ্রদ্ধা করি। বাজে বই লেখে এমন বাজে লেখক অসংখ্য। তাদের এই লেখক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করলে চলবে না। আমি বলছি গণ্যমান্য বেশ নামী দামী তালেবর লেখকদের কথা। তাদের বইয়ের ভেতরের বক্তব্যের স্বাদ গ্রহণ করে পাওয়া যায় অনেক কিছু। বুদ্ধি পাকে। হেথাহোথা বেড়ানো যায়। মহৎ জীবন বা ঘটনা প্রতিফলনের ছবি দেখে নিজেকে বেশ কিছুটা তৈরি করা যায়। আমি তো ভাবি, বই বড় মহার্ঘ জিনিস। মানুষের বড় আশ্চর্য এক আবিষ্কার। কাঁহা কাঁহা মুলুকের খবর আর মহা মহা জীবনের রসদ এই বইয়েরই মধ্যে এক মায়াবী অক্ষরের শিকলে বাঁধা। যুগের পর যুগ যাচ্ছে কর্পূরের মত উবে, কিন্তু অভিজ্ঞতার, উপলব্ধির টাটকা ঐশ্বর্য পেয়ে যাচ্ছি সামান্য একখানা বইয়ের চার চৌকো কষ্টিপাথরে।

আর সেই বইয়ের নামকরণ নিয়ে আমি বহুসময় ভেবেছি। ডুবেছি। লেখকরা কী অপরূপ নাম রাখেন তাঁদের বইয়ের, আমরা তারিফ না করে পারি না। একসময় আমি বইয়ের সুন্দর সুন্দর নাম লিস্ট করে রাখতুম আর সেই নামকরণের উৎস অনুসন্ধান করে একটা বাজে নেশার সঞ্চয় বাড়াতুম। এই নেশার কথাই এখানে খানিকটা খুলে বলি।

বহুকাল আগের কথা। কলকাতা তখন এখনকার মতন এমন ভয়ঙ্কর ছিল না। হ্যারিসন রোড বা বইপাড়া ছিল আমাদের প্রথম যৌবনের অদম্য আকর্ষণ। কলেজ স্ট্রীটের প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-এর গায়ের পুরনো বইয়ের রাজত্ব ছিল আমার কাছে মণিমুক্তোর খনি। সে-সব দিনের কথা ভাবলে এখনও শিহরন হয়। পুরনো বইয়ের কথা,—সে এক অন্য প্রসঙ্গ। তখন 'সিগনেট বুকশপ' প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১০ নম্বর এলগিন রোড থেকে আমারই নামের ডাকবাক্সে আসত 'টুকরো কথা'-র খাম। পুস্তক প্রকাশের এমন আশ্চর্য অভিনবত্ব বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে সেই প্রথম। বই বেরলে সেটাও যে একটা স্বপ্ন-সংবাদ, সেই প্রথম জেনেছিলুম। আশ্চর্য, স্বপ্নের মতন ছিমছাম গদ্যে লেখা নানা বই প্রকাশের বা খবরাখবরের লোভনীয় বিজ্ঞাপন। আর সেই বইয়ের এক-একটা নামকরণের ছোঁয়ায় চমকে উঠতুম।

এরও আগে গড়পারে থাকত আমার স্কুলের সহপাঠী এক বন্ধু। সাহিত্য করত। নাম সুবোধ রায়। একটা আশ্চর্য বই একবার সে আমাকে পড়তে দিয়েছিল। বই তো নয়। অক্ষরে বোনা বা স্বপ্নের লাল নীল সবুজ হলুদ পুঁতিতে গাঁথা একখানা পাতলা কবিতার বই, নাম 'নকসীকাঁথার মাঠ'। এই নামটা বুকে আজও নামকরণের জন্যে গাঁথা হয়ে আছে। বইয়ের ভিতরের স্বাদও বোধহয় জীবনে ভোলবার নয়। মিষ্টি, মিষ্টি কী মিষ্টি। যদিও মনে হয় যেন কোনও অচিন প্রাচীন কালে লেখা প্রাচীন চালে। এইসময় অনেক পুরনো ধুলো ছোঁয়া কাব্যগ্রন্থ আমার পড়া হয়ে গিয়েছিল—কালিদাস রায়ের 'খুঁদকুড়া', 'ছাত্রধারা' তো স্কুলেই পড়ে এসেছি—কুমুদরঞ্জনের 'তূণীর', যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'মরুতৃষ্ণা' আরও আগের রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোকগুচ্ছ'।

এই আরম্ভ হল আমার বইয়ের নামকরণ নিয়ে বা পেয়ে বা শুনে চমকানো। দেখলুম, একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখলে, তার সঙ্গে পরিচয় না হয়ে, না মিশে, তার সম্পর্কে কিছু না জেনে, শুধু এক ঝলক চোখের দেখাতেই যা একটা নতুন কচি কলাপাতা দেখার মত স্নিগ্ধ আনন্দ, একটা সুন্দর বইয়ের নাম শুনলেও তেমন অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার আনন্দ পাওয়া যায়।

সেই সময়টায়, সেই যুগে, কলকাতার সেই পুরনো রোদ্দুর লাগা দিনগুলিতে, বা পুরনো জোছনার অ্যালুমিনিয়াম জড়ানো রাত্রিগুলিতে, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে ঘুরে আমার নিজস্ব পছন্দমত লেখকদের বই সংগ্রহ করে বেড়াতুম। তখন বেরত বুদ্ধদেব বসুর আশ্চর্য পত্রিকা 'কবিতা'। তখনকার আধুনিক কবিদের বইগুলো পাওয়া যেত না সাধারণ বইয়ের দোকানে। হয় পাওয়া যেত তাঁদের বাড়িতে নয়ত বুদ্ধদেব বসু-র কবিতাভবনে। আর একবার চমকাতে হল একটা বড়সড় বই হাতে নিয়ে, নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। অপূর্ব ছায়াময় নাম। মনটার মধ্যেই কেমন এক ধুলো-ওড়া পুরনো ছাতা-পড়া কুড়ো-মাখা জগতের রহস্যভরা ছবি ভেসে এল। কবিতাগুলোর কথা আলাদা। ও তো ইহজন্ম পরজন্ম গতজন্ম সব তালগোল পাকিয়ে দেয়।

একটা সুন্দর নাম বোধ হয়েছিল— 'কিনু গোয়ালার গলি'। অনেক দিন বিভোর হয়েছিলাম। যদিও রবীন্দ্রনাথের কবিতাটা তখন আমি পড়িইনি। সন্তোষকুমার ঘোষের প্রতি এই নামের জন্যেই ভাল লাগায় মরে গিয়েছিলাম।

আমাদের শক্তিমান কৃতী লেখকরা অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের কাছে নামকরণের জন্যে অশেষ ঋণী। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামগুলো অগতানুগতিক তবু চমকে দেয়নি কখনও। তারাশঙ্করও তাই। ধরন নতুন। কিন্তু অনেকক্ষণ অনেকদিন শুধু বইয়ের নামটাই মউমাছির গুঞ্জনের মত মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে—এমন নাম খুবই কম। তারাশঙ্করের নাম এই মুহূর্তে যা মনে ভেসে উঠছে তা 'চৈতালি ঘূর্ণি', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'। মানিকও নামকরণের অতি সাদামাটা আটপৌরে গতানুগতিকতায় চমকেছেন—'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'হলুদ নদী, সবুজ বন'—শেষোক্ত নামটির মধ্যে একটা ছবির আমেজ মনকে মাতিয়ে তোলে।

সেকালের বইয়ের যে-নামগুলি আমার মনের মধ্যে লেগে আছে তারা হল—ভ্রান্তিবিলাস, স্বর্ণলতা, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, নববাবুবিলাস, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, নীলদর্পণ—এবং এই ধরনের আরও কয়েকখানি! কিন্তু একালের লেখকরা তাঁদের বইয়ের যা নাম দেন সে যেন অনেক সহজ, সহজে স্মৃতি-বেঁধা করে রাখবার মত! ঐ নামটাও আমার খুবই সুন্দর লেগেছিল—বেশ একটু মধু-বিষের আস্বাদ মাখা, 'নীলাঙ্গুরীয়'। আর একটি নাম তত নয় তবুও ভাল, 'দুয়ার হতে অদূরে'। মধু-বিষ? এই প্রসঙ্গে একটি কাব্যগ্রন্থের কাঁটা-বেঁধা নাম মোহিতলাল মজুমদারের 'স্মরগরল'। আর আশ্চর্য বই—অথচ একেবারেই অনাশ্চর্য সাইনবোর্ড সুলভ নাম 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব', 'মিসমিদের কবচ', 'চাঁদের পাহাড়', 'আরণ্যক', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'বিপিনের সংসার', 'উৎকর্ণ', 'ইছামতী' প্রভৃতি।

একালের লেখকদের বইয়ের নামকরণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চমকে দিয়েছিলেন রমাপদ চৌধুরী। তাঁর বইয়ের নামকরণই ছিল তখনকার দিনে আমার এক কৌতূহলী আকর্ষণ। প্রথম যে-বইটির নাম ছাপ ফেলেছিল সেটি 'অভিসার রঙ্গনটী' এরপর 'প্রথম প্রহর', 'ঝুমরাবিবির মেলা', 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস'। ভাল লেগেছিল খুব গৌরকিশোর ঘোষের 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। নজরুলের কাব্যগ্রন্থ 'ঝিঙে ফুল' নামটা; বা বহুকাল আগে একটা ছোট্ট কবিতার বইয়ের নাম 'চুনী পান্নার কান্না'—প্রণেতা হরপ্রসাদ মিত্র, বা তারও আগে নারীর নামে একটা কাব্যগ্রন্থের নাম 'এষা', অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। আমি দেখেছি, কবিতার নামকরণের প্রসঙ্গ এলেই মনটা মজে ওঠে নেচে ওঠে। দিব্যি রসিয়ে ওঠে। কিন্তু চেষ্টাকৃত নামকরণ কেমন যেন ছাপ ফেলে না মনে। যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কুলায় ও কালপুরুষ', 'বন্দীর বন্দনা', (কি আশ্চর্য বই! এখনও, কিন্তু নামটা কি শুধুই অনুপ্রাসের ছেলেমানুষি খেলা নয়?)—অথচ এই মুহূর্তে মনে পড়ল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'চিরকূট' নামটা, অশোকবিজয় রাহার 'ডিহং নদীর বাঁকে', 'ভানুমতীর মাঠ', 'উড়ো

চিঠির ঝাঁক', অমিয় চক্রবর্তীর 'দূরযানী', 'মাটির দেয়াল', বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফেরারী ফৌজ' ও 'সাগর থেকে ফেরা'।

নাম। নাম। নাম! শুধু বইয়ের একটা ভাল, মধুর, হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেওয়া নাম শুনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকতুম সেই পুরনো দিনগুলিতে। তখনকার গ্যাসপোস্ট দাঁড়ানো নীলচে আলোর রাত্রি মাখা, আর রাস্তার কলের জল খাওয়া তৃষ্ণা মেটানো কলকাতায় কবিতা আর গদ্যের রাজত্বে বিভোর দিনগুলিতে একটি প্রকাশিতব্য, বইয়ের নামকরণটি শুনবার জন্যে প্রকাশকদের দোকানে হেলাফেলা বিকেলবেলা সন্ধ্যাবেলা হানা দিতুম। তখন সিগনেট বুকশপ খোলা হল কলেজ স্ট্রীট তল্লাটে মানে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটে—সেই প্রথম দেখলুম রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-র সিগনেট বুক-শপের শোকেসে বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাস, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তীর ছবি। বইয়ের দোকান সাজানোর পদ্ধতিটাও একেবারে নতুন রকমের লেগেছিল। এই প্রকাশনার কর্ণধার দিলীপ গুপ্ত মশাই মাঝে মাঝে নিজে আবির্ভূত হতেন জনসাধারণের মধ্যে বইচেতনা জাগিয়ে তুলবার জন্য। সেই গোল-গাল ঢিলেঢালা প্যান্টশার্ট-পরা মানুষটি। বইয়ের যত্ন শেখাতেন। পাঁউরুটির নরম ঘষায় পেন্সিলের আঁচড় তুলতেন—শুধু রূপসী বই নয়—বইয়ের মলাটও পেস্টবোর্ড ছাড়াও কি এক প্রক্রিয়ায় শক্ত মজবুত পাখনার দ্বৈত-বন্ধনে বাঁধাই-য়ের রেওয়াজ চালু করেছিলেন। প্রচ্ছদে নতুনত্বের অসাধারণত্বের যে মন-কাড়া বৈচিত্র্য সে আজকের চলচ্চিত্র-বিখ্যাত সত্যজিৎ রায়ের। সিগনেট পুস্তক-প্রকাশক মহলে বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে একটা অমিল ব্যতিক্রম। বইয়ের দোকান আবার এইরকম হয় নাকি? আধুনিক কবিরা রবীন্দ্র-তোড়ের পর নেপথ্য-কোণে চলে গিয়েছিলেন। আমাদেরই মত এইরকম অনুসন্ধানী গ্রন্থসন্ধানী কাঠঠোকরার ক্রমান্বয় কৌতূহল নিবারণের মূল্য হিসাবে আধুনিক কবিদের বইয়ের একটি পুঁজি রাখলেন সিগনেট। মনে আছে, সেবার, পঁচিশে বৈশাখের কবিপক্ষে মহা লাভ আমাদেরও, অর্থাৎ ক্রেতাদের এবং বই বিক্রেতাদেরও। সেই সময়ের ঘটনা। সিগনেটের বিকাশবাবু বললেন, শীগ্‌গীরই বিষ্ণুবাবুর একটি বই বেরবে। বিষ্ণু দে-র কাব্যগ্রন্থ! আমেজে ডুবে গেলাম। এর আগে সিগনেট দুটো কবিতার বই ছেপে, বলা বাহুল্য, আধুনিক কবির আসর বেশ জমিয়েছেন। প্রথম নরেশ গুহ-র 'দুরন্ত দুপুর'। নামটা খুব একটা চমকানি না হলেও, প্রচ্ছদ লেগেছিল বুকে প্রায় ছোরা বেঁধানোব মত। সত্যজিৎ রায়ের আঁকা। সাংঘাতিক। হলুদ রোদ আর রুপোলি রেখা, আর সুন্দরী মেয়ের দুপুরে জল তেষ্টা পেয়েছে, তাই ঠোঁট ফাঁক করা একটু হাঁ। এখানেই শেষ নয়। এরপর বেরল একটি আশ্চর্য কবিতার বই। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর যেমন লাগসই নাম, তেমনি চোখ জুড়োনো স্নিগ্ধ জলের বা আকাশের রূপ মনে পড়ানো মলাট 'নীল নির্জন'। সত্যিই যেন নামটাই একটা গরম ফ্যানের হাওয়া, বা ক্লান্তির পরে বটগাছ-তলা দূরে জলরেখা। সিগনেট বুক শপের কর্মচারী বিকাশবাবু বললেন, বিষ্ণু দে-র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়! দিন যাচ্ছে। দিন যায়। একটা পিপাসু কৌতূহলের কাঁটা ফুটে আছে। কবে বেরচ্ছে? এই তো সবে ছাপা শেষ হয়েছে। মলাট? ও সত্যজিৎবাবু। নাম কী বইয়ের? সেইটে নিয়েই তো সমস্যা। এখনও নাম ঠিক হয়নি। ভাবছেন। সামনের সপ্তাহে হয়ত বেরতে পারে। কিন্তু এখনও নাম পাইনি আমরা। বহু কাজ করি। ছাত্র পড়ানো। কবিতা পড়া। কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় বই-পোকার মত বই খোঁজা। একটা ভাল বই মানে একটা আস্ত সুখ-স্বপ্ন। এর মধ্যে কেটে গেছে আরও হপ্তা দেড়েক। আবার গিয়েছি সিগনেট-এ। বিষ্ণুবাবুর বইটার খোঁজ নিতে। কী নামকরণ করেন সে-টা একটা অদম্য কৌতূহলের কাঁটা। হ্যাঁ, নাম দিয়েছেন। নাম রেখেছেন! প্রকাশ আসন্ন কাব্যগ্রন্থের। কি নাম রেখেছেন? টেনে টেনে বললেন বিকাশবাবু 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'। সমস্ত কান যেন নামের গুনগুনানিতে ভরে গেল! আঃ। সুন্দর! সুন্দর! ভারী সুন্দর! এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম দিককার সুন্দর তিনটি নাম কবিতার বইয়ের—'এক মুঠো', 'খসড়া', 'দূরযানী'।

বাংলা সাহিত্যের যিনিই নিবিড় পাঠক নিপুণ অনুসন্ধানী তিনি যেমন সাহিত্য সংক্রান্ত অনেক খবরই রাখেন, তেমন বইয়ের নামের সৌন্দর্যেও কখনও কখনও নিশ্চয়ই প্রলুব্ধ হয়ে থাকবেন। বহু লেখক, কবি তাঁদের বইয়ের নাম দেন সাদা-মাটা আবার কেউ কেউ আশ্চর্য মনে রাখার

মত। আমাদের সেই প্রথম যৌবনে ভারী চমক লাগত রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের সেই আশ্চর্য নামটি। উপন্যাসের নাম 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ'। নামটার মধ্যেই কেমন একটা রঙাচঙা প্রকৃতি-লীনা আকর্ষণীয়তা রয়ে গিয়েছে।

প্রত্যেক পাঠক, অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্রের নতুন পাঠক নয়, পুরনো পাঠক, তাঁর নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও প্রিয় লেখক থাকবেন। সে এক বা একাধিক হতে পারে। আমার প্রিয় বাঙালি সাহিত্যস্রষ্টা অনেকে। তার মধ্যে প্রধানত বুদ্ধদেব বসু। স্বভাবতই তাঁর সম্পর্কে, বলা বাহুল্য, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যপাঠ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা কিঞ্চিৎ বেশি। কিন্তু তাঁর বইয়ের নামকরণের সূত্র-সন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি রবীন্দ্র-অনুরক্তি বেশ কিছুটা পক্ষপাত-ঘেঁষা। বহু গ্রন্থেব নামব রণে তিনি আমার স্মৃতির সোনার কৌটোয় বন্দী। বহু অসাধারণ নাম তিনি রেখেছেন তাঁর গ্রন্থসমূহের। খুবই অবাক-করা তাৎপর্যময় নাম তাঁর কবিতার বইয়ের। 'দ্রৌপদীর শাড়ি'। উঃ, মেঘ আর মেঘ, আর মেঘের কী বর্ণময় স্পর্শময় ভাবনাময় নাম। কী চমৎকার স্বাদ! অধিকাংশ, বেশির ভাগ তাঁর বইয়ের নামই রবীন্দ্র-কবিতা থেকে ধার করা। শুধু রবীন্দ্র-শস্য থেকেই নয়, নিয়েছেন জীবনানন্দ থেকেও, যেমন—'নির্জন স্বাক্ষর'। কি অপরূপ সুন্দর নাম। তাঁরই একটা বইয়ের নাম 'অপরূপ রূপকথা'। আর সেই নামটাও মধুর, মোলায়েম, কবিত্বময়—কিন্তু বইটি বাংলা আধুনিক কবি ও কবিতা বিষয়ক। 'কালের পুতুল'! ভাল না নামটি? যে-কজন স্রষ্টা ওখানে আলোচিত—সবাই তো কালস্রোতে মাটির পুতুল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে শব্দ তুলে বইয়ের এত সুন্দর নামকরণে ব্যবহার বুদ্ধদেব ছাড়া আর কেউ পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। বুদ্ধদেবের প্রথম যুগের বই 'রেখাচিত্র' তাঁব নিজস্ব, কিন্তু 'হঠাৎ আলোব ঝলকানি'?—বা, 'যেদিন ফুটল কমল'? পরবর্তীকালে তাঁর সুদীর্ঘ উপন্যাস—যে উপন্যাসের নামটি মনে হয়েছিল তাঁর মৌলিক এবং লেগেছিলও স্বপ্নময়, মধুমিষ্টি, সেটিও গীতবিতানের কোনও এক গানে হঠাৎ একদিন চোখে পড়ে নিজের সঙ্গে বাজি হেরে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, এত বড় মহান শিল্পী তিনি কি কিছুতেই রবীন্দ্র-ফসল ছাড়া তাঁর বইয়ের নামকরণের কথা খুঁজে পান না। সেই বইটির নাম 'তিথিডোর'! কিন্তু 'কালো হাওয়া' নিশ্চয়ই তাঁর একান্ত নিজস্ব, সেখানে কোনও কর্জ নেই। অপরূপ নাম 'ধূসর গোধূলি', সে-ও রবীন্দ্রনাথের।

এবার ভেবে দেখি একালের কিছু লেখক-কবির বইয়ের নামকরণের সৌন্দর্যের সম্পর্কে। একটা ছোট্ট নাম, কিন্তু হৃদয়ে বিঁধে থাকবার পক্ষে যথেষ্ট—'খড়কুটো'। লেখক একালের বিশিষ্টতম সাহিত্যিক বিমল কর। বিমল কর তাঁর উপন্যাস গল্পগ্রন্থেব অনেক সুন্দর নাম দিয়েছেন এ-পর্যন্ত। নাম ছোট রাখবার দিকেই তাঁর ঝোঁক। কিন্তু একটি মাত্র শব্দে তিনি যে সৌন্দর্যের ইঙ্গিত দেন তার রোদ্দুর আলো চতুর্দিগন্ত সুদূরপ্রসারী। তাঁর উপন্যাসের মারাত্মক নাম 'দেওয়াল'। 'এই প্রেম, আঁধারে', গল্পগ্রন্থ—'বরফ সাহেবের মেয়ে', 'কাঁচঘব' ইত্যাদি। গৌরকিশোর ঘোষের এই বইটির নাম স্মৃতি-স্থায়ী—'ব্রজবুলি'। স্বর্গত নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন 'সূর্যসাক্ষী'। ভাল নাম। হয়ত মোটামুটি ভাল নাম উদ্ধার করা চলে অজস্র, কিন্তু আমার রুচি অন্যত্র। যেমন একটি অসাধারণ মিষ্টি নাম দিয়েছিলেন অজিত দত্ত তাঁর কবিতার বইয়ের, 'ছায়ার আলপনা', —কী নরম অথচ কী রেশম-কোমল নাম। তাঁবই রম্যরচনা গ্রন্থের নাম 'মন-পবনের নাও'। 'কুসুমের মাস' নামটিও কবিতার বইয়ের ভারী উপযোগী। এ-সব নাম ভুলে যাওয়া শক্ত। তেমনি ভোলা শক্ত জীবনানন্দেব 'সাতটি তারার তিমির' বা 'বেলা অবেলা কালবেলা', 'রূপসী বাংলা', 'বনলতা সেন'। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'ময়ূরকণ্ঠী' নামটি মিষ্টি, যদিও খুব একটা চিন্তার মশলা নেই, অথচ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম কবিতার বই 'নিরিবিলি' বেশ ছিমছাম, নিকোনো, নীরব, নির্জন। ভাল নামের তালিকার হয়ত শেষ নেই, কিন্তু আশ্চর্য নামকরণের তালিকা খুবই সংক্ষিপ্ত।

এবার আমি একেবারে একালের সাহিত্যস্রষ্টাদের নামকরণের ভূমিকায় মুনশীয়ানায় মন দেব। একালের শক্তিমান লেখকদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের তেজী স্ট্রেট সাহসী নাম 'আত্মপ্রকাশ'। প্রথম আবির্ভাবও বটে—তার সঙ্গে মিলিয়ে সত্য কথাও বটে। খুব স্পষ্ট অথচ কী সহজ, পুরুষালি, সোজাসুজি, মাথা-উঁচু নাম। সুনীলের নামকরণের মধ্যে কবিত্ব একদিকে

যেমন বিরল, ভীষণ গাদ্যিক, তেমনি সুনীল মূলত কবিই। তাঁর কবিতার বইয়ের দারুণ নাম, 'মন ভাল নেই'। কী স্পষ্ট অথচ কী ফোয়ারার স্বতঃস্ফূর্ত। মানসিক অবস্থার এমন আবহাওয়া-সংবাদ আর কিছুতে কি দেওয়া যেত ? আরও একটি বইয়ের নাম 'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি'। কী অ-কাব্যিক, অথচ কবিতার বইয়েরই তো নাম, কী এক অদম্য কৌতূহলী আলোড়ন তুলে দেয়। উপন্যাসের কি সুন্দর, কত আটপহুরে আধুনিক নাম 'মা বাবা ভাই বোন'।

একালের আরও একজন কবি বইয়ের নাম রাখায় সিদ্ধহস্ত। তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের নাম রেখেছিলেন, 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'। নামটা সুন্দর। কিন্তু বইটির মূল্য নামের চেয়েও বেশি। এই শক্তিমান কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় একালের বইয়ের নামকরণে একবার নিশ্চয়ই ফার্স্ট হয়েছেন যখন তিনি বইয়ের নাম রেখেছিলেন 'সোনার মাছি খুন করেছি'। এই অসাধারণ নামকরণের আর তুলনা নেই। এই নামটি জীবনে আর ভোলা যাবে না। বহুসময় বহু দূর দূর সময়ের ব্যবধানে উচ্চারণ করে দেখেছি, মনে-মনে একটা ছবি আর সুর যেন দপ্ দপ্ করে ওঠে, একটা স্বর্ণচিক্কণ দৃশ্য এবং তার অলৌকিকত্ব যেন মনশ্চক্ষু আচ্ছন্ন করে ফেলে।

কত কবি কত লেখক হারিয়ে গিয়েছেন বিস্মৃতির অন্তরালে। রেখে গিয়েছেন তাঁদের বইয়ের আশ্চর্য নামের বা শিরোনামের শিরোপা। হয়ত আমরা ভুলেছি সেই কবিকে—প্রজেশকুমার রায়—যাঁর ছড়ার বইয়ের নাম ছিল, 'এক যে ছিল'। দিলীপকুমার রায় উপন্যাস লিখেছিলেন বেশ দশাসই চেহারার—মলাটটিও চমৎকার—নাম 'দোলা', দুই খণ্ডে। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এক ফর্মার চটি কবিতার বই 'সোনার কপাট'। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পাতলা কবিতার গ্রন্থ 'চন্দ্রকলা', সুকান্তর প্রথম বই আমার কলেজে প্রথম পদার্পণের বছরে, সুকান্ত তখন সদ্য-প্রয়াত যাদবপুর টি বি হসপিটালে—বইয়ের নাম—কি স্ট্রেট্—কি স্পষ্ট—'ছাড়পত্র',—যার ইংরিজি 'গেট্পাস'। তখনকার একজন খুবই বহুশ্রুত কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ভারি তাৎপর্যময় তার কাব্যগ্রন্থের নাম—'স্নায়ু'। 'মন পবন'। পরে 'মেঘ বৃষ্টি ঝড়'। এখন আর তেমন লেখেন না। চির চুপ। একজন বহুখ্যাত কবি সমর সেন। কিন্তু বইটি আশ্চর্য হলেও নামটি একেবারে ভাবনা-ছুট গতানুগতিক 'কয়েকটি কবিতা'। একটা বইয়ের নাম পেয়েছিলুম 'নোঙরহীন নৌকা', 'চরকাশেম' আর-একটি। অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'। একদা একটা নামে পটেছিলুম, সেই নামটি গোপাল হালদারের 'একদা'। অল্প বয়সে আমার এক লেখক-বন্ধুর প্রথম উপন্যাসের নাম 'চকখড়ি' আমাকে চমৎকৃত করেছিল,—আরও কত সময় কত বইয়ের নাম, তার তালিকা আজ আর মনে নেই, কিন্তু তালিকার 'শালিক-চড়ুই'-গুলি ছিল অফুরন্ত।

আধুনিক বাংলা কাব্যের একজন সুপরিচিত ব্যক্তি অরবিন্দ গুহ। জীবনানন্দের জীবিতকালেই উনি কবি হিসাবে নাম করেছিলেন। আজ অরবিন্দের পরিচয় অনেকদিকে। বাংলা সাহিত্যের বহু অভাবপূরণে তাঁর নিরলস গবেষণাধর্মী পরিশ্রম কম নয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম রেখেছিলেন 'দক্ষিণ নায়ক'। নামটা শুনলে যত না সুন্দর লাগে—মানে জানার পর কিন্তু নামটার আস্বাদ একেবারেই বদলে যায়—যেন ছিল তুঁত-নীল আকাশ হঠাৎ মিছরির গুঁড়োর মত বৃষ্টির পর নভোমণ্ডলে দেখা দিল বর্তুলাকার রামধনু। বেশ কিছুকাল আগে তখন তাঁর একটা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। বন্ধুত্বের সূত্রে একটা বই পাব আশা রাখি। কিন্তু বইয়ের নাম আর দিয়ে উঠতে পারেন না উনি—বা খুঁতখুতুনির খর্পরে পড়ে কাব্যগ্রন্থের নাম আর লাগসই হয় না কিছুতে। কিন্তু একদিন বইয়ের নামকরণ হল—এবং সে নামকরণ একদিকে গাম্ভীর্যে গরীয়ান, গমগমে, সৌন্দর্যের আভিজাত্যে শ্রুতি-গরিষ্ঠ। বইয়ের নাম রাখলেন বিদ্যাসাগরের গদ্যের একটু ছিন্নাংশ, 'নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত'।

এই রঙিন রচনা আর দীর্ঘায়িত করে লাভ নেই। অনেক অখ্যাত অজ্ঞাত বই আছে, নামটি শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। কিন্তু বই পড়বার পর আর মন ভরে না। আবার নাম শুনে কখনও কখনও নাক সিঁটকে উঠতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু বই শেষ হবার পর মন আর মুখ এক হয়ে

উচ্চারণ করে 'আঃ'। 'অপূর্ব'। 'অভূতপূর্ব'। বইয়ের ক্ষেত্রে বইয়ের নামই অনেকখানি। অনেকখানিই তার গোপন সম্মোহন।

অরওয়েল ও চপ্পল

শ্রীপান্থ

প্রশ্নটা মাথায় এল, নতুন করে জর্জ অরওয়েল পড়তে গিয়ে। কথায়-কথায় এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—ইংল্যান্ডে সোসালিজম আর কমিউনিজম এই শব্দ দুটি কিন্তু মানুষকে আকর্ষণ করে চুম্বকের মতো। তাঁর মতে, সে-দলে রয়েছেন যাঁরা ফলের রস খান তাঁরা, ন্যুডিস্টরা, প্রাকৃতিক-চিকিৎসায় আস্থাবান হাতুড়েরা, যৌনতায় তাড়িত রাক্ষসরা, ফেমিনিস্টরা...এবং যাঁরা স্যান্ডেল পরেন তাঁরা! চমকে উঠেছিলাম শেষের শ্রেণীটির উল্লেখ দেখেই। কেন না, আরও অনেকের মতোই আমিও স্যান্ডেল পরি। পরতে ভালবাসি। সেজন্য আমার কোনও লজ্জাবোধ নেই। সোস্যালিজম বা কমিউনিজম-এর প্রতি আকর্ষণও কারও পক্ষে কোনও লজ্জাকর উপসর্গ বলে আমার মনে হয় না। দুইয়ের মধ্যে কী সম্পর্ক আছে সেটাও খুব স্পষ্ট নয়। যদি বলেন, স্যান্ডেল বা চটি জুতোর তুলনায় সস্তা, সে-কারণেই তা গরিব এবং যাঁরা গরিবদের জন্য লড়তে চান তাঁদের প্রিয় প্রতীক, তবে মেনে নেওয়া শক্ত। এটা ঠিক, হো চি মিন সস্তা চপ্পল পরতেন, কিন্তু আমি বা আমার চেনাজানা চপ্পল-পরুয়ারা যা পরেন, তা কিন্তু খুব সস্তা নয়। তবু না হয় তর্কের খাতিরে আপাতত ধরে নেওয়া গেল, যাঁরা স্যান্ডেল বা চপ্পল পরেন তাঁরা গরিবের জন্য ভাবেন, তাঁরা সমাজতন্ত্রের প্রতি আসক্ত। তাই বলে কি ধরে নেওয়া ঠিক, তাঁরা সমান আসক্ত ফলের রসে কিংবা জল আর মাটির নিরাময় ব্যবস্থায়? চপ্পল-পরা আর ন্যুডিস্ট ক্লাবের সদস্য হওয়া কি এক ব্যাপার? চপ্পল পরি বলেই কি আমাদের সেক্স-ম্যানিয়াকদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসিয়ে দেওয়া ঠিক? মনে-মনে তখনই তর্ক জুড়েছিলাম অরওয়েলের সঙ্গে। আর, সেই থেকেই আমাকে পেয়ে বসেছে সোস্যালিজম নয়, কমিউনিজম নয়,—পাদুকা। কখনও স্যান্ডেল, কখনও জুতো। কখনও জুতো, কখনও স্যান্ডেল।

জুতো আবিষ্কার নিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মাথা এবং কলম খাটিয়েছেন। সুতরাং, বস্তুটিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না-করাই ভাল। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে তৃষ্ণার্ত মৃত্যুপথযাত্রী যখন জল চাইছেন তখন জল যিনি দেবেন তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল—মহাশয়ের বেতন কত? বেতনের জগতে যাঁর পদ যত উচ্চ তাঁর বেতন তত বেশি। বলী নাকি তাঁরাই যাঁরা পদাধিকার বলে বলীয়ান। লক্ষণীয় সকলের সব পদই কিন্তু জুতোর অধিকারে। যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে জুতো যেমন অসাধ্য সাধন করতে পারে, তেমনই সময়ে পা দুখানি গলাতে না পারলে ডেকে আনতে পারে বিভ্রাটও। প্রথমটির প্রমাণ নাকি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। একবার তিনি কিছুটা অনুজ্জ্বল পোশাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পিতৃঋণ শোধ করতে গিয়ে তখন তাঁর খুবই দীন অবস্থা। সেদিন তাঁর মান বাঁচিয়েছিল নাকি মণিমুক্তোখচিত একজোড়া জুতো। তহবিলে সেটিই শুধু অবশিষ্ট ছিল। ধনীমানীদের আসরে সেদিন সবাই নাকি মহর্ষির পায়ের দিকে তাকিয়ে। রুমেল বা সিরাজউদ্দৌলার উপাখ্যান আবার অন্যরকম। ওঁরা নাকি সময়ে পালাতে পারেননি, পায়ের কাছে জুতো জোড়া খুঁজে পাননি বলেই। অথবা জুতো পরিয়ে দেওয়ার মতো কেউ ছিল না বলে! শুধু বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি নন, আমাদের শাস্ত্রকারেরাও অতএব জুতোর বন্দনায় মুখর। গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ জানিয়েছেন হলায়ুধ-এর 'ব্রাহ্মণসর্বস্বে' নাকি গোভিলসূত্রের একটি বাক্যের টীকা রয়েছে। তার মর্মার্থ: 'হে জুতা যুগল! তোমরা প্রতিষ্ঠাস্বরূপ। আরব্ধ গতিক্রিয়ার অত্যাগের নাম প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বলিয়া তোমাদের নাম প্রতিষ্ঠা; অতএব তোমরা গতিবিরোধী কণ্টকাদি হইতে আমাকে রক্ষা কর!' এই প্রার্থনা খানাখন্দ-কণ্টকিত একালের কলকাতায়ও বোধহয় সমান প্রাসঙ্গিক। বেদান্ততীর্থমশাই কিন্তু পাদুকা-চর্চা করতে গিয়ে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছেন যদি না স্বয়ং সূর্যদেব তার পিছনে থাকতেন। তিনি মহাভারতের

অনুশাসনপর্বের একটি অধ্যায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। সেখানে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে জুতো আবিষ্কারের যে-কাহিনী শুনিয়েছেন, তা নাকি সম্পূর্ণ অন্যরকম। একদিন ভর-দুপুরে জমদগ্নি আকাশ তাক করে বাণ ছুঁড়ছিলেন। স্ত্রী রেণুকার কাজ ছিল, সে-সব বাণ কুড়িয়ে আনা। প্রচণ্ড রোদ। পায়ের তলায় তপ্ত মাটি, মাথার ওপর অগ্নিক্ষরা আকাশ। রেণুকা ক্লান্ত, অবসন্ন। তাই দেখে জমদগ্নি ভীষণ চটে গেলেন। তিনি বরাবরই বদরাগী। রেগে গিয়ে ধনুতে বাণ লাগালেন সূর্যকে নিশানা করে। বিপন্ন সূর্য তখন নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মর্ত্যবাসীকে উপহার দিলেন ছাতা আর জুতো। একের কাজ মাথা বাঁচানো, অন্যের পদসেবা। পদ্যের সেই আবিষ্কারক অতএব নিমিত্তমাত্র।

আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিয়ে গোপন, অথবা প্রকাশ্য কাড়াকাড়ি মারামারি পৃথিবীতে অজানা নয়। সুতরাং, প্রকৃত আবিষ্কারক কে সে-বিতর্কে না জড়িয়ে পড়াই শ্রেয়। আমার তো মনে হয়, তার চেয়ে জরুরী জুতোর সঙ্গে রেণুকার যোগাযোগ। সেটা, সম্ভবত, নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্বের এলাকায় পড়ে। 'নার্সারি রাইম'-এর সেই বুড়িকে মনে পড়ে, যার বাড়ি ছিল মস্ত একটি জুতো এবং জুতোভর্তি যার ছেলেপুলে? জুতো সম্ভবত উর্বরতার প্রতীক। বিয়ের পর ভিক্টোরিয়া যখন অ্যালবার্টকে নিয়ে বালমোরাল প্রাসাদে বাস করতে যান, তখন নাকি পুরানো জুতো ছোঁড়া হয়েছিল রানীর দিকে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। প্রজাদের প্রার্থনা যে বিফলে যায়নি ইতিহাসপাঠকের তা অজানা নয়। কলকাতার পথে মাঝে-মাঝে দেখা যায় নতুন বউ নিয়ে গাড়ি করে বাড়ি চলেছেন চীনা বর, গাড়ির পিছনে বাঁধা পুরনো জুতো। সম্ভবত শুভার্থীদের একই প্রার্থনা।

পশ্চিমী কথায়-উপকথায় জুতো নিয়ে নায়ক-নায়িকাদের কত না কাণ্ড। অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় সুন্দরী মেয়েদের হাত থেকে গড়গড়ার নলটি তুলে নিয়ে নিজের মুখে পুরে নেওয়া ছিল নাকি সিভ্যালরি। প্রেম নিবেদনেরও একটা কেতা। ইউরোপে নাকি রীতি ছিল রূপসীর পায়ের জুতোয় ঢেলে নিয়ে মদ্যপান। দেহিপদপল্লব মুদারম-এর রকমফের। আমাদের প্রেমের গল্পে নায়ক যদি কখনও-কখনও নায়িকার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ খোঁজে হাত থেকে খসে পড়া রুমাল কিংবা ভুলে ফেলে যাওয়া খাতা কিংবা বই ফেরত দেওয়ার ছলে, পশ্চিমে তবে জুতো হারানো পাটিটি নিয়ে কত না কাণ্ড। সিন্ডেরেলার অনেক দিদি রয়েছেন ইউরোপীয় উপকথায়। স্নানরতা নায়িকার এক পাটি জুতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল ঈগল। তারপর সেই জুতো আচমকা গিয়ে পড়ল নায়কের হাতে। জোড়া মিলাতে গিয়ে দেশদেশান্তরে ঘুরতে-ঘুরতে নায়িকার সঙ্গে দেখা এবং মিলন! আমাদের এখানেও জুতো চুরি হয় না এমন নয়, কিন্তু চুরি হয় একসঙ্গে দু'পাটিই, একখানা নয়। নিঃসঙ্গ এক-একটি পাটিও মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে। সে-দৃশ্য দেখা গ্রীষ্মের কলকাতার পথে, লাভার মতো গলিত পীচ কেড়ে রেখে দেয় ট্রাম-বাস যাত্রীদের একপায়ের জুতো বা চটি। ফিরে এসে কুড়িয়ে নেওয়ার সময় হয় না। কেউ কুড়িয়ে নিয়ে জোড়া মিলাবার চেষ্টা করছেন, তাও কল্পনা করা যায় না। কারণ, যদিও জুতোয় প্রথম পা রেখেছিলেন ঋষিপত্নী রেণুকা, এবং যদিও বাংলাসাহিত্যের এমন নায়িকার অভাব নেই যাঁরা হাই-হিলেও খুটখুট দিব্যি চলেন, তবে, স্বীকার করা ভাল, মনে-মনে আমরা এখনও আলতা-পরা রাঙা পায়েরই দাস। বাংলা প্রবাদ কি বলেনি—মেয়েরা দেয় জুতা পায় ভাতব্যঞ্জন পুড়ে যায়!

নৃতাত্ত্বিক যদি বলেন জুতো নারীত্বের প্রতীক, তবে সমাজতাত্ত্বিক হয়তো বলবেন জুতো প্রগতির প্রতীক। ঘোড়ার পায়ে লোহার জুতো পরাবার পর নাকি যুগান্তর ঘটে গেছে ঘোড়ার জীবনে। মানুষের ক্ষেত্রেও তা-ই। গ্রীক দেবতার পায়ের জুতোয় পাখা কারণ জুতো গতির প্রতীক। জুতো না থাকলে কেউ কি এভারেস্টে পা রাখবার কথা ভাবতে পারতেন? কিংবা চাঁদে? জুতো মানে প্রগতি। একজন শ্রদ্ধেয় লেখক তাঁর এক ছিটগ্রস্ত আত্মীয়ের গল্প বলেছিলেন। তিনি রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে হাঁক দিতেন—আয় তোরা দ্যাখ, আমার মতো প্রোগ্রেসিভ কে আছে! তাঁর হাঁকডাক শুনে ছেলেছোকরারা ছুটে আসত অন্দরে। তিনি তখন তাঁর প্রগতিশীলতা প্রমাণ করতে ঢুকে পড়তেন রান্নাঘরে। তারপর বিজয়ীর মতো চারদিকে তাকিয়ে বলতেন—দেখলি তো, জুতো পরে আমি কেমন রান্নাঘরে ঢুকে পড়লাম! যে-বাঙালি মেয়েরা প্রথম সাহস করে জুতোয় পা গলিয়েছিলেন তাঁদের বাহাদুরি কিন্তু আরও বেশি। কেননা,

রান্নাঘরের দিকে নয়, তাঁরা পা বাড়িয়েছিলেন রান্নাঘর থেকে বাইরের দুনিয়ায়। প্রবাদে সে-কারণেই বোধহয় এমন উৎকণ্ঠা !

সূর্যদেব রেণুকাকে জুতো উপহার দিয়েছিলেন, না স্যান্ডেল ? জানি না। তবে শাস্ত্রজ্ঞরা বলছেন সব ধরনের জুতোই ছিল এদেশে। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ লিখেছেন তৈত্তিরীয় সংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, গোভিলগৃহ্যসূত্র—অনেক শাস্ত্রগ্রন্থেই জুতো রয়েছে। নানা ধরনের জুতো। কখন কোন উপলক্ষে কী ধরনের জুতো পরতে হয় তারও নাকি বিধান দিয়ে গেছেন প্রাচীন শাস্ত্রকাররা। কোন তিথিতে লাউ খাওয়া যেতে পারে, কোন তিথিতে বেগুন, তাও যখন বলে গেছেন ওঁরা, তখন জুতোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির কথা ভুলে যাবেন, তা কেমন করে হয় ? কাষ্ঠ, চর্ম, তৃণ—সব ধরনের প্রাচীন পাদুকা চর্চা করে বেদান্ততীর্থমশাই জানাচ্ছেন, প্রাচীন ভারতে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা ছিল নাকি আজানুপত্রচরণের। অর্থাৎ, বুটজুতোর। এখানে-ওখানে যেসব সূর্যমূর্তি পাওয়া গেছে তার পায়ে নাকি রয়েছে সেই আজানুপত্রচরণের নমুনা। অবশ্য পাথরের গায়ে ওইসব রেখা কি জুতোর রূপরেখা না অন্য কোনও গহনা, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর তর্কাতর্কিও হয়ে গেছে একসময়। আর এক বিতর্কের প্রতিপাদ্য ছিল তৃণ বা ঘাসে তৈরি জুতো। প্রাচীন কালে যার নাম ছিল 'মঞ্জ' তাই কি একালের মোজা ? ভাবতে অবাক লাগে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র মশাইয়ের মতো ডাকসাইটে পণ্ডিত পর্যন্ত যোগ দিয়েছিলেন সেই তর্কে !

ভরত ভক্তিভরে দাদা রামচন্দ্রের যে-জুতোজোড়া পুজো করতেন, সবাই জানেন, তা ছিল কাষ্ঠপাদুকা ওরফে খড়ম। অনেক বাঙালি পরিবারের ঠাকুরঘরে হয়তো এ-ধরনের অলংকৃত খড়ম পাওয়া যাবে। ভক্তের কাছে কোনও জোড়া শ্রীচৈতন্যের, কোনও জোড়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের। কোনটি হয়তো অন্য কোনও পূজ্যপাদের। বলাবাহুল্য, এগুলো প্রতীক মাত্র। বলা যায়—পাদুকাপ্রতিমা। ভক্তিভরে তার পুজো করেন ভক্তরা। শ্রেণী বিচারে পাদুকা বা খড়ম কিন্তু স্যান্ডেল বা চপ্পলগোত্রের জিনিস। সাধারণের চোখে তা প্রণম্য, অথচ পণ্ডিতরা বলছেন জুতোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আজানুপত্রচরণ বা বুটজুতো ! অরওয়েলও কি প্রকারান্তরে সে-ই বলতে চাননি ?

অরওয়েলের সঙ্গে বোঝাপড়া পরে। আপাতত এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে, যদিও পায়ে পড়ে থাকে, জুতো ব্যবহারকারীর মেজাজ-মর্জিরই প্রতিফলন। মানুষের মনের এক দর্পণ যদি তার মুখ, তবে আর এক দর্পণ এই জুতো। অনেকে যে নিত্য বুরুশ করে জুতোজোড়াটিকে আয়নার মতো করে তোলেন, সে বোধহয় শুধু অন্যদের চোখে পরিচ্ছন্ন থাকবার জন্য নয়, মাঝে-মাঝে আড়চোখে আপনার মুখ আপনি দেখবেন বলে ! একটু ভাবলেই বোঝা যায় এক-এক জুতোর চরিত্র এক-একরকম। কোন ঘরে হয়তো সভা বসেছে। বাইরে, চৌকাঠের এপারে রাশি রাশি জুতো। রকমারি জুতো। চটি। চপ্পল। তার ওপর চোখ বুলালেই কিন্তু ভেতরে কারা বা কী ধরনের মানুষ আছেন তার কিছুটা আভাস পেয়ে যেতে পারেন আপনি। এমন কি, নজর থাকলে, ভেতরে সুন্দরী মেয়ে আছেন কি না তারও ইঙ্গিত মিলে যেতে পারে। অথবা কোনও অত্যাধুনিক মহিলার উপস্থিতি। এ-ধরনের জুতোর মেলা আবার অশ্রুর উপলক্ষও হতে পারে। মনে পড়ে একটি ছবির কথা। যুদ্ধের সময়কার নাৎসীদের একটি বন্দী শিবিরের বাইরের দৃশ্য। নানা ধরনের, নানা মাপের জুতোর পাহাড়। উচ্চকিত হাহাকার। তাকানো যায় না। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করলে, অথবা গুলি চালালে কিংবা হঠাৎ কোথাও মারদাঙ্গা শুরু হয়ে গেলে পর রণস্থলির দৃশ্যগুলোর কথা মনে পড়ে। ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে কিছু জুতো, চটি, চপ্পল। বিভ্রান্ত, ভয়ার্ত দিশেহারা মানুষের কাহিনী। জুতো, অতএব, খুবই বাঙ্ময় বস্তু !

জুতো যখন পায়ে, তখনও কিন্তু কথা বলে। না, সেকালের গল্প-উপন্যাসের নায়কের জুতোর মতো একালে জুতো আর মস্‌মস্‌ আওয়াজ তুলে বাবুয়ানা জাহির করে না। তবু বাবু-বিবিদের জুতোর ভাষা বোঝা যায় বই কি ! গাঁয়ের কথা বলছি। বাইরে খড়মের খটখট আওয়াজ শুনলে যেমন বোঝা যায় পণ্ডিতমশাই কি পুরুতমশাই চলেছেন, বাড়ির ভেতরে তেমনই একই আওয়াজ শুনে ঘোমটা টানে ভাদ্দরবৌ,—ভাসুরঠাকুর আসছেন ! ফেরিওয়ালার মতো এক-এক জুতোর এক-এক ধ্বনি,—এক-এক বক্তব্য। পুলিশের বুটের আওয়াজ আর হোমসেক্রেটারির জুতোর

আওয়াজ কি এক? কান পাতলে জানা যাবে,—দুই-ই যদিও বুটজুতো, তবু পুলিশ আর মিলিটারির জুতোর চালে এবং বোলে বিস্তর ফারাক। তেমনই, বরের জুতো আর বরকন্দাজের নিশ্চয় এক নয়। এক নয় ছিমছাম চটপটে কলেজের মেয়ের আর তার মায়ের চটি জোড়াটিও। মোকাসিম কি নিউকাট কি এক? এক নয় অবশ্যই কোলাপুরী আর কটকী চটি! চেহারায় যেমন, ধ্বনি বৈচিত্র্যেও তেমনই পাদুকার জগৎ শেষ পর্যন্ত বিভক্ত—শ্রেণী এবং ব্যক্তিতে।

কার পায়ে ঠাঁই পেয়েছে জুতোর মর্যাদার পক্ষে সেটা যেমন জরুরী, তেমনই সমান জরুরী কে কোন জুতোয় পা গলালেন সেটাও। হুবহু বাক্যগুলো মনে নেই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন—আঠারোটা বড় জিনিস। রোগা ছেলে যদি বুট পরে তবে দেখবে সে লাফিয়ে-লাফিয়ে, দুটো করে সিঁড়ি ডিঙ্গোচ্ছে, তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে ইট্ ফিট্ মিট্...এসব বোল। আর, কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি পরা বাবুটির মুখ দিয়ে কিন্তু ফুটে বেরুতে চাইবে নিধুবাবুর টপ্পা। ঠাকুর বাবুর পায়ের জুতো সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন কি না এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। পাঠক নিশ্চয়ই জানেন, শান্তিপুরী ধুতি এবং চাদরের সঙ্গে কোন জুতো মানায়, অতএব পাদপূরণে কোনও অসুবিধা নেই। স্যান্ডেল, ওরফে চপ্পল, ওরফে চটিও নিশ্চয় একইভাবে কম-বেশি প্রভাবিত করে পদকর্তা বা কর্ত্রীদের!

মানা গেল, বুট বা শু'র তুলনায় স্যান্ডেল বা চপ্পল ওজনে কিছুটা হালকা। তাই বলে এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না—চপ্পল মানেই চটুলতা। চটি যে গাম্ভীর্যের কোন পর্যায়ে তুলে নিয়ে যেতে পারে তার প্রমাণ বিদ্যাসাগর মশাই। অরওয়েল ঔপনিবেশিক যুগের ইংরেজ। 'রাজ' সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও ছিল তাঁর। সে-কারণেই ফলের রসপেয়ী কিংবা ন্যুডিস্টদের সঙ্গে চটিপরা মানুষগুলোকে তিনি এক বন্ধনীভুক্ত করছেন দেখে কিছুটা অবাকও হয়েছিলাম। তাঁর জানা উচিত ছিল, ব্রিটেনে চটির ভূমিকা যাই হোক না কেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে, বিশেষত ভারতে চটি কিছুতেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বা রসিকতার উপলক্ষ হতে পারে না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে জুতোর ভূমিকা কিন্তু মোটেই তুচ্ছ নয়। সে-লড়াইয়ের একপর্বে দেখি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুট আর চটি। প্রসঙ্গত সে-ইতিহাসও স্মরণযোগ্য।

আজকাল যেমন কাগজে জুতো বলতে বোঝায় জুতোর বিজ্ঞাপন, সেকালে কিন্তু প্রায়শ সংবাদের উপলক্ষ হতো জুতো। থেকে-থেকেই হেডিং—'দি শু কোশ্চেন!' সবাই জানেন, ইংরেজ আর ভারতীয়ের সম্পর্ক প্রভু আর দাসের সেটা মনে করিয়ে দেবার জন্য প্রভুকূল লিখিত অলিখিত কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল এ-দেশের মানুষের জন্য। তার মধ্যে একটি সাহেবের সামনে জুতো না-পরা। ভারতীয়দের কোনও অধিকার ছিল না জুতো পায়ে সাহেব সন্দর্শনে যাবার। জুতো-পরা নিয়ে কিছু নিষেধাজ্ঞা ছিল আমাদের শাস্ত্রেও। সব দেশেই নাকি এক সময় তা ছিল। প্রাচীনেরা এখনও মনে করেন, জুতো পরে দেবতা বা গুরুজনকে প্রণাম করা অসঙ্গত এবং অশাস্ত্রীয়। সাহেবরাও, বলাবাহুল্য, নিজেদের বসিয়েছিলেন দেবতার পাদপীঠে। রাজপুরুষদের সামনে পালকি বা হাতি ঘোড়া চড়া, ছাতা মাথায় দেওয়া এবং জুতো পরা তাদের মতে অশিষ্ট আচার। সুতরাং এ-দেশের জুতোধারীরা তখন রীতিমত বিপন্ন। এখনকার মতো তখনও অবশ্য অধিকাংশ ভারতীয় ছিলেন খালিপদ, তাই রক্ষে! কাঁটা-টা বিশেষ করে বিঁধছিল বড়মানুষদের পায়েই। জুতো আছে, কিন্তু তা পরে ইংরেজিটোলার দিকে পা বাড়াবার উপায় নেই। সবই আছে। ঘরবাড়ি, দাসদাসী, প্রভাব প্রতিপত্তি। সিন্দুকও খালি নয়, ইংরেজদের বিধানে বাবু তবু খালিপদ।

আমার তো এক এক সময় মনে হয় এই জুতো উপলক্ষেই হয়তো এদেশে মাথা চাড়া দিত ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ। পরিস্থিতি কিছুটা সামলে দিয়েছিলেন নাকি লর্ড অ্যাকল্যান্ড। উনিশ শতকের চারের দশকে তিনি অনুমতি দিলেন 'নেটিভ'দের পক্ষে জুতো পরে লাটভবনে আসতে কোনও অসুবিধা নেই। রোজ এমিলি ইডেন লিখেছেন, সে এক দৃশ্য। আটোসাঁটো নতুন জুতোয় পা কেটে যাচ্ছে। তবু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে লাটবাহাদুরকে সেলাম জানাতে আসছেন একের পর এক 'জেন্টু'! এমিলি জানেন না, তাঁর ভাইয়ের এই স্ট্র্যাটেজি সাম্রাজ্যের আয়ু বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল। হয়তো গরু মেরে জুতো দান, তবু বাবুরা নিশ্চয়ই রীতিমত প্রীত

সেদিন। ডার্বি, অক্সফোর্ড, পেটেন্ট লেদার, চীনে বাড়ির জুতো,—বড় ঘরে এ-সব শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু হয় তখনই।

পরবর্তী লড়াই অনুপদীনা এবং আজ্ঞানুচরণপত্রের সঙ্গে চটিজুতোর। আজ্ঞানুচরণপত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। সেটা নাকি আসলে বুট জুতো। অনুপদীনা বুট নয়, লাপেটা। (পায়ে লেপ্টে থাকে বলে ?) বিদেশীপ্রভুরা বুট বা শু মেনে নিলেন বটে, কিন্তু চটিকে তাঁরা কিছুতেই ছাড়পত্র দিতে সম্মত নন। শুরু হল চটির মুক্তিযুদ্ধ। এ-লড়াইয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত যোদ্ধা অবশ্যই ঈশ্বরচন্দ্র শর্মণ। কলেজে, এশিয়াটিক সোসাইটিতে, এমনকি পথেঘাটেও তাঁর পায়ের চটি বিদ্রোহের প্রতীক। সে-সব উপাখ্যান সকলের জানা।

তবে অন্য বিদ্রোহীরাও ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মজীবনী'তে উড্রোসাহেবের সঙ্গে শাস্ত্রীমশাইয়ের কথোপকথন প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

"উড্রো। তুমি জুতা পরিয়া এ-ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে অপমান করিয়াছ। তুমি জুতা খুলিয়া এস।

আমি। না সাহেব, আমি জুতা খুলিব না। আমি কীরূপে আপনার অপমান করিলাম বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পায়ে জুতা রহিয়াছে, আপনার কেরাণীবাবুর পায়ে জুতা দেখিতেছি। আপনারা যদি খোলেন তবে আমি খুলিতে পারি।

উড্রো। ও যে বুট জুতা !..."

চটি ত্যাগে অসম্মত বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটির দুয়ার থেকে ফিরে এসেছিলেন ১৮৭৪ সনে। একটি বাংলা কাগজ তখন ব্যঙ্গ করে লিখেছিল—'রে তালতলার চটি, ইংরাজের আমলে কেবল তোরই অদৃষ্ট ফিরল না।' কথাটা মিথ্যে নয়। চটির যখন অদৃষ্ট ফিরে এসেছে বলতে গেলে তখনই ইংরেজের ভাগ্যবিপর্যয়ের সূচনা। লর্ড অকল্যান্ড ভারতীয়দের বুট-পরার অনুমতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে শুধু রাজধানীর ভারতীয়দের। বাইরে 'নেটিভ'দের পায়ের জুতো তারপরও অনেকদিন পর্যন্ত ছিল জন বুল-এর চোখে লাল শালুর মতো, তা সে জুতোর রঙ যাই হোক না কেন! ১৮৬৮ সনে সদাশয় ভারত সরকার জানালেন, এ-দেশের মানুষ কলকাতার বাহিরেও জুতো পায়ে চলাফেরা করতে পারবে। কিন্তু সাহেবের সামনে চটিজুতো চলবে না। বিচ্ছিরি এক কাণ্ড ঘটেছিল শতাব্দীর শেষ প্রহরে। ১৮৯৮ সনের কথা। কার্জন বড়লাট হয়ে কলকাতায় এসেছেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা লাটভবনে গিয়েছেন তাঁকে অভিনন্দন বা অভিবাদন জানাতে। দলে ছিলেন বিশিষ্ট ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। তাঁর পায়ে ছিল চটি। বাধ্য হয়েই নাকি রাজদর্শন না করেই ফিরে আসতে হয় তাঁকে!

দশকের পর দশক ধরে এই ধারাবাহিক নিগ্রহ আর অপমানেরই জবাব বোধহয় গান্ধীজীর পদযুগল। সবাই জানেন, কি ডাণ্ডি, কি লন্ডন, কি নোয়াখালি, কি রাজসন্দর্শন—গান্ধীজীর পায়ে সব সময়ই চপ্পল, অরওয়েল যাকে বলেন, স্যান্ডেল। শুধু গান্ধীজী কেন, সেদিনের ভারতের জাতীয় নেতাদের অনেকেই চপ্পল অথবা চটির ভক্ত। গ্রীক পুরাণের পারসিউস-এর সেই স্যান্ডেলের মতোই ভারতের চটিও তাই সৌভাগ্যের বার্তাবহ। স্বাধীনতার তো বটেই। অরওয়েল যখন সোস্যালিজম বা কমিউনিজম প্রসঙ্গে চটির কথা তোলেন তখন তিনিও কিন্তু প্রকারান্তে স্বীকার করেন, চটির স্বাভাবিক প্রবণতা রাজনীতির দিকে। তবু চটি নিয়ে চপলতা আমার পছন্দ নয়। এমনকি অরওয়েলের কলমে হলেও না। কারণ, যত হালকা যত শস্তাই হোক, চটি, ভারতে অন্তত, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মতো জিনিস নয়। অনেক অপমানের সাথী এই চটি, তার সংগ্রামী ঐতিহ্যও অনেক দিনের। আমার চটিজোড়া কখনও আমাকে অসুবিধায় ফেলে না, এমন কথা হলপ করে বলতে পারব না। ট্রামে বাসে জুতোধারীরা হামেশাই পা মাড়িয়ে দেন, যখন তখন বিশ্বাসঘাতকতা করে স্ট্র্যাপ, কাছে ভিতে চর্মশিল্পী না থাকলে বিপদ। অস্বীকার করব না ঐতিহ্য তখন পায়ে বোঝার মতো মনে হয়,—টেনে-টেনে হয়রান। বাদলা দিনে আবার অন্য ঝঞ্ঝাট। ছিপছিপে বৃষ্টিতে চটি কাদা ছিটাতে ওস্তাদ, জামাকাপড়ে দধিকর্দম খেলা। বেশি বৃষ্টিতে অবশ্য জুতোও হাতে ওঠে, কিন্তু চটি ওঠে তার আগেই চটপট। শীতে আবার ব্যবহার তার অন্য রকম, তালতলার চটি যেন তালপাতার পাখা—, শীতে শত্রু তুমি গ্রীষ্মে সখা। তবু ছয় ঋতু বারো

মাস চটি আমার পায়ে। কারণ, অসুবিধা যাই থাক, আমার মতে চপ্পল বা চটির মতো এমন খোলামেলা নিরাসক্ত পাদুকা বোধহয় আর হয় না। চটি আসক্তিহীনও বটে। চটি লাপেটার মতো আশ্লেষে লেপ্টে থাকে না, বুটের মতো সাতপাকে বাঁধে না, চটি পরতে বা খুলতে কোনও বিশেষ উদ্যোগের প্রয়োজন হয় না। বলতে গেলে সেটা হারেমের প্রভুর বিবি নেওয়া বা ছেড়ে দেওয়ার মতোই সহজ। এককালে শৌখিন আরবরা নাকি কাউকে তালাক দেওয়ার সময় বলতেন—এই আমি চটি ছাড়লাম! সন্দেহ নেই অভব্য আচরণ, অপমানকর উক্তি। তবে তার জন্য চটি নিশ্চয়ই দায়ী নয়। আমার তো মনে হয়, পায়ের চটি কারও পায়াভারী করে না। বরং পা থেকে মাঝে মধ্যে পালিয়ে গিয়ে জানিয়ে দেয় তারও রয়েছে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা। অরওয়েল যাই বলুন, জুতোর কিন্তু সে ক্ষমতা নেই। বিশেষত সেই জুতোর, ভারতীয় শাস্ত্রে নাম যার—আজানুচরণপত্র!

নীললোহিত

আমার বাবার একসঙ্গে তিনটে হাত-ঘড়ি পকেটমার হয়ে যায়।

এক-একজন মানুষের ঘড়ি ব্যবহার করার কোনও মানেই হয় না। সময় তাঁদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী চলে। যেমন আমার বাবা। তাঁর সময়জ্ঞানের সঙ্গে কিছুতেই আমরা তাল দিতে পারতুম না।

সকালবেলা যাতে আমরা তাড়াতাড়ি পড়তে বসি, সেইজন্য বাবা আমাদের ডেকে দিতেন। আচমকা ঘুম ভেঙে শুনতাম, বাবা ধমক দিয়ে ডাকছেন, এই নীলু, ওঠ্ ওঠ্, কত বেলা হয়ে গেল, পৌনে ন'টা বাজে, এখনও পড়তে বসার নাম নেই!

ধড়মড় করে উঠে কোনোক্রমে চোখে মুখে জল দিয়ে দেখতাম, দেয়াল ঘড়িতে বাজে ছটা দশ। আমাদের দেয়াল ঘড়িটি বেশ বিশ্বস্ত, তা ছাড়া রোদও সেইরকম নরম। বাড়িয়ে বলার একটা সীমা তো আছে, ছটা দশের জায়গায় বাবা সাতটা বলতে পারতেন, তা নয় একেবারে পৌনে নটা। রাত্রিবেলা পড়তে-পড়তে ঘুমে চোখ ঢুলে এলে বাবা বলতেন, মাত্র সাতটা চল্লিশ বাজে, এর মধ্যেই ঘুম! আসলে তখন বাজে ঠিক দশটা। বিকেলে খেলাধুলোর পর ঠিক সন্ধে সাড়ে ছ'টার মধ্যে আমাদের বাড়ি ফেরা নিয়ম। একদিন এক বন্ধু তার বাড়িতে টেনে নিয়ে গেল, সেখানে আমাকে কুকুরে কামড়াল, তাই নিয়ে খুব হুলস্থুলু, সুতরাং বাড়ি ফিরতে দেরি হলো বেশ। রাস্তায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। বুক দুরু দুরু করছে। নির্ঘাৎ আটটা সাড়ে আটটা বাজে। দরজা খুলেই বাবা কড়া গলায় বললেন, বারোটা বাজতে পাঁচ, বাকি রাতটা বাড়ির বাইরে কাটিয়ে এলেই পারতি!

রাউণ্ড ফিগারের বদলে খুচরোয় বলতেন বলেই বাবার সময়-জ্ঞাপন হঠাৎ শুনে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতো।

বাবা যে-হাত-ঘড়িটি পরতেন, সেটি অবশ্য সময় দিত নিখুঁত। সেটা তাঁর বিয়ের সময়কার ঘড়ি। অন্য কেউ সে-ঘড়িতে হাত দিলেই চটে যেতেন। আমরা হাত পাকাতুম দেয়াল ঘড়িটায়। পুরনো আমলের এই ঘড়ি ডাকবার আগে দুবার খ-র-র-র, খ-র-র-র শব্দ করে। যেন হাইজাম্প দেবার আগে কয়েক পা ছুটে আসার মতন। যদিও ঘড়িটার গায়ে সাঁটা এক টুকরো কাগজে হাতে লেখা ছিল সোমবার, তবু আমরা ভাই-বোনেরা যার যখন খুশী দম দিয়ে দিতুম। ঘড়িটির পেণ্ডুলামের খোপের দরজাটা ঠিক মতন বন্ধ করা যেত না, ওটা যখন তখন খুলে যেত। সেই জন্য ওই ছোট্ট খোপটা প্রথম দিকে টিকটিকি, পরের দিকে চড়ুই পাখিদের খুব প্রিয় জায়গা ছিল। এক একদিন হতো কী ঘড়িটা খ-র-র-র খ-র-র-র করার পর আর টং টং করে বাজত না। তখনই আমরা বুঝতুম, ভেতরে কেউ ঢুকেছে। একদিন ওই অবস্থায় তদন্ত করতে গিয়ে আমার মুখের উপর দুটো ইঁদুর লাফিয়ে পড়েছিল।

বড় দেয়াল ঘড়িটা মেরামতি বা অয়েলিং-এর তোয়াক্কাই করত না। কিন্তু সেবার ইঁদুর-অভিযানের ফলে ঘড়িটিকে দোকানে পাঠাতেই হল। তারপর দিনকতক আমাদের বাড়িতে বাবার হাত ঘড়িই ভরসা। তখন বাবা ইচ্ছেমতন দিনকে রাত, রাতকে দিন করে দিতে পারতেন। রবিবার দিন সাধারণত একটু দেরিতে খাওয়া দাওয়া হয়, বাড়িতে আড্ডা বসে, কিন্তু এক রবিবার বাবা হঠাৎ সকাল দশটার সময় ভাত খাওয়ার জন্য তাড়া লাগালেন। ঘড়ি দেখে বাবার মনে হয়েছিল, সেই দিনটা সোমবার!

বাবার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তাঁর হাত-ঘড়িটিও এক সময় বিচিত্র ব্যবহার শুরু করলো। যখন তখন স্লো বা ফাস্ট হয়ে যায়। এমনকি এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা পর্যন্ত। রাস্তার লোক

'কটা বাজে?' জিজ্ঞেস করে সেই ঘড়ি দেখে আঁতকে আঁতকে উঠত। একবার নাকি একটি কলেজের ছাত্র ওই ঘড়িতে সময় দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। বাবার সহকর্মীরা বলতে শুরু করলেন, এবারে ঘড়িটা সারান, ও-রকম ঘড়ি হাতে রাখার চেয়ে না রাখাই তো কম বিপজ্জনক! বাবা গম্ভীরভাবে বলতেন, দেব, দেব, সময় পাচ্ছি না।

অর্থাৎ ওইরকম দামি ঘড়ি তো পাড়ার ছোটখাটো দোকানে সারাতে দেওয়া যায় না। সাহেবপাড়ায় অর্থাৎ পার্ক স্ট্রিটে একটি ঘড়ির দোকান বাবার চেনা আছে, সেই দোকানে এখনও একটি সাহেব ঘড়ি-মিস্তিরি বসে, তাঁকে ছাড়া বাবা আর কারুর হাতে ঘড়ি দিতে ভরসা পান না। সাহেবটি বুড়ো হলেও ঘড়ির ব্যাপারে একবোর ধন্বন্তরি। এবং তাঁর ব্যবহার অতি অমায়িক। বাবার মুখে সেই সাহেবের গুণপনার বর্ণনা শুনে মনে হতে পারত যে, তিনি একেবারে সাক্ষাৎ ডেভিড হেয়ারের বংশধর! বাবার দু'জন সহকর্মী তাঁদের দুটি অচল ঘড়ি দিয়ে বললেন, তাহলে আপনি যেদিন যাবেন, আমাদের ওই দুটোও সারিয়ে আনবেন।

একটা শুভদিন দেখে বাবা একদিন বাসে চেপে রওনা হলেন পার্ক স্ট্রিটের উদ্দেশে। যেহেতু, তিনটি রিস্ট ওয়াচ এবং তিনটিই খারাপ, একসঙ্গে হাতে পরা যায় না, সেইজন্য ঘড়ি তিনটিকে একটা রুমালে পুঁটুলি বেঁধে পকেটে রাখলেন বাবা। বাসের পকেটমারদের পক্ষে সেই পুঁটুলিটা তুলে নেওয়া তো অতি সহজ কাজ।

আমি যতবারই আমার বন্ধুবান্ধবদের বলতে গেছি যে আমার বাবার রিস্ট ওয়াচ পকেটমার হয়েছিল, সবাই আমার ভাষায় ভুল ধরতে চেয়েছে। কিন্তু এই হল হাত-ঘড়ি পকেটমারের রহস্য।

সেই সময় বেশ কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে কোনও ঘড়ির পাটই ছিল না। সময়ের সেই নৈরাজ্যে আমরা কিন্তু বেশ আনন্দেই ছিলুম, রোদ্দুরের রঙ পাল্টানো ও রাত্রির শব্দ শুনেই আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারতুম প্রহরের হিসেব।

ছেলেরা সাধারণত প্রথম হাত-ঘড়িটা বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। আমার ক্ষেত্রে সেটা ঘটেনি। সেই রিস্টওয়াচ চুরি যাবার পর বাবা একটি গোল পকেট-ঘড়ি কিনেছিলেন। পকেটমারদের ওপর রাগ করে আবার ফের পকেটেই ঘড়ি রাখার যে কী মানে হয়, তা আমরা বুঝিনি।

আমি প্রথম ঘড়ি পরি একটি লটারিতে জিতে। বাড়ির কাছে চিলড্রেন্স পার্কে একজন লোক বিক্রি করত হজমি-চুরান। দশ পয়সা দিয়ে অনেকগুলি প্যাকেটের মধ্যে তুলে নিতে হত যে-কোন একটি। এর মধ্যে এক-একটা প্যাকেটের মধ্যে থাকত একটি করে উপহার। একটা পেতলের আংটি বা পাঁচটা বেলুন বা কানের দুল। একবার সেইরকম একটা প্যাকেটে আমি পেয়েছিলুম একটা প্লাস্টিকের ঘড়ি। কাঁটা না ঘুরলেও ঘড়িটি বেশ সুদৃশ্য ছিল। কিন্তু পরদিনই স্কুলে আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু একটান মেরে সেই ঘড়িটা ছিঁড়ে দেয়, তারপর ঝগড়া, মারামারি, একেবারে রক্তারক্তি পর্যন্ত। সেইদিনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে, আমার ভাগ্যে কোনওদিন ঘড়ি সইবে না।

কলেজ জীবনে একটা পরীক্ষার পর আমি একটি জ্যান্ত ঘড়ি উপহার পাই। ঘড়িটি উপহার দেন আমার এক মামা। আমার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বাবা-মাও আমাকে সেই সময় পাঁচ-দশ টাকা করে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। ফার্স্ট-সেকেন্ড হবার ব্যাপার কিন্তু নয়, আমি স্রেফ পাশ করেছিলুম বলে। এঁরা সকলেই নাকি দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন আমার ফেল-সংবাদ শোনার জন্য।

মামার দেওয়া ঘড়িটি বেশ ভালো জাতের, দেখতে-শুনতেও চমৎকার। আমার ছোটকাকা অবশ্য বলেছিল, তুই ও ঘড়ি নিয়ে কী করবি, ওটা আমায় দিয়ে দে, তার বদলে তোকে আমি একটা পকেট নাইফ দিচ্ছি। কিন্তু ছুরির বদলে ঘড়ি বিনিময় করতে আমি রাজি হইনি। মঞ্চে অনেক অভিনেতা যেমন তাদের হাত দুটোকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না, আমারও বাঁ হাতটা নিয়ে সেই অবস্থা হয়েছিল কিছুদিন। হাতটা ঝুলিয়ে রাখলে মনে হয় ঘড়িটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। হাতটা ওপরে তুলে রাখলে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ঘড়িটা অবশ্য আমার সঙ্গে বেশিদিন সহবাস করেনি। একদিন দক্ষিণ কলকাতা থেকে এক বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছি অনেক রাতে। দোতলা বাসের ওপরে বেশ ভালো বসার জায়গা পেয়ে গেলুম। বেশ গুরুভোজন হয়ে গেছে, হাওয়া দিচ্ছে ফুরফুরে, জানলার পাশে মাথাটা রাখতেই ঘুমে চোখ ঢুলে এলো।

এক সময় কে যেন ডাকল, এই যে দাদা, উঠুন! উঠুন! কী ঘুম রে বাবা!

চোখ মেলে দেখি চার পাশে ঘুরঘুটে অন্ধকার। পাশে ছায়ার মতন একটা লম্বা লোক দাঁড়িয়ে। প্রথমে বুঝতেই পারলুম না আমি কোথায় আছি, তারপর মনে পড়লো বাসে...কিন্তু বাস তো চলছে না, এটা তো রাস্তা নয়!

বাসটা চলে এসেছে পাইকপাড়ার গ্যারাজে। কণ্ডাক্টরবাবু আমায় জাগিয়ে দেননি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি কে জানে। বাইরে থেকে আমার কনুইটা দেখতে পেয়ে গ্যারাজের নাইট গার্ড আমায় ডাকতে এসেছে।

কটা বাজে তা দেখবার জন্য বাঁ হাতের কব্জি ঘোরাতেই দেখলুম সে-জায়গাটা ফাঁকা! অমনি বুকের মধ্যে জয়ঢাক বাজতে লাগল।

আমার ঘড়ি? আমার ঘড়ি? বলে দু' চারবার চ্যাঁচামেচি করতেই নাইট গার্ড টর্চ জ্বেলে সিটের নিচগুলো একটু খুঁজে দেখল। তারপর আমাকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল, এত রাত্রে ঘড়ি কোথায় পাওয়া যাবে! দেখুন গে, বাড়িতেই ফেলে এসেছেন।

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, না, না, বাসে ওঠার সময়ও আমার হাতে ঘড়ি ছিল! এই দেখুন প্রমাণ!

অনবরত ঘড়ি পরলে সেই জায়গাটায় হাতের রোমগুলো ইট-চাপা ঘাসের মতন হয়ে যায়। নাইট গার্ড টর্চের আলোয় আমার হাতটা পরীক্ষা করে আমার কথা মেনে নিতে বাধ্য হল। তারপর বলল, কে খুলে নিয়ে গেছে! আর ভেবে কী হবে?

কিন্তু ঘড়ি ছাড়া আমি বাড়ি যাব কী করে? একবার যেন মনে হল, এই নাইট গার্ডই আমার ঘড়িটা খুলে লুকিয়ে রেখে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে।

সেই মর্মে একটু সামান্য ইঙ্গিত করতেই ধমক খেলুম। লোকটি হঠাৎ গলার আওয়াজ বদলে বলল, আপনার ঘড়ি হারিয়েছে তো আমরা কী করব? থানায় গিয়ে রিপোর্ট করুন। গ্যারাজের মধ্যে আপনি বে-আইনি ভাবে ঢুকেছেন, তা জানেন?

পাইকপাড়া বাস ডিপো থেকে দু'পা বাড়ালেই থানা। সেখানে আমার অভিযোগ জানাবার আগেই এক উদ্ভট সংবাদ শুনলুম। ওই বাস ডিপো এই থানার আওতারে নয়। সুতরাং ওখানকার কোনও ঘটনা এই থানা শুনতেই রাজি নয়! একজন এস আই হাসতে হাসতে বলল, রাস্তার ওপরে যদি আপনার ছেনতাই হয়, কিংবা কেউ আপনাকে খুন করতে আসে, তা হলেও আপনাকে যেতে হবে কাশীপুর থানায়। সেখানেই চলে যান।

এত রাত্তিরে আমি কাশীপুর থানা চিনবো কী করে? চড়ে বসলুম একটা রিক্সায়। মনে হল যেন অনেক দূরের পথ। আকাশের চেহারা দেখে মনে হয় মাঝ রাত। এই সময়েও থানায় বেশ ভিড় এবং পুরোদস্তুর কাজকর্ম চলছে। এরই মধ্যে দারোগাবাবু বেশ আড্ডার মেজাজে রয়েছেন। আমার কাহিনী শুনে তিনি বেশ উপভোগের সঙ্গে অট্টহাসি করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, এমন ঘুম, অ্যাঁ? ঘড়ি খুলে নিয়ে গেল? অ্যাঁ? কে দিয়েছিল ঘড়ি?

হঠাৎ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, নম্বর কত?

বুঝতে আমার বেশ সময় লাগল। এই প্রথম আমি জানতে পারলুম, গাড়ির মতন ঘড়িরও নাকি নম্বর থাকে, এবং ঘড়ির মালিকরা সেই নম্বর নোট বইতে লিখে রাখে। আমি সেরকম কিছু লিখে রাখিনি, সুতরাং ঘড়ির মালিক হবার যোগ্যতা আমার নেই।

আরও কিছুক্ষণ হাসাহাসির পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক আছে, কী ঘড়ি ছিল? খুব দামি? কোন্ কম্পানির।

আমি নিশ্চুপ!

তিনি আবার ধমক দিয়ে বললেন, কী ঘড়ি ছিল, বলুন! নাকি সেটাও জানেন না?

থানার পরিবেশে আমার মাথা ঘুরে গেছে। আমার কী ঘড়ি ছিল তা তো আমি ভুলে গেছিই, কোনো ঘড়ির নামই আমার মনে আসছে না। আমার মনে পড়ছে পার্কার, সেফার্স, পাইলট, ওয়াটারম্যান... । এমন বিপদে বোধহয় জীবনেও পড়িনি।

হাসিও যে মানুষকে তাড়া করতে পারে তা সেদিন জানলুম। দারোগাবাবুর হাসির তাড়া খেয়ে ল্যাজ-গুটোনো শিয়ালের মতন পালিয়ে বেঁচেছিলুম সেদিন।

তারপর থেকে আমি আর ঘড়ি পরবই না ঠিক করেছিলুম। কিন্তু ঘড়ি আমাকে অনেক বিপাকে ফেলেছে। সেই ঘটনার পর থেকে আমি রাস্তায় ঘাটে প্রচুর লোককে আমার ঘড়ি হাতে পরে ঘুরতে দেখেছি। বিশেষত একাধিক বাস কণ্ডাক্টরের হাতে টিসট্‌ ! এবং তারা আমার দিকে আড়চোখে তাকায়। চোরকে আমি চিনি না, কিন্তু চোর নিশ্চয়ই আমাকে চিনে রেখেছে।

আমার এক মামাতো বোনের বিয়ে হল দিল্লির এক ব্যারিস্টারের সঙ্গে। নতুন জামাইবাবু তার শ্যালক-শ্যালিকাগোষ্ঠীর পনেরোজনকে একদিন নেমন্তন্ন করলেন এক দামি হোটেলে। এত সুসজ্জিত হোটেলে আমি আগে কখনও ঢুকিনি। সেখানকার বেয়ারাদের মস্তক-সজ্জা পাঠান সৈনিকদের মতন।

তিনখানা টেবিল জোড়া দিয়ে আমরা সবেমাত্র বসেছি, তক্ষুনি আমার চোখে পড়লো আমার ঠিক পায়ের কাছেই পড়ে আছে একটা ঘড়ি। স্টিলের ব্যান্ড, সোনালি রং, নির্ঘাৎ টিসট্‌। ঘড়িটি শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, তার বুকটা যেন বৈদূর্যমণির মতন জ্বলছে। প্রথম দর্শনেই মনে হল, আমার জিনিস ফিরে এসেছে আমার কাছে। বাস কণ্ডাক্টরদের মিথ্যে সন্দেহ করেছিলুম, এ অনেক বড় দরের চোরের কাজ, যারা এইসব রেস্তোরাঁয় হরদম খেতে আসে। নিয়ত নির্বন্ধে আজই সেটা চোরের হাত থেকে খসে পড়েছে।

একটু নিচু হয়ে আমি অনায়াসে ঘড়িটা তুলে নিতে পারতুম। কিন্তু তাহলেই সবাই ওটা সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। আমার ঘড়িই যে আমার কাছে ফিরে এসেছে এটা কি সবাই বিশ্বাস করতে চাইবে ? বিশেষত নতুন জামাইবাবুকে বেশ সন্দেহপ্রবণ মানুষই মনে হয়, উনি আবার ব্যারিস্টার ! সুতরাং আমার উচিত হচ্ছে হাত থেকে একটা কিছু জিনিস ফেলে দিয়ে সেটা তোলার অছিলায় টপ করে ঘড়িটা তুলে পকেটে ভরে ফেলা। তবে, এক্ষুনি যদি একটা লোক এসে বলে, আমার ঘড়ি ? আমার ঘড়ি ? মুখের ভাবেই আমি ধরা পড়ে যাব।

পা দিয়ে চেপে রাখলুম ঘড়িটি। ইত্যবসরে খাওয়া দাওয়া চলতে লাগল। আমার চটি ভেদ করে, পায়ের শিরা-উপশিরা বেয়ে সেই রিস্টওয়াচের টিকটিক শব্দ উঠে আসতে লাগল ওপরে, আমার বুকে সেই শব্দ যেন দামামা বাজাচ্ছে। সকলেই কি তা শুনতে পাচ্ছে। সবাই চাপা গলায় কথা বলছে কেন ? কেউ হাসছে না। আমার দিকে কেউ সরাসরি তাকাচ্ছে না। সৈনিকের মতন পোশাক পরা বেয়ারারা মাঝে-মাঝেই আমার পিঠের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে কেন ? কী দেখছে তারা ? একটু বাদেই এসব সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমি মন দিলুম খাওয়াদাওয়ায়। কেউ কিছু লক্ষ করেনি, ঘড়ি খুঁজতে কেউ এল না।

প্রায় একঘণ্টা বাদে সবাই যখন উঠছে তখন আমি জুতো পরতে বেশি সময় নিলুম। আমি সবার শেষে। ঘড়িটা তুলে নেওয়ার এই-ই সুবর্ণ সুযোগ। শেষ মুহূর্তে আমি পা দিয়ে ঘড়িটাকে ঠেলে দিলুম অনেক দূরে। নিজের কাছে নিজেকে সৎ প্রমাণ করে বেশ একটা বাহবা নেওয়া গেল সঙ্গোপনে, আর এই উপলক্ষে সময়কেও একখানা লাথি কষানো গেল।

আমার জীবনে দ্বিতীয় ঘড়িটি আসে অতি অযাচিতভাবে। কফি হাউসে আমার এক বন্ধুর বন্ধু একদিন আমার কাছে হঠাৎ কুড়ি টাকা ধার চাইল। আমার পকেটে সেদিন ঠিক বাইশ টাকা ছিল বলে ধার দিতে কোনও অসুবিধেই হল না। ছেলেটিকে আমি কম চিনি, কিন্তু সে এমন ভাবে চেয়েছিল যাতে মনে হয়, তার খুবই দরকার।

এর দিন পনেরো বাদে ছেলেটির সঙ্গে আবার দেখা হল একটা আড্ডায়। সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মাঝপথে অন্য কথা থামিয়ে বলে উঠল, ও তুমি তো আমার কাছে কুড়ি টাকা পাবে, ভুলেই গিয়েছিলুম। আমি লজ্জা পেলুম বেশ। আমার চোখে কি মহাজনসুলভ একটা ভাব ফুটে উঠেছিল ? এই রকম সময়ে যা বলতে হয়, আমি মাথা নিচু করে বললুম, না, না, ওর

জন্য ব্যস্ত হবার কী আছে ?

ছেলেটি পকেট থেকে হাত বার করে বলল, তুমি ঘড়ি পরো না ? তুমি এটা নাও ।

ঝট করে সে নিজের মণিবন্ধ থেকে ঘড়িটা খুলে ফেললো। আমার ঘোরতর আপত্তি কিছুই সে শুনতে চায় না, সে শুধু বলে, তার চার-পাঁচটা ঘড়ি আছে। শুধু শুধু বাড়িতে পড়ে থাকে ! অন্য বন্ধুরাও তাল মিলিয়ে বলতে লাগল, নিয়ে নে, পাচ্ছিস যখন... ।

বাধ্য হয়ে ঘড়িটা আমার হাতে গলাতে হল। মনে মনে ঠিক করে রাখলুম, খানিকবাদে কোনও ছুতোয় ওটা ফেরত দেব ! কুড়ি টাকার বদলে একটা রিস্টওয়াচ ? সেকেন্ড হ্যান্ড ঘড়ি যত শস্তাই হোক, কুড়ি টাকায় হতে পারে না !

কিন্তু সে-ঘড়ি আর আমার ফেরত দেওয়া হলো না। সেদিনটা তালেগোলে কেটে গেলে, তারপর দিন সাতেক কফি হাউসে সেই ছেলেটিকে আমি দেখতেই পেলুম না। তখন ঠিক করলুম, তার বাড়িতে গিয়ে ঘড়িটা পৌঁছে দিয়ে আসব। আজ যাই, কাল যাই করতে-করতে একদিন জানা গেল, ছেলেটি দিল্লি চলে গেছে একটা চাকরি নিয়ে।

ঘড়িটিকে প্রথম থেকেই আমি অপছন্দ করেছিলুম। ওটার দিকে তাকালেই গ্লানি বোধ হয়। যেন একটা অন্যায় করেছি। অথচ আমার কোনও দোষ আছে ? একটা জলজ্যান্ত ঘড়ি রাস্তায় ফেলেও দেওয়া যায় না প্রাণে ধরে। বাড়িতেও দু'একটা ছোটখাটো মিথ্যে কথা বলতে হল ওর জন্য।

ঘড়িটা চলে কিন্তু ঠিকঠাক। চেহারাটা শৌখিন নয়, বরং গাঁট্টাগোঁট্টা মজবুত ধরনের। এক আধদিন দম দিতে ভুলে গেলেও হাঁপিয়ে যায় না। বন্ধু-বান্ধবরা যারা ঘটনাটা জানে, তারা আমার হাতে ঘড়িটা দেখলে বাঁকা ভাবে হাসে, ভাবখানা এই, দারুণ দাঁও মেরে ঘড়িটা বাগিয়েছিস। আবার ওটা বাড়িতে ফেলে রাখলেও মা বলেন, ঘড়িটা পরিস না কেন, কিনেছিস যখন...। মাঝে-মাঝে আমার হর্ষবর্ধনের মতন হয়ে গিয়ে সব কিছুর সঙ্গে ঘড়িটাও বিলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। ঘড়িটা খুলে দোলাতে দোলাতে বলি, কে নেবে ? কে নেবে ? কেউ রাজি হয় না।

আমার এক মাসতুতো দাদা দুর্গাপুরে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাবে, আমাকে বলল, তোর ঘড়িটা আমায় কদিনের জন্য দিবি ? আমি তৎক্ষণাৎ রাজি। আমার দাদার স্বভাব আমি জানি, আমি নিজে বারবার না চাইলে ও-ঘড়ি আর কোনওদিন ফেরৎ দেবে না।

এর পর কয়েকটা দিন খুব ফুরফুরে, হালকা সময় কাটতে লাগল। শরীরের ওপর কোনও চাপ নেই, হাত দু'খানিই স্বাধীন। কোনও ধরা-বাঁধা ব্যাপার নেই, যখন যেখানে খুশী যাওয়া যায়। ঘড়ি না থাকার এত সুখ।

কিন্তু এই সুখ আমার বেশিদিন সইল না। আমার মাসতুতো দাদা একদিন নিজে থেকে আমার ঘড়িটা ফেরত দিয়ে গেল, তাও অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে। কী ব্যাপার ? আমার সেই দাদা একটা সাবানের ক্যাপসান লেখা ও চিত্রতারকাদের মুখ চেনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল, ফোর্থ প্রাইজ হিসেবে একটা হাতঘড়ি উপহার পেয়েছে। খবরের কাগজে সাবান বা সেলাইকলের ওই ধরনের বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখি বটে। কিন্তু কোনও জ্যান্ত মানুষ যে ওই ক্যাপসান লেখে কিংবা সত্যি পুরস্কার পায় সে-সম্পর্কে আমার ধারণাই ছিল না। মানুষ কত কী পারে, মানুষ এভারেস্টের চূড়ায় ওঠে, বিজ্ঞাপন দেখে সাবানের ক্যাপসানও লেখে !

কিছুদিন পর আমি গেলুম আসামে বেড়াতে। ডিগবয় শহরটির নাম শুনলেই আমার সায়েন্স ফিকশানের কথা মনে পড়ত। যেন সাঙ্ঘাতিক কোনও রোমহর্ষক ব্যাপার ওখানে যখন তখন ঘটতে পারে। গিয়ে দেখলুম, পাহাড়ের গায়ে বেশ নিরিবিলি ছিমছাম শহর। আশ্রয় পেলাম এক সজ্জন পরিবারে, সেখানে প্রচুর খাতির যত্ন, আমার জন্য একটা আলাদা ঘর, নানারকমের খাওয়া-দাওয়া, গাড়িতে দূর দূর জঙ্গল-পাহাড় ডিঙিয়ে বেড়াতে যাওয়া। ঘড়িটা রাত্তিরে খুলে রাখি বিছানার পাশে। এক সকালে বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি ঘড়িটি নেই। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। তারপর পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সে অনুপস্থিত। একজন ঢ্যাঙা চেহারার লোক আমার ঘরে খিদমদ্‌গিরি করে, ওর হাতে ঘড়িটি বেশ ভালো মানাবে। পাছে সে লজ্জা পায় তাই আমি তার চোখে চোখ ফেলি না পর্যন্ত।

কিন্তু সে-বাড়ির গিন্নির প্রখর নজর। গোয়েন্দা বিভাগে যদি শুধু মহিলাদের নিয়োগ করা হত, তাহলে টপাটপ সব অপরাধীরা ধরা পড়ে যেত। বিকেলবেলা বেড়াতে বেরুচ্ছি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতে ঘড়ি ছিল না? ঘড়ি পরেই তো এসেছিলে—। আমি বললুম, আছে... সব সময় পরি না...। পরদিন সকালে উঠেই তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘড়িতে দম দাও তো? কই, ঘড়িটা কোথায়? আমি আমতা আমতা করে বললুম, আছে কোথাও, ঠিক যে কোথায় রেখেছি, মনে পড়ছে না...পরশুদিন জঙ্গলে গিয়ে বোধহয়...। তিনি আমার কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য করলেন না, বাড়ির পেছন মহলে গিয়ে কাকে যেন খুব বকাবকি করতে লাগলেন। আবার বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি আমার সেই শ্রীমান ঘড়ি ফিরে এসে যথাস্থানে জ্বলজ্বল করছে!

ইচ্ছে হল ঘড়িটাকে নিয়ে মাটিতে আছাড় মারি। এমন অময় গোঁয়ার ঘড়ি আর কেউ দেখেছে! একবার ভাবলুম, ঘড়িটা যে চুরি করেছিল, তাকেই ডেকে দান করে দিই। কিন্তু বাড়ির গিন্নি নির্ঘাৎ আপত্তি করবেন। ডিগবয় থেকে চলে আসার দিনে শেষ মুহূর্তে ঘড়িটা খুলে রেখে এলাম আমার ভূতপূর্ব ঘরের টেবিলে। গাড়ি ছাড়ব-ছাড়ব এমন সময় গৃহকর্ত্রী বললেন, আবার ঘড়ি ফেলে যাচ্ছো, আচ্ছা ভুলো মন তো তোমার!

প্লেনের জানলা যদি খোলা যেত তা হলে আমি আকাশে ছুঁড়ে মারতে পারতুম ঘড়িটা। আকাশই তো ওদের জায়গা। তবে একটা ভয় ছিল, ঘড়িটাকে ওইভাবে তাড়াবাব চেষ্টা করলে নির্ঘাৎ ওখানেই প্লেন ক্র্যাশ হত এবং আমার পঙ্গু শরীরে অনুগত ভৃত্যের মতন ফিরে আসত ওই ঘড়ি।

এরপর আমি ওই ঘড়ি হাতে দিয়ে নদীতে সাঁতার দিয়েছি, বেহালায় এক বাগান বাড়িতে পিকনিক করতে গিয়ে কাঁচা আম পাড়ার জন্য ওটাকে ঢিল হিসেবে ব্যবহার করেছি, কিন্তু ওর কোনও লয়-ক্ষয় নেই। ঘড়ি তো আর পুরাতন ভৃত্য নয় যে কোনও এক সময় হঠাৎ স্মল পক্সে মারা যাবে। পুরো দাম দিয়ে কিনলেও এ ঘড়িব নষ্ট হবার বা চুরি যাবার ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকত, কিন্তু এ যে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। কুড়িটা টাকা মানুষের যখন তখন খরচ হয়ে যায়, কিন্তু তার বিনিময়ে পাওয়া ঘড়ি আমাকে একেবারে মরণ কামড়ে আঁকড়ে ধরে রইল। আর সেই যে, সেই ছোকরা দিল্লি চলে গেল, তারপর তার পাত্তাই নেই!

তখন আমি ওকে স্লো পয়জনে মারব ঠিক করলুম। সুযোগ পেলেই দম দেওয়া বন্ধ করে দিই। দেখি ও না খেতে পেয়েও কতদিন বাঁচে। দু' তিন দিনের জন্য বাইরে গেলে তো দম দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ওরও জেদ সাঙ্ঘাতিক। তিন দিন পরে দম দিলেও আবার বেশ চলতে শুরু করে। কোনও প্রতিবাদ নেই। কোনও কলকব্জায় জং ধরার সাহসই পায় না।

এরপর একটা কাণ্ড হল, তাতে আমার কোনো হাত নেই। অল্প চলন্ত বাস থেকে নামতে গিয়ে একদিন আছাড় খেয়ে পড়লুম রাস্তায়। ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবার পর দেখলুম, আমার ঘড়ির কাঁচটা নেই, একটা কাঁটাও নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সে-দুটি পাওয়া গেল না।

শুধু এক কাঁটাতেই সেই ঘড়ি দিব্যি চালু রইল। ছোট কাঁটাটা রয়েছে, তাতে দিব্যি সময় বোঝা যায়। মরতে ও কিছুতেই রাজি নয়। এ-অবস্থাতে ঘড়িটি বাবার চোখে পড়ল। আমি এক কাঁটার ঘড়ি হাতে দিয়ে আছি, এটা যেন সাঙ্ঘাতিক একটা পাপ কাজ। সুতরাং বাবা ওটা সারিয়ে দেবার দায়িত্ব নিলেন, তাঁর চেনা পার্ক স্ট্রিটের সেই বিখ্যাত দোকানে। অতি সাবধানে গিয়ে সেটি জমাও দিয়ে এলেন একদিন। দিন পনেরো বাদে বাবা এক সন্ধেবেলা কাচুমাচু মুখে আমাকে একটা অত্যন্ত সুসংবাদ দিলেন। পার্ক স্ট্রিটের সেই ঘড়ির দোকানটা নাকি হঠাৎ উঠে গেছে। কাছাকাছি লোকেরা কোনও খবরও দিতে পারেনি। ও ঘড়ি আর পাবার আশা নেই।

তবু আমার আশঙ্কা ছিল, সাহেব জাতের নীতিবোধ বড় কড়া, দোকান উঠে গেলেও বুড়ো সাহেব হয়তো বাড়ি বয়ে এসে ঘড়ি ফেরত দিয়ে যাবে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না।

অনুশোচনায় পীড়িত হয়ে বাবা আমাকে একটি নতুন ঘড়ি কিনে দিলেন। আমি যথেষ্ট আপত্তি করেছিলুম, কিন্তু মা আর বাবা দুজনেই ধরে নিলেন, সেটা আমার অভিমান। নতুন ঘড়িটা তো শুধু ঘড়ি নয়, সেটা একটা যন্ত্র-দানব। তাতে শুধু চব্বিশ ঘন্টার হিসেব নয়, তার

ওপর রয়েছে তারিখ ও বার। এবং সে-ঘড়িতে দম দেবার দরকার নেই, হাতে পরে থাকলেই হল। সে-ঘড়ি নিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই আমার একেবারে নাজেহাল অবস্থা!

কোনও মাস তিরিশ দিনে, কোনও মাস একতিরিশ দিনে। যেই একতিরিশ দিনে মাস হল, অমনি আমার হাল ফ্যাশানের ঘড়িতে দিন আর তারিখের সব গোলমাল হয়ে গেল। কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাথা ঘুরে যাবার মতন অবস্থা। একেই সময়ের তাল সামলানো শক্ত, তার ওপরে দিনও ভুল, তারিখও ভুল। ঘড়ি দেখেই যদি দিন আর তারিখ জানতে হবে, তা হলে ক্যালেণ্ডার রাখার কী দরকার!

এই ঘড়িতে চাবি দিতে হয় না বটে, কিন্তু দিনে দশ-বারো ঘণ্টা হাতে পরে থাকতে হয়। কী জ্বালা! ছুটির দিনে আমি বাড়ি থেকে বেরুলাম না, শুধু পা-জামা পরে খালি গায়ে বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে আরাম করবো, তার উপায় নেই, হাতে ঘড়ি পরে থাকতে হবে। হাত-কড়া বাঁধার সঙ্গে তফাত কী? প্রতিদিন হিসেব রাখতে হবে দশ বারো ঘণ্টা, হিসেবে কমতি হয়ে গেলে বাথরুমেও ঘড়ি হাতে দিয়ে পুষিয়ে নিতে হবে। অন্য যে-কোনও কাজ থেকে তিন চারদিন ছুটি নেওয়া যায়, কিন্তু ঘড়ির হাত থেকে ছুটি নেই। সাধারণ ঘড়ি আট দশ দিন পরে দম দিলেও আবার চলতে শুরু করে কিন্তু এই সব ঘোরালো ধরনের ঘড়ি চলতে শুরু করলেও সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র সব ওলট পালট করে দেবে। সোমবারকে করে দেবে শনিবার। মাসের আঠাশ তারিখকে করে দেবে এক তারিখ।

স্নেহ-মমতা দিয়ে জড়ানো সময় বড় দ্রুত পালিয়ে যায়। ন্যায্য দাম দিয়ে কেনা ঘড়ি বেশিদিন এক জায়গায় স্থির থাকে না। আমার এই আদিখ্যেতাপূর্ণ ঘড়িটিও একটি ট্রেন জার্নির সময় উধাও হয়ে গেল। কী করে গেল তা আমি জানি না। সম্ভবত আমাকে অপছন্দ করে ডানা মেলে নিজেই উড়ে চলে গেল যোগ্য কোনও হাতে।

অমন দামি একটা ঘড়ি হারিয়ে ফেলার জন্য বাবা আমাকে আর ঘড়ি কিনে দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। আমিও বেঁচে গেলুম।

তারপর থেকে আমি ঘড়ির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখিনি। সুখী জীবন ও বন্ধু লাভের উপায় আমি নিশ্চিত জেনে গেছি। আমি এখন খাঁটি ভারতীয়। আমি আজকাল ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাই, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত রোদ্দুরের রং বদল লক্ষ করি, শীত-গ্রীষ্মের ছোট-বড় রাত্রি-দিন অনুভব করি শরীর দিয়ে।

কয়েক শতাব্দী ধরেই ঘড়ি তৈরি করার জন্য সুইসরা সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। কেউ একজন মন্তব্য করেছিল, সেইজন্যই সুইজারল্যান্ড সময়ের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। আমার ঘড়ির সঙ্গে আড়ি, সেইজন্য সময়ের স্রোতে যখন-তখন হাবুডুবু খেতে আমার কোনও অসুবিধে হয় না!

তিন টুকরো আমি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

১। বিমানযাত্রা

পাইলট ! পাইলট ! বলে এক-একদিন ঘুমের মধ্যেও চেঁচিয়ে উঠে বসতুম। শব্দটা ছিল ম্যাজিকের মতো। শুনলেই শিরা টানটান, রক্তে জোয়ার, পেশীতে হিলিবিলি।

ওই অনেক ওপর দিয়ে, মেঘের ভিতরে বা সূর্যের গা ঘেঁষে গঙ্গাফড়িং-এর মতো প্লেনটা যে ভেসে যাচ্ছে তা দু হাতের পাতায় চোখ রোদ-আড়াল করে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মনটা কোথায় চলে যেত। মনশ্চক্ষে তখন পাইলটকে দেখতুম, রূপবান, রহস্যময়, শক্তিমান ও ভয়ংকর এক পুরুষ। তার চোখে কালো চশমা। তার পায়ের নীচে তুচ্ছ হয়ে পড়ে থাকে পাহাড় পর্বত, সমুদ্র তার কাছে গোষ্পদ। আকাশ ফেঁড়ে দুরন্ত ঝড়ের মতো সে উড়ে যায় দেশ দেশান্তর। সে ইচ্ছে করলেই বোমা ফেলতে পারে, ইচ্ছে করলেই বেড়িয়ে আসতে পারে চাঁদে, ইচ্ছে করলেই সে পারে সূর্যের গায়ে পাঁউরুটি সেঁকে নিতে। পাইলটকে কখনো ভাবতুম দস্যু মোহন, কখনো রবিন হুড। ম্যাজিশিয়ান, সার্কাসের খেলোয়াড়, রিং মাস্টার কুস্তিগীর ও মুষ্টিযোদ্ধা একসঙ্গে মিশিয়ে তবে একজন পাইলট। বরং তার চেয়েও কিছু বেশি।

একজন বন্ধু বলেছিল তার কাকা প্লেনের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেঘ ধরেছিল। মেঘ নাকি খুব ঠাণ্ডা, অনেকটা আইসক্রিমের মতো। কাছে থেকে প্লেন দেখেছিলুম প্রথম মালবাজারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কোনও একটি প্লেন কবে ভেঙে পড়েছিল একটা ছোট্ট জঙ্গলের মধ্যে। দোমড়ানো মোচড়ানো ছিটানো সেই প্লেনটির গায়ে তখন লতা বইছে, ঘাসজঙ্গলে ডুবে গেছে তার শরীর। করুণ সেই অবস্থা দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, এই জিনিস একদিন আকাশে উড়ত। তবু প্রতিদিন সেই জঙ্গলে ঢুকে প্লেনটাকে দেখে আসতে হত। নেশার মতো দাঁড়ায় অভ্যাসটা। রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতুম, কালো চশমা পরা দুর্দান্ত পাইলট এসে ভাঙা প্লেনটা স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে জোড়া লাগাল। তারপর সাঁ করে উড়ে গেল আকাশে।

সেইসব স্বপ্ন একদিন বাস্তবে নেমে এল। উত্তরবঙ্গের বছরওয়ারি বন্যায় সেবারও রেললাইন ভেসে গেছে, সড়ক ভেঙে পড়েছে, হারিয়ে গেছে ব্রিজ। কুচবিহারে জলবন্দী আমি ফিরব শিলিগুড়ি। তখন বেসরকারী একটি প্লেন কুচবিহার-শিলিগুড়ি ট্রিপ দিচ্ছে রোজ। ভাড়া মাথাপিছু পনেরো টাকা। টিকিট কেটে এয়ারোড্রামে হাঁ করে উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে আছি প্লেন আসবে তো ? অন্য কোথাও চলে গেল না তো ! আর এলেও আমাকে উঠতে দেবে তো ! শেষ অবধি কোনও গণ্ডগোল হবে না তো :

এল শেষ অবধি। প্রথমে দিগন্তে একটি মাছি, তারপর ফড়িং তারপর পাখি এবং সবশেষে এরোপ্লেনের আকার নিয়ে দুই প্রপেলারের নিদারুণ শব্দ করতে করতে জ্যান্ত প্লেন আমার চোখের সামনে নেমে পড়ল। চেহারা দেখে উৎফুল্ল হওয়ার মতো কিছু ছিল না প্লেনটার। পুরনো আমলের ডাকোটা। একটু নড়বড়ে লজ্ঝড়ে চেহারা। নামামাত্রই একদল কুলি দরজা খুলে দুমদাম ভিতরে মাল বোঝাই করতে লাগল। যাত্রীদের বলা হল, মাল ওঠার পর তারা উঠবে। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম অধীর আগ্রহে।

ককপিট থেকে একজন রোগা, ক্ষয়াটে চেহারার, খাকি ফুলপ্যান্ট আর সাদা হাফশার্ট পরা লোক নেমে এল। ডেলা পাকানো চোখ। চিনেবাদামওয়লার কাছ থেকে সে এক আনার বাদাম কিনে ফাউ চাইল এবং তাই নিয়ে একটু বচসাও করল বাদামওলার সঙ্গে।

আমার পাশে দাঁড়ানো এক যুবক মাড়োয়ারি আমার কানে ফিসফিস করে বলল, পাইলট! পাইলট!

পাইলট! যে-শব্দ শুনে শিশুকাল থেকে আমার রক্ত উদ্দাম হত এ সেই পাইলট! কোথায় এর কালো চশমা, দুরন্ত স্বাস্থ্য, রহস্যময়তা? পাইলট কি কখনও আমাদের মতো চিনেবাদাম খায়? ফাউ চায়? বিশ্বাস হল না। কী করে শিশুকাল-থেকে-দেখে-আসা স্বপ্নকে এ-রকম ভঙ্গুর বাসনের মতো চুরমার হয়ে যেতে দিই?

মাল উঠল। তারপর আমাদেরও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে উঠতে দেওয়া হল প্লেনে। ভিতরে ডাঁই হয়ে আছে তামাকপাতা, প্যাকিং বাক্স, বস্তা। বসার জায়গা বলতে প্লেনের দেয়ালে কয়েকটা ফোল্ডিং অ্যালুমিনিয়ামের ট্রে-র মতো। গদি বা সীট বেল্টের ব্যবস্থা নেই। যে যার মতো বসে পড়ো। সেই ডেলা-পাকানো চোখ, খাকি প্যান্ট রোগা ভোগা চেহারার লোকটাই ককপিটে উঠল। বিকট শব্দ করে প্লেনটা কিছুক্ষণ দৌড়ে একখানা তুর্কী লাফ মারল আকাশে। আমার পাশে বসা মাড়োয়ারি যুবকটি 'বাপ রে' বলে জানালার খাঁজ আঁকড়ে ধরল। আমিও ছিটকে পড়তে পড়তে সামনের একটা প্যাকিং বাক্স ধরে সামাল দিলুম।

বিমান আবিষ্কারের প্রথম যুগে বোধহয় এ-রকম অভিজ্ঞতা হত মানুষের। প্লেনের সর্বাঙ্গে ম্যালেরিয়া রুগীর মতো কাঁপুনি, নাটবল্টু এবং অন্যান্য নড়বড়ে যন্ত্রপাতির ধাতব আওয়াজ অসার যাত্রীদের মৃদু বা উচ্চকিত আর্তনাদ মিলেমিশে এক আতঙ্কিত বাতাবরণ। ডাঁই করা মালপত্র দড়ি দিয়ে আঁট করে বাঁধা হয়েছে মেঝেয় বসানো আংটার সঙ্গে, তবু ঝাঁকুনিতে সেগুলো হেলে পড়তে চাইছে। একটা ছোট প্যাকিং বাক্স খানিকদূর নেচে নেচে চলেও গেল।

তবু বলব প্রথম বিমানভ্রমণের থ্রিলও কিছু ছিল। ওপর থেকে পৃথিবীর চেহারা কখনও দেখিনি। সেদিন আকাশে ঝুলে থেকে দেখলাম সেই আশ্চর্য দৃশ্য। যা কত বড়সড় মনে হত তা কত ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। ওই তো তোরসা নদী, যার দাপটে কুচবিহার জলের তলায় কুঁকড়ে গেছে, তা নালার মতো ক্ষুদ্রকায় হয়ে পড়ে আছে নিচে, কী হাস্যকর রকমের খেলাঘর বলে মনে হল পিলখানাকে, সাইডিং-এ দাঁড় করানো একসার মালগাড়িকে দেখাল হেলেসাপের ছেড়ে যাওয়া খোলসের মতো।

মাত্র বিশ-পঁচিশ মিনিটের সেই ওড়া। মাত্র বিশ-পঁচিশ মিনিটই আমার আশৈশব-লালিত বহু ধারণার মিনার ভেঙে দিল কালাপাহাড়ের মতো। যখন শিলিগুড়ির বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নামলুম তখন আমি অন্য মানুষ। বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যেন প্রাপ্তবয়স্ক, অভিজ্ঞ, বিষণ্ণ।

শুনতে পাই, সেইসব পুরনো ডাকোটা এখন আর চালু নেই। সম্ভবত, নেই সেইসব পাইলটও। কুচবিহারের সেই ক্ষুদে এয়ারপোর্ট কবে বন্ধ হয়ে গেছে, এখন সেখানে সম্ভবত, ধান চাষ হয়। তবে আমাকে তার পরে আরও বহুবার প্লেন-এ চড়তে হয়েছে। বোয়িং ৭৩৭ বা এয়ারবাস। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সুগন্ধী অভ্যন্তর, নরম গদি, মৃদু বাজনা, স্মার্ট বিমানসেবিকা, শব্দহীন পরিবেশ, চা, কফি ও স্ন্যাকস—সব-মিলিয়ে একটা বেশ সুসভ্য বড়লোকী ব্যাপার। একটু উটকো, গেঁয়ো, আগন্তুকের মতো বসে থাকি। কিছুতেই যেন আমার সঙ্গে এইসব প্লেন-এর কমিউনেকশন বা রাপোর্ট হয় না।

তবে, একবার হল। গৌহাটি থেকে কলকাতায় ফেরার পথেই বুঝি। আকাশে প্রচণ্ড মেঘ ছিল। বোয়িং স্বচ্ছন্দে উঠে গিয়েছিল মেঘস্তরের ওপর সূর্যালোকিত আকাশে। কিন্তু তলায় মেঘ থাকলে বায়ুস্তরে অসমান নানা ফাঁকফোকর সৃষ্টি হয়। ফলে আধুনিক বোয়িং অবিকল হুবহু গ্রাম্য রাস্তায় গরুর গাড়ি যেমন ঝকাং ঝকাং করে লাফায় তেমনি লাফাতে লাগল। তার সারা গায়ে ম্যালেরিয়া কাঁপুনি, মচমচ শব্দ। যাত্রীদের অনেকেই ওয়াক তুলে ফেলতে লাগলেন। একজন সুবেশা এয়ার হোস্টেস খাবারের প্যাকেট নিয়ে যেতে যেতে ব্যালান্সের খেলায় হার মেনে আমার গায়ে এবং পাশের দুটি খালি সীটের ওপর সবকটা প্যাকেট বর্ষণ করে নিজেও বর্ষিত হলেন তার ওপর। একবার 'সরি' বলার মতোও শারীরিক অবস্থা নয়। শুধু আমাদের দিকে চেয়ে করুণ মুখে মাথাটা নাড়লেন। সেদিন প্লেনের বেয়াদবি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, নিজের কোলে পড়ে-থাকা খাবারের প্যাকেটটি তুলে পাশের সীটে রেখে দেওয়ার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত আমার ছিল

না। প্লেন তখন সেকেণ্ডে আট-দশ ফুট করে হাই জাম্প, লং জাম্প দিচ্ছে। কখনো দুলছে দোলনার মতো। এক-একবার প্রবল তাড়নায় মনে হচ্ছে, দু'আধখানা হয়ে ভেঙে পড়ে যাবে আধুনিক বোয়িং ৭৩৭। সীট বেল্ট কষে আঁটা থাকা সত্ত্বেও ভয় হচ্ছে, এবার ছিটকে পড়ে যাবো।

কিন্তু আশ্চর্য এই, আমার তেমন খারাপ লাগছিল না। জীবনে প্রথম প্রেমের মতো আমার ভিতরেও একটি দুর্বলতা নিজের অজান্তেই থেকে গেছে। কুচবিহার থেকে যে-লজঝরে পুরনো আমলের মালবাহী ডাকোটা আমাকে প্রথম মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটিয়ে আকাশে তুলেছিল তার সঙ্গে কী করে যেন আমার একটা স্থায়ী কোমল হৃদয়াবেগের সম্পর্ক থেকে গেছে। থেকে যে গেছে তা টের পেলুম এই এতদিন পর, অসমান বায়ুস্তরে নাজেহাল বোয়িং বিমানে বসে।

কুচবিহারের সেই প্লেনটা ছিল নিতান্তই গরীব-দুঃখী শ্রেণীর। হতাদর সেই বিমান তামাকপাতা আর প্যাকিং বাক্স বয়ে বয়ে ইজ্জত হারিয়েছে। তার মধ্যবিত্ত পাইলট নিতান্তই পকেটের জোর নেই বলে চিনেবাদাম কেনে এবং ফাউ না পেলে ঝগড়া করে। সেই প্লেন এবং তার পাইলট আমার সযত্নে রচিত এক স্বপ্নকে ভেঙে দিয়েছিল বটে, কিন্তু ছাপোষা গেরস্তঘরের বয়ঃসন্ধির এক বালকের হৃদয়কে চমকে দেয়নি ঝা-চকচকে মহার্ঘ্য সম্ভার দিয়ে। তার সঙ্গে আমার শ্রেণীবৈষম্য ছিল না। তাই স্বপ্নভঙ্গ ঘটে থাকলেও সেই বিমান ও তার পাইলটের সঙ্গে আমার এক সহানুভূতির যোগসূত্রও রচিত হয়ে গিয়েছিল নিজের অজান্তে। বোয়িং বিমানের ওলটপালটের মধ্যে বসে সেটা স্পষ্ট টের পেলুম। স্পষ্ট টের পেলুম, আমার ভিতরে পুরনো সেই ডাকোটা প্লেনটা হেসে খুন হচ্ছে, হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে খেতে বোয়িং ৭৩৭-টাকে বলছে, এখন কেমন, অ্যাঁ ? খুব তো ফুটুনি মারছিলে, এখন কেন নাকের জলে চোখের জলে ?

পৃথিবীর যে-কটি ডাকোটা আজও অবশিষ্ট আছে তারা আজ অধোবদন, ম্লানমুখ। অতি গোপনে আকাশের সংকীর্ণ গলিপথ দিয়ে আজও তারা বিড়ি বা তামাক পাতা নিয়ে ওড়াউড়ি করে। তাদের ওড়ায় চিনেবাদামখেকো, রোগা ও গরীব পাইলট। একদিন গোপনে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে তারা নিঃশব্দে বিদায় নেবে। গগনবিদারী নতুন নতুন সব প্লেন ছেয়ে ফেলবে পৃথিবীর আকাশ। সেদিন অখ্যাত অজ্ঞাত সব এয়ারপোর্টে বিড়ির বাণ্ডিল আর তামাকপাতা বোঝাই হবে বোয়িং আর এয়ারবাসে। পাইলটরা চিনেবাদাম খেতে খেতে উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তে চেয়ে থাকবে।

পৃথিবীর এ-রকমই নিয়ম।

২। এক নম্বর ও দু'নম্বর আমি

আমার সঙ্গে আমার দেখা হয় রাত বারোটার পর। এই যে এক নম্বর আর দু'নম্বর আমি, এদের মধ্যে একজন অবিকল আমার মতো সাদামাটা। তার নাকটা উঁচু এবং বাঁকা, দাঁত সামান্য বড়, জুলজুলে ভীতু-ভীতু চোখ, মাথায় পাতলা হয়ে আসা চুল, কোলকুঁজো, একটু ক্যাবলা, একটু আত্মসচেতন, একটু হীনম্মন্য, অবশ্যই আনস্মার্ট। আর-একজন আমি দেখতে রীতিমতো ভাল। তার নাক উঁচু হলেও বাঁকা নয়, দাঁত চমৎকার সাজানো, চোখে বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি, সটান এবং সবল চেহারা, মাথায় ঘন কেশদাম। এই পার্থক্য সত্ত্বেও আমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ চমৎকার।

১৯৫৬-তে এক নম্বর আমির নাকের ডগা দিয়ে দু'নম্বর আমি রোম অলিম্পিকে গিয়ে দৌড়ে এবং লাফ-এ পাঁচটি সোনার মেডেল নিয়ে এসেছিল। পাঁচটিই বিশ্বরেকর্ড। ১৯৫৭ থেকে সে টানা আটবার জয় করে উইমবলডন সিঙ্গলস টেনিস খেতাব, এর মধ্যে পাঁচবার গ্র্যাণ্ড স্লাম। তারপর থেকেই দু' নম্বর আমির মাথায় চাপে পলিটিকস। পায়ে হেঁটে সে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ায় এবং হাজার হাজার লোকের সঙ্গে তার আঁতাত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে নিজেদের লোক বলে চিনতে পারে। ফলে ষাটের দশকের কোনো এক বছর সে তার দল নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়ায় এবং বিপুলভাবে জয়ী হয়। সেই জয় এমনই নির্মম যে বিরোধী পক্ষের একজনও সংসদে নির্বাচিত হতে পারেনি। সে তখন নিজের দলের পাঁচজন এম পি-কে পদত্যাগ করায় এবং সেই জায়গায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পাঁচজন বিরোধী নেতাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করিয়ে আনে।

মোটকথা তার আধিপত্য ছিল নীরেট ও সম্পূর্ণ। এই দু' নম্বর আমি কিন্তু একজন ব্যর্থ প্রেমিক। না, যথার্থ ব্যর্থ প্রেমিক বলতে যা বোঝায়, সে কোনওদিনই তা নয়। তার জন্য অড্রে হেপ বার্ন থেকে শুরু করে হেমা মালিনী বা আরও সব সুন্দরীরা পাগল। কিন্তু সে নিরুত্তাপ। জন্ম-রোম্যান্টিক হওয়া সত্ত্বেও সে জানে, প্রেমিকাকে বউ করতে নেই। সে তো গাড়ল নয়। দীর্ঘদিন যাবৎ এই দু' নম্বর আমির বয়স দাঁড়িয়ে আছে চব্বিশে। দেশের সে তরুণতম প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বের তরুণতম পথ প্রদর্শক। লেখক হিসেবে একবার, শান্তির দূত হিসেবে একবার এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়ার জন্য আর-একবার—এই মোট তিনবার সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে। তার আমলেই ভারত হয়ে দাঁড়াল বিশ্বের বৃহত্তম শক্তি। প্রতিটি ভারতীয়ই হল লক্ষ বা কোটিপতি। তার আমলে খুন জখম রাহাজানি দাঙ্গা নারী ধর্ষণ চুরি ঘুষ ভেজাল করফাঁকি কালোটাকা লালফিতা মূল্যবৃদ্ধি ধর্মঘট লকআউট ক্লোজার মিছিল বিক্ষোভ আত্মহত্যা কলেরা বসন্ত মহামারী ক্যানসার করোনারি ও সেরিব্রাল থ্রম্বসিস বিমান-রেল-বাস দুর্ঘটনা ঘাটতি বাজেট ঝগড়া মারপিট গালাগাল অপমান মাতলামি বেশ্যাবৃত্তি জনসংখ্যাবৃদ্ধি গুণ্ডামি সমকাম পশুহত্যা ইত্যাদি সম্পূর্ণ লোপ পেল। সারা দেশে অখণ্ড শান্তি আর সমৃদ্ধি। ভারতের ক্যামেরা, ভারতের লাইটার, ভারতের কলম, ভারতের মোটরগাড়ি, জাহাজ, ফ্রিজ, টিভি, ভারতের যুদ্ধাস্ত্র বা বস্ত্রসম্ভার বিদেশে এতই সমাদৃত যে সেই বিপুল চাহিদা পূরণ করায় উপায় নেই। দু' নম্বর আমি শুধু নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করেই শান্ত থাকেনি। তার দূত গিয়ে আফ্রিকার রাজ্যে রাজ্যে বিপ্লব ঘটিয়েছে, স্থাপন করেছে গণতান্ত্রিক প্রগতিমুখী শাসনব্যবস্থা, এনেছে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি। দু'নম্বর আমি হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে ড্রিলিং করে অফুরন্ত তেলের সম্ভার আবিষ্কার করেছে, সন্ধান মিলেছে বিকল্প শক্তির উৎসের। নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বন্যা ও খরা।

রাত বারোটার পর বাড়ি ও পাড়ায় ঘুম নেমে আসে। সারাদিন নানা উঞ্ছবৃত্তি ও পরিশ্রমের পর আমি আমার টেবিলের সামনে এসে বসি। ছোট বাতি জ্বেলে মশা তাড়াতে তাড়াতে চুপচাপ চেয়ে থাকি। সারা দিনরাতের মধ্যে এইটুকুই আমার নিজস্ব সময়। এই দুর্লভ অবকাশটুকু পাওয়ার জন্য রোজ আমি ঘুম চুরি করি। এই রাতের নির্জনতায় দু'নম্বর আমি এসে মুখোমুখি বসে। তার মুখে চোখে কোনও ক্লান্তির ছাপ নেই, বয়সের কুঞ্চন নেই, নিষ্প্রভতা নেই। চব্বিশ বছরের পর তার আর বয়স বাড়েনি বলে এখনও সে কান্তিতে উজ্জ্বল। তার ভাবনাচিন্তাগুলিও অন্যরকম। ঘর সংসার বেতন বা কোনওরকম স্বার্থচিন্তা তার মাথায় আসে না। তার মাথায় কেবল বড় বড় চিন্তা। সেইসব চিন্তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। একমাত্র আমার সঙ্গেই তার ব্যক্তিগত স্তরে কিছু ভাবনার আদানপ্রদান ঘটে থাকে।

আজ দু'নম্বর আমি আমাকে আচমকা প্রশ্ন করল, তোমার বয়স কত?

আমি আমতা আমতা করে বললুম, কেন, তুমি কি জানো না?

না। কারণ তোমার সঙ্গেই আমার জন্ম। আমাদের একবয়সীই হওয়ার কথা। কিন্তু তুমি আমার বয়স বাড়তে দাওনি। চব্বিশ বছরে ঠেকে থেকে আমি কিছুতেই বোঝার বয়স আন্দাজ করতে পারছি'না।

তাহলে তোমার আর তা জেনে কাজ নেই। বয়স বলে সত্যিই কি কিছু আছে? বয়স একটা আজগুবি ধারণা মাত্র। একটা উটোপিয়া। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, বছর এসব কিছু নেই। মহাকাশে গিয়ে দেখ, সেখানে সূর্য নেই, দিন নেই, রাত নেই। সেখানে তোমার সময়ের হিসেব অচল।

দু' নম্বর আমি ভ্রূ কুঁচকে চিন্তিতভাবে আমার দিকে চেয়ে ছিল। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। সে টেবিলের ওপর থেকে পেপারওয়েটটা তুলে নিয়ে একটু নাচাতে নাচাতে বলল, তার মানে তোমার বয়স হচ্ছে, এবং বয়সকে তুমি ভয় পাচ্ছো।

মাথা নেড়ে দৃঢ় গলায় বললুম, আমি বয়স মানি না।

সে অপলক চোখে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুমি বয়স মানো না। তুমি আমাকে চব্বিশ বছর বয়সে স্থির রেখেছো। কিন্তু মুশকিল কি জানো? বয়স না মানলেও তুমি একদিন বুড়ো হয়ে মরবে, আর তুমি যেদিন মরবে সেদিন আমারও মৃত্যু। তোমার মৃত্যুর পর কেউ

আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

তুমি কি আমার চেয়েও বেশি আয়ুষ্মান হতে চাও ?

নয় কেন ? আমার দিকে চেয়ে দেখ। এত সুন্দর ও সফল পুরুষ তুমি কি আর দেখেছো এ জীবনে ?

না। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, তোমার চেয়ে সুন্দর সফল ও সিদ্ধকাম কেউ নেই।

তাহলে তোমার সঙ্গেই আমাকে মরতে হবে কেন ? আমি অপুষ্টিতে ভুগি না, আমার রক্তচাপ, হৃদযন্ত্র, লিভার, পেট সবই খুব ভাল কণ্ডিশনে আছে। আমার জগতে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নেই, সবই আমি দূর করে দিয়েছি। আমার জীবনে কোনো দুঃখ নেই, দুশ্চিন্তা নেই। জরা আমাব কাছ থেকে এখনও বহু দূরে। তবে কেন আমাকে তোমার সঙ্গেই সহমরণে যেতে হবে ?

আমি তোমার মৃত্যু চাই না।

সেক্ষেত্রে তোমাকেও অমর হতে হয়।

আমি সামান্য ধরা গলায় বলি, আমি নিজে অমর নই বলেই তোমাকেই অমর করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু তা বোধহয় হওয়ার নয়। আমি কোনও ব্যাপারেই তোমার সমকক্ষ নই, শুধু ওই মৃত্যুর লগ্নটিতে তুমি আর আমি এক। না চাইলেও।

তাই বা কেন ?

আমি তার দিকে করুণ চোখে চেয়ে থেকে বলি, তুমি কেন বহুদিন বেঁচে থাকতে চাও ?

আমি যে বেঁচে থাকাটাকে প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করি। কী শান্তি, কী স্বস্তি, কী সমৃদ্ধি, কী সৌন্দর্য চারদিকে। কী অগাধ আনুগত্য আমার প্রতি সকলের ! আমার অঙ্গুলিহেলনে রাষ্ট্রের বা ব্যক্তির উত্থান পতন। কী খ্যাতি, কী ক্ষমতা আমার ! এই উজ্জ্বল জীবন ছেড়ে কে যেতে চায় বলো !

আমি করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর বলি, তোমার আর কী কাজ বাকি আছে বলতে পারো ?

সে আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বলে, আমার কাজ ? না, আর কী কাজ বাকি থাকবে ? দেশ ও দেশান্তরে যা কিছু সমস্যা ছিল সবই আমি সমাধান করেছি।

আমি বললুম, তাহলে বেঁচে থাকতে চাও কেন ?

বেঁচে থাকতে চাই বেঁচে থাকার জন্যই। আমি আবার অলিম্পিকে দৌড়োবো, আবার উইম্বলডন জিতব, আবার...

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমার নতুন কিছু করার নেই ?

নতুন ! হ্যাঁ, নতুনই তো। নতুন করে আমি আবার সব শুরু করব। বাচ্চারা যেমন খেলাঘর ভেঙে দিয়ে ফের গড়ে।

তোমার নতুন কোনও জয় বাকি নেই ?

জয়ের কি শেষ আছে ?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। দু' নম্বর আমি বুঝতে পারছে না যে, তত্ত্বগতভাবে তার মৃত্যু ঘটে গেছে। তার আর কাজ নেই, আর জয়ের কিছু নেই।

কিন্তু এক নম্বর আমির অনেক কাজ। এক নম্বর আমি আজ পর্যন্ত কিছুই জয় করে উঠতে পারেনি। তবে ধুকধুক করেও সে এখনও বেঁচে আছে।

৩। রিভলভার

কেউ বিশ্বাস করবে না জানি, তবু সত্যি কথা বলতে কি, আমি আগে বেশ নিরীহ মানুষ ছিলুম। ঝগড়া, কাজিয়া, গণ্ডগোল, মারপিটে কক্ষনো যেতুম না। একদিন হল কি, কে যেন আমার বৈঠকখানার জানালা গলিয়ে রাতের বেলা একখানা রিভলভার ফেলে গিয়েছিল। সকালে উঠে সেই রিভলভারটা দেখে অবাক হয়ে আমি সেটা হাতে তুলে নিলুম। আশ্চর্য এই যে, সঙ্গে সঙ্গে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল, মনে অদ্ভুত একটা কাঠিন্য এসে গেল। হঠাৎ খুব হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে উঠলুম।

তারপরই গুড়ুম গুম। গুড়ুম গুম। গুড়ুম গুম। আমার রিভলভারের গুলিতে এখানে সেখানে লাশ পড়ে যেতে লাগল। আমাকে দেখলেই লোকে আতঙ্কে পালায়। হাটে বাটে মাঠে সকলেই বিনীতভাবে পথ ছেড়ে দেয়। আমার কৃপাদৃষ্টিতে থাকার জন্য ভেট দিয়ে যায়।

কিন্তু এসবের মূলেই কিন্তু ওই রিভলভারটা। নইলে আমার স্ত্রীকে বা আমার বাবা মা ভাই বোনকে জিজ্ঞেস করলেই আপনারা জানতে পারবেন, আমি মানুষ হিসেবে মোটেই খারাপ নই। আমি ভারী নিরীহ, বিনয়ী, অহিংস মানুষ। কিন্তু ওই রিভলভারটিই আমাকে হিংস্র করে তোলে। যুক্তি পরম্পরায় বিচার করলে দেখা যাবে, আমি যে-ক'জন লোককে খুন করেছি তাদের একজনেরও মৃত্যুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নই। দায়ী ওই রিভলভারটা। খুন সেই করে, আমি নিমিত্তমাত্র, কেবল নলটা তাক করে ঘোড়া টিপে যাই।

যাই হোক সকলেরই উঠতি পড়তি আছে। আমার রিভলভারটিরও। হল কি, একদিন একটা ঝা-চকচকে স্টেনগান আমার হাতে চলে এল। বেশ জিনিস। ধকল কম। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বেরোয়। আজকাল আমি স্টেনগানটা নিয়েই ঘুরি। রিভলভারটা তাকে তুলে রেখে দিয়েছি।

একদিন দেখি আমার স্ত্রী রিভলভারটার বাঁট দিয়ে দেয়ালে মশারির পেরেক ঠুকছে। আমি দেখেও কিছু বললাম না। যাক, কাজে তো লাগছে। আর একদিন রিভলভার দিয়ে আদা থেঁতো করা হল, তাও দেখলাম। তারপর একদিন আমার ছেলে সেটা নিয়ে খেলা করতে লাগল। আমি তাতেও বাধা দিলাম না।

একদিন দেখলুম, আমার প্রতিবেশী রামবাবু এবং শ্যামবাবু প্রচণ্ড ঝগড়া করছেন। রামবাবু নাকি শ্যামবাবুর জমির খানিকটা নিয়ে দেয়াল গেঁথেছেন। ঝগড়া লাগলেই আমি মধ্যস্থতা করতে এগোই। সালিশী হিসেবে আমি প্রায় অপরিহার্য। আমাকে সবাই ভয় খায় এবং মানে। দু'পক্ষের নালিশ শুনে আমি রামবাবুকে বললুম, কাজটা ঠিক করেননি, তবে কী আর করা, শ্যামবাবুকে কিছু টাকা দিয়ে দিন। এতে রামবাবু খুশি হলেন না। রাত্রিবেলা চুপি চুপি আমার কাছে এসে বললেন, শ্যাম আমার নামে মামলা ঠুকবে বলেছে। ভীষণ পাজি। ওকে কি করে টিট করা যায় বলুন তো!

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, টিট করতে চান?

চাই।

আমি উদারভাবে হাসলাম। রিভলভারটা ফালতু জিনিসের মতো পড়ে আছে। ওটা তাক থেকে নিয়ে এসে রামবাবুর হাতে দিয়ে বললাম, খুব ভাল জিনিস। পঞ্চাশটা টাকা দিলেই হবে।

রামবাবু রিভলভার নিয়ে চলে গেলেন। গভীর রাত্রে একটা শব্দ শুনলুম, গুড়ুম।

হাঃ হাঃ করে খুব হাসতে লাগলুম আমি। খুব হাসতে লাগলুম।

শশধর, হাক্‌সলি অ্যান্ড গুজ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বেঁচে থাকার যাচ্ছেতাই একটা একঘেয়েমি আছে। বাঁচতে-বাঁচতে আমার সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীটাও বুড়িয়ে যাচ্ছে। সেই একই আকাশ, একই বাতাস। চারপাশে একই রকম ঘর-বাড়ি, মানুষ-জন। সকাল, বিকেল, রাত। আবার সকাল বিকেল রাত। চাকা ঘুরেই চলেছে, ঘুরেই চলেছে। তেল দাও আর না-ই দাও।

যখন বালক, তখন একরকম। নতুন চোখে পৃথিবী দেখা। কল্পনার ঘোড়া ছুটছে। ছোট ছোট চাহিদা। বড় বড় স্বপ্ন। শিকারী হব। ভূপর্যটক হব। খেলোয়াড় হব। পাইলট হব। গোয়েন্দা হব। এমন কিছু করতে হবে যা কেউ কখনও করেনি। অভিভাবকদের ছাতপেটাই সহ্য করে নিতে পারলে, জীবনের ওই অবস্থাটা নেহাত মন্দ নয়। পৃথিবীর ভাসমান রূপে মুগ্ধ। আলোর খেলা। অন্ধকারের খোঁজখবর কে রাখে। ওই জীবনে চোর, জোচ্চোর, বাটপাড়, অকৃতজ্ঞ, মামলাবাজের অস্তিত্ব নেই। একমাত্র ভয় বছরে বার-তিনেক পরীক্ষায় বসা। পাস ফেলের আতঙ্ক। তাছাড়া বেশ স্বাধীন জীবন। রোজ সকালে পড়ি কি মরি করে জীবিকার হাতল ধরার জন্যে নাকে মুখে গুঁজে, কাছা কোঁচা খোলা অবস্থায় ছুটতে হয় না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাক পাখির মত ফুরফুরে মুক্ত জীবন। লাট্টু, লেত্তি, ঘুড়ি, লাটাই, মাঞ্জা, ফুটবল,, টেনিসবল, রহস্য রোমাঞ্চ নিয়ে অদ্ভুত এক হিংসে করার মত জীবন। ফেলে আসা শৈশবের কথা ভাবলেই মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কেন মরতে ধেড়ে হলুম। আমি কী আর ইচ্ছে করে হলুম। হইয়ে দিল। পক্ব কেশ, বাতের ব্যথায় কোমর সোজা হয় না। মাথায় দুশ্চিন্তার মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। ঝাপটা মারলেও যেতে চায় না। তেড়ে তেড়ে আসে। লক্ষপ্রকার দায়দায়িত্ব। ট্যাক্‌স, বিল, ভাড়া, লাইসেন্‌স। পাশ বইয়ে পাঁচটা শূন্য থাকলেও, মন কিন্তু সদাসর্বদাই তুবড়ে থাকবে। লাইফ হেল। হাসতে গেলে মুখে কান্নার ভাঁজ। বিছানায় শুয়ে আড়াই হাজার ভেড়া গুনলেও চোখ বুজে আসার আগেই কাজের মহিলার কর্কশ কড়া নাড়া। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে ভাগাড়ের জ্যান্ত মড়া আর শকুনের সম্পর্ক। দেহি, দেহি। স্কুলের মাইনে দাও। গৃহশিক্ষকের প্রণামী দাও। শাড়ি দাও, মাসোহারা দাও। এন্টারটেনমেন্ট ট্যাক্স দাও। খাবলে খুবলে স্কেলিটন বের করে দেবার জন্য সব তেড়ে আসছে। পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। মুখ সব তোলো হাঁড়ি হয়ে যাবে। টেবিলে জলের গেলাস নামবে হিরোসিমায় অ্যাটমবোমার শব্দে। একাক্ষরে কথা চলবে, হুঁ আর না।

যৌবন হল বাল্য আর বার্ধক্যের মাঝে পড়ে থাকা সবুজ উপত্যকা। ভবিষ্যতের ভাবনা আছে। ঘোড়া একটা ধরতেই হবে। টগবগে ওয়েলার হলে কথা নেই, বেতো হলে মন্দের ভালো। সারাটা পথ পয়দালে মারতে হলে যৌবনেই জীবন্মৃত। যৌবনে বেশ পাকা হাতে স্টিয়ারিং ধরতে না পারলে সোজা গাড্ডায়। কেউ তখন টেনে তুলবে না। অন্তত বাঙালিকে তোলার মত বাঙালি বিরল। বড় জোর দুটো জ্ঞানের কথা ছুঁড়ে দেবে। ঠিক হয়েচে ব্যাটা, যেমন কর্ম তেমন ফল।

তবু যৌবন হল জীবনের কোকিল। কুহু তানে ভরপুর। একটা প্রেমিক প্রেমিক ভাব। ছন্দ মিলুক না মিলুক দু'চার চরণ কবিতা আসবেই। যে-কোনও নাটক মঞ্চে একবার ঠেলে তুলবেই। অসমাপ্ত হলেও জীবনরসে ভরপুর একটা নভেল খাতা ঝাড়লে খোঁড়া আরসোলার মত খসে পড়বে। যৌবন তেড়েফুঁড়ে একই সঙ্গে বিভিন্ন পথে জলের মত প্রবাহিত হতে চায়! আধখেচড়া একটা প্রেমের ব্যাপারও থাকা অসম্ভব নয়। যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে? পাখির যেমন পালক, বেড়ালের যেমন গোঁফ, চোখের যেমন পলক, যৌবনের তেমনি প্রেম। একালে

বেশির ভাগ প্রেমই ছাঁদনাতলায় গিয়ে শেষ হয়। প্রেম আর সার্জারি, দুটো জিনিসেরই এযুগে খুব উন্নতি হয়েছে। একশোটা অপারেসানে নিরানব্বইটা সাকসেসফুল। প্রেমে সাফল্যের হার শ'য়ে শ' না হলেও ফিফটি-ফিফটি তো বটেই। সে-যুগে ছিল মেডিসিন। দাওয়াই দিয়ে ব্যামো সারাবার চেষ্টা চলত। প্রেমরোগের দাওয়াই ছিল আড়ং ধোলাই। অভিভাবকদের বিদঘুটে মেজাজ ছিল। দেউড়ির ভোজপুরী দারোয়ানের মত। ইংরেজ পুলিস-সার্জেনদের মত। মেয়ে যদিওবা প্রেমিকা হল, মেয়ের পিতা যেন কবিরাজী পাঁচন। অবাক হয়ে ভাবতে ইচ্ছে করত, অমন বাপের এমন মেয়ে হয় কী করে। যেন দৈত্যকুলে স্ত্রীলিঙ্গ প্রহ্লাদ। সে যুগের শ্বশুর দেখলে বিয়ের ইচ্ছে মাথায় উঠত। স্বাধীন হবার এই বছর তিরিশ পরে দেশজুড়ে প্রেমের একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানের যেমন উন্নতি হয়েছে, প্রেমেরও সেইরকম উন্নতি হয়েছে। সেকালের প্রেম ছিল জন্‌ডিসের মত। ধরলে রুগী হলদে মেরে যেত। সবাই অনুভব করত ছোকরার একটা কিছু হয়েছে। তোড়ে কবিতা নামছে ড্যাম ফাটা জলের মত। দৃষ্টি এ-জগতে নেই। তখন মালার খোঁজ পড়ত। দৈব মালা নয়। জুতোর মালা। সে-যুগে প্রেম আর ভূত একই কায়দায় ছাড়ানো হত। প্রেম থেকে ছাঁদনাতলার ঘটনা দু'একটা ঘটত না যে তা নয়। প্রবীণ, প্রবীণারা প্রেমিকদম্পতিকে ছিছিক্কার করতেন। আর নবীনরা দিতেন নায়ক-নায়িকার সম্মান। মেয়ের অভিভাবক মেয়েকে আর ছেলের অভিভাবক ছেলেকে বিদ্রোহী হবার অপরাধে নড়া ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিতেন। তাতে প্রেমের ভাবমূর্তি আরও বেড়ে যেত। ফুটবল ম্যাচ জেতার পর বিজয়ীদলকে যেমন শিল্ড দেবার প্রথা চালু আছে, উপায় থাকলে সেইরকম একটা কিছু দেওয়া হত। কিছু না হোক একটা সংবর্ধনা।

একালে প্রেমের আর সে-জলুস নেই। দ্বাদশবর্ষীয় বালক-বালিকারা বলছে, আমার লাভার। চার্মটাই নষ্ট হয়ে গেছে। পার্কে, গঙ্গার ঘাটে, মাঠে-ময়দানে জোড়ায় জোড়ায় দিবসরজনী কেজি-কেজি চীনেবাদাম খেয়ে ফোঁস ফোঁস দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ রেখে, পুলিস আর ছেনতাই পার্টির তাড়া খেয়ে প্রেমকে ভয়ঙ্কর চিপ করে ফেলেছে। সেই টনটনে রোমান্‌স আর নেই। প্রেমের এখন ইংরেজী নাম হয়েছে পারমিসিবিলিটি, ফ্রী সেক্‌স। মনের চেয়ে হুমদো দেহ বড় হয়েছে। সেই চির প্রেমিক-প্রেমিকা রাধা-কৃষ্ণ এখন হীনপ্রভ। বৈষ্ণবপদাবলী অপাঠ্য।

প্রেমের গল্প, প্রেমের উপন্যাস, কবিতা বস্তা বস্তা লেখা হয়; কিন্তু শেষের কবিতা হয় না। রেমার্কের থ্রি কমরেডস হয় না। আঁদ্রে মারোয়ার ক্লাইমেটস অব লাভ হয় না। হ্যামসুনের প্যান হয় না। প্রেমে হাঁপানির অনুপ্রবেশ, রাজনীতি, ট্রেড ইউনিয়নের খোঁচা। মিলনের পথে আয়ান ঘোষ নয়, বাধা হয়ে দাঁড়ায় জীবিকা, বাসস্থান, অর্থনীতি। প্রেম ধরে টান মারার সঙ্গে সঙ্গে পুরো সোসিও-ইকনমিক স্ট্রাকচার শিকড় সমেত উঠে চলে এল। দেবদাস এখন ব্যঙ্গের পাত্র। অমিতের পপুলারিটি সেকালের চেয়ে একালে বেড়েছে না কমেছে গবেষকরা বলতে পারবেন। একালের প্রেম তিন রকম, উপন্যাসের প্রেম, বাংলা ছায়াছবির প্রেম, আর হিন্দি ছায়াছবির প্রেম। ইংরেজী উপন্যাস আর ছায়াছবি থেকে প্রেম উবে গেছে। আছে সেক্‌স আর ভায়োলেন্‌স। বাংলা উপন্যাসের চরিত্রদের সোস্যাল স্ট্যাটাস আর আগের মত নেই। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের অবস্থা, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। এধারে এক জোড়া, ওধারে এক জোড়া বাপ-মা। এ-সংসারের হাল ধরে আছে ছেলে, ও-সংসারের হাল ধরে আছে মেয়ে। মেয়ের বিয়ে করা মানে সংসার লাটে ওঠা। ছেলের বিয়ে মানে হালে পানি না পাওয়া সংসারে বাড়তি চাপ। বোনের বিয়ে হয়নি। বেকার ভাই। পিতার শ্বাসকষ্ট। মায়ের বাত সহযোগে অ্যানিমিয়া। এই পরিস্থিতিতে প্রেমিক-প্রেমিকার অপরাহ্ণ মিলন। বসে বসে পায়ের কাছে ঘাস ছেঁড়া আর আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁতে কাটা। ব্যাকগ্রাউন্ডে রাজনৈতিক মিছিল। স্লোগান। নেতার বক্তৃতা। নায়কের দীর্ঘশ্বাস—আর কতকাল। নায়িকার দীর্ঘশ্বাস—আর কতকাল। এরই মাঝে অফিস-বস ভিলেনের চেহারা নিয়ে মূল কাহিনীতে ঢুকে পড়তে পারে। মাপা ডোজে সেক্‌স না ছাড়লে বই বিকোবে না। বড়লোকের দামড়া ছেলে ছায়া ফেলতে পারে। নায়িকার হঠাৎ বিয়ে হয়ে যেতে পারে। অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে নায়িকা বলতে পারে, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না

প্রসূন। কাহিনী তখন ট্র্যাজেডির দিকে মোড় নেবে। নায়ক সারাজীবন বিয়ে না করে অন্যের বিয়ে দিয়ে বেড়াবে। জীবনে আর একটি মেয়ে আসতে পারে। নায়ক তখন নারীবিদ্বেষী। শেষ মুহূর্তে চরম কথাটি বলবে রাতের গঙ্গার ধারে—প্রেম বলে কিছু নেই সীমা। সবই হল দেহ আর অর্থ। সীমার চোখে হাপুস জল—কী বলছ তুমি প্রসূন। ডবল ট্র্যাজেডি অথবা ট্র্যাজেডির দ্বিতলিকা। ব্রেকডাউন স্টেটবাসের মত কাহিনীর সমাপ্তি। সিনেমা সচেতন ঔপন্যাসিক এই ফর্মুলায় আরও মালমশলা ঢোকাতে পারেন। একটা প্রেমের ত্রিভুজ তৈরি করতে পারেন। কোনও নেতাকে এনে রাজনীতির ঝলক ফেলতে পারেন। রাজনীতির সঙ্গে মাস্তান আসবেই। যেমন কান টানলে মাথা। এ-ফর্মুলা পাবলিক খাবেই। বছর না ঘুরতেই রুপোলি পর্দায়। সিনেমার কল্যাণে স্টোরির খোল নলচে পাল্টে যাবে এবং অবধারিত ফ্লপ।

হিন্দি সিনেমার ফাউন্ডেশানই হল প্রেম। একটা ছাঁচ একবারই তৈরি হয়েছিল। সেই ছাঁচেই যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার ছবি ঢালাই হয়ে আসছে। নায়ক ধনী হলে নায়িকা গরিব। নায়িকা বড়লোক হলে নায়ক গরিব। প্রথম সাক্ষাতে একটা খিচিমিচি হবে। হয় নায়িকার ডিলুক্স সিডানের তলায় নায়ক, আর তা না হলে নায়িকা পড়বে। কেস হাসপাতাল অবদি নাও গড়াতে পারে, আবার পারেও। যে ডিরেক্টারের যেমন ইচ্ছে। এরপর গজ দশেক একটা গান। গানেই প্রেম এসটাব্লিশড হবে। দু'জনেরই দু'জনের কথা মনে পড়তে থাকবে। গানের প্রতি চরণে মোহব্বত শব্দটি থাকবে। অতঃপর শুরু হবে রক-হার্ড বাপের খেল। দুই জেনারেশানের ইনফাইট। এই সময় ভীষণ ভালো ভালো ডায়ালগ ছোঁড়াছুঁড়ি হবে দু'পক্ষে। অর্থনীতি প্রেমের পথে বাধা হতে পারে না। যেসব শব্দের ওপর ডায়ালগ ঘোরাঘুরি করবে, তার মধ্যে প্রধান হবে, ইনসান, মোহব্বত, আজাদি, ঝুটা। এই প্রেমের ট্র্যাংগলে পিতা হবে ভিলেন। তারই নিযুক্ত পোষা গুণ্ডারা দুটো চেষ্টা করবে। নায়ক কড়োরপতি হলে, নায়িকাকে রেপ করার। আর নায়িকা কড়োরপতি হলে নায়ককে মার্ডার করার। দু' মাইল লম্বা এই কাহিনীর মাঝে মধ্যেই একরাউন্ড, দু'রাউন্ড ফাইটিং চলবে। ঘুষোঘুষি, গান, নাচ ঘুরে ঘুরে আসবে। কমিনে, কুত্তের ছড়াছড়ি, অবশেষে প্রেমের জয়, ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়।

শিল্পের জগতে দুটি শব্দ প্রায়ই শোনা যায় প্রোডাক্ট আর বাইপ্রোডাক্ট। হিন্দি ছবির প্রেম হল প্রোডাক্ট। বাইপ্রোডাক্ট হল ক্রাইম, ভায়োলেন্স আর সেকস। এ যুগ হল বাইপ্রোডাক্টের যুগ। যুবচিত্তে এখন ক্রাইম আর ভায়োলেন্সের প্রভাবই বেশি। বেশ একটা ম্যানলি ব্যাপার। সেকালের ভারতীয়রা বিলেতে পড়তে যেতেন। অনেকে পণ্ডিত হয়ে ফিরতেন, আবার অনেকে ফিরে আসতেন শুধু গেলাস ধরা আর টাই আঁটা শিখে। বঙ্গসন্তান বিলেত থেকে ফিরে এসে, খেতে বসে পিসীকে বলছেন, পিসী, পিসী, মোচার ঘ্যান্ট, মোচার ঘ্যান্ট। বি সি দত্ত ফিরে এসে হয়ে গেলেন বি সি ডুটা। আমাদের বর্তমান হালচাল অনেকটা সেইরকম। বম্বে অ্যামেরিকাকে মেরে ফাঁক করে দিলে, আর আমরা কায়াছবির বদলে, ছায়ছবির হয়ে সর্বত্র ঢিসুম ঢিসুম করে বেড়াচ্ছি।

ডি এল রায় লিখেছিলেন :
আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলে
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি
... ...
আমরা বিলিতি ধরনে হাসি
আমরা ফরাসি ধরনে কাশি
আমরা পা ফাঁক করে সিগারেট
খেতে
বড্ডই ভালবাসি।
... ...
সব আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি

স্পীচ দেই ইংরেজি খাঁটি
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই

মত

চম্পট পরিপাটি।

ইংরেজ আর আমাদের অনুকরণীয় নয়। আমেরিকার কাউবয়ের বোম্বাই ভার্সানেই যুবসমাজ গুরুর সন্ধান পেয়ে গেছে। আর ভাবনা নেই। ঘরে ঘরে হিরো। ছাদে ছাদে হিরোইন। অভিভাবকহীন সংসার, মাথাহীন সমাজ, ব্যক্তিত্বহীন প্রশাসন, লোভী রাজনীতিক, কমপ্লিট ফ্রীডম ফর অল। অভয়ারণ্যে বাঘ, সিংহ, শৃগাল, হরিণ বিচরণ করছে। টং ঘরে বসে আছেন জনতার প্রতিনিধি। এগজিস্টেন্সিয়ালিস্ট দি গ্রেট। আজ বাঁচি, কালের কথা কাল ভাবা যাবে।

এখনকার প্রবীণদের যৌবন ভরে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র। 'বেশ করেছি প্রেম করেছি, করবই তো'র যুগে রবীন্দ্রনাথ এখনও অতলে তলিয়ে যাননি। তবে যেভাবে আমাদের নিজেদের ঔর্ধ্বদাহিক ক্রিয়া চলেছে তাতে কালে ডিসকো রবীন্দ্রসংগীত শুনতে হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এখন গিমিকের যুগ চলেছে। পপ কালচারে দেশ ছেয়ে গেছে। বোধবুদ্ধি ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে কবে সেই ছেলে হবে। কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে॥ কবির এ-আক্ষেপে কেউ সাড়া দেয়নি। মুখেন মারিতং জগৎ। একালের পাঠ্য, জেমস হ্যাডলি চেজ, আর্ভিং ওয়ালেস, এলিস্টেয়ার ম্যাকলিন, আর্থার হেইলি। ক্ল্যাসিক্যাল রাইটারদের আর সে-অ্যাপিল নেই। হার্ড নাট টু ক্র্যাক। জীবন-ভাবনায় এতই সব ভাবিত পড়তে ভাল্লাগে না। বোরিং। টান নেই। বয়স্কদেরও এখন শিশুর মগজ। মজা চাই, মজা। কমিকস, অরণ্যদেব। জীবনই নেই তো জীবন-ভাবনা। শার্দুলরা সব শৃগাল হয়ে গেছে। এই অবক্ষয় ঠেকাবে কে? স্যাডিস্ট জাত মেরে আর মরে আনন্দ পায়। চেতনা জাগ্রত করার মত কথা শুনলে বলে, ব্যাটা জ্ঞান দিচ্ছে। টসকে দে। সেই ছাত্রদ্বয়ের মত অবস্থা। কিছুতেই যখন পড়বে না, মাস্টারমশাই ভাই দুটিকে নিয়ে ছাতে গেলেন। নাও ঘুড়ি ওড়াও। খুব মজা। উড়ছে ঘুড়ি। প্রথম প্যাঁচে একটা ঘুড়ি কাটল। দ্বিতীয় প্যাঁচে আর একটা। কায়দা করে অঙ্ক শেখাতে হবে। মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, কটা কাটল? ছোট ভাই মাস্টারমশাইয়ের ধান্দা ধরে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বললে, দাদা পাইলে আয়। ম্যাস্টার শালা অঙ্ক শেখাচ্ছে। দেশ এখন দেশ থেকে পালাতে চাইছে। সবই অন্তঃসার শূন্য। সব কিছুর কাঠামো আছে, প্রাণ, নেই। বাইরের পোশাক ঝলমলে, ভেতরে ছোবড়া।

রিপাবলিক মানুষ চায় না। চায় কিছু ব্রুট্যাল, ইনহিউম্যান মানুষ। নিরেট-মস্তিষ্ক দ্বিপদ কিছু প্রাণী। যে মানুষ ভাবে, যে মানুষ ভবিষ্যৎ চিন্তা করে, যারা উন্নত মানুষের জীবন-যাপন করতে চায়, তাদের হাত থেকে সহজে ভোগা দিয়ে মোয়া খাওয়া যায় না। সুতরাং ব্লুপ্রিন্ট হল যুবশক্তির বারোটা বাজিয়ে দাও। তাদের হোলসেল ক্রিমিন্যাল বানিয়ে দাও। ক্রিমিন্যালদের মর‍্যাল থাকে না। তখন তারা ক্ষমতার হাতের মুঠোয় ক্রীতদাস। উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। সব দাবার ঘুঁটি। ইংরেজের সেই নীতি, ডিভাইড অ্যান্ড রুল। সারমেয় প্রথা। পাড়ায় পাড়ায় কেনেল ক্লাব। দাদারা হলেন কিপার। দাদাইজম আর ক্যানানিজম দেশকে হুই হুই করে অগ্রগতির দিকে নিয়ে চলেছে। যার ছেলে তার ছেলে নয়, দাদার কাছে টিকি বাঁধা। পুত্র তোমার পরিচয়? আমি ওমুকের চামচা। চামচা শব্দটাও বোম্বে-ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দান। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধনের পর ভ্যাকুয়াম তো থাকতে পারে না। গ্রামকে পাড়ার টুকরোয় ভেঙে এক এক পাড়া তুলে দেওয়া হয়েছে এক এক মাস্তানের হাতে। তারাই পালক, শাসক, সংহারক। তারা খাজনা, আদায় করে, তোলা তোলে, যথাস্থানে, আইনের দেবালয়ে খাজনা জমা দেয়। আইন অমনি স্মিত নেত্রে বরাভয় প্রদান করে, চালিয়ে যা গুগ্‌লু, আমি এই পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লুম। দেখেও দেখব না, শুনবো না। তোমরা নতুন কোড অফ কন্ডাক্ট তৈরি করো। নতুন ভ্যালুজ; চরিত্রের নতুন ডেফিনিশান। শিক্ষার নতুন ব্যবস্থা। জীবনের নতুন রুটিন।

বৈদিক আমলে শিক্ষার্থীর শৈশব আর যৌবনের অগ্রভাগ আলোর তপস্যায় গুরুগৃহে অতিবাহিত হত। গুরুরা আবার ফিরে এসেছেন ভোল পালটে, ড্রেস পালটে, নতুন ভ্যালুজ

নিয়ে। তাঁদের কণ্ঠেও উপনিষদের বাণী। তবে প্রার্থিত বস্তু একটু অন্য ধরনের, অসতোমা তদ্ অসতোগময়। তমসো মা তমসোতরগময়। মৃত্যোর্মা গরলং গময়॥ অসত্য থেকে আরও অসত্যের দিকে নিয়ে চলো। অন্ধকার থেকে নিয়ে চলো আরও অন্ধকারে। মৃত্যু থেকে ঠেলে দাও গরলসমুদ্রে। আধুনিক গুরু চ্যালা চামুণ্ডা নিয়ে ঘোটুলে বসবাস করেন। রক হল চৌকি। উষাকালে নিদ্রা। রাত্রে জাগরণ। তখনকার করণীয় কর্মের নাম, অ্যাকসান। সেকাল বড় বেকাল ছিল। যুদ্ধ হত দেশে দেশে। এখন হয় পাড়ায় পাড়ায়। কে জাগে ? আমরা জাগি আর জাগে পাল পাল নেড়ি। সূর্যাস্তে শয্যাত্যাগ নবগুরুবিধান। আরক পান। নার্ভ-উত্তেজক বটিকা সেবন। তারপর চুইংগাম চিবোতে চিবোতে দেশের নতুন ভবিষ্যৎদের সাধনা শুরু, কখনও শাক্তমতে, কখনও বৈষ্ণব মতে। শাক্তধারায় অ্যাকসান, বৈষ্ণবধারায়, লীলা।

একালের যৌবনে প্রেম নেই। দেহ আছে। দৈহিক ক্রিয়া আছে গণ্ডীবদ্ধ জীবন : যৌবন বিকিয়ে গেছে। ভালো কিছু হবার বাসনা নেই। ভালো শব্দটাও আপেক্ষিক। সেকালের ভালো ছেলে বলতে বোঝাত, লেখাপড়ায় ভালো, দৈহিক আর মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী, বিনয়ী, সচ্চরিত্র, ম্যানারস আর এটিকেট দুরস্ত। জীবনে প্রতিষ্ঠিত। ডাক্তার অথবা আইনজীবী, কি অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, অথবা সৎব্যবসায়ী এবং পরোপকারী। সংজ্ঞা এখন পাল্টে গেছে। ঔদ্ধত্য, অসভ্যতা, তেরিয়া-মেরিয়া স্বভাবের অধিকারী না হলে পাঁচজনে বলবেন, অ্যাঃ ব্যাটা মেনিমুখো, ম্যাদামারা। বাপ্ বললে শালা না বললে চরিত্র সার্টিফিকেট থেকে পঞ্চাশ নম্বর কাটা পড়বে। ম্যানারস, এটিকেট সেকেলে ন্যাকামি। পারমিসিভ সোসাইটি। যে যা করবে সেইটাই আচরণ বিধি। রাত বারোটায় হল্লা মাচাও, মাইক চালাও, বোমা ফাটিয়ে বিজয়ানন্দ প্রকাশ করো। চা খেয়ে তলানি সমেত ভাঁড় ছুঁড়ে দাও পথচারীর গায়ে। যত্রতত্র থুতু ছেটাও। দেয়াল ভাসিয়ে দাও। পা মাড়িয়ে কনুইয়ের গুঁতো মেরে এগিয়ে চলো। প্রতিবাদ করলেই লাশ ফেলে দাও নর্দমায়।

যৌবনের ভিসুভিয়াসের ওপর বার্ধক্য কাঁপছে। সমাজের দিকে তাকালেই দেখা যাবে প্রবীণদের কী হতাশ অবস্থা। রাস্তার একপাশ দিয়ে, নর্দমার কিনারা ঘেঁষে গুটিসুটি চলেছেন অমুকের বাবা, তমুকের বাবা। এক সময়ের মাননীয়, আদর্শপরায়ণ শিক্ষক। সৎ নাগরিক। কর্তব্যপরায়ণ সংসারী। ওল্ড ফুলের দল। রাস্তার মাঝখান দিয়ে বুক চিতিয়ে চলেছে যৌবন। মুখে নয়া জমানার ল্যাঙ্গুয়েজ। মনে ? মনে কী আছে ? আবার ডি এল রায়কে স্মরণ করি :

You are not far wrong if you think
যে আমরা করি একটু বেশি drink কিন্তু considering our evolution-এর state.
আমাদের morals নয় খুব loose
তবে about morals
We care a hang if you think
তা'লে you are an awful goose.

তিন মাথা যার বুদ্ধি নেবে তার, এই আপ্তবাক্য, একালের প্রাপ্তবয়স্করা কিঞ্চিৎ সংশোধন করে নিয়েছে। তিনমাথা যার সে একটি বুদ্ধু।

বিপদভঞ্জন মধুসূদন ব্রাত্য প্রবীণদের সহায়। ব্যবসায়ী মধুসূদন ভেজাল তেল খাইয়ে চোখের লেন্সে চালশে ফেলেছেন। দূর থেকে জগৎ ঝাপসা। পর্দার ওপাশে চলমান ক্যারিকেচার। ড্রাইভার মধুসূদন ইলেকট্রিক ভেঁপু মেরে মেরে, কানের পর্দা থ্রেডবেয়ার করে দিয়েছে। কোনও বাক্যই আর স্পষ্ট নয়। তালগোল পাকান নয়েজ। প্রশাসক মধুসূদন অর্থনীতির হাল অ্যায়সা কঠিন মুঠোয় ধরেছেন, দৈহিক পুষ্টির আর প্রশ্নই ওঠে না। পেটে কী ঢুকছে, ঢুকে তার কী কন্‌ট্রিবিউশান, কেউ আর মাথা ঘামায় না। সেই আপ্তবাক্যও একালে অচল, মাঝপুকুরের জল খাবে, প্রতি গ্রাসে মাছের মুড়ো। অতএব অকালেই ভীমরতি। মন কিছু নেয়ও না, ধরে রাখতেও পারে না। মানুষ বললে মানুষ, গাধা বললে গাধা। লগবগে পায়ে ওই একবার মেয়ের বাড়ি নয়তো বড় ছেলের বাড়ি, নয়তো বাল্যবন্ধু আর এক ওলড্‌ফুলের সুইট হোমে। যেখানে

অষ্টপ্রহর শব্দের জগাখিচুড়ি চলেছে। সস্তা ট্রানজিস্টার গলিত হিন্দিগান ঢালছে। রেকর্ড প্লেয়ার নাকিসুরে কাঁদছে। বৈঠকখানায় তরুণদের তরতাজা বাণী বেরচ্ছে, হেঁসেলে গৃহবধূ তাল ঠুকছে। কলতলায় কাজের মহিলা খই ভাজছে, পাশের বাড়িতে কর্তাগিন্নির স্টক টেকিং চলেছে পাড়া কাঁপিয়ে, শীতলাতলায় বাবা তারকনাথের ক্যাম্প খোলা হয়েছে, মাইক ফুঁসছে অমায়িক আস্ফালনে। কোণের গুমটি ঘরে বাল্যবন্ধু বসে আছে। ছানাবড়া চোখ। পাথরের মুখ। স্টোন ফেসেড। উঠনে বড় ছেলে আর মেজ ছেলেতে কাজিয়া চলেছে, মর্ডান ভোকাবুলারিতে। বার কয়েক শুয়ারের বাচ্চা শ্রুত হয়েছে। বৃদ্ধের তাজিয়া যতদিন না এ বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে ততদিন এই কাজিয়া চলছে চলবে। বুড়ো গন তো বাড়িও গন। কম্যুন্যাল, রায়ট বেঁধে যাবে।

নেশা আর আশা এই নিয়ে বাঁচা। সেকালে মানুষ বাঁচত ছেলের আশায়, মেয়েকে সৎপাত্রস্থ দেখে যাবার আশায়। তীর্থে স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে মৃত্যুর আশায়। মুখে এক চামচ গঙ্গোদক, ঠোঁটে ছেলের হাতের আগুন। প্রিমিটিভ ডিজায়ার্স। একালের আশা—এমন থাকবে না, দিন অবশ্যই পাল্টাবে। আবার পক্ষী সকল গান করিবে, অপ্সরাগণ নৃত্য করিবে, স্বর্গে দুন্দুভি বাজিবে। নিরাশাবাদীর ধমক, কাঁচকলা হবে। আরও খারাপ দিন, ভেরি ভেরি ব্যাড ডেজ আর কামিং। মানুষ অতঃপর মানুষ ধরে খাবে।

আশা গেল তো রইল নেশা। বাঁচার নেশা। যে-কোনওরকম বাঁচারই একটা নেশা থাকে। সেই নেশায় আর একটু নেশা ঢালতে পারলেই দুঃখের রজনী আর দীর্ঘ মনে হবে না। চোলাইয়ের নেশা নয়। অন্য নেশা। জ্যোতিষী মন্দ নয়। গ্রহনক্ষত্রের পরিবর্তনশীল লাগাতার চক্রান্ত। সেই চক্রান্ত ফাঁস করার চেষ্টায় জগৎ মিথ্যা হয়ে যাবে। চোখ ভালো থাকলে পড়ার নেশা। একালের মত এত বই, এত রকমের বই কোনও কালে ছিল না। তা না হলে মাছধরার নেশা। ছিপ ফেলে বোসো। লটারির নেশা। একটা কাটলে এক সপ্তাহ বেঁচে থাকার স্টিম্যুলেন্ট এসে গেল। সেটা না লাগলে, আর একটা, আবার এক সপ্তাহ। ওটা না লাগলে আর একটা, আবার এক সপ্তাহ। গেঁটে বাতের মত, নেশার আশা, আসার নেশায় গাঁট থেকে গাঁটে উতরে যাওয়া।

যে গাধা চলতে চায় না তার নাকের ডগায় গাজর দুলিয়ে, আশায় আশায় চালাতে হয়। গাধা ভাবে একধাপ এগোলেই গাজর নাগালে এসে যাবে। মানুষগাধা জানে আশা সাধারণত অপূর্ণই থেকে যায়। জীবন নিয়ে কাব্য করে বলা যায়—আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু হায়। মানুষ দার্শনিক প্রাণী, অতৃপ্তি, অসুখ, আশাভঙ্গ, ব্যর্থতা, বেদনা থেকেও একধরনের তৃপ্তি খুঁজে বের করে। সফল প্রেমিকের চেয়ে ব্যর্থ প্রেমিকের সুখ অনেক বেশি। প্রেম থেকে বিবাহ। বিবাহ থেকে সন্তান-সন্ততি, চ্যাঁ-ভ্যাঁ, দুধ, বেবিফুড, অয়েল ক্লথ, মুতো কাঁথা। টিউমারের মত সংসার বাড়বে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। যে প্রেমিকার হাত ধরে চাঁদের আলোয়, ঝাউবনে সিনেমার ঢঙে গান গাওয়া হয়েছিল—তুমি আর আমি, সেই প্রেমিকা স্ত্রী হলেই নিত্য, খ্যাচাখেচি। প্রেমের এ হেন অপমান অসহ্য। প্রেম আকাশের চাঁদের মত, হাতের নাগালের বাইরে ফুটে থাকা ফুলের মত হলে তবেই তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। তুমি আমায় ভালোবাসো, আমি তোমায় ভালোবাসি। দাস ফার অ্যান্ড নো ফার্দার। ব্যর্থ প্রেমিক সেই কারণে অনেক সুখী। আশাভঙ্গের তিক্ততায় বলতে হয় না—হায়! এর নাম প্রেম? সারাজীবন একটা বিরহী বিরহী ভাব নিয়ে, বৈষ্ণব পদাবলী হয়ে জীবন কাটানো যায়। দাগামারা বিরহী। সে এমন একটা জিনিস বলে বোঝানো যাবে না। এমন মানুষ যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে এলে আত্মভোলা, সদাশিব। মেজভাই, ছোটবোন বলবে—দাদা! দাদা তো আর বিয়েটিয়ে করলে না, ওই নিয়েই আছে। কি নিয়ে আছে?

এই নিয়ে থাকাটাই সব। মগজের একটা দুটো ইস্ক্রুপ সামান্য ঢিলে করে দিয়ে পার্টোয়ারের দুনিয়ার বাইরে নিজস্ব একটা জগৎ তৈরি করে তোফা থাকা। 'শ্যান পাগল বুঁচকি আগল' হলে চলবে না। প্রকৃত একসেন্ট্রিক হতে হবে। একটু খামখেয়ালী, এক বগ্‌গা। এমন মানুষ বড় সুখে দিনাতিপাত করে। কোনও কিছুতেই তেমন আগল থাকে না, বাঁধন থাকে না। মন থেকে বিষয়ের চিন্তাটা কোনও রকমে সরাতে পারলেই বেঁচে থাকার আনন্দদায়ক রাস্তা খুলে যায়।

অমুকের তমুক হল। গাড়ি হল, বাড়ি হল, ছেলের ভালো চাকরি হল, মেয়ের ভালো বিয়ে হল, বিরাট প্রোমোশন হল, বিদেশ গেল, এইসব ভেবে ভেবে জলবিছুটি খাওয়া মানুষের মত চিড়বিড় করে জীবন কাটাতে হবে না। যৌবনের শুরুতেই বেশ একটা ঘা খেয়ে মনের অসমপ্রবৃত্তিগুলোকে ভোঁতা করে ফেল তারপর জীবন একেবারে সহজ সরল। নারীই পুরুষকে পথ দেখায়। কোনও সন্দেহ নেই। আদ্যাশক্তি। আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে ঘোরতর সংসারী। বাঁধন খুলে দিলে মুক্তপাখি। সারা জীবন উড়ে উড়ে বেড়াও। সংসারের জোয়ালে জুততে না হলে, কত কী যে করা যায়। জীবনের ধরনধারণই পাল্টে যায়। মনের সব প্যাঁচপোঁচ খুলে যায়। টাকা আনা পাইয়ের প্রবল দুশ্চিন্তা নেই। জীবিকা ভয় দেখাতে পারে না। তেলের পাত্র নিয়ে ওপরে ওঠার পথ সুগম করতে হয় না। সর্বসময় সেই গল্পের কোলাব্যাঙের মত গালগলা ফুলিয়ে বলে যাও—'কে কার কড়ি ধারে'। সেই ব্যাঙটি একটি আধুলি পেয়েছিল।

এমন মানুষ যে কত আছেন। ট্যাঁকে ছেলে নিয়ে যাঁদের কোনও দিন শিশু-বিশেষজ্ঞের চেম্বারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিতে হল না। সারা রাত জেগে জেগে পাখার বাতাস টানতে হল না। মাঝরাতে প্রসব বেদনায় কাতর স্ত্রীকে নিয়ে ছুটতে হল না নার্সিং হোমে। ঠিকুর রোদে দাঁড়াতে হল না কেরোসিনের লাইনে। ছেঁড়া রেশন কার্ড পাল্টাবার জন্যে বাবা তারকনাথের স্থানে হত্যা দেবার মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকতে হল না রেশনিং অফিসে। সরকারী দুধ এল না বলে বিহারী দুগ্ধ ব্যবসায়ীর চরণের সেবায় লাগতে হল না। এই সব মানুষ নারীজাতির ভীষণ ভালবাসার পাত্র। এক নারীর ল্যাং খেলে সমগ্র নারীজাতির ভালবাসার সহস্রধারা খুলে যায়। জীবনের এই এক মজা। যাকে চাওয়া যায়, তাকে পাওয়া যায় না। পেলেও বনিবনা হয় না। আর তখন যে চায় তার কাছে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ডগ ইন দি ম্যানজার। নিজেও খাবে না ঘোড়াকেও খেতে দেবে না। প্রেম উত্তম বস্তু। মানুষের স্বভাবচরিত্র পাল্টে দেয়। সংসার কিন্তু ভালো নয়। বিজ্ঞান বলে, বেশি আঁচে সেদ্ধ হলে তরিতরকারির ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। কলে বেশি ছাঁটাই হলে চালের ভিটামিন-বি ঝরে যায়। প্রেমকে ওই কারণে সংসারের আঁচে ফেলতে নেই। পার্ক, গঙ্গারধার, সিনেমা, রেস্তোরাঁয় ফেলে রেখে সরে আসতে হয় স্মৃতি নিয়ে, ক্ষত নিয়ে। প্রতিদ্বন্দ্বীই হল আমাদের জীবনের প্রকৃত বন্ধু। যে কেড়ে নেয় সেই আমাদের আসল জিনিস দিয়ে যায়। দিয়ে যায় জীবন-দর্শন। বদ্ধপুরুষকে দেখিয়ে দেয় মুক্তপুরুষের রাস্তা।

সংসার এক ধরনের আলসার। মশলাবর্জিত জীবনের বোঝা টেনে যেতে হয়। অথচ জীবনের কত রকমের মশলাই না আছে। প্রতিদিন এক ভদ্রলোক পার্ক স্ট্রিটের অকসানারদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান। মধ্যবয়সী মানুষ। দু'পাশে দু ভাগ করা কাঁচা-পাকা চুল। চোখে চিকচিকে সোনার চশমা। ওয়েল ড্রেসড। অনুসন্ধানের বস্তু পুরনো আমলের ঘড়ি। ঘড়ি-পাগল মানুষ। সর্বযুগের ঘড়ি-শোভিত ঘরে বসে দিনরাত সময়ের চলন শোনেন। আমার সঙ্গে পরিচয় নেই। না থাকলেও আমি তাঁর জীবন-কাহিনী লিখতে পারি। কারণ আমরা দুজনেই এক পালকের পাখি। আমার অনুসন্ধানের বস্তু কলম। দেশ-বিদেশের পুরনো আমলের কলম। আমরা দুজনেই ব্যর্থ প্রেমিক। আমাদের চপলা কী কমলা আমাদের রাইভ্যালের কণ্ঠলগ্না। এখন তারা স্থূলকায়া। সন্তানের মুখরা জননী। তারা যাঁদের স্কন্ধারূঢ় তাঁরা হয়তো মনে মনে সদাসর্বদাই বলছেন—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। যতই বল না কেন, কমলী নেহি ছোড়তি। আমরা দুই মুক্তপুরুষ বেশ মজায় আছি। একজনের আকর্ষণ ঘড়ি, আর একজনের কলম।

নার্সারিতে নার্সারিতে যে গাছপাগল মানুষটি প্রায়ই যাওয়া-আসা করেন তাঁকেও আমি চিনি। মানুষের কাছে ঘা খেতে খেতে দ্বিপদ মনুষ্যসমাজ থেকে সরে এসে গাছের জগতে মুক্তি খুঁজছেন। মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। হতাশ করতে পারে। গাছ কিন্তু করে না। পরিচর্যা করলে সময়ে ফুলে ফলে ভরে উঠবেই। সন্তান বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরে পড়তে পারে। সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে বিপথে যেতে পারে। গোলাপ পরিচর্যায় গোলাপই দেবে। কামিনী ভরে যাবে বর্ষার আগমনে। শীতের চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া। রোদ ঝলসানো বৈশাখে

হলুদ সোঁদাল। আইনস্টাইন শেষ জীবনে হতাশাগ্রস্ত এক পত্রলেখককে উপদেশ দিয়েছিলেন—লাভ নেচার, বি-ফ্রেন্ড অ্যানিম্যালস। প্রকৃতিকে ভালবাসলে সেন্ট পারসেন্ট রিটার্ন পাওয়া যায়। কোনও সন্দেহ নেই। আর জীবজগৎ থেকে মনের মত একটি কুকুর। সব নিঃসঙ্গতা ভরে যাবে।

কুকুর-প্রেমী মানুষকেও আমি চিনি। মানুষের পেছনে, কোনও মানবীর পেছনে উপহারের ডালা সাজিয়ে ছুটে কী হবে। ন্যাকান্যাকা প্রেমের কথা বলেই বা কী লাভ! আবেগের কোনও মূল্য আছে! ভস্মে ঘি ঢালা। মানুষ বড় নিষ্ঠুর, স্বার্থপর প্রাণী। কুকুরকে ভালবাসলে প্রভুর জন্যে জীবন দেবে। বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত বসে থাকবে পথ চেয়ে। অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে মাথার কাছে বসে থাকবে অন্ন-জল ত্যাগ করে। কোনও মানুষ কী এমন ব্যবহার করবে। ঘাটের মড়া কোথায় আড্ডা মারছে কে জানে। রইল রাতের খাবর চাপা।

বই-পাগল মানুষকেও আমি চিনি। খেয়ে না খেয়ে একের পর এক বই কিনে চলেছেন। ঘরদোর বইয়ে ঠেসে গেছে। দৃকপাত নেই। সংসার সমুদ্র ছেড়ে জ্ঞান-সমুদ্রে নিমজ্জিত। দুটি সুন্দর মলাটের অন্তরালে পৃথিবীর যত ষড়যন্ত্র সব ফাঁস হয়ে আছে। মহাকাশের রহস্য, পশুর গোপন আচার আচরণ, নিভৃত অরণ্যের শোভা। মানুষের পদসেবা করে পাওয়া যাবে অকৃতজ্ঞতা, তিক্ততা। বই মানুষকে শুধু হাতে, শুকনো মুখে ফেরাবে না। এক এক করে জীবনের পাতা ওল্টালেও জ্ঞান বাড়বে। সেখানেও রহস্য রোমাঞ্চ আছে। তবে জীবনের সব পাতা একেবারে ওল্টানো যায় না। জীবনের শেষ দিনে শেষ পাতাটি ওল্টাতে হবে। তখন আর জমাখরচের হিসেব থাকে না। কি দিলুম আর কি পেলুম, অর্থহীন প্রশ্ন। জ্ঞানসমুদ্র আগের আগের বহু আগের, বর্তমানের মানুষের দান-সমুদ্র। দ্রষ্টার ভবিষ্যৎ-দর্শনেও সমৃদ্ধ। সেয়ানা-পাগল না হয়ে জ্ঞানপাগল হলে পুনঃ পুনঃ গতাগতির এই বিচিত্র, অজানা, রহস্যময় জগতের কাণ্ডকারখানা আর তেমন অসহ্য লাগে না।

বহু পথ ধরেই জীবনান্তরের সিংহ-দরজায় যাওয়া যায়। হাসতে হাসতে যাওয়া ভালো, না নাকের জলে চোখের জলে যাওয়া ভালো! যার যেমন অভিরুচি। সকলেরই তো এক অবস্থা :

কোঈ উম্মীদ বর নঁহী আতী,
কোঈ সুরৎ নজর নঁহী আতী ॥
[গালিব]
কোন আশাই পূর্ণ হয় না,
কোনো পথই দেখা যায় না কোথাও ॥
[অনুঃ আবু সয়ীদ আইয়ুব]

এই অবস্থাটাই তো আমরা বুঝি না। চোগাচাপকানের অহঙ্কার, জীবিকার অহঙ্কার, ডিগ্রি-ডিপ্লোমার অহঙ্কার, জাগতিক জ্ঞানের অহঙ্কার নিয়ে হিলতোলা জুতোর মত খটমট। কত রকমের অহঙ্কার যে আছে! একটু ভালো চেহারা, উঁচু নাক, ফর্সা চামড়া, বাস্ হয়ে গেল। প্রিন্স অফ ওয়েলস। কথায় কথায় এমন উক্তি—ওই প্যাঁচামুখো ছেলেটা কে এসেছিল হে? অমুকের কেলে কিসকিণ্ডে বউটা লাল শাড়ি পরে চলেছে, যেন টিকেয় আগুন। সামান্য চুলেরও কত অহঙ্কার। কী? না মাথায় এক মাথা চুল আছে। এই তেল পড়ছে, এই শ্যাম্পু পড়ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের কেয়ারি। চুলের পেছনেই ফরচুন গেলো। পোশাকের অহঙ্কার। সেও এক সাংঘাতিক ব্যাপার। সব সময় টিপটপ। ওয়ার্ডরোব উপচে পড়ছে। জামাকাপড়ের হিসেব থাকে না। এর ওপর যদি আবার ফোরেনের নেশা চাপে, দুনিয়া অন্ধকার। ফোরেন প্যান্ট শার্ট পরে গরমে গায়ে ব্লিস্টার, মরো মরো অবস্থা। তা হোক। দেহসুখ না থাক, ইগো স্যাটিসফায়েড। পোশাকের পরিচর্যায় সব সময় চলে গেল। ধোলাই। পাতিলেবুর রস, কমলালেবুর রস, ভিনিগারে চোবানো। নরম গরমে ইস্তিরি। দাগ লেগে যাবে কী পাট ভেঙে যাবে বলে, চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে আড়ষ্ট কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ। এমন মানুষ প্রায়ই চোখে পড়বে। বাসস্টপে, অথবা প্রেক্ষাগৃহের সামনে, দাঁড়িয়ে আছেন। সকলের থেকে

পৃথক। রুমাল চাপা নাক। যেন বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং থেকে সড়াত করে নেমে এসেছেন। এমন মানুষও আছেন যাঁর শ'খানেক সোয়েটার আছে। আমরা যেমন শুনি, স্বল্পং তথা আয়ু/বহ্বশ্চ বিঘ্না। সেই রকম স্বল্পং তথা শীতায়ু বহ্বশ্চ শীতবস্ত্রা ? মাস দুয়েক স্থায়ী শীতে শ'দেড়েক সোয়েটার পরা। কী যে যাতনা। যে-মহিলার শ-পাঁচেক শাড়ি তাঁরই বা কী অবস্থা ? ন্যাজে-গোবরে ব্যাপার। যে-ভদ্রলোক গোটা বারো বিভিন্ন ফ্রেমের চশমার মালিক, বারে বারে ভোল পাল্টাবার অপরাধে পুলিস যদি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কিছু বলার আছে ? যিনি শ-আড়াই কলমের মালিক, তাঁর অবস্থাও তো মোগল-বাদশাহের মত। কলমের হারেম। ছুটির দিন শুধু জল পোরো আর জল ফেলো। নয় তো কলম শুকিয়ে চামচিকি হয়ে যাবে।
যাঁর নিজের কিছু নেই, তিনি আবার অন্যের গরবে গরবিত। আমার বউ সুন্দরী, প্যারাগন অফ বিউটি। স্ত্রী চলেছেন আগে আগে, দু'পা পেছনে স্বামী মোরগের মত গর্বিত চলন, মিটি মিটি ইতি-উতি চাওয়া। জগৎ দেখ, দেখ, সুন্দরী বউয়ের মালিক আমি এক শশধর।

আমার ভায়রা ফোরেনে বিরাট ইঞ্জিনিয়ার, সেই গর্বেই গদ্গদ। সারা জীবনে সেই ভায়রা কদাচ খবর নিলেন না। শ্যালিকা আমেরিকায় থাকেন, সেই অহঙ্কারেই জনৈক চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাওয়ার পর টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচেন। কারুর কিছু প্রয়োজন হলেই আগ বাড়িয়ে বলেন, আমেরিকা থেকে আনিয়ে দেবো। আমি দিশি ব্লেড ব্যবহার করি না, দিশি পারফ্যুম, সাবান আমি ছুঁই না। ওই যে আমার শ্যালিকা আমেরিকায় থাকেন ওয়ানস এ ইয়ার কামস হিয়ার।

জীবন থেকে সরে এসে, নভোচরের মত সামান্য উর্ধ্বে উঠে জগৎ সংসারের দিকে তাকালে অদ্ভুত এক প্যান্টোমাইম। ক্রেজি ওয়ার্ল্ড। কেউ হাসছে, কেউ গাইছে, কেউ কাঁদছে, কেউ হাত-পা ছুঁড়ে বক্তৃতা মারছে। কেউ যোগাসনে, কেউ ভোগাসনে। কেউ জ্ঞান দিচ্ছেন, কেউ জ্ঞান নিচ্ছেন। কেউ সেবক, কেউ সেবিত। যেন রঙমাখা সব সঙের খেলা। কবীর যা দেখেছিলেন, সেই দর্শনই হবে, আকাশ আর ভূমি, এই দুই জাঁতার মাঝখানে গমের দানার মত জীবন ঠিকরে বেড়াচ্ছে। বাবুরা কাবু। জীবন যন্ত্রণায় বেহাল। তবু আস্ফালন। আঁতেলের আঁতলামো, ভাঁড়ের ভাঁড়ামো, ভণ্ডের ভণ্ডামি, ইতরের ইতরামি, বাঁদরের বাঁদরামি। তালগোল পাকানো জীবনের মণ্ড। 'আমরা Beautiful muddle, a queer amalgam of শশধর Huxley and goose,'

শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর

নবনীতা দেবসেন

'Parlare alcuno di se medesimo pare non lici to'—('নিজের বিষয়ে কথা বলাটা সমীচীন নয়'।) Dante, CONVIVIO.

কোথায় গেল আমার সেই চোখ, যা সকলকে সুন্দর দেখত ? কোথায় সেই মন, যা সবেতেই আশ্চর্য হত ? জীবন, হে জীবন মহারাজ, দয়া করে ফিরে নাও তোমার চালশের এই চশমা আমি আর স্পষ্ট দেখতে চাই না, আমি শুধু রম্য দেখতে চাই। কে তুমি হে আমার এই চোখের কোটরে এসে বসেছ, রংবেরঙের কড়া আলো ফেলে পালটে দিচ্ছে, দৃশ্যপট, আমি আর স্বচ্ছ দেখতে পাচ্ছিনে কেন ?

কোথায়, আমার তুষারশিখর হিমালয়, দাও ধুয়ে দাও মলিন এই চোখ ? কই ? গঙ্গোত্রীর উচ্ছল গঙ্গা ? এসো, স্থির করে দাও এই চপল বক্ষোতল, তোমার সেই শৈবালহীন, মর্মরখণ্ডগুলির মতো নিষ্কলঙ্ক মসৃণ আর কঠিন করে দাও। অঝোরঝরনা সহস্র প্রস্রবণেও যেন সে-বুকে দাগ না পড়ে, ক্ষত না হয়। তবেই তো আমার কলমে ধরা পড়বে, যা রম্য ! তবে তো ধরা পড়বে, যা মধুর !

নাকি পড়বে না ধরা ? শেষ পর্যন্ত কি অধরাই থেকে যাবে, যত মাধুরী ? তবে হ্যাঁ, নয়ন, শ্রবণ, স্পর্শন, এসবের চেয়ে ঢের বড়ো ফাঁদ শব্দের ফাঁদ। 'শব্দ' দিয়ে আমি দেখি, শুনি, ছুঁই জড়াই। বয়সের ঘষটানি লেগে ভোঁতা হতে হতে একদিন যদি চোখ থাকতেও দেখতে ভুলে যাই, শ্রবণ থাকতেও ভুলে যাই শ্রুতি, তবুও 'শব্দ' দিয়ে, মগজের দর্পণে আমি ঠিক দেখব, শুনব।

তা বলে পাঁচ-হাজার শব্দ চাই ? ও বাবা ! হে সম্পাদক মশাই, এ তো এগারো অক্ষৌহিণীর মতো শুনতে লাগছে। শব্দ তো এমনিতেই দৈব বলে বলীয়ান—প্রায় অপরাজেয়, প্রায় অপ্রতিরোধ্য, যাকে বলে সারস্বত সেনা। নিজের যা-খুশি-তাই নিয়ে পাঁচ-হাজার-রম্য-শব্দ ? তাছাড়া আমার স্বভাবটা একটু ক্রীতদাস-টাইপের—যদি তর্জনী উঁচিয়ে বলে দেওয়া হয় ইশকুলের রচনা লেখার মতো 'এই নাও তোমার বিষয়বস্তু', তবে হুড়হুড়িয়ে ভাবতে পারি। কিন্তু 'যা-খুশি' ? ব্যাস্। হয়ে গেল। খুশিটা যে আমার কিসে সেটাই কি আমি জানি ছাই ? পাঁচ হাজার মোট শব্দই কি আমি জানি ? আমার নিজস্ব জীবনে অতগুলো শব্দ কি জরুরি হয়ে উঠতে পেরেছে কখনই ? যা একান্ত জরুরি নয়, তা লিখেই বা কী হবে ?

অবিশ্যি শব্দ ছাড়া লেখার আছেই বা কী ? শব্দ দিয়েই তো প্রাণ-সন্ধি। শব্দই তো মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র। মানুষের সঙ্গে পরিপার্শ্বের পরিচয়ের ঘটক চূড়ামণি।

বড়ই আশ্চর্য জিনিস এই 'শব্দ'। শব্দের ভেলায় ভেসে যেমন কোথাও উত্তীর্ণ হওয়া যায়, শব্দের পাথরে ঠোক্কর লেগে তেমনি ডুবেও যাওয়া যায়। শব্দেরই বাতাসে আমরা শ্বাস নিচ্ছি, শব্দের অন্নেই আমরা পুষ্ট হচ্ছি, সত্যিই এই 'শব্দ' বড় আশ্চর্য বিষয়। পাঁচ হাজার রম্য শব্দ ? বেশ তো, শব্দের বিষয়েই লেখা যাক না কেন ? ছোট্ট থেকে একের পর এক নিত্য নতুন শব্দের রাজত্বেই তো আমি বাস করে এসেছি—রীতিমতো খাজনা আদায় করে প্রজা বানিয়ে ছেড়েছে আমাকে এক এক সময়ে এক একটা শব্দ। কিছু কিছু শব্দ হয়তো যেখানে ছিল থেকে গেছে সেখানেই. আমি তাদের অতিক্রম করে এসেছি।—কিছু কিছু আবার আমারই সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে, পরিবর্তিত হয়েছে তাদের চেহারা, তাদের মুখচ্ছবি। কোনও শব্দ ক্রমশ অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, কোনও শব্দ আবার ছোট হতে হতে কুঁকড়ে গেছে, কেউ বা রং বদলেছে, কেউ ঢং। শব্দেরা যেমন এক জায়গায় থাকে না, তেমনি এক থাকে না শব্দের সঙ্গে নিয়ত আমাদের

যোগাযোগ, আমাদের সম্পর্কও। কেউ কাছে চলে আসে, কেউ দূরে সরে যায়। কোনও-কোনও ধূপছায়া রঙের শব্দ হয়তো চিরকালই রহস্যের আলো-আঁধারি মেখে আধোজানা থেকে যায়। শেষ দিন পর্যন্ত চলে তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়া।

শব্দের ইঁট বসিয়ে বসিয়েই তো আমাদের চৈতন্যের প্রাসাদ গড়ে ওঠে—শব্দের ওপরেই আমাদের জানা-বোঝা-মানা-অমান্য করা সব কিছু। শব্দ দিয়ে তৈরি এই যে জগৎ, শব্দসিদ্ধ, শব্দসন্ধ এই যে বিপুল বিশ্বভুবন আমার সামনে, আমার ভিতরে, একটু একটু করে গড়ে উঠল, সেই বাড়ন্ত জগৎটার একটা জরিপের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? নিতান্তই শব্দনির্ভর যে-চেতনা সেই চেতনাই তো আমি। কবির সচেতন শব্দব্যবহারের, শব্দলীলার প্রসঙ্গ নয়, সাধারণভাবে মানুষের শব্দনির্ভর চৈতন্যের কথা বলছি।

জীবনে আমার কাছে সবচেয়ে যে-শব্দগুলি জরুরি, সেগুলি—নাম। নাম, শুধু নাম। শুধু নাম। নাম তো নয় এক একটা পৃথিবী।

মান-অভিমান, প্রাপ্তি-বঞ্চনা, আশা-হতাশায় ভরা এক একটি নাম আমার জীবনের এক একটা ভিত্তিপ্রস্তর। কিন্তু আজ সেই বিশেষ শব্দগুলির কাছে যাব না। প্রিয় নামগুলি, অপ্রিয় নামগুলির সঙ্গেই আজ একটু দূরে থাকুক। আজ বরং স্মৃতি থেকে কুড়িয়ে আনি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সেইসব শব্দকে যারা সকলের। সকলের হয়েও তারা যেখানে আমার নিজস্ব, ঠিক সেখানে তাদের খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি। অন্যদের দিকে তাদের নজর কেমন কে জানে? আমার দিকে তাদের চাউনিটা ঘোর-লাগানো। কখনও ভয়ের, কখনও ভাবনার, কখনও ভালোবাসার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় সমানবয়সী আমি, আমার চেতনার প্রথম উন্মেষের মুহূর্তে 'যুদ্ধ' শব্দটি ছিল প্রায় 'দুধ' শব্দের মতোই জরুরি। আর ছিল, অন্ধকার মাখানো, ভয় জড়ানো একটি শব্দ, 'ব্ল্যাক আউট'। যার পাশাপাশি বুকের মধ্যে উৎসৃত হত তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ—'সাইরেন' শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ভয়, ছোট্ ছোট্ ছোট্! সব্বাই একতলায় গিয়ে 'দিদা'র ঘরে জড়ো হই। ছোটরা গুঁড়ি মেরে ঢুকতুম দিদার তক্তপোষের নিচে। ইঁট দিয়ে করা তক্তপোষ, তার নিচে কী নেই? আমরাও যোগ দিতুম সেই সব বাসন-কোসন—বাক্স-প্যাঁটরার সঙ্গে। এবার নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাক—বোমা পড়ার অপেক্ষায়। 'অলক্লিয়ার' সিগন্যাল দিলে, তবে বেরোও মাথাময় ঝুলকালি মেখে, খুবই হতাশ হয়ে। দেখে মনে হত যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই আসছি। ঐ সময়ে শাদা হেলমেট পরা বেশ কিছু লোক পথেঘাটে দৌড়োদৌড়ি করত ইতস্তত। মায়ের কাছে সদ্য তখন এ বি সি ডি শিখছি। ভেবেই পেতুম না একই লোকের নাম 'এ' আর 'পি' হয় কী করে? ওই নামের অনেক লোক ছিল পাড়াতে। তারপর এল ফর্টিটু—এবং 'ইভ্যাকুয়েশন' শব্দ। এবং আমরা কুচবিহারে চলে গেলুম। কী সুন্দর শব্দ 'কুচবিহার'। বাড়িটা একতলা, একটা মস্ত বাগান ছিল কোথাও—দোপাটিফুল, বেলফুলের সঙ্গে তাতে ছিল পেঁপে গাছ, পেয়ারা গাছ, বেল গাছ। একটি পেতলের সাজিতে করে ভোরবেলা ফুল তুলতুম। পাশের বাড়ির উঠনের মধ্যে 'পুজোবাড়ি' ছিল, একটাই ঘর, দশদিকে ঘেরা গোলবারান্দা, অনেক ঠাকুর দেবতার বাসা সেই ঘরে। সন্ধেবেলায় আরতি হত। আমাদের এ-বাড়ির উঠনেও একটা গোল কুটিরের মতো দেখতে বাড়ি ছিল, কিন্তু তাতে ঢোকার পথ ছিল না, যদিও নাম 'গোলাঘর'।—তাতে নাকি সারা বছরের ধান তোলা থাকে। বাবা যাননি সঙ্গে, বাবার চিঠি যেত। এই সময়েই আমার 'নির্মলা' শব্দটি অসম্ভব ভালো লেগে গেল। এত ভালো, যে আমার অপছন্দের 'নবনীতা' নাম আমি চুপি চুপি বদলে ফেললুম। সেই প্রথমবার। বাবাকে চিঠির নিচে নাম সই করলুম ইতি—নির্মলা। এবং গোপন অনুরোধ বাবা যেন এবার থেকে ওই নামেই ডাকেন আমাকে। তারপরেই সেই প্রচণ্ড কেলেংকারি। আমার জীবনের প্রথম সামাজিক লজ্জার ব্যাপারটা ঘটল। ছেলেদের বিশ্বাস করতে নেই সেদিনই বোঝা উচিত ছিল আমার।—একদিন খামে একটি চিঠি এল। কেউই বুঝতে পারে না ও-চিঠি কার। নাম রয়েছে—'কুমারী নির্মলা দেব'।

এদিকে আমি তো মর্মে মর্মে বুঝেছি, আর বাবার ওপরে অভিমানে গলায় পাথর ঠেলে আসছে। যা ছিল গোপন, আমাদের একান্ত ব্যাপার, তা বাবা কেন প্রকাশ এবং সর্বজনীন করে দিলেন? চিঠি খুলে দেখা গেল ভিতরে ছবি এঁকে, বড় বড় হরফে, আমাকে লেখা বাবার চিঠি!

আমি আর নির্মলা নামে বাবাকে, বা কাউকেই চিঠি লিখিনি বটে তবে বাড়িতে অট্টহাসি আর থামল না। মাসীমা তো সেদিনও হাসতেন। এখন নেহাৎ তিনি হাসিকান্নার বাইরে।

কলকাতায় বাবা। মামা, মেসোমশাইদের খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট হচ্ছিল, জাপানীরাও আর বোমা ফেলবে বলে মনে হচ্ছিল না, ওই যা পড়ার দু'একটা তখনই পড়ে গিয়েছিল। আমরা আবার সদলে কলকাতায় ফিরলুম। আমার বেশ মনে আছে একদিন ভোরবেলা একতলা থেকে খবরের কাগজগুলো নিয়ে ওপরে আসছি, বাবামাকে দেবো, একটা কাগজের দিকে চেয়ে দেখি নামাঙ্কনের চেয়েও বড়ো বড়ো হরফে লেখা রয়েছে, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান"। সেই খবর বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে জীবন থেকে আস্তে আস্তে সরে গেল মুছেই গেল, 'শেল্টার' 'মিলিটারি ক্যাম্প', 'বম্বার্ডমেন্ট', স্পিলন্টার' 'এয়াররেইড', 'ব্যাফল ওয়াল' 'ট্রেঞ্চ' 'সাবমেরিন' 'টর্পিডো' ইত্যাদি একগাদা চেনা শব্দ—যারা হয়ে উঠেছিল দিবারাত্রের সঙ্গী, বড়দের আলাপচারিতে।

যুদ্ধের সময়ে 'জাপানী' আর 'জার্মানী' এই শব্দ দুটো খুব নিষ্ঠুর আর ভয়ের মনে হতো। বিদেশী, অচেনা এই শব্দ দুটিকে কানে একইরকম শুনতে লাগতো, আর প্রায়ই গুলিয়ে ফেলতুম। বিশেষণ, বিশেষ্য ব্যাপারটা বোঝবার মত বড় হইনি তখন। গুলিয়ে ফেলতুম ফ্যাশিস্ট আর বলশেভিক এই শব্দ দুটোও। কোনটারই মানে জানি না, সর্বদা শুনছি। আরো দুটো এইরকম একধরনের গোলমেলে শব্দ ছিল। টিটো আর তোজো। এক যে ছিলেন টিটো এক-যে ছিলেন তোজো—তাঁরা শাদা, না কালো, মন্দ, নাকি ভালো, কিছুই বুঝি না। এই নামদুটোও কেবলি গুলিয়ে যেত।

কিন্তু গুলিয়ে যেত না চার্চিলের সঙ্গে চুরুট, হিটলারের সঙ্গে মাছি-গোঁফ, স্ট্যালিনের সঙ্গে বাবা-গোঁফ। একটা মজার শব্দ ছিল, তাতে কুয়োর মধ্যে বোতলের ঘটি নামিয়ে দেবার মতন আওয়াজ হত : কুয়ো-মিন্-টাং। আরেকটা শব্দ ছিল খুব ভয়ের মতন, খাই-খাই আর ঠক্ ঠক্ কাঁপুনি ভরা, চিয়াং-খাই-শেক। ওই সময়ে চীনদেশে একজন বিখ্যাত বাঙালী নেতা ছিলেন, তাঁর নামের আধখানা উর্দু, আধখানা বাংলা,—সানিয়াৎ সেন। হিন্দু, না মুসলমান কে জানে?

ইতিপূর্বেই জীবনে আবির্ভূত হয়েছে 'ড্রাকুলা' শব্দের মতই রক্তখেকো, দাঁত-বের-করা 'ভ্যাম্পায়ার' শব্দের মত হাড়-হিম-করা দুটি শব্দ।—সেই শব্দেরা সোজাসুজি বুকের ওপরে আছড়ে পড়ে, ফেটে রক্তাক্ত হয়ে ছিটিয়ে পড়েছে চৈতন্যের চতুর্দিকে, শান বাঁধানো পথের ওপরে যেমন ফাট্ত ইলাবাসে'র পাকা বটফল।—হিরোশিমা, নাগাসাকি। তাদের সঙ্গে যুক্ত হল আরেকটি শব্দ—'নোয়াখালি'।

আমাদের হিন্দুস্থান পার্কের শান্তিপূর্ণ বাড়িটা থেকে 'নোয়াখালি' আর 'নাগাসাকি' যেন প্রায় একইরকম সুদূর আর অবাস্তব। সোজাসুজি চেনাশুনোর প্রশ্ন নেই—কিন্তু বড়দের মুখে শোনা কথার ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকা আছে। তাতেই শুধু তাতেই এই শব্দগুলো নিজেরাই হয়ে উঠেছিল মূর্ত হাহাকার, ধ্বস্ত মনুষ্যত্বের রক্তাক্ত প্রতীক। আর একটা ভয়-ভয়-করা মরীয়া ধরনের শব্দ ক'দিন ধরে ফিস্‌ফিস্ শুনছিলুম ;—শুনতে শুনতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল, তারপর এসে গেল সেই নির্দিষ্ট তারিখ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' শব্দ কাজে পরিণত হল। ষোলই অগাস্ট ১৯৪৬। 'কমুনাল রায়ট' শব্দের সঙ্গে আর মৃত্যুভয়ের সঙ্গে সেই পরিচয়। যুদ্ধের 'সাইরেন' বাজা ও ছুটোছুটি করার মধ্যে যেন খেলাই ছিল, মৃত্যুভয় ছিল না। অন্তত আমার কাছে তখন 'বোমা'র চেয়েও 'আরশোলা' অনেক বেশি ভয়াবহ শব্দ ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও 'দাঙ্গা' শব্দটার সঙ্গে মৃত্যু জড়ানো আমার মনে। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শব্দটি এখন হোয়াইটওয়াশ্‌ড হয়ে কেমন ভোল পালটে ফেলেছে। অন্য প্রসঙ্গে অন্য ক্ষেত্রে সহজভাবে সসম্মানে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমার মনের মধ্যে কিন্তু তার রং হিংসায় অপ্রেমে নির্দয়তায় মাখামাখি। 'কমুনাল রায়ট' শব্দের বানান করবার যোগ্যতা সেই ৭/৮ বছর বয়সে অর্জন করিনি বটে, কিন্তু হৃদয়ে তার বানান ভুল হবে না কোনওদিন। বাবার বন্ধু, ইমপ্রেসারিয়ো হরেন ঘোষের শরীর টুকরো টুকরো করে কেটে প্যাকিং বাক্সে ভরা পাওয়া গিয়েছিল। সেই বর্ণনা দিনে রাতে

আমাকে কষ্ট দিত, ঘুমিয়ে পড়তে ভয় করত যদি স্বপ্নে দেখি? শুনেছিলুম তিনি লোকটি খুব ভালো ছিলেন, প্রতিবেশীদের বিশ্বাস করেছিলেন। তাই পাড়া ছেড়ে পালাননি। মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকবার হাতে-নাতে উদাহরণ আমার জীবনে সেই প্রথম। সেই শুরু। শেষ করবে হবে কে জানে?

তারই মধ্যে গভীর একটা শব্দ বুদ্ধমন্দিরের বিশাল গং-টার আওয়াজের মতো উদাত্ত পবিত্র ধ্বনি তুলত বুকের মধ্যে সেই শব্দ, 'স্বাধীনতা'। 'স্বাধীনতা'র সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্'। তারপর 'জয়হিন্দ'। এখন 'বন্দেমাতরম্' শব্দটা হয়ে গেছে হিন্দুয়ানি, 'জয়হিন্দ' হয়ে গেছে কংগ্রেসী, আর 'স্বাধীনতা' শব্দকেও আমরা তার সোনার সিংহাসন থেকে টেনে এনে নর্দমায় ফেলে দিয়েছি। একদিন যে-শব্দের জন্য এতগুলি প্রাণ অবহেলায় ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, "ইয়ে আজ়াদী ঝুটা হ্যায়" শ্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দকেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল কী অবহেলায়! সেই আমাদের ফেলে দেবার শুরু। পতনের অবমূল্যায়নের দিন শুরু। ওইসঙ্গে ক্রমে ক্রমে বিসর্জনে চলে গেছে অনেক গাঢ়-গভীর, উষ্ণ-উজ্জ্বল বিশ্বাস। বুকের মাটিটাই যেন ক্রমশ পিছল হয়ে গিয়েছে—কিছুই আর দাঁড়িয়ে থাকে না। সবই হারিয়ে যায়। যেমন হারিয়ে গেছে আমাদের ছোটবেলার সেই হিমহিম শিশির ভেজা ছমছমে ভোর রাত্তিরে আলো আঁধারি মাখা, কড়া ইস্ত্রির ধবধবে পোশাকপরা, ড্রাম-বিউগলের শব্দে শিহরিত পদপাতের ছন্দে দৃপ্ত সুরেলা শব্দ—'প্রভাতফেরী'।

আর কি ম্যাজিক আছে, সেই আশ্চর্য শব্দে, চোদ্দই অগাস্ট? যে-রাতে পাড়াসুদ্ধু মানুষ, ছোট-বড় সবাই নির্ভয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল, রাত বারোটাতে জোরে রেডিও বেজে উঠেছিল ঘরে-ঘরে, নতুন পতাকা উড়েছিলো ছাদে-ছাদে। —সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত শব্দটি এখন পনেরোই আগস্টের সরকারী ছুটি হয়ে ক্যালেন্ডারেই যা লেগে আছে। বুকের মধ্যে তার জাদুর ছোঁয়া ঘুচে গেছে কবেই।

'স্বদেশ' 'স্বাধীনতা' এইসব শব্দ বুকের মধ্যে মোচড় দিত একদিন। তেমনি ওই শঙ্খ-শুভ্রতার পাশেই একই সঙ্গে ছিল লজ্জা, কান্না, অপমান জড়ানো শেকলপরানো এক কালো শব্দ, 'পরাধীনতা'। যেটাকে ইরেজার ঘষে মুছে ফেলাই আমাদের শিশু-কল্পনার চরম ছিল। এখন তো শাদাকালো দুটি শব্দই মুছে গেছে। পেয়েছি কি সেই আকাঙ্ক্ষিত 'স্বদেশ' শব্দের ঠিকানা?

'পরাধীনতা'র চেয়েও কুৎসিত কয়েকটা শব্দ ছিল। মানুষের মাথাকাটা যাওয়ার মতো শব্দ। যেমন 'মীর কাশিম', যেমন 'জুডাস'। শৈশবে মানুষের বুকে ভয় আর ভালোবাসার অভিজ্ঞতা যতটা থাকে, ঘৃণার অভিজ্ঞতা ততটা থাকে কি? ফ্রয়েডসাহেব অবিশ্যি গোড়াতেই বাপ তুলে বাক্যারম্ভ করবেন, ঘৃণা-ভালোবাসায় ব্র্যাকেট বেঁধে—আমি বলছি কেবল চেতনমনের কথাই। 'মীর কাশিম' অনেকটাই দূরের শব্দ, 'জুডাস' তো আরো দূরগামী, তবু, ঘৃণার রংটা আমাকে চিনিয়েছিল এরাই। কিন্তু খুব ভালো করে চেনালো এর পরে আরেকটি শব্দ। খুব কাছের, জীবন্ত গুলির শব্দ হয়ে চলে এলো, 'গড়সে'। আমার শৈশবে ঘৃণিততম শব্দ। (হিটলারের কীর্তিকলাপ তখনো কিছুই জানি না। যদিও 'নাজী' শব্দটা শুনেছি যথেষ্ট, ওটা খারাপ শব্দ তাও জানি। 'নাৎসি' শব্দটি শিখেছি অনেক পরে।) ত্রিশে জানুয়ারির সেই রেডিওবার্তা মার সেই ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া, সেই অনন্ত মৌন মিছিল যেখানে খালিপায়ে হেঁটে যাওয়া প্রতিটি মানুষের চোখে জল। সেই আমার মায়ের সঙ্গে মায়ের পাশাপাশি কোন মিছিলে হাঁটা। মাকে আর কখনও মিছিলে দেখিনি। যে-মা ঘরেও চটি না পরে থাকতে পারেন না, আর আমি খালিপায়ে ঘুরি বলে বকাবকি করেন, তিনিই বেরুনোর আগে চটি খুলে রাখলেন।

তখনও দেশের এমন 'হাওয়াই' দিন আসেনি। না এসেছে হাফপ্যান্টপরা মার্কিন ভ্রমণকারীদের অঙ্গের 'হাওয়াই শার্ট' না ফুটপাতে ঢেলে 'হাওয়াই চটি'। আর ছিল কেবল একটি গান, 'হাওয়াই দ্বীপে আজ ফুল ফুটেছে, সেই দেশে নৌকা ভাসাই'—আর আমরা ছোটরা তার সঙ্গে নাচতুম সরস্বতীপুজোর প্যানডালে। হাওয়াই চটি ছিল না বলে 'অশৌচে'র কোনো কমপ্রোমাইজও বেরোয়নি। হয় খালিপায়ে থাকো, নয় জুতো পরো। যেমন মস্তক মুণ্ডনের

কোনো মধ্যপন্থা নেই।

'গড়সে'র অনেক আগেই শিখে গেছি 'পাকিস্তান' শব্দ। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' 'আল্লা হো আকবর' ইত্যাদি রক্তাক্ত কয়েকটি শব্দপুঞ্জ সমেত—এই শেষ ধ্বনিটি লিখতে গিয়েও এক অনুপলের জন্য আঙুলে অনুভব করলুম এক অস্পষ্ট স্নায়বিক ভীতি—ছোটবেলায় এই স্লোগানটি থেকে অনেক রক্ত ঝরেছে। বিপরীতে, 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিরও যে চরম অবমাননা, চূড়ান্ত অপব্যবহার ঘটেছিল ওই একই প্রেক্ষিতে, সেই বয়েসে সেটা ঠিক টের পাইনি। তার জন্য বড় হতে হয়েছে, ইতিহাসসচেতন হতে, নিরপেক্ষ হতে হয়েছে। শৈশবে 'বন্দেমাতরমে'র সঙ্গে জড়িয়ে ছিল কেবলই বীরত্ব আর আত্মত্যাগ 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'র সুর, ছোরাছুরি দাঙ্গাহাঙ্গামা আগুন ছারখার নয়।

জানুয়ারির তেইশে আর ছাব্বিশে, পনেরোই আগস্ট, ২৫শে বৈশাখ, এইসব ছিল প্রভাতফেরীর লগ্ন। আর ত্রিশে জানুয়ারির মতো মুখ-কালো করা অন্ধকার দিন আরেকটি ছিল, বাইশে শ্রাবণ। বাবা মা ঘোষণা করতেন : বাইশে শ্রাবণ আমরা মানি না। ওইদিন কোনও সভায় ডাকলে, তাঁরা যেতেন না। অথচ দিনযাপনের প্রাত্যহিক ছন্দের মধ্যে কেমন সূক্ষ্মভাবে তিরতির্ করে চলে আসত স্মৃতি-অশ্রুর ভিজে বাতাস। এই শিশুটির বুকে ছুঁয়ে ঠিক জানিয়ে যেত—'আজই বাইশে শ্রাবণ'।

'বাইশে শ্রাবণ'টাও মনে পড়ে। তখন বছর তিনেক আমার বয়েস, বাবামা সেদিন সারাদিন বাড়ি নেই, অনেক রাত হয়ে গেল, ফিরছেন না, গুনিয়াভাই আর আমি বাড়িতে। কখন আমি মনের দুঃখে কেঁদে কেঁদে ঠাকুমার ভারি বাসনের সিন্ধুকটার তলায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছি। শেষে ছোট মামা এসে আমাকে খুঁজে বের করে আদর করে খাইয়েছিলেন। আমার জীবনে তরুণ সুন্দর ছোট মামারও সেই শেষ স্মৃতি। তারপরেই শিখলুম ভয়ংকর 'টাইফয়েড' শব্দটা। 'ক্লোরোমাইসেটিন' শব্দ আরও প্রায় দশ বছর পরের ঘটনা। 'টাইফয়েড' দৈত্যকে নির্বীজ করেছে সে। এইভাবে বড় থেকে ছোট হয়ে গেছে অনেক শব্দই। কখনও ভয় থেকে নির্ভয়ে, কখনও প্রেম থেকে অপ্রেমে, কখনো অজানা থেকে জানায় পৌঁছে। যেমন যক্ষ্মা। যেমন স্বদেশ। যেমন চাঁদ।

'স্বাধীনতা' শব্দটা একদিন কত বিপুল ছিল এখন কতো ছোট হয়ে গেছে। যেমন 'কংগ্রেসী' শব্দ। বাল্যকালে আমার মনে মনে ওই শব্দের রং ছিল গেরুয়া, ত্যাগের রং, সন্ন্যাসের রং। আস্তে আস্তে রং বদল হয়ে এখন তো 'কংগ্রেসী গুণ্ডা' বলে শব্দও চালু হয়েছে—, 'সোনার পাথরবাটি'র মতো। এখন কংগ্রেসী মানে ত্যাগী নয়, ভোগী। শুধু কি 'কংগ্রেসী' ? 'রাজনীতি ?' রাজনীতি-করা ছেলে মানেই এককালে ছিল যে-ছেলে দেশের উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিকে জলাঞ্জলি দিয়েছে, অথচ এখন পলিটিক্স মানেই ধান্দাবাজী। চাকরি, কি ব্যবসাপাতির মতই রাজনীতিও একটা পেশা। আমার এক গুজরাতি বন্ধু তো রাশভারি তামাক কোম্পানির ডিরেক্টরের পদ ছেড়ে দিয়ে দিল্লি চলে গেল, মন দিয়ে পেশাদারি রাজনীতি করবার আশায়। রাজনীতির মত সহজে ব্যক্তিগত উন্নতির পথ সুগম করতে আর কোনো পেশাই পারে না। ডাক্তারি, ব্যারিস্টারি, জমিদারি, কালোবাজারি, সব ছেড়ে লোভী মানুষরা ছুটেছে 'পলিটিক্সে'। এখন পলিটিক্সেই আসল দুনিয়াদারি। সম্মান। অর্থ। ক্ষমতা। যা চাও সব সেখানে।

কেন, আমাদের ছাত্রজীবনের সেই অগ্নিশুদ্ধ, উজ্জ্বলতম শব্দ, 'কমিউনিস্ট' ? 'আমরা তখন আর 'কংগ্রেসী' শব্দের প্রজা হয়ে নেই, বুকের ভেতরে অন্য এক নতুন স্পন্দন। উদয়-সূর্যের মতো টকটকে লাল, নাঙ্গা তরওয়ালের মতো ধারালো শব্দ—'কমিউনিজম' আমাদের বশ করেছে। একটা কোনো দেশ নয়, সারা পৃথিবীটা জুড়ে দুঃখী মানুষ উদ্ধারের কাজে ঐক্যবদ্ধ ভাবে জান-কবুল করেছে কে ? কংগ্রেসী নয়,'কমিউনিস্ট'। তখন আই পি টি-এর রমরমা। 'জনশিক্ষা' পরিষদে কত উজ্জ্বল মুখ। আজ কোথায় সেই শ্রদ্ধেয় শব্দ 'কমিউনিস্ট' ? তার সেই পবিত্র জ্যোতির্মণ্ডল কোথায় ? এখন বহুধাবিভক্ত হয়ে সে 'কংগ্রেসী' শব্দের পাশে, একই পচা আস্তাকুড়ে এসে ঠাঁই নিয়েছে।

'বিপ্লব' ও 'বিপ্লবী' এই শব্দ দুটোকেও বেয়াল্লিশ থেকে বাহাত্তরের মধ্যে কেমনভাবে উলটে পালটে বদলে যেতে দেখলুম। বেয়াল্লিশে আমি পৃথিবীতে মাত্র ৩/৪ বছরের বাসিন্দা টেররিজমের ধারণাটা শিখেছি পরে। ইতিহাসে। কিন্তু নকশালবাড়ির আগে অনেক ঘাটের জল খাওয়া হয়েছে। দীর্ঘ, সুদীর্ঘ প্রবাসযাপনের ফলে স্বদেশের প্রতি অসহায় অনির্বাণ, আত্মসমর্পিত ভালোবাসাকে চেনা হয়েছে। 'বিপ্লব' তখন নতুন স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল আমাদের চোখেও। আর—এখন ?

'চীন' এই শব্দটা যেমন। রঙীন স্বপ্ন যেমন হঠাৎ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে যায়, 'চীন' শব্দটাও মনের মধ্যে কেমন রংচঙে শব্দ থেকে সরে গিয়ে শাদাকালো শব্দে পরিণত হয়েছে 'মাও' শব্দের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বুকের মধ্যে 'ভিয়েৎনাম' শব্দের প্রতিধ্বনি আজও অবিনাশ। পঁচিশ বছর বাদেও নষ্ট হয়নি 'কিউবা' শব্দের প্রতিশ্রুতি। হ্যাঁ 'ফিদেল' শব্দের সেদিনকার দৈব বিভা হয়তো খানিক ম্লান হয়েছে। তবু অবশিষ্ট আছে অনেকটাই। আর, হঠাৎ অকালমৃত্যু না এলে, বেঁচেবর্তে সুখে থাকলে, আজো কি এমনি উজ্জ্বল থাকত 'চে' শব্দটি ?

একটা সময় ছিল যখন 'জনগণ' শব্দটি ছিল শ্রদ্ধেয়। এখন শব্দটা ব্যঙ্গাত্মক। যেমন ধরা যাক 'জনসভা' শব্দ। এ-শব্দটি নিজেই একদা সুমহান ছিল। 'জনসভা' শব্দে ওজন ছিল, ব্যাপ্তি ছিল, মহত্ত্ব ছিল। যথাযথ ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হলে, জনতাও উপস্থিত হত, সভা মহৎ হয়ে উঠত আপনা থেকেই।

বিজ্ঞপ্তিতে 'সভা'র আগে তুলি কলম নিয়ে 'মহতী' জুড়তে হত না। 'জনসভা' শব্দের মধ্যে ইন্দ্রজাল ছিল, আবেগ ছিল, যৌবন আব স্বপ্ন ছিল, ধ্যান আর প্রতিজ্ঞা ছিল, যা ছিল 'মিছিল' এই শব্দের মধ্যেও।

বাল্যের 'প্রভাতফেরী' আর 'কংগ্রেসী'র নির্দিষ্ট জায়গায় কৈশোরে 'মিছিল' আর 'কমুনিস্ট' শব্দ দুটি এসে দাঁড়িয়েছিল। এখন ? ওই 'মহতী জনসভার' পোস্টারের আর প্রতিবাদ মিছিলের ঘোষণায় শহরের দেওয়াল যতই ঢেকেছে, হৃদয় ঠিক ততই ফাঁকা হয়েছে। এখন জনসভা মোটে জনতার ব্যাপারই নয়, পার্টির ব্যাপার। হয় পয়সার খেলা, নয়তো ব্যবস্থাপনার নৈপুণ্য অথবা দুটোই। হৃদয়াবেগের জাদুতে আর জনসভার সাফল্য নির্ধারিত হয় না।

'জাদু' শব্দে মনে পড়ে গেল খুব ছোট বেলাতে তিনজন জাদুকরকে নিয়ে বেজায় গোলমাল বাধত মনের মধ্যে। ধ্যানচাঁদ, ব্র্যাডম্যান, আর সরকার। হকি, ক্রিকেট দুটোই আমার অচেনা না-খেলা খেলা। কে যে কোন্‌টার জাদুকর, মনে থাকত না। —কেবল সুস্পষ্ট জাগ্রত থাকতেন পি সি সরকার। জাদুসম্রাট বলে কথা ! তাঁর বেলায় গোলমাল নেই !

শুধু 'জনসভা', কি 'স্বাধীনতা' কেন, বাবা, মা, শিক্ষক, অধ্যাপক, শব্দগুলির মুখও আমাদের সময়ে যেমন ছিল, আমাদের সন্তানদের সময়ে তা নেই। শব্দগুলির সেই ধারও নেই ভারও নেই। রুপোর টাকা নয়, কাগজের নোট। বাবা-মা কেন, এখন 'বন্ধু' শব্দ, 'ভাই' শব্দ 'বিশ্বাস' শব্দ কেমন নীরক্ত, কেমন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে না ? ঠিক সেই আগের মতন আছে কি, তেমনি জ্বলজ্বলে, জবাকুসুমসঙ্কাশ শব্দ হয়ে ? যেমন সস্তা হয়ে গেছে 'বিলেত ফেরতা' শব্দটাও। আগে তার সঙ্গে যোগ ছিল যোগ্যতার, এখন কেবলই অর্থের। কলিকালে যে অর্থই একমাত্র যোগ্যতা, আর যৌন-আহ্লাদ একমাত্র আনন্দ হবার কথা ছিল, সেটা এমনভাবে মিলে যাবে বিশ্বজুড়ে, ছোটবেলায় বিশ্বাস করিনি।

'দেশপ্রেম', 'জনগণ', 'দেশ-উদ্ধার' শব্দগুলো বহু ব্যবহারে, আর অপব্যবহারে হালকা হতে হতে ক্রমে শূন্য হয়ে গেল। তারপর মাইনাস। শ্লেষাত্মক, ব্যঙ্গাত্মক শব্দ হয়ে দাঁড়াল। 'বিপ্লব' শব্দেরও যে সেই দুর্গতি, সেই একই দশা হবে কে ভেবেছিল। একদিন মেয়েকে জিগেস করলুম, "হ্যাঁরে, 'বিপ্লব' শুনলে তোদের কী মনে হয় ?" শুনে সে হাসল,—"হাসি পায়।" আমার কান্না পেয়েছিল ওদের কথা ভেবে এ কোন্ লীলা মহাকালের ? এদের খুঁটি কোথায় ? অবিশ্যি আমাদেরই বা খুঁটি কোথায় রইল ? শুধুমাত্র শব্দের খুঁটি হলে সে তো শব্দের বান ডাকালেই উপড়ে যাবে। আর জীবনে যখন বান ডাকে, তখন কি শব্দের বাঁধ দিয়ে তাকে ঠেকানো যায় ?

'পার্টিশান', 'পাকিস্তান', 'উদ্বাস্তু' শব্দগুলি 'রায়ট' শব্দের পিছু পিছুই আমদানি হয়েছিল

জীবনে। আমরা কলকাতার খাস বাসিন্দে, 'পার্টিশান' শব্দের যন্ত্রণা আমাদের জীবনকে স্পর্শ করেনি, প্রধানত বুদ্ধিকেই বিচলিত করেছিল। সমুদ্রের মতো বাস্তুহারা মানুষদের কলকাতায় এসে আছড়ে পড়া, এবং কলকাতাকে ভিড়ে, দারিদ্রে, ভিখিরিতে, হুকারে, নোংরা ছাউনিতে ছেয়ে ফেলা, তার ওপর কলকাতার ভাষাকে বাঙাল ভাষা মিশিয়ে জাতিচ্যুত করা, নেটিব কলকাতাবাসীর মোটেই পছন্দ হয়নি। চাকরিতে, ইস্কুল কলেজের সীটে, পাত্র খোঁজায় চতুর্গুণ কম্পিটিশন তো আছেই। তবুও উদ্বাস্তুদের প্রতি কলকাতার মানুষের শত্রুতা ছিল না—'উদ্বাস্তু খেদাও' 'উদ্বাস্তু হটাও' অভিযানও করেনি তারা। কিন্তু বাস্তু যাদের হারায়নি, উদ্বাস্তুদের প্রতি কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা তো থাকবেই তাদের। আহা, ওরা করুণার পাত্র, খানিক দয়ামায়া করো ওদের, আর খানিক অবজ্ঞা। 'বাঙাল' শব্দ আমার বাল্যকালে যেভাবে ব্যবহৃত হত এখন আর তা হয় না গত ত্রিশ বছরে সব ফারাক ঘুচে মুছে গেছে। দক্ষিণ কলকাতায় অন্তত আলাদা করে 'বাঙাল' বলে আর কেউ নেই। উত্তর কলকাতার কথা বলতে পারি না।

গত ত্রিশ বছরেও 'উদ্বাস্তু' আসা থামেনি, এতদিনে বর্ডার সীল করার প্রশ্নে নাকি পূর্ববঙ্গের সরকার মশাই বিরক্ত হচ্ছেন, এদিকে বারো বছর আগে যে পুরো দেশটাই 'ছিনতাই' হয়ে গেল, সেটা কেউ খেয়াল করলেন না। বাংলাদেশটা আর আমাদের দেশই নয়, কেবল পূর্ববঙ্গের মানুষদের দেশ। পশ্চিম জার্মানী জার্মানীতে, পশ্চিম ইউরোপ ইউরোপে কিন্তু পশ্চিম বাংলা বাংলাদেশেই নয়। আসামেও নয়, বিহারেও নয়, ওড়িশাতেও নয়। পশ্চিম বাংলার দেশ কোথায়? পশ্চিম বাংলাকে 'উদ্বাস্তু' করেছে 'বাংলাদেশ'।

'উদ্বাস্তু শব্দটার এখন চরিত্র বদলেছে। 'উদ্বাস্তু' এই শব্দ এখন কেমন যেন সর্বগ্রাসী, সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। আমার মনের মধ্যে অন্তত শব্দটা খুব নিজস্ব। এই বিশশতকের শেষাশেষি, কোথাও কোনও দেশেই কেউ কি বাকি আছি, যে নাকি ভিটেহারা হইনি? বাস্তুভিটে কারই বা রক্ষা পেয়েছে বুকের ভেতরে? হৃদয়ের মধ্যেই কখন উপড়ে গেছে ঐতিহ্যের মূল, বিশ্বাসের ভিত, শেকড়ছেঁড়া এক আশ্চর্য ভাসমান জগৎ। একদা অনাত্মীয় এই 'উদ্বাস্তু' শব্দটি আমার নিজের জীবনে এখন চন্দ্র সূর্যের সমান সত্য। আমি সত্যি সত্যি বাস্তু হারিয়েছি। আর হারিয়েছিলেন আমার শ্বশুরমশাই। হিন্দুস্থান পার্ক বাঙালিপাড়া বটে, কিন্তু উদ্বাস্তুপাড়া নয়, যাদবপুর বা গড়িয়া যেমন। এখানে প্রচুর পূর্ববাংলার বিত্তবান মানুষ দেশবিভাগের আগেই এসে বড় বড় বাড়ি করেছিলেন। আমার শ্বশুরমশাইয়ের শান্তিনিকেতনের 'প্রতীচী' বাড়ি যেমন পার্টিশানের আগেকার। বাবা কিন্তু মনে মনে নিজেকে একজন বাস্তুহারাই ভাবতেন। বাস্তুভিটে মত্তগ্রামের জন্যে, ঢাকায় লারমিনি স্ট্রীটের পৈতৃক বসতবাড়িটি আর জয়কালী মন্দির রোডের একজোড়া ভাড়াটে বাড়ি, এদের জন্যে বাবার মনে দুঃখ ছিল। আমার শাশুড়িমা, আর তাঁর ছেলেমেয়েরা পর পর দু'পুরুষ বীরভূমের লালমাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, শান্তিনিকেতনের সঙ্গেই তাঁদের নাড়ির বাঁধন। পূর্ববঙ্গের জন্য তাঁদের মনে এই বাস্তু-শোক দেখিনি। বিষয় সম্পত্তি হারানোর দুঃখও না। শ্বশুরমশায়ের মুখের ভাষাও ছিল ঢাকাই। শাশুড়ি মা মজা করে হাসতেন, যখন বাবা বেড়ালকে 'মেকুর', নাগাল পাওয়াকে 'লাগুড় পাওয়া' বা হাত চিপ্টে যাওয়াকে 'চেঙ্গি লাগা' বলতেন। বাবা বীরভূমকে, বীরভূমের ধানক্ষেতকে প্রাণাধিক ভালোবেসেছিলেন, বছরে তিনবার করে ফসল ফলাতে শিখিয়েছিলেন বীরভূমের চাষীদের তিনি। বীরভূমেরই সেবায় জীবনের শেষটুকু উৎসর্গ করেছিলেন। তবু, কোপাই কি আর পদ্মার পাশে দাঁড়াতে পারে? বাবার বুকের মধ্যে বাস্তুহারা একটি মানুষ লুকিয়ে ছিলই, ঢাকার সঙ্গে যাঁর পিতৃ-পিতামহের পরিচয় যুক্ত। আমার শিশু কন্যাকে তিনি যখন আদর করে সাতপুরুষের পিতৃপরিচয় শেখাতেন, তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁর স্বরে ঝরে পড়ত, 'দেশের' জন্যে সেই নসট্যালজিয়া। 'দেশ', বা 'দেশের বাড়ি' ব্যাপারটা আমার কোনওদিন ছিল না, কলকাতাই আমাদের বাপের বাড়ির দেশ বলে। এই নস্ট্যালজিয়ার অভাবটা আমি খুব অনুভব করেছি ছোটবেলাতে। স্কুলের ছুটিতে যাবার জন্যে যাদের 'দেশ' ছিল, তাদের চেয়ে দরিদ্র মনে হত নিজেকে। বিয়ে হয়ে আমারও 'দেশ' হল। মত্তগ্রামের জন্যে ধার-করা দুঃখু হত আমার : যদি কখনও বাংলাদেশে যাই, নিশ্চয়ই একবার 'মত্তগ্রামে' যাব। আমার সন্তানদের সাতপুরুষের পরিচয় যে-মাটিতে।

'শ্বশুরবাড়ি' শবদটাও সত্যি আশ্চর্য বটে। ছোট্ট থেকেই একটা ঘোমটাটানা সিঁদুরপরা, গয়না ঝুমঝুম, রাঙাটুকটুক শব্দ। শব্দটার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় 'কাবুলিওয়ালা' পড়বার আগেই। সদ্য যুদ্ধ থেমেছে, মিলিটারি ক্যাম্পগুলো ভাঙা হয়েছে, পড়ে আছে বিরাট বিরাট শান-বাঁধানো খোলা জায়গা, এখানে সেখানে। গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান পার্কের মোড়েও অমন জায়গা ছিল (দমকলের ওপাশে) সার্কাসের তাঁবু পড়ল সেখানে। পাড়ার বাচ্চাদের উত্তেজনার অন্ত নেই। বাঘ সিংহীর ডাক শোনা যায়, ভোরবেলায় হাতি, উটেরা মর্নিং ওয়াকে বেরোয়, আর সবচেয়ে উত্তেজনা একজন অবাঙালি 'ক্লাউন'কে নিয়ে। তিনি বাচ্চাদের নিয়ে খুব মাতামাতি করতেন। মার্কিন মিলিটারিরা ছোটদের চুইংগাম দিত যেমন, তিনিও তেমনি আমাদের লজেন্স খাওয়াতেন। নানান মজার অঙ্গভঙ্গি তো করতেনই এর ওপর একটা ছড়া বলতেন, যেটা বললেই ছেলেরা খুব হাসত আর মেয়েরা ছুটে পালিয়ে যেত ছড়াটা এই—"তাড়াতুড়ি তাড়াতুড়ি আমি যাব শ্বশুরবাড়ি।" এতে যে এত লজ্জাশরমের কী ছিল, এখন বুঝি না। কিন্তু তখন ? ওরে ব্বাবা ! ওই 'অসভ্য' ছড়াটা শুনলেই আমরা ছুটে দূরে পালাতুম। আমিও। কেননা ওটাই দস্তুর। ওটাই রেওয়াজ। ছোটরা খুব 'রেওয়াজ' মানে। 'শ্বশুরবাড়ি' শব্দ মানেই খানিক লজ্জা, খানিক আহ্লাদ। আরেকটু বড় হয়ে বুঝলুম, খানিক স্বপ্ন, খানিক ভয়। 'বর' শব্দটাও ক্রমশ ঠাঁই করে নিচ্ছিল বুকের মধ্যে। থির্‌থির্ করে কাঁপতো যেন হ্রদের জলে বনের ছায়া। তাতে স্বপ্নের বাতাস দিচ্ছে, ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে কিছু অস্পষ্ট ছায়াময় শ্যামলিমা, দুলছে, কাঁপছে, দুলছে, বুকের আয়নায় চেপে ধরা যাচ্ছে না। যখন সত্যি সত্যি আমারও 'বর' হল, 'শ্বশুবাড়ি' হল, তখন সে কী আনন্দ আমার। এমন মনের মতো বরটি, এত স্বপ্নের মতো শ্বশুরবাড়িটি। কলকাতা, শহরে চারতলা বাড়িতে বড়-হওয়া মেয়ে, গাছ পুকুর ধানখেত ইঁদারাওলা একতলা বাড়ি আমার স্বপ্ন—ঠিক তেমনি বাড়িই 'প্রতীচী', যেমন বাড়িতে কলকাতার লোকে ২-৪ দিন ছুটিতে বেড়াতেই যেতে পায়, জন্মের শোধ বসবাস করবার অধিকার পায় না। ঠিক তেমনি বাড়িতেই লাল বেনারসী পরে শাশুড়ি-মা আমাকে কোলে করে চৌকাঠ পার করিয়ে, শিলের ওপর দাঁড় করালেন। আরেকটা শ্বশুরবাড়ি দিল্লিতে ন'নম্বর অশোক রোডে শ্বশুরমশায়ের সবকারি কোয়ার্টার। ও বাবা, সেও ইলাহি ব্যাপার। নতুন বউটি কলকাতা থেকে পৌঁছে, গাড়ি থেকে নেমেই দ্যাখে গেটে ঢুকে ডাইনে মস্ত দোলনা। আর কথা নয়, সোজা গিয়েই চড়ে বসেছে। শ্বশুর-শাশুড়ি বৌয়ের আদেখলেপনায় একটুও বকলেন না, শাশুড়ি-মা বরং আদর করে কয়েকবার দোল দিয়ে বললেন—"আজ নেমে এসো, কাল আবার হবে ?" অশোক রোডের বাড়ির সামনে চমৎকার বাগান আর পিছনে বিরাট সবুজ মাঠ, যার নাম 'লন'। আর মস্ত মস্ত বড় বড় গাছ ছিল। সন্ধেবেলা সেইসব গাছে টিয়াপাখির ঝাঁক উড়ে আসতো। এমন গাছওলা, টিয়াপাখিওলা, মাঠওলা বাড়িতে বড় হইনি তো ? ছেলেবেলায় সব খেলার মাঠেই ট্রেঞ্চ খোঁড়া থাকতো। তায় দোলনাওলা বাড়ি। খুব ভালো লেগেছিল, শ্বশুর-শাশুড়ি সমেত সুন্দর 'শ্বশুরবাড়ি', যদিও খেলার দিন শেষ। কিন্তু জীবন সব সময় কথা রাখতে পারে না। সময়ের কাছে জীবন বড় অসহায়। 'শ্বশুরবাড়ি' শব্দের ওপর এখন অনেক মেঘের ছায়া, অনেক বা. ভাসি জলের শুকনো দাগ।

জীবন থেকে কোনও শব্দ চুরি হয়ে যায়। কোনওটা বা পুরনো হয়ে যায়, পচে যায়, ফুরিয়ে যায়। আবার কত নতুন নতুন শব্দ আসে। 'বর' 'শ্বশুরবাড়ি' এসব শ্রী-ছাঁদের সঙ্গে বরণডালায় সাজানো সিঁদুর মাখানো লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তোলা শব্দগুলি ধমনীর স্রোতের সঙ্গে যা এক হয়ে গিয়েছিল, কখন আবার 'ডিভোর্স' শব্দের প্রবল প্রতাপে তারা খরচ হয়ে গেল। ওইরকম ভয়ংকর খুনখারাবির রঙের নাঙ্গা তলোয়ারের মতো শব্দ 'ডিভোর্স' যে কোনওদিন এই আমারই হাতবাক্সোতে এসে ঢুকবে এ কেউ ভেবেছিল ? আর 'ডিভোর্সী' মেয়ে মানেই তো বদ্। ছলচাতুরী করা, চরিত্রহীন। অতি সব্বেনেশে জিনিস ওই সব উড়নচণ্ডে, ঘরভাঙা মেয়েরা। ওইসব স্বামীত্যাগিনী খারাপ মেয়ের থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। অন্যের ঘরসংসারে আগুন তো জ্বালে ওরাই। ডিভোর্সের চেয়েও ভয়ংকর শব্দ ছিল ওই 'ডিভোর্সী'।

আর আজ ? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভালো করে মুখের দিকে তাকাই, দেখতে চেষ্টা করি

সেই সুলক্ষণা 'বউ' শব্দটা কোথায় ফুরোলো, আর অলুক্ষুণে 'ডিভোর্সী' শব্দটারই বা কোন্‌খান থেকে শুরু। মুখ কিছুই ক্লু দেয় না। আয়নাটা বোধহীন জড়বস্তুর মতো আচরণ করে।

কোথাকার শব্দ, কোথায় গড়ায়। 'সৎমা' শব্দটাই ধরা যাক। রূপকথায় শোনা ওই বুক দুরুদুরু ভীষণ শব্দের জীবন্ত চেহারা কখনও দেখিনি। স্কুলে একটি মেয়ে বোর্ডিঙে থাকত। শুনেছিলুম তার নাকি 'সৎমা' আছে, 'মা' নেই। তাই ওকে বাবা বোর্ডিংয়ে ফেলে রাখেন। ভয়ে ভয়ে কৌতূহলের সঙ্গে ওকে দূর থেকে চেয়ে দেখতুম, বেচারী। বাগে পেলে সৎমা ওকে না একদিন জীবজন্তু বানিয়ে দেয়। সৎমা-রা তো ডাইনি হয়। হিংসুটি হয়।

অনেক শখ করে যখন 'মা' হয়েছিলুম তখন কি ভেবেছি, আমার এই তুলতুলে পুতুলের মতো বাচ্চা দুটোর জীবনেও এই গল্পে-শোনা, সৎমা শব্দ জ্যান্ত হয়ে ঢুকে আসবে ? এক আধুনিক রূপকথার চরিত্র হয়ে উঠব আমরাই ? কিন্তু বিয়েও যেমন আর জন্মজন্মান্তরের জন্যে হয় না, কংগ্রেসীরা যেমন দেশপ্রেমিক হয় না, কমিউনিস্টরা আর হয় না মানবপ্রেমিক, এখনকার সৎমারাও আর ডাইনি-টাইনি হয় না। আর চুপিচুপি বলে রাখি, 'ডিভোর্সী'রাও হয় না তেমন কিছু ভয়াল, মুণ্ডমালিনী !

কিন্তু 'ডিভোর্স' শব্দ ? হ্যাঁ, সেই শব্দের অমোঘ আঘাত, তার মর্মবিদারি মৃত্যুতুল্য তীব্র ব্যঞ্জনা এখনও মানুষের জীবনে একইভাবে বজায় আছে, থাকবেও, 'প্রেম' শব্দের জাদু আর যন্ত্রণায় আয়ু যতদিন।

তাহলে পরিপ্রেক্ষিত বদল হলে, শব্দের চরিত্রও বদলে যায় ? যতদিন অন্যের ঘরে, ততদিন এক পোশাক, যেই নিজের ঘরে এল তখন অনন্য। শব্দের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক পালটে যায় কেমন। যেমন 'মা' শব্দ। যতদিন নিজে 'মা' হইনি, ততদিন একরকম। আর যেই নিজে 'মা' হলুম, অমনি তার আরেক মূর্তি। এই 'মা' শব্দটা আমাকে কম ভুগিয়েছে ? আরও কত ভোগাবে কে জানে ?

'মা' বললেই বুকের মধ্যে মোচড় দিত। মা-কে সশরীরে সামনে দেখেও মার জন্যে মন কেমন করত। সেই বোধহয় ভালোবাসার প্রথম পাঠ।

বিয়ের পর বিদেশে কেবল বরটি আর বউটি। জীবনের সবচেয়ে কাছের সবচেয়ে প্রিয় ডাকটি 'মা'। যখনই অন্যমনস্ক হয়ে অমর্ত্যকে ডাকতে যাই—'মা' বলে ডেকে উঠি। তারপর আমিও লজ্জা পাই, উনিও ক্ষ্যাপান। একটু কি আর চটেও যান না ? এক সময়ে দেখি 'মা' বলে ডাকলে, 'উ' বলে সাড়া আসছে। "কী করে বুঝলে তোমাকেই ডাকছি ?" আমি তো মুগ্ধ ! আর উনি নাচার ! "না বুঝে উপায় কি ? বাড়িতে আর তো তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই !" সেই 'মা' ডাক এখন আরেক ভাবে জ্বালায়। পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে অন্যের বাড়িতে, কেউ কারুকে 'মা' বলে একবার ডাকলে হয়। আর রক্ষে নেই, অমনি 'হাম্বা ! হাম্বা !' করে আমিই সাড়া দিয়ে উঠি। কখনও মুখে, আর কখনও বুকের ভেতরে। যেন জগতে 'মা' শব্দ একমাত্র আমারই ডাকনাম।

অথচ, নিজে যখন 'মা' হতে চলেছি তখন কী ভয়—'মা' যে হবো, মা হবার যোগ্যতা কি আমার আছে ? সবাই কি আর 'মা' হতে পারে ? 'মা'কে হতে হবে নিখুঁত। আমার মায়ের মতো। মা-কে জানতে হবে সব প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর, সব ভয়ের নিশ্চিত মাভৈঃ, মাকে থাকতে হবে অটল আত্মবিশ্বাসে, আর 'মা'র জীবনই হবে মার বাণী। আরেকটা পুরো 'মানুষ' তৈরি করা,—এ তো ঈশ্বরের কর্ম। আর 'মা'য়েদের। আমি কি 'মা' হতে পারি ? এদিকে প্রবলভাবে শিশু ভালবাসি। মা হবার ইচ্ছে খুব। কেমব্রিজে যখন মা হতে যাচ্ছি, খুব সীরিয়াসলি হপ্তায় দুদিন করে ন্যাচারাল চাইল্ডবার্থের স্পেশ্যাল ক্লাস করলুম, যাতে শিশুটির জন্ম মুহূর্তটি আনন্দময়, শান্তিময় হয়। বার্থ-ট্রমা যাতে স্বল্পতম হতে পারে। জন্মানোর মুহূর্ত থেকেই সন্তানের জীবন পথ যাতে স্বচ্ছন্দ, সরল, সুগম ও আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয় তার চেষ্টা, তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা চলল। 'মা' হবার পরে তো আরেক প্রস্থ দুর্ভাবনা শুরু হবে। কেমন করে বড় করা। কতটুকু ছেড়ে, কতটুকু আগলে ? কতটুকুতে ফ্রীডম, কতটুকু ছাড়ালে লাইসেন্স ? কতটুকুতে কেয়ার, কতটাতে ডিক্টেটোরিয়াল ? কতটুকুতে ইন্টারেস্টেড, ইনভল্‌ভড, কতটুকুর বেশি হলেই ইন্টারফিয়ারিং ? আর কতটুকু কমতি হলেই নেগলেক্ট ? কোথায় কেয়ার থেকে পজেসিভ্‌নেস-এর

শুরু হয়ে যায় ? এতসব আমি কেমন করে জানবো ? কী কর্তব্য বুঝবো কি ? পারবো কি ? বইয়ের পরে বই কেনা হতে লাগল। শিশু তখনও পেটের মধ্যে হাত-পা ছুঁড়ে মনের সুখে জলকেলি করছে। আমার আর 'মা' শব্দের যোগ্য হবার জন্য প্রস্তুতি শেষ হয় না। ইতিমধ্যে ডক্টরেট পাশ করে গেলুম বিনা উদ্বেগে। সেখানে যোগ্যতা নিয়ে নিজের মনে প্রশ্ন ছিল না।

যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে বিনা ওষুধপত্তরে, বিনা কাটাছেঁড়ায়, সজ্ঞানে, সানন্দে দৌড়ে স্বদেশে উড়ে এসে 'মাতৃভূমি'তে হাস্যবদনে নির্ভয়ে সন্তান প্রসব করলুম। (যদি গরুভেড়া পারে, আমিই বা পারব না কেন ?) আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সবচেয়ে সার্থকতার মুহূর্ত সেই প্রথম সন্তানের জন্ম দেওয়া। সেই 'মা' শব্দের দাবিদার হলুম।

কিন্তু সেসব অনেকদিন আগের কথা। "বিশ সাল বাদ" আমারই ভাবতে অবাক লাগে, এরকম পাগল ছিলুম ? এমন ঐকান্তিকভাবে, সর্বান্তঃকরণে 'মা' শব্দের যোগ্য হতে চেয়েছে ক'জন মেয়ে, জানি না। তবে, সেটাই ভুল হয়েছিল। এখন মনে মনে বুঝি আমার নিজের বিষয়ে সব উদ্বেগ, সব ভীতিই অভ্রান্ত ছিল। 'মা' শব্দের যোগ্যতা আমি কোনোদিনই অর্জন করতে পারব না। এই জেনারেশনের মা হবার যোগ্যতা আমাদের জেনারেশনের নেই। আমাদের মায়েদের সঙ্গে সেই যুগের অন্ত হয়েছে।

জীবন আর শব্দ পরস্পরকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কখনও আমরা শব্দের পিছু ধাই, আবার শব্দ কখনও আমাদের। হ্যাঁ, ছিল বটে স্বপ্নময়, জাদুময় 'কফি হাউস' শব্দটি! আমাদের প্রাচীন পরিবারেও যেন সার্সির ভয়ংকর দ্বীপ, যেন কামাখ্যার পাহাড় ! ওখানে পা দিলেই মেয়েরা হয়ে যায় উড়নচণ্ডী, আর ছেলেরা কমিউনিস্ট ! পড়াশুনো শিকেয় ওঠে। এবং প্রেম না করে উপায় থাকে না। অতএব বাড়ি থেকে ফতোয়াজারি করা হলো : "প্রেসিডেন্সিতে যাবে যাও, কিন্তু কফি হাউসে পদার্পণ করবে না !" 'ভালো মেয়ে' এই আত্মপ্রবঞ্চক শব্দের সঙ্গে আবাল্য এমনই একাত্ম হয়েছি যে আজও মায়ের ইচ্ছের অবাধ্য হবার শক্তি হয়নি। জুলজুল করে ঊর্ধ্বপানে কফি হাউসের দিকে চেয়ে থাকতুম, গরিব লোকে যেমন চেয়ে থাকে বড় বড় মিষ্টির দোকানের দিকে, প্রেসিডেন্সি থেকে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ক্লাস করতে যাবার পথে, বন্ধুরা সবাই স্বাধীন, তারা দিব্যি কফি হাউসে যেত, কত কি ইন্টেলেকচুয়াল কথাবার্তা শিখত। (তখনও 'আঁতেল' শব্দ চালু হয়নি।) কিন্তু কফি হাউসে না ঢুকেও আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতুম তাদের তালে তাল মিলিয়ে চলতে। তাই নিত্যি নতুন শক্ত শক্ত শব্দ শিক্ষা নিতেই হত। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাচ্ছিল এক একটা নতুন ভাবনার জগৎ। 'ডায়লেকটিক্স', 'মাস্ মোবিলাইজেশন' 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার' এসব শিখতে না শিখতে, 'লং মার্চ' নিয়ে মুগ্ধ হতে না হতেই, এসে পড়ল 'প্যার্সোনালিটি কাল্ট'-এর নিন্দে। এবং একটা খুব জরুরি শব্দ শিখলুম : 'কমিটমেন্ট'। দুই অর্থে দুই ক্ষেত্রে দুই দিগন্তে—এক : আদর্শের প্রতি। দুই : ব্যক্তির প্রতি। কি নৈতিক বিশ্বাসে, কি ব্যক্তিগত সম্পর্কে, 'কমিটেড' হওয়াটা 'ইন্টেগ্রিটি'র লক্ষণ। আর 'নন্‌কমিটাল' যারা, তারা আসলে সুবিধের লোক নয় ! অর্থাৎ সুবিধাবাদী লোক। সতীর্থরা অকালপক্ক, আমি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এঁটে আর উঠতে পারছি না, ঝটপট্ শিখে ফেলছি ওপর-ওপর কিছু শব্দের জায়গা মতো ব্যবহার। যেমন, এই 'অথেনটিক' আর 'ফোনি', 'থিওরি' আর 'প্র্যাকটিস'। 'অ্যাটিচ্যুড', 'পয়েন্ট অব ভিউ', 'অ্যাপ্রোচ', এসব 'হ্যান্ডি' শব্দগুলো খুব কাজে লেগে যেত, যেমন কাজে লাগত 'লোকাস স্ট্যান্ডাই', কি 'ভ্যালু জাজমেন্ট'—'ভ্যালুজ' কিংবা 'লজিক্যালি ইনভ্যালিড' শব্দ-টব্দগুলো। 'হাইপোথেটিক্যাল' আর 'নাইভ' তো দারুণ শব্দ। 'সাবজেকটিভ' আর 'অবজেকটিভ'ও তাই। তখন এই শব্দগুলো ঠিক শব্দ ছিল না। যেন ফরমুলা ছিল। যেমন 'প্রবেবিলিটি' মাত্রেই 'রিমোট', আর 'আইডেনটিটি' হলেই 'বেসিক' হওয়া চাই। তখনও 'আইডেনটিটি' শব্দের জুড়িদার হয়ে 'ক্রাইসিস' উপস্থিত হয়নি আমার মননে, সেটা এল বছর দুয়েক বাদে 'এগজিস্ট্যানশিয়াল' শব্দের হাত ধরে। আরেকটা বিশ্বের দোর খুলে দিয়ে।

ফরাসি শেখবার আগে আগে বড্ডই ঝামেলা বাধাত তিনটে র-দিয়ে শুরু দীর্ঘ শব্দ। বাংলা বইতে নানারকমের উচ্চারণে লেখা হয়।—রেনেসাঁ ? রেনেশাঁ ? রেনেসান্স ! রেনেসাঁস ? রেনেশাঁস ? শাঁসালো সমস্যা।—রেস্টুরেন্ট ? রেস্টোর‍্যান্ট ? রেস্তোঁরা ? রেস্তোরাঁ ? চন্দ্রবিন্দুটি

দেয় কোথায় ? আর তৃতীয় শব্দটা তো আরও গোলমেলে। —রেনডেজভুজ ? রেনদেজভুজ ? রেন্দেজভু ? রেন্দেভু ? রাঁদেভু ? দূর ছাই—ট্রিস্ট কিংবা অভিসার ঢের ভালো ! (এ-শব্দগুলো আপনাকেও নির্ঘাৎ জ্বালিয়েছে ? বুকে হাত দিয়ে বলুন, জ্বালায়নি ?)

চোখের সামনে দেখলুম একই শব্দ পোশাক পালটে নতুন নতুন শব্দ হল। ছিল ফোনোগ্রাফ, হল গ্রামোফোন, তারপর রেকর্ডপ্লেয়ার তার থেকে হাই-ফাই, স্টিরিও, কত কী। ছিল রেডিওগ্রাম, হল টু-ইন-ওয়ান, থ্রি-ইন-ওয়ান, আরও বাড় বেড়ে এখন নাম মিউজিক সেন্টার। ছিলুম কলোনি, হলুম আন্ডার ডেভেলপ কানট্রি, তারপর ডেভেলপিং নেশন এখন তৃতীয় বিশ্ব। আরও কী কী হব, তা জানতে ব্যগ্র হয়ে আছি। বাবাদের এন্ট্রাস, দাদাদের ম্যাট্রিক, আমাদের ইশকুল ফাইন্যাল, ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক যেমন। কখনও কখনও শব্দ বদলায় বটে কিন্তু আর কিছুই বদলায় না। যেমন আগে ছিল 'পাশবিক অত্যাচারে'র যুগ আর 'ফুসলাইয়া লইয়া যাইবার' দিন। পরে বড় হয়ে বুঝেছি, 'পাশবিক অত্যাচার' পশুরা কখনওই করে না, ওটা কেবলই মানবিক অধিকারের এক্তিয়ারে পড়ে ! এবং 'বলাৎকার' মানে প্রচণ্ড মারধোর নয়। অন্যকিছু। তাই পশুদের নিস্তার দিয়ে এখন দিনটা হয়ে গেছে সোজাসুজি 'ধর্ষণ'-এর। তফাৎটা কেবল এই, যে 'পাশবিক অত্যাচার' শব্দটা দেখতে হলে 'আইন-আদালত'-এর পাতা খুলতে হত। এখন 'ধর্ষণ' শব্দ প্রথম পৃষ্ঠাতেই বুক ফুলিয়ে বিরাজ করে। যুগটা বদলেছে এইখানে।

যেমন, যার নাম ছিল, ভি-ডি, তারই নাম এস টি ডি হলো, কিন্তু তাতে তো অসুখটার পদোন্নতি হল না ? তবে একটি অসুখের বরং পদচ্যুতি হয়েছে বলা যায়। যা ছিল থাইসিস তাই হল টি বি কিন্তু 'রাজ-রোগ' আর নেই সে। নায়ক-নায়িকাদের মেরে ফেলতে হলে এখন টি-বি-তে শানায় না, ক্যান্সার চাই। গাঁয়ের লোকেরা আর কল্কেফুলের বিচি কি তুঁতেবিষ খেয়ে মরে না তারা খায় ফলিডল। এর নাম টেকনোলজিকাল প্রগ্রেস।

এই ঘূর্ণ্যমান, বর্ধমান, পরিবর্তনমান জগৎ, এ তো শব্দের রণপায়েই এগিয়ে চলেছে। রকেট থেকে স্পেসল্যাবে। চালের কন্ট্রোল থেকে কাপড়ের কন্ট্রোলে, তা থেকে বার্থ কন্ট্রোলে। টেস্টটিউব জানি. বেবিও জানি। কিন্তু দুটি শব্দ জুড়ে দিয়ে যেটি হল, সেই নতুন শব্দ কোথায় বাড়িয়ে দিল জানার সীমানা ! কে জানত পাঁজরার মধ্যে বসানো যাবে লোহার যন্তর, যা নাড়ীর গতি চালু রাখবে ? কে ভেবেছিল একজনের হৃদয় সত্যিই আরেক জনের বক্ষপিঞ্জরে ফিট্ করে দেবার মতো বিশ্বকর্মা জন্মাবেন ধরাধামে ? "হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট" শব্দটা এখনও আমাকে আশ্চর্য, রোমাঞ্চিত করে—হৃদয় যেন ধানের চারা।

এই 'পারমিসিভ্' সমাজে এখন কোনও শব্দই আর নিষিদ্ধ নেই। হাইস্কুলের কিশোর কিশোরীর মুখে কী সহজেই 'ফাক্' 'স্ক্রু' এই সব শব্দ চুইংগাম চিক্‌লেটের মতো এঁটে থাকছে। কিন্তু আমাদের কৈশোরে অজস্র নিষিদ্ধ শব্দ ছিল। শব্দের রহস্যময় একটা পৃথিবীই অনাবিষ্কৃত ছিল আমাদের কাছে, বড় হবার, চাবি পাবার অপেক্ষায়। আমাদের অনেক 'অসভ্য' শব্দ ছিল। যেমন 'কিস্'। বাচ্চাদের চুমু খায়, বড়রা কিস্ করে। বোধহয় মধ্যবিত্ত বাঙালি বড়দের চুম্বনের দৃশ্য আমরা ঘরোয়া পটভূমিতে কখনও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাই না বলেই, ওই মোহময় কর্মকাণ্ডটি ইংরিজি সিনেমার পর্দার অনুষঙ্গ নিয়ে 'কিস্' হয়ে এসেছিল আমাদের শব্দ ভাণ্ডারে। 'কিস্' এর সগোত্র শব্দ ছিল 'বয়ফ্রেন্ড', ছিল 'লাভ', আর লাভার' এবং 'লাভ ম্যারেজ'। এগুলো সবই ইংরিজি ক্রিয়াপ্রক্রিয়া। কিন্তু সম্বন্ধ করে যে-শুভলগ্নের শাস্ত্রীয় কর্মটি, তার নাম 'বিয়ে'। সেটা নিষিদ্ধ শব্দ ছিল না। প্রথাসিদ্ধ শব্দ ছিল।

আমেরিকাতে পড়তে গিয়ে আরেক প্রস্থ শব্দ শিখলুম। নতুন শব্দদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে মার্কিন সংস্কৃতি, মার্কিন সমাজকে চিনলুম। যাত্রাপথেই শিখে ফেলেছি, 'ফিয়াঁসে' শব্দের সালঙ্কারা মহিমা, অনামিকায় শোভা পাচ্ছে 'এনগেজমেন্ট রিং' এবং হৃদয়ে আছেন হৃদীশ্বর। হস্টেলে গিয়ে দেখি বান্ধবীদের জীবনে ঢেউ তুলেছে গায়ে-কাঁটা-দেওয়া সব লোমহর্ষক শব্দলহরী। 'ডেটিং, 'নেকিং', 'পেটিং'। 'লাভমেকিং' মানে প্রেম করা নয়, স্লিপিং' মানে ঘুমুনো নয় মোটেই। ইংরিজি জানতুম না তা তো নয় ? অথচ জানা ছিল না এও ঠিক ! 'শিট্' মানে যে হাশিশ, 'গ্রাস' মানে যে মারিহুয়ানা, এসবও কি জীবনে জানতুম ? বিষ্ঠা বা ঘাস যে খাবার জিনিস নয়, তাই

জানি। সেসব প্রথম চমক আমার জীবনে ভোলবার নয়। প্রথম যেদিন 'স্টোন্‌ড' শব্দটা শুনি তার নিষ্ঠুরতা কল্পনা করে কেঁপে উঠেছিলুম। এ কোন্ দেশ ? এখনও এখানে লিনচিং হয় ? যেমন হতো দক্ষিণে কাফ্রি ক্রীতদাসদের বেলা, দশ মিনিট ধরে হেসে বন্ধুরা বুঝিয়ে দিয়েছিল, 'স্টোন্‌ড' মানে ড্রাগ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়া—পাথর ছুঁড়ে মারা নয়।

এসব নতুন নতুন শব্দ বেয়ে আমি এক নতুন জগতে পৌঁছলুম। 'কিস্', 'বয়ফ্রেন্ড', 'লাভ ম্যারেজ'-এর জগৎ থেকে সেটা অনেক দূরে। 'ভি.ডি.' আর 'পর্নো' সেখানে জলভাত 'হোমোসেকসুয়াল' বেশ ফ্যাশনদুরস্ত, সমাজবিপ্লবী। 'গে', 'ডাইক', এসব শব্দের পায়ে পায়েই চলে এলো 'সেকসিস্ট' আর 'ফেমিনিস্ট' শব্দের যুগ। 'ব্ল্যাক ইজ বিউটিফুল', স্লোগানের পিছু পিছু এসে পড়লো 'লেসবিয়ান সিস্টারহুড'।

রাজনীতির বিপ্লব সরে গেল সমাজনীতির দিকে, তা থেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দিকে—জানি না এখন এটা কতটা সদর্থক আর কতটা নঞর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইংরিজি শব্দের মানে জেনেও বিশেষার্থ জানতুম না, এ তেমন লজ্জার নয়—বাংলাই কি ঠিক-ঠিক জানি ? 'নিজলিঙ্গাপ্পা' নাম নিয়ে আমরা কত হাসাহাসি করেছি কলেজে, 'রাধারমণ' নিয়ে তো কেউ হাসে না, নামটার অর্থ নিয়ে কেউ যে ভাবেই না ! এ না হয় গেল একে সংস্কৃত, তায় ঠাকুর দেবতার নাম—এটা সভ্য না অসভ্য ভাবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু সভ্যভব্য বাংলা চলতি শব্দেরই কি সব বিশেষার্থ সব সময়ে জানি ? আমার একটা নির্বুদ্ধিতার গল্প তো এক্ষুণি মনে পড়ে গেল। লন্ডনের ব্যাটারসি পার্কে গেছি হবু-স্বামীর সঙ্গে। উপবনে মুক্তবায়ু সেবনের উদ্দেশে গেলেও, গিয়ে দেখি হৈ-হৈ কাণ্ড রৈ-রৈ ব্যাপার, সেটা আসলে একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্ক। কোনি আইল্যান্ড বা টিভোলিপার্ক যেমন।

কালচক্রের মতো বিপুল এক ঘূর্ণ্যমান বৈদ্যুতিক নাগরদোলায় থেকে নেমে, আমার প্রাণেশ বললেন, "তুমি বন্দুক ছুঁড়তে পার ?" চারিদিকে বিমল আনন্দের বিচিত্র ব্যবস্থা। ধুড়ুদ্দুম করে গাড়িতে গাড়িতে ধাক্কা মেরে আনন্দ দিচ্ছে 'ডজ' এম কার'এর দোকান, ডিসুম্ ডিসুম্ গুলি মেরে বেলুন ফাটিয়ে আনন্দ দিচ্ছে রাইফেলশুটিং-এর দোকান। আমার তো শোক উথলে উঠল এই প্রশ্ন শুনে। 'আন্ডার ওয়েট' বলে এন সি সি-তে রিজেক্টেড হয়েছিলুম—অন্য বন্ধুরা দিব্যি কি সুন্দর বন্দুক চালাতে শিখে গেল !

"তুমিও শিখবে ? রাইফেল চালানো খুব সোজা"—এই বলে দ্রোণাচার্য শ্রীমতী অর্জুনের কাঁধে বন্দুক তুলে দিলেন।—"ট্রিগারে এই আঙুলটা রাখো, আর ওই যে মাছিটা দেখছ, ওই মাছির সঙ্গে লক্ষ্যবস্তু ও বন্দুকের নলকে একই লাইনে নিয়ে এসো। ব্যাস হয়ে গেল 'এইম' করা ! কই, ট্রিগার টানো ?" 'টানো' বললে কি হবে আমি আর ট্রিগার টানি না। টানবো কি, মাছি ? মাছিটা গেল কোথায়, তখন লন্ডন খুব পরিচ্ছন্ন, এখনকার মত শিথিল নোংরা, দীনদুঃখী চেহারা তার ছিল না। মাছি-টাছিকে পাত্তাই দিত না শহর লন্ডন। উনি আবার মাছি পেলেন কোথা থেকে ? মহা দুর্ভাবনায় পড়া গেল, অনেক চেষ্টা করেও ওঁর-দেখা মাছিটা আমি আর দেখতে পেলুম না। সে কি স্থির হয়ে বসে থাকার জিনিস ? শেষে ভয়ে ভয়ে বলেই ফেলি—"মাছিটা উড়েটুড়ে গেছে বোধহয়, দেখতে পাচ্ছিনে তো ?" শুনে অমর্ত্য হেসেই কুটিপাটি ! এই নাকি কবির বাংলা জ্ঞানের বহর ? বন্দুকের 'মাছি' চেনো না ? চিনব কী করে, বন্দুকই দেখেছি নাকি জীবনে ? এখনো যে-কোনও মেলার মাঠে বেলুন ফাটানো খেলা দেখলেই আমার 'মাছি'র গল্পটা মনে পড়ে যায়। ব্যাটারসি পার্কের সেই সদ্য-বাগ্‌দত্ত ছেলেমেয়ে দুটির জন্য মন কেমন করে। হায় বাক ! জীবনের তোড়ে তুমি কোন্ বনবাদাড়ে ভেসে যাও।

এরই নাম 'নস্ট্যালজিয়া'। অনেক সময়ে পুরনো শব্দ নতুন হয়ে যায়। যেমন এই 'নস্ট্যালজিয়া'। এটা তো ইশকুল থেকেই জানি ? ইংরিজি কবিতা প্রসঙ্গে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় শব্দটা। কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে তার মানে অনুধাবন করতে পারা অন্য জিনিস। বিদেশে পড়তে দূরে গিয়ে প্রথমে টের পেলুম শব্দটার ভিতরের বর্ণগন্ধ কেমন। তারপর শৈশব থেকে যতই দূরে চলে এসেছি, মূল থেকে যতই উৎপাটিত হয়েছি, 'নস্ট্যালজিয়া' শব্দ যেন ততই নিওনবাতিতে জ্বলজ্বলে হয়েছে মনের মধ্যে। 'নস্ট্যালজিয়া' ব্যাপারটার শ্রেষ্ঠ বর্ণনা ছিল লন্ডনের

একটি দেয়াল লিখনে : "Nostalgia isn't what it was !" অভিমান শব্দের ইংরিজি নেই সবাই বলি, কিন্তু 'নস্ট্যালজিয়া' শব্দেরও বাংলা হয় না। বাংলা নেই।

কোন্ মনিবের কেমন করে মন রাখতে হয় সেটা শব্দেরা দিব্যি জানে। একই শব্দ সবাইকে সমান সার্ভিস দেয় না। কবি, অকবি সবার বেলায়। একবার এ-ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম। করমণ্ডল এক্সপ্রেসে মাদ্রাজ থেকে কলকাতা আসছি, কামরায় আছেন একজন মিলিটারি অফিসার ও তাঁর বালকপুত্র (কেরালার ক্রিশ্চান তাঁরা), দুজন দক্ষিণী যুবক ব্যাংককর্মী ও আমি। বাচ্চাটি মার জন্য মন খারাপ করছে আর কামরাসুদ্ধ চেষ্টা করছি তাকে খুশি রাখতে। গান হলো, কাটাকুটি খেলা হলো, পেটাপেটি খেলা হলো, তাসের ম্যাজিক, জিওগ্রাফি গেম। সব দেশেরই প্রায় A দিয়ে নাম শেষ হয়, আর A দিয়ে আরম্ভ দেশ মাত্র কয়েকটাই! অতএব সে-খেলাও ফুরোল, এল word associations, শব্দের অনুষঙ্গ বেয়ে এগিয়ে চলার খেলা। বেশ জমেছে হঠাৎ 'ডেথ' শব্দটা বাচ্চা ছেলেটির ভাগ্যেই পড়ল। সবাই তটস্থ, ওইটুকু শিশু, ও আবার মৃত্যুর অনুষঙ্গে কী বলবে কিন্তু শিশু তখুনি উত্তর দিল 'হেভ্‌ন' ! সত্যিই তো, শিশুর মনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, মৃত্যুর পরেই স্বর্গবাস। আর এক রাউন্ডে বাচ্চাটির কপালে পড়ল 'লাভ' শব্দটা। অতটুকু ছেলে প্রেমের কী জানে ? জানে, জানে। কে বলেছে, জানে না ? বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করেই সে বললে : 'মেরী—যীসাস এ্যান্ড মেরী !'

আমি নিশ্চিত জানি, আরও দশ বছর এই গ্রহে বসবাস করবার পরে ওই ছেলেটি 'লাভ' শুনলে আর 'যীসাস অ্যান্ড মেরী' বলবে না। 'ডেথ' শুনলেও অমন নিঃসংকোচে উচ্চারণ করতে পারবে না 'হেভেন'। শব্দগুলি ওর জীবনে পুনর্জাত হবে, নতুন অনুষঙ্গে, পুনর্বিচারের পর।

অর্থাৎ ছেলেটা 'বড় হয়ে' যাবে। এই বড় হওয়া বড়ই আশ্চর্য শব্দ। শুনেছিলুম বড় হলে সবই সহজ হয়ে যায়। বুদ্ধিশুদ্ধি খোলে। চিন্তাভাবনা দানা বাঁধে, বোধ-বিশ্বাস পরিচ্ছন্ন হয়। অন্যকে উপদেশ দেবার অধিকার জন্মায়। বয়স যতই বেড়েছে, অধীর হয়ে ভেবেছি, এইসব অমৃতফল এবার বুঝি হাতে আসবে।

কিন্তু 'বড় হওয়া' যে এত গোলমেলে শব্দ তা কে জানত ? আমি তো দেখলুম, যতই বড় হলুম ততই জানার শিকড় শিথিল হল, দাঁত পড়ার মত বিশ্বাসগুলো খসে পড়তে শুরু করল টুপটাপ। অন্যকে বারণ করবো কি, উপদেশ দেব কি, নিজেই কি এখন আমি নিশ্চিত করে জানি আর কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ ? কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক ? কাকে কী বলবার অধিকার কতটুকু আমার আছে, আর কতটা নেই ? আগেই বরং বেশি স্পষ্ট ধারণা ছিল— কোনটা শাদা কোনটা কালো, কে দায়ী, কে দায়হীন, হ্যাঁ-না। 'বড় হয়ে জ্ঞানগম্যি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, অনিশ্চয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হারেই, জানা জিনিস ক্রমশ অজানা হয়ে যাচ্ছে। যতই সুবিচার আর নিরপেক্ষতা নিয়ে ঘামছে মাথাটি, ততই জট পাকিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধের সূক্ষ্ম তন্তুগুলোতে, গোল বাধছে মাথার মধ্যে। এ-ও হয়, ও-ও হয়। ইয়েস অ্যান্ড নো। বোধ আর সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না, বুদ্ধিকেই দায়িত্ব দিয়ে সরে দাঁড়ায়। বুদ্ধি আবার অতি সাবধানী। হুট্ করে কিছু করে না। সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে তাই কেবলই দেরি হতে থাকে। ভুল করবার ভয়ে কাজটাই করা হয়ে ওঠে না। অথচ কথা ছিল উল্টোটা হবে, 'বড় হলে' ভয়ডর ঘুচে যাবে, ভুল করার সম্ভাবনা মুছে যাবে। কত শক্ত-পোক্ত, কত নিশ্চিন্ত, নির্ভরযোগ্য শব্দ ছিল 'বড় হওয়া'। এখন তো খুব কাছে দেখতে পাচ্ছি—কী দুর্বল, কী করুণ, কী অনিশ্চিত চেহারা বেচারীর। কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর !

যদিও নিজেই বদলে যায়, বদলাতে বদলাতেও শব্দই আমাদের ইতিহাস-বিলগ্ন করে রাখে। বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না জীবন থেকে, সত্য থেকে। যতই বন্যা আসুক, সর্বস্ব যাক, ছিন্ন হয় না শব্দের অমূর্ত বাঁধন।

হলে কী হবে, কয়েকটা শব্দ, ধূপছায়া রং, কয়েকটা বিশেষ শব্দ চিরদিনই জ্বালিয়ে যায়। আধো-জানা, আধো অজানার আলো-আঁধারি ডোরাকাটা ঝিঝি-ঝুরু জংলা ছায়ার মধ্যে গা মিলিয়ে কেবলই তারা পালিয়ে বেড়ায়, ধরা দেয় না, নাগালে আসে না। —হঠাৎ হঠাৎ এক একবার মনে হয় এই তো, ধরে ফেলেছি—মুঠো খুলে আবার দেখি, কই, নেই তো ? তেমনি মধুকরী জাদুকরী

বেশ কয়েকটি শব্দ থেকেই গেছে জীবনে—মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যাবে—অথচ হাতটা বাড়িয়ে দিলেই দেখি ফাঁকা ধু-ধু করছে—ধূসর পর্বতের মত শব্দটা সরে গেছে দিগন্তে। এমনিই এক চালিয়াৎ জালিয়াৎ শব্দ 'প্রেম', এমনিই বুক ফাটানো শব্দ 'ঈশ্বর', এমনিই অধরা-বিধুর বোরখাপরা শব্দ 'মৃত্যু'—যার শুধু চোখদুটিই চেনা যায়। আর 'বয়স' ? সেও এক পিছল শব্দ—অত শত করেও যাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আরও একটা পিছল শব্দ আছে যে যাই-যাই করেও যায় না, বুকের মধ্যে মাটি কামড়ে পড়েই থাকে, নেপথ্যে জলের তলায় যেমন পা কামড়ে ধরে থাকে অদৃশ্য কুমিরে—আমৃত্যু...সেই শব্দের নাম, 'যৌবন'।

আমরা সব সময়ে খুঁজতে চেষ্টা করি একটা কোনও শব্দের লাঠি, একটা কোনও খুঁটি, নোঙর ফেলার মতো একটা কোনও শব্দকে চেপে ধরতে চাই। ছোটবেলায় যা ছিল 'বড় হওয়া', বড় হলে সেটা কী ? বুকের ভেতরে যতদূর যায় হাত বাড়িয়ে খুঁজতে চেষ্টা করি, যদি পাই কোনও একটা মূল শব্দ, প্রাণ ভোমরার কৌটোর মতো নিবিড় নিটোল অদ্বিতীয় কোনও শব্দ, যার বিহনে এই ফুলন্ত টকটকে শিমুলগাছ সাজানো, এই সাগরদ্বীপের প্রবাসী বাতাস-দেওয়া, মেঘরঙা সন্ধেবেলা নিয়ে চৈত্রমাসটাই মিথ্যে হয়ে যাবে, হিমালয় আর হাওয়াইদ্বীপ, দানিয়ুব আর কিউবা নিয়ে বিশ্বভুবন শূন্য হয়ে যাবে, যার বিহনে বাতাস নাস্তি, দিবস নিরালোক—আমার জীবনে কী সেই মূলশব্দ, সেই Keyword বলবামাত্র কেউই কি আর চট্ করে খুঁজে পাব ? অথচ প্রত্যেকেরই এমন দিন ছিল যখন শব্দটা ভাবতেই হত না। জীবনব্যাপিয়া ভুবন ছাপিয়া নির্নিমেষ জেগে থাকত সেই মূল শব্দ, প্রত্যেকে জানতুম, কেন বাঁচি। কে কোন্ খুঁটিতে নৌকো বেঁধেছি। আজকের কুড়ি বছর বয়েস কি আর উত্তরটা তেমনি করে জানে, আমরা যেমন করে জানতুম ? আজকের কুড়ি বছর শৈবালদলের মতো ভাসে, কি শিলার মতো ডোবে। সময়ের স্বকীয় চরিত্রেই। আমাদের বাবামায়েরা তো এখনও জানেন, ঠিক কোন্খানে তাঁদের নোঙর। দিশা হারিয়ে ফেলেছি আমরাই।

নিজের ভিতরে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝতে পারি শিবরাম চক্রবর্তী শেষ জীবনে কেন তিনটি শব্দ নিয়ে অমন খেলা করেছিলেন। ঈশ্বর। পৃথিবী। ভালোবাসা।

জীবনের এক এক সময়ে এই তিন শব্দের এক একটির কাছে আমরা বল ভরসা খুঁজি। তিনটি শব্দই পৃথিবীর সমান গুরুভার। সত্যিই তো, এই শব্দময়, শব্দসর্বস্ব জীবনে যা আমাকে ধরে রাখে, যা আমাকে গেঁথে রেখে দেয়—কী সেই মূল শব্দ ?—না, বয়েস এসে বাগড়া দিল না, জ্ঞানগম্যি, বুদ্ধিযুক্তি এসে দাঁড়াল না পথ জুড়ে। কুড়ি বছর বয়েসের সেই বোধ অবিকল উঠে এসে উত্তর দিয়ে দেয়। কিন্তু সেই উচ্চারণ বাজুক শুধু নিজেরই কানে কানে, গুন গুন করে, যেন দ্বিতীয় কানটি শুনতে না পায়, তাতেও নষ্ট হয়ে যাবে ওর জাদু। বোধ বলে : 'তোমার জীবনের শেষতম শব্দটি হোক—ভালোবাসা !' ও, ভালোবাসার কাছে যাবে ? বেশ তো, নিজের বুকের মধ্যে যাও। যাও তৃণগুল্মের কাছে। নদী বৃক্ষের কাছে। গৃহপালিত প্রাণীটির শান্ত চোখের কাছে যাও। এরা বলবে না, 'ভালোবাসি' ; বলবে না, 'আমি তোমার'। কিন্তু ভালোবাসা পেলে, শুধু তোমারই নিজস্ব হয়ে যাবে। তুমি না ছাড়লে এরা তোমাকে ছেড়ে যাবে না। ঈশ্বর যেমন। তেমনি পৃথিবী। তুমি চাইলেই আছে। যত কাছে চাও, তত কাছে।

আর 'মানুষ' ?

ও শব্দটাকে জড়িয়ো না বরং।

'ভালোবাসা' বড় ওজনদার শব্দ, বড় বেশি ভার তার। 'ঈশ্বর' কি 'পৃথিবী'র কাছে ওকে জমা রাখো, দেখো, ঠিক থাকবে। কিন্তু, মানুষ ? 'মানুষ' শব্দ যে বড় ভঙ্গুর। বড় হালকা পলকা, মধুমাধবী শব্দ, শৌখীন, যেন শোলার ফুল, বড় লঘু-মায়াবী, যেন ময়ূরপাখার মুকুট, অমন গুরুভার শব্দের ভর সইতে পারবে কেন ?

আসন্ন চৈত্র-সন্ধ্যার নোনা বাতাস আমার চুলে-গালে হাত বুলিয়ে শব্দবিহীন, নিঃশব্দ প্রগল্‌ভতায় বলে যায়, "পারবে, পারবে, দ্যাখোই না।"

শরতে আজ কোন অতিথি

জয় গোস্বামী

আজ ছুটি। দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাই আমি। ভুরু কুঁচকে যায়। রোদ, একটু চড়া, কিন্তু চমৎকার। রোদ, ডানা ভাসিয়ে দেবার মতো। বাড়িগুলো রোদ্দুরে অর্ধেক ডুবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেয়ালে রোদ্দুর লেগে নীচে নামছে। আমার কুঞ্চিত ভুরু স্বাভাবিক হয়ে আসে। এতক্ষণ ঘরে ছিলাম তো, তাই হঠাৎ চোখে অসুবিধে হয়েছিল আলোতে। বাড়িগুলো এত উজ্জ্বল, আগে বুঝিনি কেন? আকাশে তাকাই। আকাশও এত ঝকঝকে নীল আগে ছিল কি? ওই নীলের ভেতর দিয়ে 'মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে?' স্তূপ স্তূপ মেঘরাশি...কোঁকড়া চুলের ঝাঁক যেন ওই মেঘ পাহাড়। কত উঁচু, না? সেই মেঘের মাথায় লেগে কতখানি রোদ্দুর যে ছড়িয়ে যাচ্ছে আকাশ থেকে আরও দূর আকাশে, তার সীমানা পাওয়া যাবে না। তার থেকে সামান্য একটুই নিশ্চয়ই নামছে আমাদের এই শহরে, এই ছোট্ট মফস্বল শহরে। ছোট-ছোট দু' একটা টালির রান্নাঘর, তার একটার উপর লাউলতা তুলে দিয়েছেন সামনের বাড়ির মাসিমা...যদি ঢুকে পড়ি তবে দেখব দুটো আধভাঙা জানলা দিয়ে রোদ ঢুকেছে, আর তাতেই একেবারে ঝলমল করে উঠেছে আমাদের এই ঝুললাগা রান্নাঘর। জানলা-দিয়ে-আসা রোদ নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে তারপর ছড়িয়ে দিয়ে মাজা বাসন আলো করে দিয়েছে সামান্য সংসার।

মেঝেতে বাবু হয়ে বসে পড়ি। হাতে-গড়া গরম-গরম রুটি আর আলু-বেগুনের ঝালঝাল বাটিচচ্চড়ি। দারুণ হবে জলখাবার। ওপাশে নারকেল গাছের পাতাগুলো ছায়ারোদ্দুর নেড়ে দিচ্ছে থেকে-থেকে। পুকুরের আধখানায় ছায়া—ছায়া থেকে রোদ্দুরে বেরিয়ে এল দুটো হাঁস। রাস্তার ধারের বারোয়ারি কলতলাটাও কী সুন্দর লাগছে। কত বছর আগেকার পুরনো কলপাড়টা। আজ আমি ঘুম থেকে ওঠার আগেই যেন নতুন করে বাঁধিয়ে দিয়ে গেছে কেউ। ওই যে গোমড়ামুখো ভাঙা বাড়িটা, ওটাও আজ কী হাসিখুশি। এই রোদ্দুরের হাতে পড়েই নিশ্চয়। খুব গম্ভীর আর রাগী কোনও লোকের কাছে কোনও মেয়ে যদি গিয়ে খুব নরম গলায় কথা বলে, আবার হঠাৎ-হঠাৎ শাসন করে বা বকে দেয় তাকে, তাতে যেমন তার ভারিক্কি আর বিরক্ত মুখ খুব নিরুপায়ভাবে লাজুক আর ছেলেমানুষ হয়ে যায়, তেমনই। আকাশে ওই মেঘের স্তম্ভ এতক্ষণে ভাসতে-ভাসতে সরে এসেছে একটু, চলে এসেছে সূর্যের একটু আড়াআড়ি। আর সেই স্তম্ভের গায়ে ধাক্কা খেয়ে দিকে-দিকে ছিটকে যাচ্ছে রশ্মিরেখা—লম্বা-লম্বা কাচের পাত যেন। তার নীচে প্রয়োজন মত হাসছে, খেলছে, কান্নাকাটি করছে অথবা উৎসবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ব্যস্ত আর অন্যমনস্ক পৃথিবী...

এই রোদ প্রথম কবে দেখেছিলাম, এই পুজো-পুজো রোদ, সে-কথা আজ আর মনে পড়ছে না। স্কুলে একদিন দুপুরে ক্লাসরুমে বোর্ডের সামনে দাঁড়ানো মাস্টারমশাইয়ের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে বাইরে তাকালাম, দেখলাম স্তূপের মতো একঝাঁক মেঘ এসে দাঁড়িয়েছে আমবাগানের ওপর, পিছন থেকে রোদ বেরোচ্ছে, নীচে দু' একটা ধোঁয়ারঙের মেঘের টুকরো এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে। পিছনে আকাশে একটা অসম্ভব রকমের নীল রঙ...দেখা মাত্র মনে হয়, পুজো আসছে, মন নেচে উঠল। পুজোর অবশ্য তখন আসতে বেশ দেরি। হোক দেরি, কিন্তু মন জানল, আজ আমি উৎসবকে দেখলাম। এমন হয় না অনেক সময়, অল্প চেনা একটা মেয়ে একদিন এমন অদ্ভুত করে তাকাল, মনে হল আসলে এই মেয়েটি শরৎকালের। 'সাদা মেঘ দাবি করে একমাত্র আমাকেই দ্যাখো...' একটি কবিতায় লিখেছিলেন অলোকরঞ্জন। এই মেয়েটিও তেমনই, মুখে বলবে না, কিন্তু দাবি করবে ঠিক : আমাকেই দ্যাখো।

এই পুজো-পুজো দিনও সেটাই বলবে। আজ আর ঘরে থাকা নয়। বেরিয়ে পড়ো।

চূর্ণী নদীর ধারে যাওয়া যায়। বাড়ি থেকে দশ মিনিট হাঁটলেই নদী। একশো বছরের বেশি পুরনো স্কুল, তার সামনে নদী। আর নদীর পাশে, হ্যাঁ, বটগাছ। ১০ পয়সার খেয়া এপার-ওপার করছে। ঝুপঝাপ করে বৃষ্টি এল ঝেঁপে। গাছের নীচে দাঁড়াই। গায়ে ছাট লাগছে। পাতা থেকে বড় বড় ফোঁটা পড়ছে মাথায়। পাশেই বাঁশের মাচা বাঁধা চায়ের দোকান। ওই দোকানে, এই অসময়েও, চন্দন হাজির।

—চা খাবেন নাকি ?—খাই একটু। গায়ে বৃষ্টির ছাট লাগিয়ে ছোট্ট গেলাসের চা হাতে দাঁড়ানো। যাই, একটু নৌকো চড়ে আসি বরং। খেয়ানৌকোয় বৃষ্টিস্নান। নদী পেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বৃষ্টি ক্ষীণ, তারপর উধাও। এটা আইশতলা। এরপর সরু ইটের রাস্তা যেই পিচ-বাঁধানো পথে মিশল, অমনি সেটা রামনগর হয়ে গেল। পশ্চিমমুখো, সামনে গেলে এন এইচ থার্টিফোর। ওদিকে নয়, আমি যাব বাঁদিকে। দু'পাশ থেকে ঝাঁকড়া-মাথা গাছ দাঁড়িয়ে রাস্তা আবডাল করেছে। খেলবার সময় বড় দুটো বাচ্চা হাতে হাত দিয়ে ব্রিজ তৈরি করে দাঁড়ায়, আর ছোট বাচ্চাগুলো পিছন থেকে পরস্পরের জামা ধরে রেলগাড়ি তৈরি করে যেমন যাতায়াত করে ব্রিজের তলা দিয়ে, তেমনই। আমিও ব্রিজই পেয়ে যাব এক্ষুনি। সত্যিকারের ব্রিজ । এই রাস্তাটা, ছায়ারোদের জাফরি তৈরি-করা এই রাস্তাটা, যেই বাঁক নেবে, বাঁক নিল, অমনি আসবে উঁচু ব্রিজ। এইটা একটা মাঠ। এর পাশেই আবার সেই চূর্ণী নদী। এখান থেকে খানিক ঢালু খানিক খাড়াই পায়ে চলা পথ এঁকেবেঁকে উঠে গেছে ব্রিজে। ওই ব্রিজ থেকে ঝুঁকে নদী দেখতে কেমন লাগে আমি জানি। আপাতত তাই দেখছে ব্রিজের ওপর দাঁড়ানো দু'তিনটি ছেলেমেয়ে। নিজেদের মধ্যে খুব হাসছেও ওরা। আমি দাঁড়িয়ে আছি নীচের এই ঘাসের মাঠে। ওই ওপর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েছে ওরা। ওদের কি হাত নেড়ে ডাকব। ওরা জানে না রোদ্দুর আমার বন্ধু। বৃষ্টি আমার পাশের বাড়িতে থাকে। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কারণ মেঘ এক্ষুনি আসবে। মেঘ আমাকে আসতে বলেছে। তারপর আমরা সবাই মিলে যাব রেললাইনের ধারে কাশফুলের বাড়ি। ওই তরুণ তরুণীরা চলুক না আমাদের সঙ্গে। প্রতিবছরই পুজোর সময় এইরকমই যাই আমরা। যাই, আর কাশফুলের বাড়িতে খুব মজা হয়। প্রতি বছর, খুব মজা হয়...

॥ ২ ॥

মোটেই মজা হয় না। মেয়েরা বলে ঘণ্টা হয়। সেই, ঘণ্টা হয়। এতক্ষণ যা বললাম, প্রায় সবটাই বানিয়ে বললাম, মিথ্যে বললাম। ছোট থেকেই এই পুজো-পুজো রোদ আমার সহ্য হয় না। শরৎকালের রোদ গায়ে লাগলেই জ্বর আসে। এক্ষুনি বলেছি, ক্লাসঘরে বসে দেখলাম, বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর সাদা মেঘের ঝাঁক ভেসে যাচ্ছে গভীর নীল আকাশের ওপর দিয়ে আর মন নেচে উঠল পুজো আসছে ভেবে। তারপর কী হল ?—পুজো এল, কিন্তু তার সঙ্গেই এল প্রবল জ্বর। ঠাকুর দেখতে যেতেই পারলাম না। প্রায় প্রতি বছরই হত এমন।

নতুন জামা পরে দল বেঁধে পাড়ার মণ্ডপে চলে গেল বন্ধুরা। আমি লাল চোখ আর রুক্ষ চুল নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। তখন বিকেল তার হেলানো আলো ফেলেছে বাড়ির চারপাশের গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে। আস্তে-আস্তে এবার আরও কমে আসবে, ঝাপসা হয়ে আসবে এই আলো। তারপর মরে যাবে। গাছগুলো সব কালো হয়ে যাবে। আরও একটা পুজো এল। চলে গেল। এবারও ঠাকুর দেখা হল না। আর ক'দিন পরেই ওই গাছের পাতাগুলো সব হলুদ হলুদ হয়ে আসবে। পরীক্ষা পরীক্ষা হাওয়া দেবে। শীত শীত করবে, সেই সঙ্গে ভয় ভয়ও।

পরীক্ষা-পরীক্ষা হাওয়া মানে ? আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, সেই ষাটের দশকে, তখন স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষা হত নভেম্বরের তৃতীয় বা শেষ সপ্তাহে। হেমন্তে যেই নরম হত রোদ, পুজোর পর যেই জুড়িয়ে আসত চারপাশটা, উৎসব-উৎসব মেজাজটা উবে যেত কোথায়। বইপত্রে হাত লাগাতে হত। সন্ধে হওয়া মাত্র এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে ভেসে আসত সরু মোটা নানা গলায় নানারকম পড়া মুখস্থ করার আওয়াজ। দ্বিতীয় পানিপথ থেকে ভৌত পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন নিউটনের গতিসূত্র দূরত্বের-বর্গের ব্যস্তানুপাতিক থেকে ছিনাত বউরুপী বা এ হোস্ট অব

গোল্ডেন ড্যাফোডিলস...বিভিন্ন ক্লাসের বিভিন্ন পাঠ্য নানা বাড়ি থেকে উচ্চারিত হতে-হতে এক হয়ে তৈরি করত অদ্ভুত এক আবৃত্ত ধ্বনিপুঞ্জ, যার একাংশ মাত্র বোঝা যেত, বাকিটা শুধু বেঁচে রইত গমগমে একটা আওয়াজ হয়ে। চারদিকে সেই পড়া মুখস্থ করার আওয়াজ। জানলা দিয়ে শীত-শীত হাওয়া। শুনতে পাচ্ছ, বাবু মিলু কেমন পড়তে বসে গেছে। শোনো, শেখো! এক্ষুনি তো ঢুলবে। বুলুর মা বলছিলেন বুলু রাত চারটেয় উঠে পড়তে বসে যায়। ওরা কত এগিয়ে গেছে...

ওরা কত এগিয়ে গেছে? কত? কত?—সারা বছর অসুখে আর অমনোযোগিতায় পড়াশুনা-না-করা ছেলেটির থেকে কত কত এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, প্রতি মুহূর্তে তার কাছে পরীক্ষা এক ভয়। অষ্টমী আর নবমীর দিন ঠাকুর দেখতে যাওয়া হল না, কিন্তু জ্বর গায়ে বারান্দায় বসে থাকতে-থাকতে মাথায় এসে গেল, পাতার হলুদ হয়ে আসা আর পরীক্ষা-পরীক্ষা হাওয়ার চিন্তা। চিন্তা আর ভয়। মাথা আর জেগে থাকতে চায় না। শুয়ে পড়ে মেঝেতে। বারান্দায়। মেঝেতে শুতে নেই, ঘরে চলো। মা নিয়ে আসে ঘরে...রুক্ষ চুল লাল চোখ নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসা, একটু পরে ঘরে এসে শুয়ে পড়া—এই ছিল আমার পুজোর মজা। অধিকাংশ পুজোর মজা। নতুন জামা একটাই হত। দুটো কোনও বার। কিন্তু পরে ঠাকুর দেখা হত না। থাক, পরের বারে হবে। তোলা থাকল।—নতুন জামা পরের বছরের দিকে উড়ে যেত। পরীক্ষা, সে-ও দেওয়া হল না একবার। সময়মত তৈরি হতে পারিনি। পরের বার দেওয়া হবে। ক্লাসে ওঠা? তাহলে সে-ও পরের বার?—ভয় কী?

সন্ধের মুখে খাটে শুয়ে পড়তাম, আর চোখ দিয়ে পড়ত গরম গরম জলের ফোঁটা, ছিঃ, কাঁদে না। আবার জ্বর বাড়বে। কাছেই মণ্ডপ, আরতির ঘণ্টা কাঁসি ঢাকের শব্দ আসছে। এটা দক্ষিণে। পশ্চিমে আরও পুজো। আসলে একটাই পুজো ছিল। ঝগড়া করে দু' টুকরো হয়ে দুদিকে চলে গেছে। দু'দিক থেকে ভেসে আসছে আরতির শব্দ। কত কত মানুষজন এখন মণ্ডপে মণ্ডপে। এর মধ্যে ঘুম এসেছে কখন। ঘুমের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে, গভীর রাত্রিতে জেগে উঠে পড়া মুখস্থ করছে সবাই। এ-পাশে থেকে বাবু মিলু পড়ছে, ওদিক থেকে আলো-শঙ্কররা পড়ছে, জোরে জোরে পড়ছে, পুকুরের ওপার থেকে পড়ছে আশিসদা আর তাপস, পিছনের বাড়ি থেকে রেবাদি, খুটুদিরা পড়ছে, পড়ছে রমা বুলুরা, রানা ঝুমুররা সবাই একযোগে পড়ে চলেছে, মাঝরাতের স্কুল কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের ক্লাসের সবাই চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়ছে, সব ক্লাস থেকে সব ছেলে পড়ছে। টেবিলে বেত আছড়াতে-আছড়াতে স্যারেরাও পড়ছেন। কেউ ধুতি শার্ট পরে চেয়ারে বসে ঢুলতে-ঢুলতে পড়ছেন, কেউ পিছন পিছন ফিরে চক দিয়ে বোর্ডে লিখতে-লিখতে পড়ছেন, ডাস্টার দিয়ে সেই বোর্ড মুছতে-মুছতে পড়ছেন কেউ: সবাই, সবাই, সমস্ত স্কুল মাঝরাত্রে দুলে-দুলে পড়া মুখস্থ করছে। আর আমি ঢুকতে পারছি না ক্লাসে, কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি। কত কত এগিয়ে যাচ্ছে ওরা? হঠাৎ সমস্ত স্যার আর ছাত্ররা চেঁচিয়ে পড়া পড়া বলতে-বলতেই লাইন করে দাঁড়াল স্কুলের সামনের মাঠে। এখন কি প্রেয়ার হবে? কিন্তু না, আমাদের এন সি সি টিচার এসে দাঁড়ালেন, তিনিও কী একটা পড়া বলছেন, অমনি সবাই মার্চ করতে শুরু করল। পড়া বলতে-বলতে আর মার্চ করতে-করতে ছাত্র আর শিক্ষকরা সবাই স্কুলের মাঠ পেরিয়ে কেষ্টপুরের বিল যেদিকে, সেদিকে চলে গেল। কত কত এগিয়ে গেল ওরা, ওদের আর দেখা গেল না, পিছনে পড়ে রইল মস্ত স্কুল বাড়িটা, আর তার কম্পাউণ্ডে মাঝরাত্রে বইখাতা হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। ঠিক তক্ষুনি পরীক্ষা-পরীক্ষা হাওয়া দিতে লাগল, আমি ভয়ে কাঁদতে লাগলাম, কেউ এসে পিঠে হাত রেখে বলল, ছিঃ কাঁদে না, ঘরে চলো...

সেই থেকে ঘরেই আছি শরৎকালে। আজ এত বছর পরেও শরৎকালের রোদ আমার পক্ষে বিষ। লাগলেই জ্বর। বৃষ্টি, তাও বিষ। বৃষ্টিতে ভিজলেই সেই জল আর পা বেয়ে মাটিতে নামবে না। হাওয়া শুকোবে না। বুকে জমে যাবে। হ্রদ তৈরি করবে। ডুবিয়ে দেবে ফুসফুস। প্লুরিসি? এখন আস্তানা নিয়েছি শহরে। অফিস যাই, খানিকটা ভয়ে-ভয়ে। সাবধানে-সাবধানে। কিন্তু শরৎকাল আমার সঙ্গে শত্রুতা করবেই। ক'দিন আগে যেমন।

শরীরে অল্প জ্বর আছে। হাতে আছে একটা লেখা। শেষ করতে পারছি না। জ্বরটাকে অল্পেই থামাতে হবে। বাড়তে দিলে চলবে না। কারণ সময় নেই আর, বাড়িয়ে নিতে হবে লেখাটাকে।—অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোলাম, বাড়ি ফিরে লেখা নিয়ে বসতে হবে। হেঁটে গিয়ে মেট্রো ধরব। কালীঘাট স্টেশনে নেমে অটো ধরে গড়িয়াহাট। সেখান থেকে আবার টুকটুক করে হেঁটেই ডোভার লেন। আস্তানা। চট করে হয়ে গেল।

ওয়াটার্লু স্ট্রিট অবধি আসতেই ঝেঁপে বৃষ্টি। কোনও দোকানের নীচে দাঁড়াতে গেলাম, সেখানে আগেই হুড়োহুড়ি করে লোক দাঁড়িয়ে গেল। কোনওমতে মেট্রো স্টেশন। কালীঘাটে নামলাম, যাক বৃষ্টি নেই। মেঘলা করেছে। শেষ দুপুর। অটোর পিছনে উঠতে গিয়েও পারলাম না, সবাই সবল।

একাধিকবার যুদ্ধে হেরে অবশেষে সামনে উঠলাম। আর রোদ্দুর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে গেল আকাশে। অর্ধেক শরীর পুড়তে লাগল তীব্র, তির্যক রোদে। কাচের মত রোদ। ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে এসেই সেই রোদ বদলে গেল একঝাঁক উড়ো বৃষ্টিতে। অটোয় বসেই ভিজতে লাগলাম। কোনওমতে বাড়ি যখন পৌঁছলাম, শীতে শরীর কাঁপছে। মনে পড়ল ক'দিন আগেই একটা দোকান ঘরের ছায়ায় ফুটপাতে অন্তত আধ ঘন্টা দাঁড়িয়েছিলাম। পথে নামতে পারছিলাম না। কারণ, বড় রাস্তা আর ও-পাশের ফুটপাত রোদে ভেসে যাচ্ছে। আর আমার গায়ে ছিল এমনই অল্প জ্বর। মানুষ আচ্ছাদনের নীচে দাঁড়ায় বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য। আমি দাঁড়িয়েছিলাম রোদের থেকে বাঁচবার জন্য।—আজও তেড়ে জ্বর এল। এক ঘন্টার মধ্যেই অফিস। অফিস যাওয়া বন্ধ। লেখা বন্ধ। পুজোর নতুন জামা পরের বার পরা হত, ঠাকুর দেখা পরের বার হত। পরীক্ষা আর ক্লাসে ওঠাও কখনও-কখনও পরের বার হয়েছে, এবার থেকে লেখাও কি তবে, শিবরামের কথামতো, পরের দিন হবে ?

॥৩॥

সেভেনে পড়ি যখন, তখন আমাদের স্কুলে একবার শরৎ কবিতাটি নিয়ে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। এসেছে শরৎ হিমের পরশ...তিন সেকশন মিলিয়ে ৫৫ জন। প্রথম দিকটায় খুব মন দিয়ে শুনছি—কেউ ভুলে গেল, ভাবছি, কী বোকা, এই জায়গাটা ভুলে গেল। দারুণ উৎসাহ। বোধহয় জনা দশেক পর্যন্ত ছিল এই উৎসাহ। তারপর এক সময়, কে কী বলছে কিছুই আর ঢুকছিল না মাথায় ! কখন শেষ হয়ে গেছে, মনেও নেই। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত শরৎ প্রকৃতির অজস্র বর্ণনা—পড়ে আসছি। তার মধ্যে কয়েকটি আছে সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ : তাদের ধরছি না। অমূল্য সম্পদ বেশি হয় না। কিন্তু লিখিত হয় অনেক। সাধারণত, বছরের এই সময়টায় পাড়ার পুজোর স্যুভেনীরগুলি থেকে খবর কাগজের ক্রোড়পত্র পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে কিছু পরিমাণে পুরাণচর্চাও। মানুষের জানবার আগ্রহ সীমাহীন। রাত্রিকালীন আকাশের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে, ওই তারাটি কোথায়, কীভাবে ওই তারায় পৌঁছানো যাবে ? সমুদ্র দেখে সে জানতে চায় তার অতল, অথবা পেরিয়ে যেতে চায় তাকে। পাহাড় দেখলেই সে লঙ্ঘন করে। কিংবা তার চূড়ায় উঠে পতাকা তোলে ও চকলেট খায়। প্রতি বছর পুজোর আগে সে আর-একবার শরৎকালের প্রকৃতি বিষয়ে জানবেই। দেবীর উৎপত্তি থেকে অসুরনিধন পর্যন্ত বিষয়টাও জানতে হবে তাকে। তা ছাড়া কত রকম গুঁড়ো আর তেল মুখে গায়ে লাগাতে পারলে আমাদের ঘরের মেয়েরাও বিজ্ঞাপনের মতো ঝলমলে করবে, তা জানার পক্ষেও এটা বেশ ভাল সময়। মানুষের জানবার আগ্রহও যথেষ্ট। আশা করি, আমার জ্ঞান পিপাসাও একদিন সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

বিখ্যাত ব্যক্তিরা বচ্ছরকার দিনে কে কী খাবেন, তাও খুব জানতে চায় মানুষ। জেনে, বেলা বারোটা একটা নাগাদ, নিজের বাড়ির মেনুর কথা ভেবেই হয়তো, উস আস্ ইস্ আঃ এইসব করে। আমি তেমন খাদ্যরসিক নই। কীসের কী মাহাত্ম্য, জানি না। তবে চারপাশের মানুষ, যাদের সঙ্গে বারো মাস থাকি সেই পড়োশিপ্রতিবেশীরা, কে কী বলছে কানে আসে।

বিশুর বাবা বলেন : বাব্বা, চার দিনই এত এত সব, আমরা এক দিনই পারব না। চন্দন বলে,

আরে কী লিখেছে দ্যাখো। বলছে, 'কটা গলদা চিংড়ি খাব সে-হিসেব দিতে পারছি না—বাপরে! তিলক যাবি নাকি? চল, দুপুরে খাওয়ার সময় হাজির হয়ে বলি, আমরা আপনার খুব ফ্যান, আলাপ করতে এলাম।' মন্টুদা বলে, 'এবার তো হল না। পরের বার বোনাস পেলেই কী-কী মেনু হবে চার দিন, লিখে রাখো এখনই। কাগজটা নষ্ট কোরো না।'—

অতসী বৌদি মুখ ঝামটা দেয়, 'থাক্, খুব হয়েছে! সব কথাতেই তো শুনি এর পরের বার।'—

বুঝতে পারি, আমার পুজোর জামা, ঠাকুর দেখা, আর পরীক্ষা ও ক্লাসে ওঠার মতো মধ্যবিত্তদের অনেকই তো পরের বার আছে।

অতসী বৌদি বলে : ওদের ভাগ্যে আছে তাই হচ্ছে। ক'জনের ভাগ্যে হয় অমন?—

ক'জনের ভাগ্যে হয়? ক'জনের?—আর তাই, বাকি সব করে রব।—ক'জনের?

আমার কী? আমার তো সুখাদ্য সহ্যই হয় না পেটে—কী মজা! কী মজা!

এরা সবাই মফস্বলের লোক। নিম্ন মধ্যবিত্ত। বিশুর বাবার আছে একটা রেডিও সারাইয়ের দোকান। ছেলে কাজ করে বিহারে। কোনওরকম একটা চাকরি। যথাসাধ্য পাঠায়। চলে কোনমতে। মন্টুদা সিনেমা হলের কাউন্টারে বসে। চন্দন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি। বড় ছেলে। ভাই বোন ছোট। এঁরা কাগজ পড়েন। কারও হয়তো রোজ কেনার সামর্থ্য নেই। রবিবারে একটা কেনা হয়। কিংবা উৎসবের দিনে। কাগজের সঙ্গে বিনামূল্যে একটা বই পেলে কাড়াকাড়ি করে পড়া।

শেফালিদির ছেলে টাপু। বয়স ১০। স্কুলে যায়। শেফালিদি ৪৫ কিংবা ৪০ কিংবা ৫০। বোঝা যায় না। রানাঘাট হাওড়া রোজ যাওয়া-আসা। তারও কাজ ওষুধের কোম্পানিতে, কারখানায়। স্বামী অকালমৃত। কখনও সুশ্রী ছিলেন। আজ তার চিহ্ন শেষ হয়ে গেছে। শেফালিদি মানে একটা কালো ছাপ।—

টাপু জানতে চাইছে। নানা কিছু—যেমন, মা ক্যারামেল পুডিং কী? আমি খাব।—ছোট কোর্সের খাওয়া কাকে বলে? ফটিকবাবুর মিষ্টির দোকানে কি রাবড়ি পাওয়া যায়?—অফিস থেকে আসার সময় রাবড়ি আনো না কেন?—এইসব। খাটের ওপর থেকে সে বলছে। তাকে ছোটখাটো উত্তর দেওয়া ও থামানো হচ্ছে।

—মা, গলদা চিংড়ির মালাইকারি করো না কেন? আমি একদিনও খাইনি!

—অ্যাই, খেয়েছিস। বাজে কথা বলছিস যে। আমাদের অফিসের মালিকের ছেলের বিয়েতে গিয়ে তোর জন্য নিয়ে এসেছিলাম না? মনে নেই?—

—সেইটা নাকি? সে তো একদিন মোটে। আর একদিন খাব!

—খেও। বড় হও, মানুষ হও। তখন খেও।

—না, এখন খাব। এখন।

—ঠিক আছে। ভাল করে পরীক্ষা দাও, পাশ করো, তখন দেখা যাবে।

—ঠিক তো?

—বললাম তো, দেখা যাবে।

টাপুও মানুষ। সে-ও পাহাড় দেখলেই লঙ্ঘন করতে চায়। বলে : বেশ। কিন্তু কটা খাব, তা কিন্তু বলতে পারছি না।

আঃ, হ্যাংলামি কোরো না। তুমি কি খেতে পাও না বাড়িতে? কেন যে [illegible]ব লেখে!...

'ও কী কথা শিপু!'—এবার শেফালিদির মা কথা বলছেন—সত্তর পেরিয়েছেন তিনি—'নিজেরা খাই না খাই, গণ্যমান্য লোক কী খাচ্ছে, কী পরছে, জানতে পারছি, সে কি কম কথা!'

মানুষের জানবার আগ্রহ প্রবল। আমার জ্ঞানপিপাসাও তবে একদিন সীমা ছাড়িয়ে যাবে আশা করি।

আমার এক বন্ধুর বাবা, সাহিত্যপ্রেমিক, পুজোর দিনে উঠোনে ঢুকে-পড়া বাচ্চা-কোলে একটা বউকে দেখে বলেছিলেন : 'এই পুজোর দিন কটাও তোমরা একটু ছাড় দিতে পারো না বাবা।

পুজোর সময় সব দোকানও তো কিছু-কিছু ছাড় দেয়...'

আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। একবার অষ্টমীর দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে বারান্দায় বসে পুজোসংখ্যা পড়ছি। একজন বয়স্ক লোক ঢুকল। কিছু সাহায্য করেন, বাবা। মুখের দিকে তাকালাম। লোকটি বলল : 'ভিক্ষা না, কিছু সাহায্য দেন।' লোকটির হাতে একটা বাঁশের ছাতা। পায়ে চটি। ছেঁড়া, কিন্তু চটি। ভিখিরিদের পায়ে জুতো থাকে কি, কুষ্ঠরোগী ছাড়া ? নীল হাফশার্ট। সেটাও ছেঁড়া। কোথায় থাকেন, জিগ্যেস করতে, যথারীতি, কেঁদে ফেলল। স্টেশনে। লোকে উৎপাত করে না ? অন্য ভিখিরিরা ?—করে, ছোঁড়াগুলো হাড়বজ্জাত। মায়ালোকগুলাও। সেটাই হওয়ার কথা। দেখেই আন্দাজ করা যায় লোকটি সদ্য ভিক্ষুক হয়েছে। 'সদ্য চাকরি পেয়েছে' বা 'সদ্য বিয়ে করেছে'-র মতো দেখেই বোঝা যায়। কয়েক মাস আগেও সে একজন ঋণ-ও দুর্দশা-গ্রস্ত গরিব গৃহস্থ ছিল। এই মুহূর্তে স্টেশনের পেশাদার ভিক্ষুকরা তাকে ভাল চোখে দেখবে না। ভাববে, একটা বাড়তি লোক। বলবে হুঁ, গুমোর কত। লোকটিরও নোংরার মধ্যে বসতে শুতে অসুবিধে। তা ছাড়া, সেও কখনও নিজেকে ঠিক-ঠিক ভিক্ষুক ভাবতে পারবে না, সে তখন অতিমাত্রায় অভিমানী হয়ে আছে। তাই পুরনোরা তো বটেই, ছেলেছোকরারাও যারা কেউ ওই স্টেশনেই জন্মেছে ও বড় হচ্ছে—তারা সবাই তেড়ে লাগবে ওর পিছনে। লোকটির সত্যিই অবস্থা খারাপ।

আমি একটা আধুলি দিতে গেলাম তাকে। নিল। কিন্তু তার মধ্যেই দেখে ফেলল পাঞ্জাবির ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা আমার সাদা পৈতেটাকে। নতুন পৈতে পরেছি। গতকাল। বলল : 'আপনেরা বামুন ?' 'হ্যাঁ, কেন ?'—তবে দুটি ভাত দেন। তখন আমাদের দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে। ভাত নেই। রাত্তিরের রুটি রাত্তিরে হবে। আছে একটু তরকারি। কী দেব ? বোঝাবার চেষ্টা করলাম। বুঝল না। শেষে আর একটা আধুলি দিলাম। দিয়ে রেগে গেলাম ! একটাকা গেল। লোকটি তবু অনুনয় বিনয় করতে লাগল। শেষে, হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে যখন, দরজা থেকে জিগ্যেস করল : আপনেদের এইখানে কি আর কোনো বামুনবাড়ি আছে দাদা ? কেন, বামুনবাড়ি কেন ? না, তাইলে, একটু ভাত খাইতাম। বামুনবাড়ি ছাড়া তো আর ভাত খাইতে পারি না, বলেন...

চিন্তা করো ! সমস্ত গেছে। নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে গেছে। তবু বামুনবাড়ি ছাড়া খাবে না। কী সাংঘাতিক ! আমরাও সেইরকম। জানি যে কোনও লাভ নেই, তবু এইসব বিষয় নিয়ে লিখব, সমাজ সংসারের এত অদ্ভুত নিয়মনীতি নিয়ে খোঁচা দেব, কথা বলব, সমালোচনা করব। তবু কোথাও একতিল কিছু বদলাবে না। উৎসবে আমোদে অপচয় পল্লীতে-পল্লীতে ঝলমল করবে বিদ্যুতে। মানুষের পান-ভোজন আর রঙতামাশার উল্লাস আরওই ফেনিল হয়ে উঠবে। আর সেসব কথা জানাবার বিক্রম ক্রমে-ক্রমে ঢেকে দেবে আমাদের ছোট্ট ছোট্ট ঘরগুলো। আমরা হাঁ করে দেখব। হাঁ করে শুনব। হাঁ করে গিলব। পেট ভরে যাবে আমাদের !

বিকেলে চন্দনের বাড়ি গেছি। টাপু ঘুরছে। ওরা চন্দনের প্রতিবেশী।

—'দাড়িমামা, এই দ্যাখো এঁকেছি।' রোজই কিছু-না-কিছু আঁকে ছেলেটা। আমাকে আর চন্দনকে দেখায়। আমরা কত বুঝি ! তবু তারিফও করি। আঁকুক। আজ দু'পাতা জুড়ে এঁকেছে লম্বা একটা আজব প্রাণী, মুখের কাছে দাঁড়া, না শুঁড় ? মুখের নীচে আঙটা-দেওয়া একটা বালতি-মতো পাত্র। এটা কী এঁকেছিস রে ?—এটা তো সেই গলদা চিংড়িটা, সেটা আমি খাব। চন্দন বলে, কী মস্ত রে, ওটা তো রাক্ষুসে চিংড়ি হয়েছে।

—হোক, আমি ওটাই খাব।

—আর মুখের কাছে এটা কী ?

—ওটা হচ্ছে রাবড়ির বালতি। চিংড়িটা রাবড়ি খাচ্ছে...

মস্ত একটা ক্যানভাস। ঘরের মাঝখানে রাখা। ক্যানভাসের ওপর নানা ভাবে হেলানো, ভাসমান সব সুখাদ্যের ছবি। তেল-রঙ। একটা কোনায় মস্ত একটা গলদা চিংড়ি। রান্না করা। অন্য পাশে সুদৃশ্য একটা থালার ওপর চুড়ো করে রাখা ফ্রায়েড রাইস। নীচের দিকে ভাসছে মুখ-খোলা রাবড়ির হাঁড়ি। এক পাশে বাটি-উপচানো মাছের মাথা। মুরগির রোস্ট-করা ঠ্যাং,

সেও ক্যানভাসে ভাসছে। আর কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ পটাং করে ক্যানভাসে একটা ফুটো হয়ে গেল। গলদা চিংড়ি উধাও। সেখানে একটা গর্ত। পটাং করে ক্যানভাসে আর একটা গর্ত হয়ে যায়। রাবড়ির বাটিটা নেই। আবার একটা ফুটো। এবার মুরগির ঠ্যাং পালিয়েছে। একটু ঝুঁকে দেখতে গেছি। গর্ত দিয়ে টাপু উঁকি মারে। অ্যাই, চিংড়িটা কই। —আমি খাচ্ছি। ঝোল আর কাই মাখা এঁটো মুখে টাপু হাসল। তারপর আধখাওয়া চিংড়িটা হাতে নিয়ে বসে পড়ল, ক্যানভাসের পিছনের দিকদিশাহীন অন্ধকারে। এবার আর-একটা গর্তের মধ্যে তাকাই। ধু-ধু করছে মাঠ। দুটো-একটা শুকনো নারকোল গাছ। দুটো-চারটে পরিত্যক্ত ভাঙা চালাঘর। কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই। ধুলো উড়ছে মাটিতে। আকাশে উড়ছে শকুন। পাক দিয়ে উড়ছে। ওই কি তবে সেই পদচিহ্ন ? মন্বন্তরে মানুষহীন হয়ে যাওয়া দুই শতাব্দী আগের সেই গ্রাম ?—ধুলো উড়ছে, ধুলো উড়ছে মেঘের ভিতরে যাওয়া-আসা-করা উড়োজাহাজের মতো এই দৃশ্য একবার ভেসে উঠেই ডুবে যাচ্ছে একবার ধুলোঝড়ের মধ্যে...এর বেশি আর কিছু আমাদের অধিগত নয়।

॥ ৪ ॥

ওই যে গ্রাম দেখা গেল, ক্যানভাসের ওই গর্তের মধ্য দিয়ে ভেসে উঠল ওই যে দূর দিগন্তরেখা, উড়ে বেড়ানো চিল-শকুন, সেই গ্রামে, কত আগেকাব সেই পদচিহ্নে সত্যিই কি কখনও পৌঁছতে পারবে কেউ ? সময়-যানে উঠে মানুষ কি কোনও দিন পৌঁছবে অতীতে ? কে জানে ? সমরজিৎবাবুকে জিগ্যেস করতে হবে একদিন। কিংবা পথিক গুহকে। আপাতত ঘরে বসে থাকি। নিজের ঘরে। আর অফিসঘরেও। সিনেমা দেখতে ক্বচিৎ গেলাম। সেখানেও পাত্র-পাত্রী ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠে-রাস্তায়। ওই দ্যাখো, রোদ পড়েছে। গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা দেখি রোদ্দুরে নামল। অফিসে বসে আছি, কেউ এল। কিংবা বাড়িতে। কপাল থেকে আঙুলে মুছে ফেলল ঘাম, উঃ, যা গরম বাইরে। শরৎকাল তো। ছাতা নেন না কেন। নাঃ, ছাতায় অনেক ঝামেলা, বইতে হয়। হারিয়ে যায়। এই ভাল।

এই ভাল বলতে পারব, আমি ? পারবনা। ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াবে রোদ্দুরে। মেঘ, যেমন-ইচ্ছে ভেসে যাবে। সাদা মেঘ। আমার নদীয়ার মদনপুর রানাঘাট, পায়রাডাঙা, বীরনগরের রেললাইনের ধারে-ধারে কাশ ফুল দুলবে। আমার দেখা হবে না। ছোঁয়া হবে না। ঘোরা হবে না। আমি দাঁড়িয়ে থাকি সেই দরজার সামনেই। জানলা দিয়ে চেয়ে থাকি। পুজো পুজো বোদ। মেয়েরা একটা-দুটো প্যাকেট হাতে নিয়ে দোকান থেকে পথে নামে। কাশ ফুল মাথা দোলায় কোথাও। মেয়েরা সুন্দর করে চোখ তোলে। আমি মনে-মনে দেখি। মনে-মনে নামিয়ে নিই চোখ। কাউকে বলি না। হাসবে। হাসে। সুস্থ মানুষরা বলে, বাতিক। সবলে আর দুর্বলে ভাগ হয়ে আছে পৃথিবী। বলি না। রোদ্দুরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকি। আরও, আরও কুঁচকে যায় আমার ভুরু। জানলার ভেতর, রৌদ্রহীন ছায়ায় ভেঙেচুরে যায় মুখ। ছায়া. মুখ পুড়িয়ে দিতে থাকে। দেখো, সময় যদি পাও, দেখো একবার তাকিয়ে, জানলার শিকের ওপারে ছায়ান্ধকারে জ্বলছে একটুকরো অঙ্গার। জ্বলছে, জ্বলছে, তাবপর জ্বলতে-জ্বলতে এক সময় ছাই হয়ে যায়...

কিন্তু ছাই যখন, তখন তো সে আর বন্দি থাকবে না। হাওয়ার একটা ঢেউ এসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবেই। রোদ্দুরে-রোদ্দুরে খুব ঘুরে বেড়াবে তখন সে। বৃষ্টি তাকে ভেজাবে যখন-তখন। ওই সব মদনপুর শিমুরালি পায়রাডাঙা পালপাড়ার ছোট-ছোট পাড়ায়, বাড়িঘরের পিছনে-পিছনে অতসব পুকুর-ডোবা ঘিরে-থাকা বড়-বড় কচুর পাতায়, আর সেখানে জমে-থাকা ফোঁটা-ফোঁটা শিশিরে, আধভাঙা বাড়ির ফাটলে-ফাটলে জেগে-ওঠা নতুন-নতুন চারাগাছগুলোয় অথবা ছোট-ছোট ইট-বাঁধানো গলিতে, গাছের নীচে টিউকলে জল-নিতে-আসা বউ-ঝি-দের ঝগড়া কিংবা হাসির দমকে চলবে সে, ভেসে ভেসে চলবে, মোড়ে আর রোয়াকে আর চায়ের দোকানের গুলতানির মধ্যেও মিশে গিয়ে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে আড্ডা দেবে সে ! তারপর একসময় কোনও পাড়ার মাঠে গিয়ে ঘাসে-ঘাসে ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর দেবী সরস্বতী এক দিন

পাঠাবেন তাঁর ছাত্রীকে। সব জেনেশুনেও যে একদিন নিজে থেকেই আসতে চাইবে। সব জেনেশুনেই, যে এসে খুঁজে নেবে তাকে। শিশির আর শিউলি গাছ থেকে, ঘাস আর ঘাসফুল থেকে, ধানের সারি আর কাশগুচ্ছ থেকে নতুন করে তৈরি করবে তার মুখ। ভাঙাচোরা মুখ নয়। তরুণ, কোমল, স্মিত মুখ। দু'হাতের মধ্যে নেবে। বলবে : এত দিন পালিয়ে বসে ছিলে কেন ?

কেন অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে যেতে চেয়েছিলে ? গভীরতম অন্ধকার থেকে রৌদ্র প্রকৃতির দিকে, বৃষ্টি প্রকৃতির দিকে তুমি কি এতকাল ধরে বারবার জেগে ওঠোনি ? সেসব কি ধরা নেই তোমার স্মৃতিতে ? সব ভুলে গেছ ?—কেন ? কেন তুমি এ-রকম হয়ে আছ ?—ওই দ্যাখো, পুজো এসে গেছে। ওই দ্যাখো, খোলা বইয়ের মতো নিজেকে মেলে ধরেছে পৃথিবী। তার এক পৃষ্ঠায় সমুদ্র বইছে, এক পৃষ্ঠায় দুলছে অরণ্য, এক পাতায় রোদ্দুর উঠেছে, এক পাতায় বৃষ্টি নামল...। তোমার তো কত পড়া বাকি আছে—চলো, এবার আমরা একসঙ্গে পড়ে দেখি, চলো...

ওই ওরা বেরিয়ে পড়ল দিগন্তের দিকে।

বাংলায় রম্যরচনা

অমলেন্দু বসু

বাংলা ভাষায় রম্যরচনার ইতিহাস বাংলা গদ্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। বস্তুত, শুধু বাংলা ভাষায় কেন, বাংলা ভাষার সঙ্গে যেসব বিদেশী ভাষায় লিখিত রম্যরচনার সংযোগ বা সাদৃশ্য লক্ষ্যসাধ্য, সেখানেও দেখতে পাই, রম্যরচনার উৎপত্তি ও প্রসার সেসব ভাষার গদ্যসাহিত্যে। ইংরেজি শব্দ Eassay হচ্ছে এক-শ্রেণীর রচনার নাম। যেমন বলি, চার্লস্ ল্যাম্-লিখিত Essays of Elia নামক বইখানা হচ্ছে ইংরেজি গদ্যে রচিত একটি সাহিত্যগ্রন্থ। কিন্তু আবার এ-ও লক্ষ করি যে, আঠারো শতকী ইংরেজ কবি আলেকজাণ্ডার পোপ্-এর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম হচ্ছে An Essay on Criticism। তবুও ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে এ-কথাটাই মানা হয় যে, Essay শব্দটি দিয়ে ফরাসি এবং ইংরেজি ভাষায় একটি বিশেষ ধরনের গদ্যরচনা বুঝতে হবে। আমাদের বাংলা শব্দ 'রম্যরচনা' এই বিশেষ ধরনের গদ্যরচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। রম্যরচনার শৈলী হচ্ছে গদ্যেরই শৈলী।

এই শৈলীর কোনও বৈশিষ্ট্য আছে কি? সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্ন আসে, গদ্য কাকে বলি? গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য দিয়ে কি রম্যরচনা সৃজিত হয়। ইয়োরোপীয় ভাষায় গদ্যকে বলা হয় 'প্রোজ্', 'প্রোজা', 'প্রোজা অরেশিয়ো' অর্থাৎ আধুনিক ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি সরল বাক্য, সোজাসুজি কথা। ছন্দে, সুরে, মিলে, জড়িয়ে বললেই বাক্যটির রূপ হয়ে যায় অলঙ্কারসমৃদ্ধ, কিন্তু 'প্রোজা' বা 'গদ্য' হচ্ছে সেই অলঙ্কার বর্জিত, সাদামাটা কথাটি। আমাদের বাংলা ভাষায় 'গদ্য' বলতে বুঝি, "কথ্যভাষার ন্যায় পদছন্দোবদ্ধহীন রচনা।" এই বাগর্থ মেনেও একটি কথা আমাদের নিয়ত স্মরণ রাখতে হবে যে, গদ্যই হচ্ছে সর্বজাতির মানুষের নিজ-নিজ ভাষায় সর্বক্ষণের কথা-বলার শৈলী। আমরা সর্বক্ষণ গদ্যে আত্মপ্রকাশ করি, যদিও স্থানবিশেষে এবং প্রয়োজন-নির্ভরে আমাদের মুখনিঃসৃত গদ্যে নানাভাবে সুর ও তান মিলে যেতে পারে। গদ্য দিয়ে যেমন প্রয়োজনের কথাবার্তা বলা হয়েছে চিরকাল, তেমনই গদ্য দিয়ে সৌজন্যের প্রকাশ করা হয়েছে, বিরাগের প্রকাশও করা হয়েছে, অবসর-বিনোদনের আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত, গদ্যের প্রকাশ-শক্তির পরিধি যেন অশেষ, সেই শক্তি যেন মানুষের সমগ্র সত্তার সঙ্গে সমাত্ম। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় গদ্য ছিল কথিত ভাষা কিন্তু লিখিত ভাষা ছিল পদ্য। এই তারতম্য প্রচলিত ছিল দীর্ঘকাল অবধি। এ সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি উক্তি স্মরণীয় ("বঙ্গসাহিত্যে গদ্যের উদ্ভব, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা"): "বাঙ্গালা কাব্যে পয়ার-প্রাধান্য গদ্যরীতির উদ্ভবকে আধুনিককাল পর্যন্ত ঠেকাইয়া রাখার একটি কারণ। বহু শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে ইহা এমন একটা সহজ মসৃণতা লাভ করিয়াছিল, লেখকের বক্তব্য ও মনোভাবের সহিত ইহার এমন একটা চেষ্টাহীন সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠিয়াছিল যে সমস্ত কাব্যপ্রচেষ্টা অতীতের এই কারুকার্যহীন সাধারণ ছাঁচে যেন একটা অনিবার্য মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইতে চাহিত।" এ-কথা বলার পরে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মহামূল্যবান কথা বলেছেন: "পয়ারের মধ্যে পদ্যরীতির ছদ্মবেশে গদ্যরীতির প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বই খাঁটি গদ্যের প্রয়োজনীয়তাবোধকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।"

২

গদ্যশৈলী যে কথোপকথনে ব্যবহৃত হত, তার মূল্যবান ফল দেখা গিয়েছিল বাংলা ভাষার ক্রমবিস্তৃতিতে ও ক্রমগভীরতায়। একটি মূল্যবান ফল তো দেখা গিয়েছিল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের অন্ত্য-মধ্যযুগে, যে-কালে কাহিনী-কথনের প্রচলন খুব বেড়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথের

রচনায় আমরা দেখতে পাই ঐতিহাসিক কাহিনী-কথন, সেইসঙ্গে দেখতে পাই, অলৌকিক জগতের বৈচিত্র্য, এবং তা'ছাড়া অতিসাধারণ ঘটনার ও দৃশ্যের সমাবেশ। রূপকথার শৈলী অবনীন্দ্রনাথের রচনায় হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি অরূপরতন, যেমন জার্মান লেখক হাইন্‌স্ মোদে'র এবং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রচনাশৈলীতে গদ্যের এক আশ্চর্য উল্লাস।

বাংলা গদ্যের মৌখিক রূপ যখন এহেন শক্তি ও বৈচিত্র্য অর্জন করল, অর্জন করল উনিশ শতকের গোড়ায়, তখন বাংলা পদ্যের ও বাংলা গদ্যের—দুই শ্রেণীর লিখন-পদ্ধতিতেই বেশ কিছু নূতন আঙ্গিক প্রবেশ করতে লাগল। বাংলা পদ্যের তো কতরকমই আঙ্গিকের সংখ্যা বাড়ল এবং পদ্যের আগন্তুকদের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সনেট হল সবচেয়ে বেশি শক্তিমান। গদ্যরচনার অনেক নতুন আঙ্গিকের মধ্যে ঐশ্বর্যশালী আঙ্গিক বলে আত্মপ্রতিষ্ঠ হল রম্যরচনা। এ-রচনা অবশ্যই গদ্যমাধ্যমে রচিত, এ-রচনায় পাঠকের চিত্তে সুরের ও ভাবের সমন্বয় সাধিত হয়, এ-রচনায় ঐহিক জীবন আবার সেইসঙ্গে কল্পজীবন দুই-ই বর্ণিল এবং ঐশ্বর্যময় হয় এবং হতে পারে। এ-রচনা শুধু তথ্য আহরণ এবং দৈহিক প্রয়োজন চরিতার্থ করে না, এ-রচনায় আত্মিক ও মানসিক তৃপ্তিলাভ হয়। ফরাসি ভাষায় Belle Letters যাকে বলা হয় (অর্থাৎ beautiful literature; literature as one of the fine arts; fiction poetry drama imaginative prose as distinguished from technical and scientific writing), গদ্যের মাধ্যমে এই ধরনের উচ্চাঙ্গের ভাবনা ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় সতেরো শতক থেকেই শুরু হয়েছিল কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যে এর গভীরতম প্রকাশ হয়েছিল রোমান্টিক যুগে, উনিশ শতকের গোড়ায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে ধরুন চার্লস্ ল্যাম্-লিখিত রচনাটি, Dream Children, যার তুল্য রম্য-রচনা ইংরেজি ভাষায় নেই, যে-রচনায় তাঁর কল্পিত (আজীবন তিনি অবিবাহিত ছিলেন) সন্তানদের সঙ্গে তিনি বসে আছেন; অথবা ধরুন The Superannuated Man—কাজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত মানুষ—এ-হেন উচ্চ সৃষ্টি তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি অসাধারণ কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন। এই রচনাতেই আমরা belles-letters—সুন্দর রচনা, অপরূপ রম্যরচনা পাই।

রম্যরচনা ইংরেজি সাহিত্যে শুরু হয়েছিল আঠারো শতকে; উনিশ এবং বিশ শতকে তার বৈচিত্র্য বিকশিত হয়েছিল, সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উচ্চশ্রেণীতে। সেই প্রতিষ্ঠার উচ্চতা আজও অম্লান। শুধ রম্যরচনার লেখক হয়ে অনেকে ইতিহাসে উজ্জ্বল আসন পেয়েছেন: চেস্‌টারটন, এমার্সন, জর্জ মূর এবং আরও কয়েকজন। আমাদের সাহিত্যে উনিশ শতক থেকেই কোনও-কোনও লেখক প্রবন্ধ-রচক হয়েছেন, তাঁদের বিষয় হয়েছে হয়তো সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থা, নতুবা ধর্মের ও দর্শনের তত্ত্ব অথবা শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তাশীল উক্তি। যে-কথা তাঁরা বলেছেন, সেগুলি দৃঢ়সংবদ্ধ উক্তি কিন্তু স্বচ্ছ। বিগত শতকের মধ্য যুগে বাংলা দেশে কয়েকজন মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল; যথা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ, তাঁদের বাক্যে, কর্মে যে-শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল তার ফলে এদেশ অগ্রগতির পথে চলতে পেরেছিল। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগামিতা আরও উজ্জ্বল হল যখন বাংলা গদ্যের বহুবিধ উন্নতি তো হলই, সেইসঙ্গে রম্যরচনার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল। সাহিত্য-জাতীয় চেতনা—ধর্মবুদ্ধি এ-সব গভীর তাত্ত্বিক বিষয় আজও আমাদের রচনায় প্রবল, কিন্তু সেইসঙ্গে কিছু তরুণ লেখক সৃজনী কর্মে যোগ দিয়েছেন এবং আমাদের ভাষার গদ্যরচনার দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। এ-ধরনের লেখক সংখ্যা কম নয়, কিন্তু যেহেতু এই সংক্ষিপ্ত রচনাটি নামসমৃদ্ধ ও বিস্তৃত হওয়ার উচ্চাশা রাখে না, রচনাটি প্রধানত রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করে ক্ষান্ত হবে। জীবনের প্রায় সব দিকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর দৃষ্টিপাত করেছেন। ভাষা ও সাহিত্য (সমালোচনা, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য); ইতিহাস; স্বদেশ ও সমাজ; কালান্তর। অল্প কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হল, কিন্তু একথা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, যে-বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করেছেন, আলোচনা করেছেন, তাঁর বিশ্বধৃত দৃষ্টি সমগ্র মানব জীবন আপন সংবেদনার অন্তর্গত করেছেন। রম্যরচনায় বাংলা সাহিত্যেব উজ্জ্বল সম্পদ।